হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি

أصول الحديث

হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি

أصول الحديث

আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া
সিনিয়র মুহাদ্দিস. জামিয়া শার্‌ইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭
সহকারী মহাসচিব. বাংলাদেশ কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড,
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ

মাকতাবাতুল আযহার
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি

[পরিমার্জিত ও সংযোজিত ২য় সংস্করণ]

গ্রন্থনা

আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল আযহার

আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

৩য় প্রকাশ

আগস্ট ২০১২

২য় প্রকাশ

এপ্রিল ২০১০ ঈ.

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ২০০৯ ঈ.

বর্ণবিন্যাস

আব্দুল্লাহ আল ফারুক ০১৯১১৫২৫০৭০

প্রচ্ছদ ডিজাইন

সালসাবীল

মূল্য

২০০.০০ দুইশত টাকা মাত্র

Hadis Oddoyonar mulnity

By Abul Fatah Muhammad Yahya,

Published by Maktabatul Azhar.

1st Edition at July-2009.

2nd Edition at April-2010.

3rd Edition at August-2012.

Price : Taka- 200.00 Only.

মালিবাগ জামিয়ার মুহ্‌তামিম, স্বনামধন্য শায়খুল হাদীস, উস্তাজুল আসাতিযা হযরত মাও. কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ দা. বা.-এর

বাণী

نحمده، ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد :

বস্তুতঃ ইলম হল মহান আল্লাহ তা'আলার সীফাত। সেই ইলমের অবিধায় অভিসিক্ত হয়ে মানুষ জ্ঞানবান। যে ইলম মহান আল্লাহ তা'আলার সীফাত সেটাই মূলত ইলম। এর বাইরে পৃথিবীতে জ্ঞানের যত ধারা বহমান সবই মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। সে জ্ঞান মানুষের জীবন জীবিকাকে সহজতর করে, জীবন চলার পথকে গতিময় করে, জীবনকে ভোগময়, বিনোদন বহুল করে মাত্র; কিন্তু মনুষ্যত্বের উত্তরণে কোন পথ দেখায় না। কিন্তু ঐশী উৎসধারা থেকে সঞ্জাত জ্ঞান মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, মানুষের আখলাক ও নৈতিকতাকে পূর্ণতা দান করে। ইনসানিয়্যাতকে পৌঁছায় কামালাতের চূড়ান্ত পর্যায়ে।

ঐশী খাযানা থেকে উলূমে ইলাহিয়্যাহকে দু'টি উৎস ধারার মাধ্যমে যমীনবাসীর জন্য সরবরাহ করেছেন মহান আল্লাহ তা'আলা। তার একটি কিতাবুল্লাহ ও কালামুল্লাহ, আর অন্যটি হল সুন্নতে রাসুল তথা আহাদীসে রাসূল। দুটোই উলূমে ওয়াহী। তবে একটি প্রত্যক্ষ ওয়াহীর মাধ্যমে সরবরাহকৃত; কিন্তু তা মুজমাল সংক্ষিপ্ত তথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণহীন। আর অন্যটি পরোক্ষ ওয়াহীর মাধ্যমে সরবরাহকৃত; কিন্তু অতিসংক্ষেপ ও অস্পষ্ট নয় বরং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ ও প্রেক্টিক্যাল নমূনা সম্বলিত।

সুতরাং কালামুল্লাহ থেকে মুরাদুল্লাহ তথা আল্লাহর মানশা ও মর্জি বুঝতে হলে সুন্নতে রাসূলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তা বুঝতে হবে। এছাড়া দুসরা কোন পথ নেই। ভিন্ন পথে বুঝতে গেলেই নির্ঘাত বিভ্রান্তি। আল্লাহর মানশা ও তার মনোনীত দ্বীন ইসলামকে বুঝতে হলে আহাদীসে রাসূলের আলোকেই তা বুঝতে হবে।

হাদীস শাস্ত্র এক মহাসমুদ্র। সেই অতলান্ত সাগর সন্তরণের জন্য প্রখর মেধা, প্রবল স্মৃতিশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য যেমন প্রয়োজন; তেমনি এতদসংক্রান্ত উসূল ও মুলনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকাও অপরিহার্য। এ বিষয়ে আরবী ভাষায় প্রচুর গ্রন্থাদি রচিত হলেও আমাদের বাংলা ভাষায় কোন মূল্যবান গ্রন্থ অদ্যাবদি রচিত হয়নি।

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের সিনিয়র মুহাদ্দিস স্বনামধন্য লেখক বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা আমার একান্ত স্নেহভাজন মাও. আবুল ফাতাহ বহু পরিশ্রম করে এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় একটি তথ্যবহুল, সুবিন্যস্ত, মূল্যবান গ্রন্থ তৈরী করেছেন। আমি বইটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখে দিয়েছি। আমার বিশ্বাস এ গ্রন্থের দ্বারা উসূলে হাদীসের বিষয়টি ছাত্রদের জন্য খুবই সহজবোধ্য হয়ে উঠবে। সাধারণ শিক্ষিত যারা হাদীস চর্চা করতে চান তাদের জন্যও এ গ্রন্থটি যথেষ্ট সহায়ক হবে। হাদীস চর্চার বিষয়টি যে মুক্তচিন্তার বিষয় নয়, বরং হাজারো নিয়মনীতির পথ মাড়িয়েই এ ময়াদানে অবতীর্ণ হতে হয় এই অনুভূতিটুকু জন্মালেও মুক্তচিন্তার বিভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা সহজ হবে।

পরিশেষে লেখকের জন্য দু'আ করি আল্লাহ তাকে এ ধরণের ইলমী খিদমাতে জীবন উৎসর্গ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(আল্লামা) কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ
মুহ্‌তামিম, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ

প্রকাশকের কথা

পবিত্র কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। চিরন্তন আলোর উৎস। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ-নিসৃত হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা। শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। এ হাদীসের অধ্যয়ন ও চর্চা হতে হবে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে। নীতিমালা এড়িয়ে হাদীসচর্চার প্রয়াসে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। এতদসংক্রান্ত নীতিমালা ও মূলনীতিগুলো মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় উসূলে হাদীস ও উলূমুল হাদীস নামে পরিচিত।

আরবী ও উর্দূ ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তর কাজ হয়েছে। সে তুলনায় বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে রচিত বই-পুস্তক খুবই সীমিত। পাঠকদের এ প্রয়োজনটুকু মেটাতে প্রয়াসী হয়েছেন জামিয়া শার্‌ইয়্যাহ মালিবাগের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, গবেষক ও সুসাহিত্যিক হযরত মাও. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (দামাত বারাকাতুহুম)। লেখকের এ বইটি আলোচ্য বিষয়ে একটি অনন্য গ্রন্থ। হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতিগুলোকে লেখক অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় খুব দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন।

আমার বিশ্বাস বইটি হাদীসের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকবৃন্দের পিপাসা মেটাতে সক্ষম হবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকদের জন্যে রেফারেন্সবুক ও প্রামাণ্যগ্রন্থের কাজ দেবে। বিশেষকরে যারা উলূমুল হাদীসের ছাত্র এবং যারা ফযীলত–২ জামাতের ছাত্র, শরহে নুখবা পড়েন কিংবা তাকমীল জামাতের ছাত্র, উলূমুল হাদীস সম্পর্কে অধ্যয়ন করছেন তাদের জন্য এ গ্রন্থটি খুবই উপযোগী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভালো নম্বর লাভের জন্য খুবই সহায়ক হবে। এ ভাবনা থেকেই আমরা গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। ছাত্ররা উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের এ খিদমাতকে কবূল করুন। আমীন।

প্রকাশক

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ

মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

লেখকের বক্তব্য

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি মানুষকে সৃজন করে তাদের রাহনুমায়ীর জন্য উলূমে ওয়াহী ও উলূমে নবুয়্যত তথা কুরআন ও সুন্নাহকে সরবরাহ করেছেন। দুরুদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মদ সা.-এর উপর যাঁর উম্মত হতে পেরে আমরা গর্বিত। বস্তুতঃ কুরআন ও সুন্নাহ হল ইসলামের মূল ভিত্তি। এরই আলোকে গড়ে উঠেছে ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক, ইবাদত, মুআমালাত ও মু'আশারাত সব কিছুই। ইসলামী জীবন-দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবনাচার, ব্যাবহারিক দর্শন, নৈতিক ভিত্তি, মন ও মননের বিষয়-আশয় এবং ভোগ ও বিনোদন সব কিছুর মূলভিত্তি হল কুরআন-হাদীস।

বস্তুতঃ হাদীস হল ইসলামী শরীয়তের বিশ্লেষণধর্মী ভিত্তি, যার আলোকে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে গোটা শরীয়ত। হাদীস ও সুন্নাহ থেকে শরীয়তকে অনুধাবন করতে হলে সুন্নাহ বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা প্রয়োজন। আর এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে এর মূলনীতি সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন অপরিহার্য। হাদীসসমূহের শুদ্ধা-শুদ্ধি যাচাই, নির্ভরযোগ্যতার পর্যায় নির্ণয়, কোন একটি হাদীস প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার যোগ্য কি না? হাদীসটির সনদে বা মতনে কোন ত্রুটি আছে কি না? একটি হাদীস অন্য কোন হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক কি না? হাদীসটির বিধান রহিত হয়ে গেছে কি না? ইত্যাদি সবই মূলনীতির আলোকে নির্ণীত হয়ে থাকে। এটি অতীব কঠিন একটি বিষয়। প্রচণ্ড স্মৃতিধর ও প্রখর মেধার অধিকারী না হলে এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করা যায় না।

ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান অঞ্চলের কওমী মাদ্রাসাসমূহে এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী রচিত نزهة النظر في شرح نخبة الفكر নামের একটি গ্রন্থ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমনিতেই বিষয়টি কঠিন, তার উপর সে কিতাবের ভাষা অন্যন্ত সংক্ষেপ ও জটিল বিধায় বিষয়ের মর্ম উদ্ধার করে ছাত্রদের জন্য তা পাঠ করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে। তাছাড়া লেখক যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন; এ কারণে তিনি তাঁর মাযহাবের প্রাধান্য দিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের ছাত্ররা হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও সে কিতাটিই পাঠ করে থাকে। এ বিষয়ে যেহেতু একটিই কিতাব পড়ানো হয়, ফলে ছাত্ররা অনেক ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়। শাফেয়ী মাযহাবের মূলনীতিকে নিজেদের মূলনীতি হিসাবে ধারণা করে বসে।

তদুপরি এ বিষয়ের আরবী পরিভাষাগুলোর বাংলা মর্মার্থ কি তা অনুধাবন করতে না পারার ফলে পরিভাষাগত জটিলতার কারণে বিষয়টির দুর্বোধ্যতা আরো বৃদ্ধি পায়। অথচ নিজস্ব ভাষায় মর্ম অনুধাবন করে বিষয়টি পাঠ করতে পারলে আমাদের ছাত্ররা এ বিষয়ে আরো অনেক বেশী দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারত নিঃসন্দেহে। তাছাড়া আলেম নয়; এমন বাংলা ভাষাভাষী গবেষকরা হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি সম্পর্কে নাওয়াকিফ থাকার কারণে এক্ষেত্রে তারা মুক্ত চিন্তার পথ অবলম্বন করে ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকেন। তাদের সামনেও এসব মূলনীতিগুলো থাকা প্রয়োজন। তাহলে তারা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

এসব ভাবনা থেকেই বিষয়টিকে হানাফী মাযহাবের আলোকে আমাদের নিজস্ব ভাষায় রূপান্তরিত করার একটা আগ্রহ নিজের মাঝে অনুভত করি। সে আগ্রহের ফসল 'হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি' নামক বক্ষমান এই গ্রন্থ।

বস্তুতঃ উলূমুল হাদীস একটি পৃথক শাস্ত্র। আল্লামা মাহমূদ আত্-তাহ্হান এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন-

هو علم بأصول وقواعد يعرف به احوال السند والمتن من حيث القبول والرد

উলূমুল হাদীস এমন কতিপয় নিয়ম-নীতির সমষ্টিকে বলা হয় যদ্বারা গ্রহণীয় ও বর্জনীয় হওয়ার প্রেক্ষিতে সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।[১]

আমাদের ভাবনা অনুসারে সংজ্ঞাটিতে ومن حيث المعنى المراد والفوائد المستبطة منه لهداية البشرية (অর্থাৎ -এবং হাদীসটির প্রকৃত অর্থ ও তাথেকে মানুষের হিদায়াতের জন্য উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়) এই বাক্যটি বর্ধিত করে দিলে সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ হত।

উলূমুল হাদীসকে দুইভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়। যথা :

১. علم الحديث المتعلق بالرواية রিওয়ায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলমে হাদীস।

২. علم الحديث المتعلق بالدراية অর্থ ও ভাব অনুধাবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলমে হাদীস।

আমাদের দৃষ্টিতে এদু'টি বিষয়ের সংজ্ঞা সহজবোধ্য করে নিম্নোক্তভাবে দেওয়া যায়।

১. ইলমুল হাদীস বির্-রিওয়ায়াহ-এর সংজ্ঞা

هو علم يبحث فيه عن طريق وصول الحديث الينا اتصالا وانقطاعا وعن حالة الرواة ضبطا و عدالة أو صحة وضعفا

---

১. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ১৫।

যে শাস্ত্রে আমাদের পর্যন্ত হাদীসগুলো পৌঁছার প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিচ্ছিন্নসূত্রে পৌঁছেছে না অবিচ্ছিন্নসূত্রে পৌঁছেছে এবং রাবীদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের স্মৃতিশক্তি, সংরক্ষণগুণ, বিশ্বস্ততা এবং তিনি গ্রহণযোগ্য না যয়ীফ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমুল হাদীস বির্-রিওয়ায়াহ বলা হয়।[১]

২. ইলমুল হাদীস বিদ্-দিরায়াহ-এর সংজ্ঞা

هو علم يبحث فيه عن الفاظ الحديث من حيث المعنى والمطالب باعتبار القواعد العربية والأصول الشرعية – وعن الفوائد المستنبطة منها لهداية البشرية–

যে শাস্ত্রে আরবী ভাষার নিয়ম-কানূন ও শরীয়তের মূলনীতির আলোকে হাদীসের আক্ষরিক অর্থ ও ভাবার্থ এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য তাথেকে উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমুল হাদীস বিদ্-দিরায়াহ বলা হয়।[২]

আমরা বক্ষমান গ্রন্থে ইলমুল হাদীস বির্-রিওয়ায়াহ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। আর ইলমুল হাদীস বিদ্-দিরায়াহ সম্পর্কে হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

উলূমুল হাদীসের এবিষয়টি একসময় আমাদের দেশে ততটা গুরুত্বের সাথে পড়া বা পড়ানো হত না। বর্তমানে এর গুরুত্ব বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যবহুল সুবিন্যস্ত গ্রন্থ খুবই প্রয়োজন ছিল। অধমের ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়া আসলেই সম্ভব ছিল না। তবুও নিজের যোগ্যতার চেয়ে ছাত্রদের প্রয়োজন পূরণের চেতনা আমাকে বেশী উৎসাহিত করেছে। সে হিসাবে ছাত্রদের সামনে এ বিষয়ে একটি সুবিন্যস্ত প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বিস্তারিত আলোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ, মনীষীদের মতামতের সমাহার ঘটিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে প্রত্যেকটি বিষয়ে ছাত্ররা যেন একটি প্রাথমিক স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করতে পারে সে বিষয়টিই আমার মূল লক্ষ্য ছিল। কতটা সফল হয়েছি পাঠকরাই তার বিচার করবেন।

উলূমুল হাদীসের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকের পক্ষ থেকে দাওরায়ে হাদীসের ক্লাশে 'উলূমুল হাদীস' নামে একটি বিষয় চালু করা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য পৃথক কোন পুস্তক নেই। ফলে ছাত্ররা তথ্যসংকটে ভোগে। সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পুস্তকের শুরুর দিকে হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও উলূমুল হাদীসের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নামে দু'টি

---

[১] মিফতাহুস-সা'আদাত খ:২ পৃ: ৫২ তে প্রদত্ত সংজ্ঞার সার অবলম্বনে রচিত। -গ্রন্থকার
[২] মিফতাহুস-সা'আদাত খ:২ পৃ: ১১৩ তে প্রদত্ত সংজ্ঞার সার অবলম্বনে রচিত। -গ্রন্থকার

ভূমিকামূলক প্রবন্ধ সংযোজন করে দিয়েছি। আর পুস্তকের শেষে পরিশিষ্ট আকারে ১. হাদীস থেকে বিধান আহরণের পক্রিয়া ২. হুজ্জিয়্যতে হাদীস ৩. রাবীদের স্ত রবিন্যাস, ৪. মৃত্যু তারিখের ক্রমানুসারে উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস ও উসূলবিদদের শতাব্দী ভিত্তিক একটি তালিকা, ৫. ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে ইলমে হাদীস নামে ৫টি পরিশিষ্ট সংযোজন করে দিয়েছি। আশাকরি এদ্বারা উলূমুল হাদীস বিষয়ে ছাত্ররা যথেষ্ট সহযোগিতা পাবে।

পাণ্ডুলিপি কম্পিউটারে কম্পোজ করার পর আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ ও স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, শায়খুল হাদীস হযরত মাও. কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ ও হযরত মাও. নূর হোসাইন কাসেমী (মুদ্দাঃ)-এর খিদমাতে পেশ করেছিলাম। তাঁরা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু অংশ দেখে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনীও পেশ করেছেন।

মারকাযুদ্-দা'ওয়াহ্ আল-ইসলামীর শিক্ষাসচিব বন্ধুবর মাও. আব্দুল মালেক এ বিষয়ে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য রাখেন। পাণ্ডুলিপিটি দেখে দেওয়ার জন্য তার কাছেও পেশ করেছিলাম। তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করে দক্ষ সমালোচকের ন্যায় পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন ও মুক্ত মনে সমালোচনা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। তার কিছু কিছু পরামর্শ অতীব মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিধায় সেগুলোকে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। আর কিছু কিছু সমালোচনা অতি উচ্চাঙ্গের হওয়ার কারণে আমাদের এ প্রাথমিক ধারণা সম্বলিত গ্রন্থে তার মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি। আমরা উক্ত গ্রন্থের সবক্ষেত্রে সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্যটুকুই উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছি। পর্যালোচনামূলক বক্তব্য এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছি। যাতে প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য বিষয়টি বুঝা সহজ হয়।

এ গ্রন্থ রচনায় অনেকেই আমাকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে ও তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন। জামিয়া শার্ইয়্যাহ মালিবাগের মুহাদ্দিস মাও. আহমদ মায়মূন ও মাও. আরীফুদ্দীন মা'রুফের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষকরে আমার জামাতা জামিয়া ইসলামিয়া তেজগাঁওয়ের মুহাদ্দিস মাও. হাবীবুর রহমান আকন্দ ছিল আমার এ পাণ্ডুলিপির একজন একনিষ্ঠ শ্রোতা। প্রত্যেকটি অধ্যায় রচনার পর প্রথম তাকে শুনিয়েছি। একজন ধৈর্য্যশীল শ্রোতা হিসাবে আমার লেখাগুলো মনযোগ সহকারে শ্রবণ করার পর সে প্রয়োজনীয় মন্তব্য করেছে এবং পরামর্শ দিয়েছে; আবার উৎসাহিতও করেছে। পরিশেষে বইটির শেষ প্রুফটিও সে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে দেখে দিয়েছে। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমার ছোট ভাই মাও. ফখরুল ইসলাম বর্তমানে মারকাযুদ্-দা'ওয়ায়

উলূমুল হাদীসের শেষবর্ষের ছাত্র। পাণ্ডুলিপির বেশকিছু জায়গার প্রয়োজনীয় তাহকীক সে করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যও সে সংযোজন করে দিয়েছে। আরেক ছোট ভাই জামিয়া শার্ইয়্যাহ মালিবাগের মুহাদ্দিস মাও. নজরুল ইসলাম তথ্যবিন্যাস ও প্রুফ রিডিং-এর কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। আমার বড় ছেলে আবু নাঈম মুহা. সাজেদ কোন কোন লেখা আমার ফরমায়েশ অনুসারে তৈরী করে দিয়েছে, কোন কোন লেখার অনুলিখন তৈরী ও সূচীপত্র তৈরীর কাজটিও সে আঞ্জাম দিয়েছে। আল্লাহ সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। মাকতাবাতুল আযহার বইটির ২য় এডিশন প্রকাশের দয়িত্বভার গ্রহণ করায় আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বর্তমান এডিশনটি তৃতীয় এডিশন। এই এডিশনে বইটির মেকাপে বেশ পরিমার্জন করা হয়েছে। ফলে বইটির কলেবর একটু বেড়ে গেছে।

ভুল-ত্রুটি মুক্ত করে একটি পুস্তক পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে লেখক ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রচেষ্টার কোন কমতি থাকে না। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যায়। তাছাড়া কোন নতুন বিষয়ে কাজ করতে গেলে ভুল-ভ্রান্তি থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। এমন কিছু কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেওয়ার আশা রাখি। আল্লাহ আমাদের এই খিদমাতকে নাজাতের ওসিলা হিসাবে কবুল করুন। আমীন!

আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া
সাহারা কুড়িল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ
কুড়িল চৌরাস্তা, ঢাকা

সংক্ষিপ্ত সূচী

প্রথম অধ্যায়–
হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ▪ ১-১৪৫
দ্বিতীয় অধ্যায়–
উলূমুল হাদীসের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ▪ ৫৬-৭১
তৃতীয় অধ্যায়–
ইলমে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় পরিভাষা ▪ ৭৩-১১৬
চতুর্থ অধ্যায়–
মাকবূল হাদীস ও তার শ্রেণীবিভাজন ▪ ১২১-১৫৪
পঞ্চম অধ্যায়–
সনদের নিভরযোগ্যতার বিচারে মাকবূল হাদীসের প্রকারভেদ ▪ ১৫৫-১৯৭
ষষ্ঠ অধ্যায়–
মারদূদ ও যয়ীফ হাদীস ও তার শ্রেণীবিভাজন ▪ ১৯৯-২১৮
সপ্তম অধ্যায়–
সনদ থেকে রাবী পড়ে যাওয়ার কারণে যয়ীফ হাদীসের প্রকারভেদ ▪ ২২০-২৬২
অষ্টম অধ্যায়–
রাবী সমালোচিত ও অভিযুক্ত হওয়ার কারণে যয়ীফ হাদীসের প্রকারভেদ ▪ ২৬৩-২৭৬
নবম অধ্যায়–
যবতের সাথে সম্পর্কিত ত্রুটিসমূহ ▪ ২৭৭-৩৪৩
দশম অধ্যায়–
মওযূ‘ হাদীস ও তার বিধান ▪ ৩৪৪-৩৭৮
একাদশতম অধ্যায়–
জরাহ ও তা‘দীলের মূলনীতি ▪ ৩৭৯-৪০১
পরিশিষ্ট– ১ : হাদীস থেকে বিধান আহরণের প্রক্রিয়া ▪ ৪০৩-৪১৬
পরিশিষ্ট– ২ : হাদীস শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি (حجيت حديث) ▪ ৪১৮-৪৩৬
পরিশিষ্ট– ৩ : রাবীদের স্তরবিন্যাস ▪ ৪৩৯-৪৪০
পরিশিষ্ট– ৪ : উল্লেখযোগ্য উসূলবিদ ও মুহাদ্দিসগণের
শতাব্দীভিত্তিক তালিকা (মৃত্যুসনের ক্রমানুসারে) ▪ ৪৪১-৪৫২
পরিশিষ্ট– ৫ : ভারতবর্ষে ইলমে হাদীস ▪ ৪৫৩-৪৯২
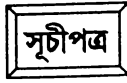
প্রথম অধ্যায়
(হাদীস সংকলনের ইতিহাস)

নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে ইলমের প্রকারভেদ ১
ইয়াকীনি ইলম (يقيني علم) ১
গায়রে ইয়াকীনি ইলম (غير يقيني علم) ২
হাদীস বলতে কী বুঝি? ২
কুরআনে ওয়াহী শব্দের ব্যবহার ৩
موحى به এর প্রেক্ষিতে ওয়াহী দুই প্রকার ৫
হাদীসের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ৬
কখন থেকে হাদীস সংকলন শুরু হয়? ৬
হিজরী প্রথম শতকে হাদীস সংকলন ১৩
প্রথম তবাকা ১৫
দ্বিতীয় তবাকা ১৬
তৃতীয় তবাকা ১৬
চতুর্থ তবাকা ১৭
পঞ্চম তবাকা ১৮
সাহাবীদের যুগে হাদীসের কতিপয় লিখিত সংকলন ২৪
একটি প্রশ্ন ও উত্তর ২৬
হিজরী দ্বিতীয় শতকে হাদীস সংকলন ২৭
হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণের দু'টি শ্রেণী ছিল ৩৩
দ্বিতীয় শতকের উল্লেখযোগ্য হাদীসের গ্রন্থসমূহ ৩৫
হাদীস সংকলন তৃতীয় শতকে ৩৫
ইমাম বুখারী ৩৯
ইমাম মুসলিম ৪০
নাসায়ী ও আবূ দাউদ ৪২
তিরমিযী ৪২
ইমাম ইবনে মাজাহ ৪৩
তৃতীয় শতকে রচিত হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ ৪৪
হাদীসের গ্রন্থাবলীর প্রকারভেদ ৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
(উলূমুল হাদীসের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)

উলূমুল হাদীসের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৫৬
উলূমুল হাদীসের উপর সর্বপ্রথম সংকলিত গ্রন্থ ৫৭
ইবনুস সালাহ–এর মুকাদ্দামা ৬৫
যারা ইবনুস সালাহ–এর মুকাদ্দামার ব্যাখ্যাগ্রন্থ তৈরী করেছেন ৬৫
যারা এ গ্রন্থের সংক্ষেপায়ন করেছেন ৬৬
যারা এ গ্রন্থের টিকা রচনা করেছেন ৬৬
যারা এ গ্রন্থকে পদ্যাকারে রচনা করেছেন ৬৬
আলফিয়ায়ে ইরাকী ও তার শরাহ ৬৭
ইরাকীর কাব্যগ্রন্থের ব্যাখ্যাকারদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ৬৭
এ গ্রন্থের টিকাকারদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ৬৭
যারা ইরাকীর শরহে আলফিয়ার সংক্ষেপায়ন করেছেন–
ইবনে হজর রচিত নুখবাতুল ফিকার ৬৭
নুখবাতুল ফিকারের যারা ব্যাখ্যাগ্রন্থ তৈরী করেছেন– ৬৮
শরহে নুখবার ব্যাখ্যাকারকদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ ৬৮
শরহে নুখবার কাব্যকারদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ ৬৯
শরহে নুখবার টিকাকারদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ ৬৯
শরহে নুখবার পরবর্তীতে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ ৭০
উলূমুল হাদীস সম্পর্কে ভারতীয় উলামারা যে খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন– ৭১

তৃতীয় অধ্যায়
ইলমে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় পরিভাষা

হাদীস (الحديث) ৭৩
আভিধানিক অর্থ ৭৩
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৭৩
সুন্নাহ (السنة) ৭৪
আভিধানিক অর্থ ৭৪
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৭৪
খবর (الخبر) ৭৬
আভিধানিক অর্থ ৭৬
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৭৬
আসার (الأثر) ৭৭

আভিধানিক অর্থ ৭৭
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৭৭
সনদ (السند) ৭৯
আভিধানিক অর্থ ৭৯
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৭৯
ইসনাদ (الإسناد) ৭৯
আভিধানিক অর্থ ৭৯
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৭৯
সনদকে প্রথমতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায় ৭৯
মুত্তাসিল ৮০
মুনকাতে' ৮০
মুসনাদ (المسنَد) ৮০
আভিধানিক অর্থ ৮০
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৮০
মুসনিদ (المسنِد) ৮১
আভিধানিক অর্থ ৮১
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৮১
সনদে আলী ৮১
সনদে নাযিল ৮১
মতন (المتن) ৮২
আভিধানিক অর্থ ৮২
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৮২
রাবী (الراوي) ৮২
আভিধানিক অর্থ ৮২
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৮৩
রিওয়ায়াহ (الرواية) ৮৩
আভিধানিক অর্থ ৮৩
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৮৪
মারফূ' (المرفوع)
আভিধানিক অর্থ ৮৪
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৮৪
মারফূ'-এর প্রকারভেদ ৮৫
মারফূ' হাদীসের হুকুম ৮৫

মাওকূফ (الموقوف)	৮৬
আভিধানিক অর্থ	৮৬
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৮৬
মাওকূফের প্রকারভেদ	৮৬
মাওকূফ হাদীস বিভিন্ন কারণে মারফূ' বলে গণ্য হয়	৮৭
মাওকূফ হাদীস প্রমাণযোগ্য কি না?	৮৯
মাকতূ' (المقطوع)	৯০
আভিধানিক অর্থ	৯০
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৯১
মাকতূ'–এর প্রকার ও উদাহরণ	৯১
মাকতূ'–এর হুকুম	৯১
হাদীসে কুদসী (الحديث القدسي)	৯২
আভিধানিক অর্থ	৯২
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৯২
কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মাঝে পার্থক্য	৯৩
হাদীস ও হাদীসে কুদসীর মাঝে পার্থক্য	৯৪
মুসালসাল (المسلسل)	৯৪
আভিধানিক অর্থ	৯৪
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৯৪
মু'আন'আন (المعنعن)	৯৬
আভিধানিক অর্থ	৯৬
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৯৬
মু'আন'আন হাদীসের হুকুম	৯৬
মুআন্নান (المؤنن)	৯৭
আভিধানিক অর্থ	৯৭
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৯৭
মুআন্নানের বিধান	৯৭
মুহকাম (المحكم)	৯৮
আভিধানিক অর্থ	৯৮
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৯৮
মুখতালাফুল হাদীস (مختلف الحديث)	৯৮
আভিধানিক অর্থ	৯৮
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৯৮

উদাহরণ	৯৮
পরস্পরবিরোধী হাদীসের ক্ষেত্রে করণীয়	৯৯
নাসেখ ও মানসূখ (الناسخ والمنسوخ)	১০১
আভিধানিক অর্থ	১০১
পারিভাষিক সংজ্ঞা	১০১
নাসেখ ও মানসূখ চিনার উপায়	১০২
শর্তসমূহ ১০৩	
রাজেহ ও মারজূহ (الراجح والمرجوح)	১০৪
আভিধানিক অর্থ	১০৪
পারিভাষিক সংজ্ঞা	১০৪
وجوه ترجيح বা প্রাধান্য দেয়ার পন্থাসমূহ	১০৫
আদালত (العدالة)	১০৬
আভিধানিক অর্থ	১০৬
পারিভাষিক সংজ্ঞা	১০৭
যবত (الضبط)	১০৮
আভিধানিক অর্থ	১০৮
পারিভাষিক সংজ্ঞা	১০৮
যবতের প্রকার	১০৮
স্মৃতিতে সংরক্ষণ (ضبط الصدر)	১০৮
পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ (ضبط الكتاب)	১০৮
সিকাহ (الثقة)	১০৯
আভিধানিক অর্থ	১০৯
পারিভাষিক সংজ্ঞা	১০৯
রিজাল (الرجال)	১০৯
আভিধানিক অর্থ	১০৯
পারিভাষিক সংজ্ঞা	১০৯
রিজালে হাদীসের বিভিন্ন খেতাব	১০৯
حدثنا ও أخبرنا ইত্যাদীর ব্যবহারিক পার্থক্য ও সংক্ষেপায়নের পদ্ধতি	১১৩
সংক্ষেপায়ন পদ্ধতি	১১৪
تحويل الإسناد বা সনদের ধারা পরিবর্তন	১১৫
الرواية بالمعنى বা হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনার বিধান	১১৬

চতুর্থ অধ্যায়
(মাকবূল হাদীস ও তার শ্রেণী বিভাজন)

মাকবূল (المقبول)	১২১
আভিধানিক অর্থ	১২১
পারিভাষিক সংজ্ঞা	১২১
রিওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত ৪টি	১২১
মারদূদ (المردود)	১২২
আভিধানিক অর্থ	১২২
পারিভাষিক সংজ্ঞা	১২২
মাকবূলের প্রকারভেদ	১২২
খবরে মাকবূলের হুকুম	১২২
মুতাওয়াতির (المتواتر)	১২৩
আভিধানিক অর্থ	১২৩
পারিভাষিক সংজ্ঞা	১২৩
মুতাওয়াতিরের প্রকারভেদ	১২৩
তাওয়াতুরে ইসনাদ	১২৪
পারিভাষিক সংজ্ঞা	১২৪
তাওয়াতুরে ইসনাদের শর্তসমূহ	১২৪
তাওয়াতুরে ইসনাদের প্রকার	১২৫
তাওয়াতুরে লাফযীর সংজ্ঞা	১২৫
তাওয়াতুরে মা'নাবীর সংজ্ঞা	১২৬
বিশেষ দ্রষ্টব্য	১২৭
তাওয়াতুরে ইসনাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সংখ্যক সূত্রের শর্ত রয়েছে কি না?	১২৭
তাওয়াতুরে তাবকার সংজ্ঞা	১৩০
তাওয়াতুরে তাবকার প্রকার	১৩০
তাওয়াতুর বিল আমলের সংজ্ঞা	১৩০
তাওয়াতুর বি মাফহুমিল খবরের সংজ্ঞা	১৩১
মুতাওয়াতিরের হুকুম	১৩১
العلم الضروري বা স্বভাবজাত সাধারণ জ্ঞান	১৩১
العلم النظري বা যুক্তিনির্ভর জ্ঞান	১৩২
মুতাওয়াতির হাদীসের সংখ্যা কত?	১৩৩
মুতাওয়াতির হাদীসের উপর লিখিত গ্রন্থাবলী	১৩৪
একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৩৪
খবরে মাশহুর দ্বারা অর্জিত ইলম কোন পর্যায়ের?	১৩৫

খবরুল আহাদ (خبر الآحاد) ১৩৫
আভিধানিক অর্থ ১৩৫
পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৩৫
খবরে ওয়াহিদের হুকুম ১৩৫
খবরে ওয়াহিদ প্রামাণিক ভিত্তি ১৩৭
খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহর-কোনো বিধান পরিবর্তন কিংবা বিধানটির ধরণ কি? তা নির্ধারণ করা যাবে কি না? ১৪০
খবরে ওয়াহিদ যদি যয়ীফ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয় তাহলে তা আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে কি না? ১৪০
খবরে ওয়াহিদ যদি কোন মাজহুল রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না? ১৪০
خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم কথাটির তাৎপর্য ১৪১
খবরে ওয়াহিদের প্রকারভেদ ১৪২
মশহূর (المشهور) ১৪২
আভিধানিক অর্থ ১৪২
পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৪৩
মশহূরের উদাহরণ ১৪৩
মশহূরের ব্যতিক্রম ব্যবহার ১৪৩
বিশেষ দ্রষ্টব্য : মুস্তাফিয ১৪৪
খবরে মশহূরের হুকুম ১৪৫
মশহূর সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী ১৪৬
আযীয (العزيز) ১৪৬
আভিধানিক অর্থ ১৪৬
পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৪৭
বিশেষ দ্রষ্টব্য : ইবনুস সলাহ প্রদত্ত্ব সংজ্ঞায় জটিলতা ১৪৭
আযীযের উদাহরণ ১৪৭
গরীব (الغريب) ১৪৮
আভিধানিক অর্থ ১৪৮
পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৪৮
গরীবের উদাহরণ ১৪৯
ফরদ (الفرد) ১৪৯
গরীবের প্রকারভেদ ১৫০
সাধারণ গরীব ও তার সংজ্ঞা ১৫০

বিশেষ প্রেক্ষিতে গরীব ও তার সংজ্ঞা ১৫০
সনদ ও মতন গরীব হওয়ার প্রেক্ষিতে গরীবের প্রকারভেদ ১৫১
সনদ ও মতন উভয় প্রেক্ষিতে গরীব ১৫২
সংজ্ঞা ও উদাহরণ ১৫২
সনদ হিসেবে গরীব তবে মতন হিসেবে গরীব নয় ১৫৩
সংজ্ঞা ও উদাহরণ ১৫৩
মতন হিসেবে গরীব তবে সনদ হিসেবে গরীব নয় ১৫৪
গরীব সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাবলী ১৫৪
বিশেষ দ্রষ্টব্য ১৫৪

পঞ্চম অধ্যায়
(সনদের নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে মাকবূল হাদীসের প্রকারভেদ)

সহীহ (الصحيح) ১৫৫
আভিধানিক অর্থ ১৫৫
পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৫৫
সংজ্ঞার বিশ্লেষণ ১৫৫
সহীহ হাদীসের প্রকারভেদ ১৫৮
الصحيح لذاته বা স্ব-বৈশিষ্ট্যে সহীহ-এর সংজ্ঞা ১৫৮
الصحيح لغيره বা অন্যের সমর্থনের কারণে সহীহ-এর সংজ্ঞা ১৫৮
বিশেষ দ্রষ্টব্য ১৬০
সহীহ হাদীসের হুকুম ১৬০
সনদের প্রেক্ষিতে সহীহ-এর পর্যায়ভূক্ত নয় এমন হাদীসকেও বিভিন্ন কারণে সহীহ-এর পর্যায়ভূক্ত বলে মনে করা হয় ১৬৩
কোন নির্দিষ্ট সূত্র সম্পর্কে أصحّ الأسانيد এ মন্তব্য করা ঠিক নয় ১৬৫
অঞ্চলভিত্তিক أصحّ الأسانيد ১৬৫
أصحّ شيء في الباب এর অর্থ ১৬৮
সহীহ হাদীসের স্তরভেদ ১৬৮
ইবনুল হাম্বলীর বিভাজন ১৭৩
নতুন বিভাজন ১৭৫
هذا حديث صحيح এবং هذا حديث صحيح الإسناد এর মাঝে পার্থক্য ১৭৭
বর্তমানে কোন মুহাদ্দিসের জন্য কোন হাদীস সম্পর্কে সহীহ কিংবা যয়ীফ হওয়ার মন্তব্য করার অধিকার আছে কি নেই? ১৭৭
সহীহ হাদীসের উৎস গ্রন্থসমূহ ১৭৮
মুসতাখরাজ 'আলাস-সহীহাইন ১৮৩

কেবলমাত্র সহীহ বুখারীর উপর যারা মুসতাখরাজ গ্রন্থ তৈরী করেছেন ১৮৩
শুধুমাত্র সহীহ মুসলিমের উপর যারা মুসতাখরাজ গ্রন্থ তৈরী করেছেন ১৮৩
বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থের উপর যারা পৃথক পৃথকভাবে মুসতাখরাজ
তৈরী করেছেন ১৮৩
বিশেষ দ্রষ্টব্য ১৮৪
মুসতাখরাজ গ্রন্থ তৈরীর উদ্দেশ্য ১৮৪
সহীহাইনের শ্রেষ্টত্ব ও বুখারীর প্রাধান্য ১৮৫
হাসান (الحسن) ১৮৯
আভিধানিক অর্থ ১৮৯
পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৮৯
হাসানের ইজমালী সংজ্ঞা ১৮৯
হাসানের প্রকারভেদ ১৮৯
হাসান লি–যাতিহীর সংজ্ঞা ১৯০
হাসান লি–গায়রিহীর সংজ্ঞা ১৯০
বিশেষ দ্রষ্টব্য ১৯০
হাসান হাদীসের উপমা ১৯৩
হাসান লি-যাতিহীর উদাহরণ ১৯৪
হাসান লি-গায়রিহীর উদাহরণ ১৯৪
বিশেষ দ্রষ্টব্য ১৯৪
হাসানের হুকুম ১৯৫
ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য هذا حديث حسن صحيح এর অর্থ ১৯৫
অধমের অভিমত ১৯৬
রাবী মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য এ কথা বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণ
যে সব শব্দ ব্যবহার করেন ১৯৭
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য এ কথা বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণ
যে সব শব্দ ব্যবহার করেন ১৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
(মারদূদ বা বর্জনীয়)

মারদূদ (المردود) ১৯৯
আভিধানিক অর্থ ১৯৯
পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৯৯
বিশেষ দ্রষ্টব্য ২০২

যয়ীফ ২০২
আভিধানিক অর্থ ২০২
পারিভাষিক সংজ্ঞা ২০৩
যয়ীফের উদাহরণ ২০৩
যয়ীফ হাদীসের স্তরভেদ ২০৩
নোট ২০৬
যয়ীফের শ্রেণীবিভাগ ২০৬
বস্তুত হাদীস যয়ীফ হওয়ার কারণ দুইটি ২০৬
যয়ীফের সাধারণ হুকুম ২০৭
যে যয়ীফের দুর্বলতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ২০৮
যে যয়ীফের দুর্বলতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই ২০৮
যে যয়ীফ হাদীসের শাহেদ বা মুতাবে' নেই ২০৯
যে সব কারণ বিদ্যমান থাকলে যয়ীফ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় ২১০
কোন বিষয়ে সহীহ হাদীস বিদ্যমান না থাকলে ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিসগণযয়ীফ হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতেন ২১২
যয়ীফ হাদীস বর্ণনার বিধান ২১৪
বিশেষ দ্রষ্টব্য ২১৪
ضعيف ও مضعف -এর মাঝে পার্থক্য ২১৫
রাবী ضعيف বা গ্রহণযোগ্য নয় একথা বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণ যেসব শব্দ ব্যবহার করে থাকেন ২১৫
মারদূদ হাদীসের জন্য মুহাদ্দিসগণ যেসব শব্দাবলী ব্যবহার করেন ২১৬
সহীহ কি যয়ীফ এ ব্যাপারে দ্বিমত হলে কি করতে হবে? ২১৭
أوهى الأسانيد (দুর্বলতম সনদ) ২১৮
যয়ীফ রাবীদের উপর লিখিত গ্রন্থাবলী ২১৮

সপ্তম অধ্যায়

সনদ থেকে রাবী পড়ে যাওয়ার কারণে যয়ীফ হাদীসের প্রকারভেদ

সনদ থেকে রাবী পড়ে যাওয়ার কারণে যয়ীফ হাদীসের প্রকারভেদ ২২০
বিচ্যুতির বিষয়টি সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট হওয়ার দিক থেকে বিষয়টিকে ২২০
প্রথমত দুইভাগে ভাগ করা হয়। ২২০
সুস্পষ্ট বিচ্যুতি (السقط الظاهر) ২২০
অস্পষ্ট বিচ্যুতি (السقط الخفي) ২২১
মু'আল্লাক (المعلق) ২২১

আভিধানিক অর্থ	২২১
পারিভাষিক সংজ্ঞা	২২২
মু'আল্লাকের হুকুম	২২৩
সহীহাইনের মু'আল্লাক হাদীসের বিধান	২২৪
মু'দাল (المعضل)	২২৫
আভিধানিক অর্থ	২২৫
পারিভাষিক সংজ্ঞা	২২৫
মু'দালের উদাহরণ	২২৫
বিশেষ দ্রষ্টব্য	২২৬
মু'দালের হুকুম	২২৬
বিশেষ দ্রষ্টব্য	২২৭
মু'দাল হাদীস যেসব গ্রন্থে পাওয়া যাবে	২২৭
মুনকাতে' (المنقطع)	২২৭
আভিধানিক অর্থ	২২৭
পারিভাষিক সংজ্ঞা	২২৭
মুনকাতে'-এর উদাহরণ	২২৮
মুনকাতে' -এর হুকুম	২২৮
মুরসাল (المرسل)	২২৯
আভিধানিক অর্থ	২২৯
পারিভাষিক সংজ্ঞা	২২৯
ইরসালে সাহাবী	২৩১
তাবয়ে তাবেয়ীনদের ইরসাল	২৩১
সাহাবীদের মুরসালকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়	২৩৩
তাবেয়ীনদের মুরসালও দুই ভাগে বিভক্ত হতে পারে	২৩৩
মুখদারিম (مخضرم) দের বর্ণিত হাদীস মুরসাল বলে গণ্য হবে	২৩৩
মুরসালের উদাহরণ	২৩৪
মুরসালের হুকুম	২৩৪
মুরসালে সাহাবীর হুকুম	২৩৪
মুরসালে তাবেয়ীর হুকুম	২৩৫
মুরসাল হাদীস যয়ীফ এবং বর্জনীয়	২৩৬
মুরসাল হাদীস মাকবূল এবং প্রমাণযোগ্য	২৩৬
কতিপয় শর্তসাপেক্ষে মুরসাল গ্রহণযোগ্য	২৩৯
ইবনে রজব হাম্বলী নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে মুরসালকে হুজ্জত মনে করেন	২৪০
মুরসাল গ্রহণযোগ্য হলে তা কি মুসনাদের সমমর্যাদা পাবে?	২৪১

যেসব তাবেয়ীর মুরসাল সাধারণত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়	২৪৩
মুরসালের উপর লিখিত গ্রন্থাবলী	২৪৩
মুদাল্লাস (المدَلَّس)	২৪৩
আভিধানিক অর্থ	২৪৩
পারিভাষিক সংজ্ঞা	২৪৪
মুদাল্লাস হাদীসের উদাহরণ	২৪৪
তাদলীসের প্রকারভেদ	২৪৫
তাদলীসুল ইসনাদ বা সনদে অস্বচ্ছতা	২৪৫
তাদলীসুল ইসনাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা	২৪৫
তাদলীসুল ইসনাদ ও ইরসালে খফীর মাঝে পার্থক্য	২৪৬
তাদলীসুল ইসনাদের উদাহরণ	২৪৭
তাদলীসে ইসনাদের আরো কতিপয় প্রক্রিয়া	২৪৮
তাদলীসুত্-তাসবিয়াহ (تدليس التسوية)	২৪৮
তাদলীসুল 'আত্ফ (تدليس العطف)	২৪৮
তাদলীসুস-সুকূত (تدليس السكوت)	২৪৯
তাদলীসুশ-শুয়ূখ (تدليس الشيوخ) বা উস্তাদের ব্যাপারে অস্পষ্টতা	২৪৯
তাদলীসূশ-শুয়ূখ-এরও বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে	২৪৯
তাদলীসের উদ্দেশ্য	২৫০
তাদলীস কেন এত ঘৃণ্য?	২৫২
তাদলীসের হুকুম	২৫২
মুদাল্লিসের রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হবে কি না?	২৫৩
মুদাল্লেসীনের স্তর (طبقات المدلسين)	২৫৫
বিশেষ দ্রষ্টব্য	২৫৭
কোন হাদীসে তাদলীস করা হয়েছে কি না তা কিভাবে জানা যাবে?	২৫৮
তাদলীস ও মুদাল্লেসীনের উপর রচিত গ্রন্থাবলী	২৫৮
ইরসালে খফী (الارسال الخفى)	২৫৮
আভিধানিক অর্থ	২৫৮
পারিভাষিক সংজ্ঞা	২৫৯
মুরসালে খফীর উদাহরণ	২৫৯
ইরসালে খফী চিনার উপায়	২৬০
মুরসালে খফীর হুকুম	২৬০
বিশেষ দ্রষ্টব্য	২৬০
মুহমাল (مهمل)	২৬০

২৬০
আভিধানিক অর্থ ২৬১
পারিভাষিক সংজ্ঞা' ২৬১
মুহমালের উদাহরণ ২৬২
মুহমালের হুকুম ২৬২
ইহমাল দূরীভূত করা যায় দুই পন্থায়

অষ্টম অধ্যায়

রাবী সমালোচিত ও অভিযুক্ত হওয়ার কারণে ২৬৩
যয়ীফ হাদীসের প্রকারভেদ
বিশ্বস্ততার দিক থেকে সমালোচনা বা طعن في العدالة এর ২৬৩
বিষয়টি প্রধানত ৫ ভাগে বিভক্ত ২৬৩
كذب في حديث الرسول বা হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে মিথ্যা ২৬৩
تهمة الكذب বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ২৬৪
মাত্‌রুক (المتروك) ২৬৪
মাতরুকের আভিধানিক অর্থ ২৬৪
মাতরুকের পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৬৪
মাতরুকের উদাহরণ ২৬৫
মাতরুকের হুকুম ২৬৫
বিশেষ দ্রষ্টব্য ২৬৫
পাপাচার (الفسق) ২৬৫
আভিধানিক অর্থ ২৬৬
পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৬৬
বিদ'আত (البدعة) ২৬৬
আভিধানিক অর্থ ২৬৭
পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৬৭
اعتقاد مكفرة যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে কাফের বলে গণ্য করা হয় ২৬৮
اعتقاد مفسقة যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে ফাসেক বলে গণ্য করা হয় ২৭০
বর্ণনাকারী সম্পর্কে অজ্ঞতা (جهالة في الراوي) ২৭০
আভিধানিক অর্থ ২৭০
পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৭১
মজহুলের বিধান ২৭১
বর্ণনাকারী বা রাবী সম্পর্কে অজ্ঞতা সৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ

মাজহূলকে চারভাগে ভাগ করা যায় ২৭২
মুবহাম ২৭২
মুহমাল ২৭৩
মজহুলুল আইন ২৭৩
মজহুলুল হাল ২৭৪
বিশেষ দ্রষ্টব্য ২৭৬
মজহুলের উপর লিখিত গ্রন্থাবলী ২৭৬

নবম অধ্যায়

যবৃতের সাথে সম্পর্কিত ত্রুটিসমূহ

স্মৃতিদৌর্বল্য জনিত ব্যাপক ভুল (سوء الحفظ) ২৭৭
পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৭৮
স্মৃতিদৌর্বল্যের প্রকারভেদ ২৭৮
لازم বা স্থায়ী স্মৃতিদৌর্বল্য ২৭৮
অসর্তকতা জনিত মারাত্মক ধরণের ভুল (فحش الغلط) ২৮০
পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৮০
হাদীস আহরণ, ধারণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে
অসতর্কতা (الغفلة في التحمل والضبط والصيانة) ২৮১
পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৮১
ব্যাপক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব (كثرة الاوهام) ২৮১
মুআল্লাল (المعلل) ২৮১
পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৮৩
বিশেষ দ্রষ্টব্য ২৮৩
ইল্লতের শ্রেণী বিভাজন ২৮৮
মু'আল্লাল-এর ভিন্ন ব্যবহার ২৯৩
সনদে জটিলতা পাওয়া গেলে তাদ্বারা মতনটি সমস্যাগ্রস্থ হবে কি না? ২৯৪
মু'আল্লাল–এর উপর লিখিত গ্রন্থাবলী ২৯৪
নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণিত রিওয়ায়াতের পরিপন্থী বর্ণনা (مخالفة الثقات) ২৯৫
পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৯৫
মুখালাফাতুস্ সীকাতের উদাহরণ ২৯৫
মুদরাজ (المدرج) ২৯৯
পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৯৯

মুদরাজুল মতন (مدرج المتن) এর সংজ্ঞা	৩০০
মুদরাজুল ইসনাদ (مدرج الإسناد) -এর সংজ্ঞা	৩০২
মুদরাজের হুকুম	৩০৪
যেসব কারণে ইদরাজ করা হয়ে থাকে	৩০৪
হাদীসে ইদরাজ ঘটেছে কিনা তা চেনার উপায়	৩০৪
এসম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাবলী	৩০৫
মাকলূব (مقلوب)	৩০৫
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩০৫
মাকলূবের প্রকার	৩০৭
মাকলূবুল মতন এর উদাহরণ	৩০৭
মাকলূবুল ইসনাদ	৩০৮
মাকলূবুল ইসনাদের প্রকার	৩০৮
মাকলূবের হুকুম	৩১০
মাকলূবের উপর রচিত গ্রন্থাবলী	৩১১
মযীদ ফি মুত্তাসিলিল আসানিদ (مزيد في متصل الأسانيد)	৩১১
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩১১
উদাহরণ	৩১৪
মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদের হুকুম	৩১৫
এসম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ	৩১৫
মুযতারিব (المضطرب)	৩১৫
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩১৬
মুযতারিবের প্রকার	৩১৬
সনদে ইযতিরাবের উদাহরণ	৩১৬
মতনে ইযতিরাবের উদাহরণ	৩১৭
সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রে ইযতিরাবের উদাহরণ	৩১৮
ইযতিরাবের হুকুম	৩২০
ইয্তিরাবের উপর লিখিত গ্রন্থাবলী	৩২০
মুসাহ্হাফ (المصحف)	৩২০
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩২১
তাসহীফ বা তাহরীফ কেন হয়?	৩২১
তাসহীফ ও তাহরীফের প্রকারভেদ	৩২২
উদাহরণ	৩২২
মুনকার (المنكر)	৩২৪

মুনকারের সংজ্ঞা	৩২৫
মুনকারের উদাহরণ	৩২৫
আরেকটি উদাহরণ	৩২৬
মুনকার শব্দ ব্যবহারে মুতাকাদ্দেমীন ও মুতাআখখেরীনদের মাঝে পার্থক্য	৩২৬
বিশেষ দ্রষ্টব্য	৩২৭
حديث منكر ও منكر الحديث এর মাঝে পার্থক্য	৩২৭
মুনকারের স্তর	৩২৯
মা'রুফ (المعروف)	৩২৯
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩২৯
শায্ (الشاذ)	৩৩০
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩৩০
শায্ -এর উদাহরণ	৩৩৩
শাযের হুকুম	৩৩৪
মাহ্ফূয (المحفوظ)	৩৩৪
আভিধানিক অর্থ	৩৩৪
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩৩৪
উদাহরণ	৩৩৪
শাহেদ ও মুতাবে' (شاهد و متابع)	৩৩৫
মুতাবে' (المتابع)	৩৩৫
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩৩৫
উদাহরণ	৩৩৫
শাহেদ (الشاهد)	৩৩৬
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩৩৭
উদাহরণ	৩৩৭
শাহেদ ও মুতাবে'-এর হুকুম	৩৩৮
নির্ভরযোগ্য রাবীদের পরিবর্ধন গ্রহণযোগ্য কি না? (زيادة الثقات مقبولة أم لا)	৩৩৮
আভিধানিক অর্থ	৩৩৮
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩৩৯
নির্ভরযোগ্য রাবীদের পরিবর্ধনের বিধান	৩৪০
এক্ষেত্রে আরো যে সব মতামত রয়েছে	৩৪০
সনদে পরিবর্ধনের উদাহরণ	৩৪১
মতনে পরিবর্ধনের বিধান	৩৪১
মতনে পরিবর্ধনের উদাহরণ	৩৪৩

দশম অধ্যায়
(মওযূ‘ হাদীস ও তার বিধান)

মওযূ‘ (الموضوع) ৩৪৪
আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ৩৪৪
কখন থেকে মিথ্যা বা জাল হাদীস তৈরী শুরু হয়? ৩৪৫
কি উদ্দেশ্যে জাল হাদীস তৈরী করা হয়? ৩৫১
রাজনৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট ধর্মীয় ফিরকাসমূহ আপনাপন মতাদর্শের সমর্থনে জাল হাদীস তৈরী করেছে ৩৫১
সাবায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক হাদীস জালকরণ ৩৫১
শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক হাদীস জালকরণ ৩৫২
খারেজীদের হাদীস জালকরণ ৩৫৪
যিন্দীকদের হাদীস জালকরণ ৩৫৫
কাররামিয়্যাহদের জাল হাদীস ৩৫৬
মুরজিয়াদের জাল হাদীস ৩৫৭
কাদরিয়্যাহদের জাল হাদীস ৩৫৭
জাবরিয়্যাহদের জাল হাদীস ৩৫৮
মু‘তাযিলাদের জাল হাদীস ৩৫৮
মাযহাবের অনুসারীদের রচিত জাল হাদীস ৩৫৯
সাম্প্রদায়িক গোড়ামীর কারণেও জাল হাদীস তৈরী করা হয়েছে ৩৬০
কিস্‌সা ও কাহিনীকার এবং স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন ওয়ায়েযরাও সুনাম-সুখ্যাতি বৃদ্ধির মানসে বহু হাদীস জাল করেছেন ৩৬০
কাহিনীকার ও ওয়ায়েজদের হাদীস জালকরণের একটি চাক্ষুষ প্রমাণ ৩৬২
অনেক মুহাদ্দিস তার সন্তান-সন্ততি ও নিকটাত্মীয়দের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে জাল হাদীস বর্ণনার জটিলতায় ফেসে গেছেন ৩৬৩
অনেকেই ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের জন্য কিংবা অর্থ-কড়ি উপার্জনের জন্য জাল হাদীস তৈরী করেছেন ৩৬৪
অনেকেই মুহাদ্দিস হিসাবে সুখ্যাতি কুড়ানোর জন্য হাদীসের সনদ উলট–পালট করে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন, ফলে হাদীসটি মওযূ‘ বলে সাব্যস্ত হয়েছে ৩৬৫
সম্রাটের কথা বা কর্মের অনুকূলে হাদীস বর্ণনা করে তাদের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেও জাল হাদীস তৈরী করা হয়েছে ৩৬৫
অনেক যাহেদ আবেদ ব্যক্তি মানুষকে দ্বীনের প্রতি অনুরক্ত করার মানসে এবং সাওয়ারের প্রত্যাশায় হাদীস জাল করেছেন ৩৬৬
বিশেষ দ্রষ্টব্য ৩৬৮
হাদীস জালকারীদের অনুসৃত পন্থাসমূহ ৩৬৮
মওযূ‘ হাদীসের বিভাজান ৩৭০
জাল হাদীসের বিভিন্ন স্তর ৩৭১

মওযূ' বা জাল হাদীসের হুকুম ৩৭১
মওযূ' বা জাল হাদীস বর্ণনার হুকুম ৩৭১
জাল হাদীস রচনাকারীদের হুকুম ৩৭২
জাল হাদীস চিনার উপায় ৩৭৩
হাদীসটি জাল একথা বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণ যেসব শব্দ ব্যবহার করেন ৩৭৬
জাল হাদীসের উপর রচিত গ্রন্থবলী ৩৭৮

একাদশতম অধ্যায়

রাবীদের (جرح وتعديل) বা নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের মূলনীতি

রাবীদের (جرح وتعديل) বা নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের মূলনীতি ৩৭৯
আভিধানিক অর্থ ৩৭৯
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৩৭৯
রাবীদের দোষ-ত্রুটির আলোচনা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয় ৩৮০
রাবীদের (جرح وتعديل) নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা
সম্পর্কে মন্তব্য করার মূলনীতি ৩৮৫
যারা রাবীদের দোষ-ত্রুটি সনাক্ত করবেন তাদের জন্য শর্তসমূহ ৩৮৬
রাবী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার মূলভিত্তি কি কি? ৩৮৯
রাবী (عادل) বা বিশ্বস্ত তা কিভাবে বুঝা যাবে? ৩৮৯
রাবীর যব্ত ও সংরক্ষণগুণে কোন ত্রুটি নেই তা কিভাবে প্রমাণিত হবে? ৩৯০
রাবীদের ব্যাপারে অস্পষ্ট মন্তব্য (جرح مبهم) গ্রহণযোগ্য হবে কি না? ৩৯০
জরাহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে বিশেষ সংখ্যার শর্ত আছে কি না? ৩৯৩
যদি কোন রাবীর ব্যাপারে বিপরীতমুখী মন্তব্য পাওয়া যায়? ৩৯৪
প্রথম মত ৩৯৫
দ্বিতীয় মত ৩৯৫
তৃতীয় মত ৩৯৫
বিশেষ দ্রষ্টব্য ৩৯৬
কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কারো কাছ থেকে হাদীস আহরণ করলে
তা ঐ ব্যক্তিকে বিশ্বস্ত বলে প্রতিপন্ন করবে কি না? ৩৯৭
পাপাচার থেকে তাওবাকারীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে কি না? ৩৯৮
যিনি হাদীস বর্ণনার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন
তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে কি না? ৩৯৮
কোন রাবী হাদীস বর্ণনার পর তা ভুলে গেলে তাঁর হাদীস গ্রহণ করা হবে কি না? ৩৯৯
নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতার স্তরসমূহ ৩৯৯
নির্ভরযোগ্যতার স্তরসমূহ ৩৯৯
অনির্ভরযোগ্যতার স্তরসমূহ ৪০০
জরাহ ও তা'দীলের উপর রচিত গ্রন্থাবলী ৪০১

পরিশিষ্ট -১

হাদীস থেকে বিধান আহরণের প্রক্রিয়া ৪০৩
বক্তব্য থেকে বিধান আহরণ ৪০৪
বিধান আহরণের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে ৪০৪
এক. শব্দটির অর্থ কি সুস্পষ্ট না অস্পষ্ট? ৪০৪
দুই. শব্দুটির অর্থের পরিধি কতটুকু? ৪০৬
তিন. শব্দটি কি প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ হয়েছে না রূপক অর্থে? ৪০৭
চার. মূল বক্তব্য থেকে বিধানটি কোন প্রক্রিয়ায় বোধগম্য হয়েছে? ৪০৭
পাঁচ. বিধানটি কি আদেশ-নিষেধের পর্যায়ের না ঐচ্ছিক? ৪১০
আল্লামা ইবনে নুজায়মের বক্তব্য ৪১২
সারসংক্ষেপ ৪১৫
কর্মের আলোকে নিসৃত বিধান ৪১৬
তাকরীর (التقرير) বা অনুমোদনের দ্বারা উদ্ভাবিত বিধান ৪১৬
একটি জ্ঞাতব্য বিষয় ৪১৬

পরিশিষ্ট -২

(حجية الحديث) হাদীস শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি ৪১৮
নবীর দায়িত্বের পরিধি কুরআনে কারীমের আলোকে ৪২০
নবীর ইতা'আত বা আনুগত্য সম্পর্কে আল-কুরআনের ভাষ্য ৪২৪
রাসূলের ইত্তিবা বা অনুসরণ সম্পর্কে আল-কুরআনের ভাষ্য ৪২৮
ওয়াহীয়ে গায়র মাত্লূ যে নবীর কাছে প্রক্ষেপিত হত এবং সেগুলো
যে আল্লাহর নির্দেশেরই মর্যাদা রাখে কুরআনে কারীম থেকে তার প্রমাণ ৪৩০
হাদীস প্রামাণিক ভিত্তি ও অনুসরণীয় হওয়ার পক্ষে
কতিপয় যৌক্তিক বিশ্লেষণ ৪৩৬

পরিশিষ্ট -৩

রাবীদের স্তরবিন্যাস (طبقات الرواة) ৪৩৯
প্রথম শতাব্দী ৪৩৯
প্রথম স্তর ৪৩৯
দ্বিতীয় স্তর ৪৩৯
দ্বিতীয় শতাব্দী ৪৪০
তৃতীয় শতাব্দী ৪৪০

পরিশিষ্ট-৪

উল্লেখযোগ্য উসূলবিদ ও মুহাদ্দিসগণের শতাব্দীভিত্তিক তালিকা
(মৃত্যু তারিখের ক্রমানুসারে) ৪৪১
৫০ - ১০০ হিজরী ৪৪১

১০১ - ২০০ হিজরী ৪৪২
২০১ - ৩০০ হিজরী ৪৪৩
৩০১ - ৪০০ হিজরী ৪৪৫
৪০১- ৫০০ হিজরী ৪৪৬
৫০১ - ৬০০ হিজরী ৪৪৭
৬০১- ৭০০ হিজরী ৪৪৭
৭০১ - ৮০০ হিজরী ৪৪৮
৮০১ - ৯০০ হিজরী ৪৪৯
৯০১ - ১০০০ হিজরী ৪৫০
১০০১ - ১১০০ হিজরী ৪৫০
১১০১ - ১২০০ হিজরী ৪৫১
১২০১ - ১৩০০ হিজরী ৪৫১
১৩০১ - ১৪০০ হিজরী ৪৫১
১৪০০ হিজরী ৪৫২

পরিশিষ্ট -৫

ভারতবর্ষে ইলমে হাদীস ৪৫৩
সিন্ধু ও দেবল অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণ ৪৫৪
লাহোর অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণ ৪৫৪
মানসূরা (হায়দরাবাদ) অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণ ৪৫৪
কুসদার (বেলুচিস্তান) অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণ ৪৫৪
মুলতান অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণ ৪৫৪
তৎকালের কতিপয় উল্লেখযোগ্য হাদীস চর্চাকেন্দ্র ৪৫৪
অন্যান্য দেশ থেকে আগত কতিপয় মুহাদ্দেসীন ৪৫৭
ইলমে হাদীস আহরণের জন্য যারা বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন ৪৫৮
এসময়ের উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন মুহাদ্দেসীন ৪৫৯
পরবর্তী যুগের তিনজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ৪৬১
শায়খ আহমদ সারহিন্দী রাহ. ও ইলমে হাদীসে তাঁর খিদমাত ৪৬১
শায়খ আব্দুল হক দেহলভী রাহ. ও ইলমে হাদীসে তাঁর খিদমাত ৪৬২
এ সময়ের খ্যাতিমান আরো কতিপয় মুহাদ্দিস ৪৬৩
শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী ও ইলমে হাদীসে তাঁর খিদমাত ৪৬৩
শাহ আব্দুল আযীয রাহ. ও তার শাগরেদগণ ৪৬৪
শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী রাহ. ও তার শাগরেদগণ ৪৬৫
আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রাহ. ও তার শাগরেদগণ ৪৬৬
আহমদ আলী সাহারনপুরী রাহ. ও তার শাগরেদগণ ৪৬৬
মাওলানা কাসেম নানুতুবী রাহ. ও তার শাগরেদগণ ৪৬৭
মাওলানা ইয়াকূব নানুতুবী রাহ. ও তার শাগরেদগণ ৪৬৭

মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী রাহ. ও তার শাগরেদগণ ৪৬৭
মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ. ও তার শাগরেদগণ ৪৬৮
এ সময়ের কতিপয় উল্লেখযোগ্য হাদীসচর্চা কেন্দ্র ৪৬৮
দারুল উলূম দেওবন্দ ও কতিপয় প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস ৪৬৯
ভারতবর্ষের একালের কতিপয় উল্লেখযোগ্য হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্র ৪৭৩
পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ হাদীস চর্চাকেন্দ্রসমূহ ৪৭৪
বার্মায় উল্লেখযোগ্য হাদীস চর্চাকেন্দ্র ৪৭৪
দারুল উলূমের অনুকরণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে হাদীস চর্চাকেন্দ্র ৪৭৪

বাংলাদেশে ইলমে হাদীস

বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন ৪৭৫
বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইলমে হাদীসের চর্চা ৪৭৭
দেওবন্দের অনুকরণে বাংলাদেশে প্রথম হাদীস চর্চাকেন্দ্র ৪৭৮
বাংলাদেশের কতিপয় হাদীসচর্চা কেন্দ্র ৪৭৮
ঢাকা জেলা ৪৭৮
ফরিদপুর জেলা ৪৮০
মোমেনশাহী জেলা ৪৮১
সিলেট জেলা ৪৮২
কুমিল্লা জেলা ৪৮৩
নোয়াখালী জেলা ৪৮৩
চট্টগ্রাম জেলা ৪৮৪
বরিশাল জেলা ৪৮৪
পাবনা জেলা ৪৮৪
রাজশাহী জেলা ৪৮৪
বগুড়া জেলা ৪৮৪
খুলনা জেলা ৪৮৫
যশোর জেলা ৪৮৫
রংপুর জেলা ৪৮৫
কুষ্টিয়া জেলা ৪৮৫

বাংলাদেশের মুহাদ্দেসীন বা হাদীস বিশারদগণ

প্রথম যুগ ৪৮৬
দ্বিতীয় যুগ ৪৮৬
বিগত একযুগ যাবত যারা এদেশে হাদীস শিক্ষাদানে নিরত ছিলেন ৪৮৯
বর্তমানে হাদীসের খিদমতে নিরতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন ৪৯০
গ্রন্থপঞ্জী ৪৯২

প্রথম অধ্যায়

হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيدنا محمدالمصطفي النبيّ الأمي وعلى اله وأصحابه والعلماء الذين بذلوا جهدهم لحفظ نصوص الدين وعلى الذين سادوا الامة بالجهد واليقين.

নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে ইল্‌মের প্রকারভেদ

নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে ইলম দুই প্রকার। যথা :

১. علم يقيني বা প্রত্যয়ী জ্ঞান।

২. علم غيريقيني বা সংশয়যুক্ত জ্ঞান।

১. ইয়াকীনি ইলম (علم يقيني) : ইয়াকীনি ইলম বলতে এমন দ্বিধাহীন বসীরতকে বুঝায়, যা সকল প্রকার দ্বিধা সংশয় ও সন্দেহ মুক্ত। ইয়াকীনি ইলম বা প্রত্যয়ী জ্ঞান সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে। যথা :

ক. علم اليقين : ইলমুল ইয়াকীন বলতে এমন প্রত্যয়কে বুঝানো হয়, যা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ ও অর্জিত। তবে চাক্ষুষ উপলব্ধি অনুপস্থিত। যেমন : "একদিন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে" এই জ্ঞান।

খ. عين اليقين : আইনুল ইয়াকীন বলতে এমন প্রত্যয়কে বুঝানো হয়, যা চাক্ষুষ উপলব্ধি দ্বারা অর্জিত অথবা যা বিশেষ ঐশী প্রক্রিয়ায় উপলব্ধ। যেমনঃ ওয়াহী, ইলহাম ও কাশ্‌ফ ইত্যাদি দ্বারা অর্জিত জ্ঞান।

গ. حق اليقين : হক্কুল ইয়াকীন বলতে এমন সুদৃঢ় উপলব্ধিকে বুঝানো হয়, যা অতিরিক্ত প্রত্যয়ী হওয়ার কারণে সব ধরণের দ্বিধা-দ্বন্ধ ও সংশয়-সন্দেহের মিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং তা একবার অর্জিত হওয়ার পর ব্যক্তি থেকে কোন ভাবেই অপসারিত হয় না। যেমনঃ ২+২=৪ বা আকাশ উর্ধ্বে অবস্থিত ইত্যাদি ধরণের জ্ঞান।

<u>২. গায়র ইয়াকিনী ইলম (علم غيريقيني)</u> : গায়র ইয়াকিনী ইলম বলতে এমন উপলব্ধি ও অবগতিকে বুঝায়, যাতে কিছুটা হলেও দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। যেমন: বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞান ইত্যাদি।

যদিও এগুলো অনেক ক্ষেত্রে عين اليقين এর দরজায় পৌঁছে যায়, তথাপি যেহেতু বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা ভুল প্রমাণিত হওয়ার আশংকা রয়েছে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের উপলব্ধিতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এগুলো সম্পূর্ণ রূপে সন্দেহমুক্ত বলে মনে করা যায় না। আবার যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানও সব সময় ভুলের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হয় না। তবে যদি যুক্তিগুলো নির্ভুল ও অকাট্য হয়, কেবল তখনই যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত ইলম নির্ভুল হয়। অতএব যুক্তিলব্ধ জ্ঞান নির্ভুল হওয়ার জন্য যুক্তিগুলো নির্ভুল হওয়া পূর্বশর্ত।

আর যুক্তি সবসময় আপেক্ষিক হয়ে থাকে। তাই সেটি ভুল কি নির্ভুল তা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ বিষয়। যে কারণে যুক্তিলব্ধ জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত জ্ঞান বলা যায় না। আমরা শুরুতেই এই আলোচনা করে নিলাম, যাতে হাদীস দ্বারা অর্জিত ইলম কোন স্তরের পরবর্তী আলোচনা দ্বারা তা বুঝতে সহজ হয়।

হাদীস বলতে কি বুঝি?

বস্তুতঃ হাদীস হল ওয়াহীর মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের এমন এক উৎস বা আকর যা সকল প্রকার দ্বিধা-সংশয় ও শুবাহ-সন্দেহ মুক্ত। তাই হাদীস দ্বারা লব্ধ জ্ঞান আইনুল ইয়াকীনের পর্যায়ভুক্ত। হাদীসও যে এক প্রকার ওয়াহী তা কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى

তিনি নিজ প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে কিছু বলেন না। তিনি যা বলেন সেও (এক প্রকার) ওয়াহী ; যা তাঁর উপর অবতীর্ণ করা হয়।[১]

অভিধানে ওয়াহী (وحى) শব্দের অর্থ লিখা হয়- الإعلام في الخفاء বা গোপনে অবগত করা। রাগেব ইস্পাহানী বলেন- اصل الوحى الإشارة السريعة ওয়াহীর প্রকৃত অর্থ হল "দ্রুত ইঙ্গিত বা তড়িৎ ইশারা"। আর ইশারা বলা হয় দীর্ঘ বক্তব্যকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করাকে। যা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন:

* অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে- যেমন: ট্রাফিক পুলিশের ইশারা ইঙ্গিত।

---

[১] সূরা: ৫৩ আয়াত: ৩-৪

* লিখে - যেমন : هب অর্থ رواه البيهقى ।

* মুখে - যেমন : হ্যাঁ বা না দ্বারা দীর্ঘ বক্তব্যের জবাব প্রদান।

* বিভিন্ন সংকেত ব্যবহার করে, যা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই বুঝতে পারেন। যেমন : যুদ্ধ-কালে শত্রু মিত্র সনাক্ত করার জন্য সৈনিকরা একেক সময় একেক ধরণের সংকেত ব্যবহার করে থাকেন।

ওয়াহীও মূলত অধিকাংশ সময় এমন কিছু সংকেত ধ্বনির মাধ্যমে অবতীর্ণ হত যা কেবলমাত্র নবী রাসূলগণই বুঝতে পারতেন এবং তা দ্রুত সংকেতের মাধ্যমেই হত।[১] ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, নবী একই সময়ে এই ওয়াহীর সংকেত শুনতে, বুঝতে ও সংরক্ষণ করতে পারতেন।[২]

কুরআনে ওয়াহী শব্দের ব্যবহার

কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়াহী শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমনঃ নিষ্প্রাণ বস্তুর ক্ষেত্রে ওয়াহী শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

সেদিন ভূমি তার অবস্থার কথা বর্ণনা করবে যে, তোমার প্রতিপালকই তার প্রতি এই ওয়াহী অবতীর্ণ করেছেন।[৩]

আবার বিবেক-বুদ্ধিহীন প্রাণীর উপরও ওয়াহী শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে - وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ

আর তোমার প্রতিপালক মধু-মক্ষিকার প্রতি এই ওয়াহী করেছেন....।[৪]

আবার বিবেকবান প্রাণী অর্থাৎ মানুষ ও জ্বীনের উপরও ওয়াহী শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। জ্বীনের উপমা - يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

তাদের (জ্বীনদের) কতিপয় কতিপয়ের নিকট সুসজ্জিত কথামালা ওয়াহী করে থাকে।[৫]

মানুষের মাঝে যারা নবী নয় তাদের উপমা - وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى

আমি মূসার মায়ের নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করলাম।[৬]

---

[১] বুখারী শরীফ বাদউল ওয়াহী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[২] শায়খুল হাদীস: হযরত মাও. কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (দা: বা:)-এর বুখারীর তকরীর থেকে আহরিত।

[৩] সূরা: যিলযাল আয়াত: ৪-৫।

[৪] সূরা: নহল আয়াত: ৬৮।

[৫] সূরা: ৬ আয়াত: ১১২।

[৬] সূরা: কাসাস, আয়াত: ৭।

وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ (اي يوسف قبل النبوة) لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا

আমি ইউসুফের নিকট (নবী হওয়ার পূর্বে) এ মর্মে ওয়াহী অবতীর্ণ করলাম যে, আমি অবশ্যই তাদের এই কৃতকর্ম সম্পর্কে (পরে) তাদেরকে অবহিত করব।[১]

নবীদের জন্য প্রেরিত প্রত্যাদেশের জন্যও ওয়াহী শব্দের প্রয়োগ হয়েছে; ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

আমি তোমার নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করেছি, যেরূপ আমি তোমার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ করেছিলাম এবং আমি ওয়াহী অবতীর্ণ করেছি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণ এবং ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মানের নিকট এবং আমি দাউদকে দিয়েছি যাবূর।[২]

তবে শরীয়তের পরিভাষায় কেবলমাত্র নবীদের প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশকেই ওয়াহী বলা হয়। আল্লাহর অপরাপর বিশেষ বান্দাদের উপর যে ঐশী ইশারা বা ইঙ্গিত প্রক্ষেপিত হয় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় ইলহাম বলা হয়।

ইমাম গাযালী মনে করেন, ইলহাম কোনরূপ মাধ্যম ব্যতিত সরাসরি অন্তরে প্রক্ষেপণ করা হয়। তবে মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী মনে করেন, ইলহামের বেলায়ও ফিরিশতা অন্তরে অবতীর্ণ হয়। তিনি দাবী করে বলেন, আমরা ফিরিশতার মধ্যস্থতাকে অনুভব করি এবং তাদের গমনাগমনকে প্রত্যক্ষ করে থাকি।[৩]

তা সত্ত্বেও ইলহামের ক্ষেত্রে ফিরিশতাকে সরাসরি অবলোকন এবং তাদের থেকে সরাসরি শ্রবণ দু'টি বিষয় একত্রিত হয় না। তা ছাড়া ইলহাম মুবাশ্‌শারাত (শুভ ইঙ্গিত) ও জুয্য়ী বা আংশিক বিষয়ে হয়ে থাকে। আর ওয়াহী শরীয়ত ও কুল্লিয়্যাত বা সামগ্রিক ব্যাপারে হয়ে থাকে।

কুরআনে কারীমে আম্বিয়াগণের প্রতি অবতীর্ণ ওয়াহীকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

(١) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا (٢) أو مِن وَرَاءِ حِجَابٍ (٣) أو يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ - سورة الشورى : ٥١

---

[১] সূরা: ইউসুফ, আয়াত : ১৫।

[২] সূরা: ৪ আয়াত: ১৬৩।

[৩] শায়খুল হাদীস: হযরত মাও. কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (দা: বা:) -এর বুখারীর তকরীর থেকে আহরিত।

(১) وحياً أي بالمنام أو بالإلهام

অর্থাৎ স্বপ্ন কিংবা ইলহামের মাধ্যমে প্রেরিত ওয়াহী।

(২) أو مِن وَرَاء حِجَابِ أي بلا واسطة، بل يكلّمه بشراشرِه مِن وراء حجاب

অর্থাৎ পর্দার অন্তরাল থেকে কোনরূপ মাধ্যম ব্যতীত, সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে।

(৩) أو يُرْسِلَ رَسُولاً أي يرسل ملائكة فيتكلّم مع المرسل اليه

কিংবা ফিরিশতা প্রেরণের মাধ্যমে, যিনি রাসূলের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করতেন।

ফিরিশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ ওয়াহীরও বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল। যথা:

(১) জিবরাঈল কখনো আপনরূপে আবির্ভূত হতেন। যেমন: ইরশাদ হয়েছে

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ○ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى ○ (سورة النجم)

(২) জিবরাঈল মানুষের রূপধরে আবির্ভূত হতেন। (دليله في حديث جبريل)
অধিকাংশ সময় জিবরাঈল হযরত দেহইয়ায়ে কালবীর রূপধরে আবির্ভূত হতেন।

(৩) জিবরাঈল আলমে মালাকূতে থেকে নবী সা. এর قلب কে তাসখীর করে নিতেন। এর বিস্তারিত বিবরণ باب كيف كان بدؤ الوحي (বুখারী - ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য)

موحى به এর প্রেক্ষিতে ওয়াহী দুই প্রকার। যথা :

কখনো জিবরাঈল সরাসরি আল্লাহর কালামকে বহন করে নিয়ে এসে নবীকে শুনিয়ে যেতেন। এর উদাহরণ অনেকটা টেলিগ্রাফের সংকেত ধ্বনির মত কিংবা রেডিও ও টেপের মত। এটাকে ওয়াহীয়ে متلو বল হয়, যা কাদীম বা অনাদি-অনন্ত।

আবার অনেক সময় আল্লাহর কালামের ভাব জিবরাঈল নিজের ভাষায় বর্ণনা করতেন। শ্রবণের পর নবীও তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতেন। সুতরাং নবীর স্বপ্ন, ইলহাম কিংবা জিবরাঈলের ভাষ্যে বর্ণিত আল্লাহর কালাম যা তিনি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতেন এসবগুলোই ওয়াহীয়ে غير متلو এর অন্তর্ভূক্ত। যেহেতু কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ○ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ○ (سورة النجم ٣-٤)

সুতরাং ধরেই নিতে হবে, নবী যা বলেন, করেন বা সমর্থন করেন এসব কিছুই ওয়াহীয়ে গায়র মতলু। আর এগুলোকেই হাদীস বলা হয়, যা মূলত ওয়াহীরই মর্যাদা রাখে।

হাদীসের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা :

حدث মূলধাতু থেকে হাদীস (حديث) শব্দটির উৎপত্তি। বাবে نصر . حدث থেকে এর অর্থ হয় সংঘটিত হওয়া, নতুন করে ঘটা। এ থেকেই হাদীস শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ কথা। কেননা মানুষের কথাও নতুন করে করে উৎপত্তি হয়। حديث শব্দটি قديم এর বিপরীত অর্থবোধক রূপেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবে এর অর্থ হবে ক্ষণস্থায়ী, কেননা قديم এর অর্থ চিরস্থায়ী। এ বিচারে মানুষের কথাকে حديث বলা হয় এজন্য যে, এগুলো কালামুল্লার ন্যায় কাদীম বা চিরস্থায়ী নয় ; বরং ক্ষণস্থায়ী। তবে পরিভাষায় قول الرسول وفعله وتقريره রাসূলের কথা, কাজ ও অনুমোদকে হাদীস বলা হয়।

হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী বলেন: নবীর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস বলার বিষয়টি একটি আয়াত থেকে نقلا وتفاولا বা শুভ প্রত্যাশায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। কারণ কুরআনে কারীমে দ্বীনকে নিয়ামত বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, এবং আমার নিয়ামতের ধারাকে পরিসমাপ্ত করে দিলাম।[১]

অপরদিকে আল্লাহ নবী সা. কে নির্দেশ দিয়েছেন ○ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "ওয়াহীর মাধ্যমে রিসালাতের যে নিয়ামত তোমাকে দেওয়া হয়েছে তা মানুষের নিকট বর্ণনা কর। এ প্রত্যাদেশেরই সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে নবী সা. এর সামগ্রিক জীবন ধারায়। যেন সেই নিয়ামতেরই বর্ণনা করেছেন তিনি তাঁর সারা জীবনের কথোপকথন, কাজকর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে। অতএব, নবী সা. এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কখন থেকে হাদীস সংকলন শুরু হয়?

মূলতঃ হাদীসগুলো কুরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। বস্তুতঃ কুরআনের সবকথা বিস্তৃত বর্ণনা সমৃদ্ধ ছিল না। বরং তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। কেননা কোন আয়াত ছিল مشكل; কোনটি ছিল مجمل; কোনটি مطلق; কোনটি عام; কোনটি خاص। হাদীস এগুলোকে সহজবোধ্য করে দিয়েছে। মুতলাককে মুকাইয়্যিদ করে দিয়েছে। عام কে خاص করেছে। مشكل কে مفسر ভাবে বর্ণনা করেছে।

তাছাড়া কুরআন বহু হুকুম বর্ণনা করলেও তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া, সময় সীমা ইত্যাদি নির্ধারণ করে দেয়নি। যা নবী সা. বর্ণনা করে দিয়েছেন।

---

[১] সূরা: মায়েদাহ্, আয়াত : ৩।

সুতরাং নবী সা. এর সব কিছুই কুরআনের ব্যাখ্যা। যা উম্মতের জন্য অবশ্য অনুসরণীয়। তাই সংরক্ষণীয়ও বটে। বস্তুত সেকারণেই শুরু থেকে সাহাবায়ে কিরাম কুরআনের পাশাপাশি হাদীস সংরক্ষণের প্রতিও বিশেষভাবে যত্নশীল ছিলেন। বরং বলা যায় যে, রাসূল সা.-এর হাদীসকে সংরক্ষণের সুমহান দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামের জামাতকে বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুতঃ তারা ছিলেন নবীর সঙ্গলাভে ধন্য হওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে মনোনীত। তাই তারা নবীর হাদীসগুলোকে সংরক্ষণের বিষয়টিকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাদের ঐকান্তিক সাধনা, নবীর প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও ভালবাসা, অন্ধকার জীবনে নবীর বক্তব্যে আলোর সন্ধান লাভ, শুনামাত্রই তা নির্ভূলভাবে সংরক্ষণ ও অন্তরে ধারণের তীব্র আকাঙ্খা, প্রত্যেকটি কথাকে আমলে বাস্তবায়ন করার চেতনা এসব কিছু মিলিয়েই তাদের জন্য নবীর হাদীসসমূহকে সংরক্ষণ করা সহজ হয়েছিল।

কোন বিষয়কে সংরক্ষণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে স্মৃতিতে ধারণ ও লিখে সংরক্ষণ এ দু'টিই প্রধান। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এ দু'টি পন্থার কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং একটি আরেকটির সম্পূরক। কেননা অনেক সময় মানুষের স্মৃতিতে ভ্রম হয়, তখন লিখিত তথ্যের সহযোগিতায় সেই স্মৃতি-ভ্রমের সংশোধন করা হয়। আবার অনেক সময় লিখতে গিয়েও ভুল হয়, তখন স্মৃতির ভান্ডারে রক্ষিত তথ্যের সাথে মিলিয়ে সেই ভুলের সংশোধন করা হয়। বস্তুতঃ দু'টি মিলেই একটি পূর্নাঙ্গ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া গড়ে উঠে। সে ভিন্ন কথা যে, লিখিত তথ্য ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না; অথচ স্মৃতির ভান্ডারে রক্ষিত তথ্য ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অন্যদিক ভাবলে দেখা যায় যে, লিখিত তথ্য পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, হারিয়ে গিয়ে বা অন্য কোন ভাবে ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু স্মৃতির ভান্ডারে রক্ষিত তথ্য মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই অক্ষত থাকে। তাই কোনটির চেয়ে কোনটি বেশী গুরুত্ব বহন করে তা বলা যায় না।

মানুষ এদু'টি পন্থায়ই তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে। তবে যে যুগে লিখার উপকরণে স্বল্পতা ছিল, সে যুগের মানুষ স্মৃতির উপরই নির্ভর করেছে বেশী। প্রস্তর গাত্র বা শিলা খন্ডে লিখে রেখেছে খুবই অল্প। কিন্তু লিখার উপকরণ যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, স্মৃতির উপর নির্ভরশীলতাকে মানুষ ততই কমিয়ে ফেলেছে এবং লিখার মাধ্যমে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে জোরদার করেছে।

বস্তুতঃ রাসূল সা. এমন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে পৃথিবীতে এসেছিলেন, যখন মানুষের তথ্য সংরক্ষণব্যবস্থা ছিল স্মৃতিনির্ভর। কিন্তু সেটা ছিল লিখার উপকরণ বিকাশের সূচনাকাল। সে সময় পর্যন্ত মানুষ স্মৃতিতে ধারণ করে সংরক্ষণের প্রতিই অধিক

যত্নবান ছিল। তখন লিখার উপায় উপকরণও পর্যাপ্ত ছিল না, তাছাড়া লিখা-পড়া জানা লোকের সংখ্যাও ছিল নিতান্ত নগণ্য। যে কারণে প্রথমদিকে তিনি কুরআনকে লিখে সংরক্ষণ করার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তথ্য উপাত্ত থেকে যতটা অনুমান করা যায় তাতে তিনি শুরুর দিকে কুরআনকে লিখে এবং হাদীসগুলোকে স্মৃতিতে ধারণ করে সংরক্ষণের পন্থা অনুসরণের সংকল্প করেছিলেন বলে মনে হয়। যে কারণে তিনি শুরুর দিকে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরে হয়ত তিনি তার এই সিদ্ধান্ত পরিমার্জন করেছেন এবং হাদীস সমূহও লিখার অনুমতি দিয়েছেন।

বস্তুতঃ কুরআন ও হাদীস উভয় বিষয়ের সংরক্ষণের জন্য উভয় ধরণের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হয়েছে। একদিকে যেমন কাতেবীনে ওয়াহী কুরআনকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছেন। অপরদিকে হুফ্‌ফাযুল কুরআন যারা ছিলেন, তারা কুরআনকে স্মৃতিপটেও সংরক্ষণ করেছেন। আর হাফেজে হাদীসগণ মুখস্ত করে হাদীসগুলো সংরক্ষণ করেছেন, আবার সাহাবাদের অনেকেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু কিছু হাদীস লিখে রেখেও হাদীস সংরক্ষণ করেছেন। তবে নবী সা. কুরআনকে যেভাবে নিজে তত্বাবধান করে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন, হাদীসের ব্যাপারে নিজ উদ্যোগে নিজস্ব তত্বাবধানে সেগুলো লিপিবদ্ধ করানোর বিশেষ কোন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেননি। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছায় পূর্ণ কুরআন এবং হাদীসের এক বিরাট অংশ উভয় পন্থায় সংরক্ষিত হয়ে গেছে। সম্ভবত মহান আল্লাহ তা'আলা আপন ইচ্ছায় এই উভয় পন্থায় কুরআন ও হাদীসকে সংরক্ষণের মহান দায়িত্ব সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে আঞ্জাম দিয়েছেন। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য মনোনীত এই দ্বীনের সংরক্ষণ ব্যবস্থায় কোনরূপ ফাক-ফোকর না থাকে। কেননা যদি শুধু লিখন পদ্ধতির উপর নির্ভর করা হত তাহলে হয়ত সমালোচকরা বলত যে, শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর এক সম্প্রদায় লিখার কাজ আঞ্জাম দিয়েছে, কে জানে তারা কতটা যথাযথ ও নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। আর যদি শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করা হত, তাহলে তারা বলত যে, অশিক্ষিত লোকেরা তাদের স্মৃতি থেকে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছে। কে জানে তারা কতটা যথাযথ ও নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছে। যেরূপ ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিমা পণ্ডিতেরা এবং এদেশীয় তাদের দোসররা আজকাল বলে থাকে।

যদি শুধুমাত্র স্মৃতিতে ধারণ করেও হাদীস সংরক্ষণ করা হত তাহলেও এতে কোন জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সা.-এর বক্তব্যগুলোকে জীবনের পথে আলোর দিশা হিসাবে পেয়ে পরম ভক্তি ও আবেগ নিয়ে তা স্মৃতিতে ধারণ করতেন স্বযতনে। নবীর প্রতি পরম ভালবাসা ও আবেগই সেগুলো স্মৃতিতে ধারণের কাজটি তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছিল।

তাছাড়া আরবরা এমনিতেই প্রচণ্ড স্মৃতিধর ও স্মৃতিনির্ভর এক জাতি ছিল। সেই জাহেলী যুগ থেকে কবিদের রচিত সুদীর্ঘ কাব্য উপাখ্যান বংশানুক্রমে স্মৃতিতে ধারণ করে যুগ যুগ বহণ করা যাদের সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এমনকি উটের বংশ তালিকা মুখস্ত করে রাখা যাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, তাদের জন্য একান্ত প্রিয়তম নবীর পবিত্র কালামকে হুবহু মুখস্ত করা ও স্মৃতিতে ধারণ করা কোন অসম্ভব বিষয় ছিল না।

আজও আমাদের শিশুরা ৬২৩৬ আয়াত বিশিষ্ট ৩০ পারা কুরআনকে কি নিপুণ ও নির্ভুলভাবে মুখস্ত করে সারাজীবন স্মৃতিতে ধারণ করে রাখে, তাতে আমরা অসম্ভাব্যতা দেখিনা। তাহলে সাহাবায়ে কিরাম যদি আল্লাহর রাসূলের কালামগুলোকে নির্ভুলভাবে স্মৃতিতে ধারণ করে থাকেন তাতে সন্দেহ জন্মার কথা নয়।

তাছাড়া গোটা হাদীসের ভাণ্ডারের সম্পূর্ণগুলো একজন মাত্র ব্যক্তি মুখস্ত করেছিলেন বিষয়টি এমনও নয়। বরং হাকেমের অভিমত অনুসারে ৪০০০ মতান্তরে ১৫০০ ব্যক্তি মিলে একাজটি সম্মিলিতভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। এক তথ্যমতে রাসূল (সা.) থেকে যে বাণীসমূহ সংরক্ষিত আছে তাকরার বা দ্বিরুক্তি বাদে তার মোট সংখ্যা ১২০০০ এর চেয়ে কিছু বেশী। যদি একজন শিশুর পক্ষে ৬২৩৬ আয়াত সম্বলিত পূর্ণ কুরআন একাই মুখস্ত করা সম্ভব হয়, তাহলে ১২০০০ হাদীস ৪০০০ মতান্তরে ১৫০০ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে মুখস্ত করা কেন অসম্ভব হবে ?

সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সা. কর্তৃক বর্ণিত হুবহু শব্দে হাদীসগুলোকে মুখস্ত করার ব্যাপারে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। পারস্পরিক তাকরার বা আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা হুবহু শব্দে তা ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। শিশুরা যেমন কুরআন-কবিতা মুখস্ত করে, সাহাবায়ে কিরাম তেমনি রাত জেগে জেগে নবীর হাদীসগুলোকে মুখস্ত করতেন- এমন বহু ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিদ্যমান রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি আমার রাত্রগুলোকে তিনভাগে ভাগ করে নিতাম। প্রথমভাগে নিদ্রা যাপন করতাম, দ্বিতীয়ভাগে ইবাদত বন্দেগী করতাম। আর তৃতীয়ভাগে নবিজীর হাদীস মুখস্ত করতাম।[১]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শুরুর দিকে রাসূল সা. কুরআনকে লিখে ও হাদীসকে স্মৃতিতে ধারণের মাধ্যমে সংরক্ষণের চিন্তা করেছিলেন। এর একটি কারণ হয়ত পর্যাপ্ত উপকরণের দুর্লভ্যতা ও লিখতে জানেন এমন লোকের অভাবও হতে পারে।

---

১ মুসনাদে দারেমী

তাছাড়া আরবের লোকদের অধিকাংশই ছিল উম্মী। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের একটিকে অপরটির সঙ্গে মিলিয়ে ঝুলিয়ে একাকার করে ফেলার সম্ভাবনা ছিল। হতে পারে এজন্যও তিনি কুরআনকে মিশ্রণমুক্ত করে সংরক্ষণের তাকীদে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করে থাকতে পারেন।

তাছাড়া কুরআনকে بلفظه বা হুবহু শব্দে সংরক্ষণ করা যতটা অত্যাবশ্যকীয় পর্যায়ের ছিল, হাদীসের ক্ষেত্রে হুবহু শব্দে সংরক্ষণের বিষয়টি ততটা অত্যাবশ্যকীয় পর্যায়ের ছিল না। কারণ হাদীসের ক্ষেত্রে অর্থের দিকটাই প্রাধান্য পেত। সুতরাং অর্থ অবিকল রেখে কোন শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হলে তাতে তেমন কোন অসুবিধার কারণ ছিল না। যে কারণে তিনি শুরুর দিকে হাদীসগুলো লিখতে নিষেধ করেছিলেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. বলেন যে -

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ

রাসূল সা. আমাদেরকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু না লিখতে নির্দেশ দেন।[১]
তখন যারা লিখার অনুমতি চেয়েছিলেন তাদেরকে তিনি লিখার অনুমতি দেননি। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন -

اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا

আমরা রাসূল সা.-এর কাছে লিখার অনুমতি প্রার্থণা করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে অনুমতি দেননি।[২]
মুসলিম শরীফের এক রিওয়ায়াতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত আছে-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَكْتُبُوا عَنِّى وَمَنْ كَتَبَ عَنِّى غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّى وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ –

আমার কোন কথা তোমরা লিপিবদ্ধ করো না, কুরআন ছাড়া অন্য কিছু যদি কেউ আমাথেকে লিপিবদ্ধ করে থাকে তাহলে সে যেন তা মিটিয়ে ফেলে। আমার কোন কথা তোমরা মৌখিকভাবে বর্ণনা করতে পার, এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যদি কেউ ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করে তাহলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।[৩]
মুসনাদে আহমদে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে-

---

[১] উমদাতুল কারী।
[২] উমদাতুল কারী।
[৩] মুসলিম।

كُنَّا قُعُودًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "مَا هَذَا تَكْتُبُونَ؟ فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنْكَ، فَقَالَ: "أَكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ؟ أَمْحِضُوا كِتَابَ اللَّهِ وَاخْلِصُوهُ، قَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ

আমরা নবী সা. থেকে যা শুনতাম তা লিপিবদ্ধ করতাম। একদিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞাস করলেন, তোমরা এগুলো কি লিখছ? আমরা বললাম আপনাথেকে যা কিছু শুনি সেগুলো। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে আরেক কিতাব বানাতে যাচ্ছ? আল্লাহর কিতাবকে একক গ্রন্থ হিসাবে থাকতে দাও এবং তাকে মিশ্রণমুক্ত রাখ। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, এ শুনে আমরা ইতিপূর্বে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছিলাম তার সমুদয় এক মাঠে একত্রিত করলাম এবং সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিলাম। [১]

কিন্তু পরে যখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন এবং কুরআনের ন্যায় হাদীসকেও লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন, কিংবা কুরআন ও হাদীসকে মিলিয়ে একাকার করে ফেলার পর্যায় থেকে অগ্রসর হয়ে সাহাবীগণ পরিপক্কতা অর্জন করে ফেলেছেন বলে মনে করেছিলেন; উপরন্তু একদল লোক কুরআনকে হুবহু শব্দে মুখস্ত করে ফেলেছিলেন, ফলে হাদীস কুরআন একাকার হয়ে যাওয়ার আশংকা দূরিভূত হয়ে গিয়েছিল; তখন তিনি হাদীসগুলোও লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যখন তিনি লিখার অনুমতি দিয়েছিলেন তখন থেকেই সাহাবায়ে কিরামের এক জামা'আত ব্যক্তিগতভাবে হাদীস লিখে রাখার কাজ শুরু করেন।

লিখার অনুমতি পাওয়ার পর সাহাবায়ে কিরামের একটি উল্লেখযোগ্য দল রাসূল সা.-এর দরবারে বসে ব্যক্তিগতভাবে লিখার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। বিভিন্ন রিওয়ায়াতের উদ্ধৃতি থেকে তা পরিস্কারভাবে বুঝা যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. উল্লেখ করেছেন যে-

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صــ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَو رُومِيَّةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلْ مَدِينَةُ هِرَقْلَ أَوَّلًا.

আমরা যখন রাসূল সা.-এর চতুস্পার্শ্বে বসে লিখছিলাম তখন রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কনস্টান্টিনোপল ও রোম এই দুই নগরের কোনটি প্রথমে বিজিত হবে? উত্তরে তিনি বললেন, বরং হেরাক্লিয়াসের শহর (কনস্টান্টিনোপল)ই প্রথম বিজিত হবে। [২]

---

[১] মাজমাউয যাওয়ায়িদ, মুসনাদে আহমদ।
[২] সুনানে দারেমী।

এই বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল সা. লিখার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর দরবারে একদল লোক হাদীস লিখার জন্য সবসময় তাকে ঘিরে থাকতেন।

পরে যে, তিনি লিখার অনুমতি দিয়েছিলেন এ সম্পর্কে বহু রিওয়ায়াতের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তিরমিযীর রিওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনৈক আনসারী সাহাবী নিজের স্মৃতিদৌর্বল্যের অভিযোগ করে বলেন যে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رجل من الأنصار يجلسُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيسمع من النبيِّ صلى الله عليه وسلم الحديثَ، فَيُعْجِبُهُ ولا يَحْفَظُه، فَشكا ذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال : يا رسولَ الله، إني لأسْمَعُ منكَ الحديث فَيُعْجِبُني، ولا أحفَظه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : استَعِنْ بِيَمِينك، وأوْمَأ بيده إلى الخط. ترمذي عن ابى هريرة

প্রতিদিন আপনি যে, ওয়াজ-নসীহত করেন তা আমার ভালো লাগে। কিন্তু আমি তা মনে রাখতে পারি না। নবী সা. তাকে বললেন : "ডান হাতের সাহায্য গ্রহণ কর"[১]। তাছাড়াও বহু রিওয়ায়াত দ্বারা সাহাবীগণ যে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে এ ধরণের কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হল।

(١) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَو فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أو مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ــ بخارى

তরজমা : আবু হুজায়ফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি হযরত আলী রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনার নিকট কি কোন কিতাব আছে? তিনি বললেন না, তবে আল্লাহর কিতাব আছে, আর একজন মুসলমান যে জ্ঞান প্রদত্ত হয় তা আছে, আর আমার এই সহীফায় যা আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই সহীফায় কী আছে? তিনি বললেন- হত্যার দণ্ডবিধি, গোলাম আযাদ করার বিধান, এবং কোন কাফেরকে হত্যা করার দায়ে যে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না তার বিধান।[২]

(٢) عن أبي هريرة : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أهل الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ (أي ابي شاه اليمانى) ــ بخارى

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, ইয়ামানের বাসিন্দা জনৈক ব্যক্তি এগিয়ে আসলেন এবং বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ (আপনার এই বক্তব্য) আমাকে

---

১ তিরমিযী

২ বুখারী।

লিখে দিন। তখন রাসূল সা. বললেন, ফলানার বাপকে (অর্থাৎ আবু শাহ আল-ইয়ামানীকে) তা লিখে দাও।[১]

(٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ — بخارى

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে যা বর্ণিত তা ছাড়া নবী সা.-এর সাহাবীদের কেউই আমার চেয়ে বেশী হাদীস জানতেন না। কেননা তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না।[২]

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ عَنْ ذَلِكَ وَقَالُوا تَكْتُبُ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ حَتَّى ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ —

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. থেকে যা কিছু শুনতাম তাই লিপিবদ্ধ করে রাখতাম, উদ্দেশ্য ছিল সেগুলোকে সংরক্ষণ করা। কিন্তু কুরায়শরা আমাকে এমন করতে নিষেধ করল। তারা বলল- তুমি রাসূল থেকে যা শুন তাই লিপিবদ্ধ কর, অথচ রাসূল তো একজন মানুষ, অনেক কথা তিনি শান্ত স্বাভাবিক অবস্থায় বলেন আবার অনেক কথা তিনি রাগের বশবর্তী হয়েও বলেন। ফলে আমি লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত হয়ে গেলাম এবং রাসূল সা.-এর নিকট বিষয়টি বিবৃত করলাম। তিনি তখন তাঁর আঙ্গুল দিয়ে মুখের দিকে ইশারা করে বললেন- তুমি লিপিবদ্ধ করো। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি এ (মুখ) থেকে সত্য ছাড়া কিছুই নির্গত হয় না।[৩]

(٥) عن انس بن مالك رض قال قال رسول الله صـ قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ. — ابن عبدالبر في جامع البيان

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন যে, ইলমকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ কর।[৪]

হিজরী প্রথম শতকে হাদীস সংকলন

হযরত সাহাবায়ে কিরাম কুরআন ও হাদীসকে সংরক্ষণের জন্য মরণপণ সাধনা ব্যায় করে গেছেন। যদিও রাসূল সা.-এর সাহাবীর সংখ্যা ১,১৪,০০০ ছিল।

---

১ বুখারী।
২ বুখারী।
৩ বুখারী।
৪ ইবনে আব্দিল বার সংকলিত জামেউল বয়ান।

কিন্তু তাঁদের সকলেই হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। বরং যারা হাদীস আহরণ, সংরক্ষণ ও বর্ণনার সাথে জড়িত ছিলেন এবং এটাকে জীবন সাধনা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তাদের সংখ্যা হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরীর মতে ৪০০০। অবশ্য হাফেজ যাহাবী মনে করেন যে, তাদের সংখ্যা ১৫০০ এর মত হতে পারে। তবে তা কোন মতেই ২০০০ পর্যন্ত পৌঁছবে না। গবেষকরা অবশ্য যাহাবীর মতামতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

ইবনে হযম জাহেরীকৃত 'আসমাউস সাহাবা আর-রুআত' নামক গ্রন্থে নবী সা. থেকে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের (নারী পুরুষ মিলিয়ে) যে পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে, তাতে মোট ১০১৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'তালকীহু ফুহুমে আহ্লিল আসর' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আরো ৯০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সে মতে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের সংখ্যা দাঁড়ায়.- ১০১৮ + ৯০ = ১১০৮ জন। আতরাফে মুসনাদে আহমদ-এর পরিসংখ্যান অনুসারে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের সংখ্যা ১১৫৪ জন। ইবনে হজরকৃত ইত্তিহাফুল মুহরাহ-এর তথ্যমতে তাদের সংখ্যা ১৩৩১ জন। হাফেজ ইবনুল জাওযী হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তাতে মোট ১৮৫৮ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। যাদের মাঝে ১৬৪২ জন পুরুষ এবং ২১৬ জন নারী। তবে এদের কারো কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণিত থাকার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে।

ইমাম আহমদ তার মুসনাদে মোট ৯০৪ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বকী ইবনে মাখলাদ তার মুসনাদে এমন আরো ৫৬৮ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাদের থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেননি। আবু বকর আল-বারকী এই তালিকায় আরো ৮৭ জনের নাম বর্ধিত করেছেন যাদের থেকে বকী ইবনে মাখলাদ ও ইমাম আহমদ হাদীস আহরণ করেননি। ইবনুল যাওযী আরো ৬ জনের নাম বর্ধিত করেছেন। সুতরাং মোট সংখ্যা দাড়ায় ৯০৪ + ৫৬৮ + ৮৭ + ৬ =১৫৬৫। তবে এই তালিকার কারো কারো সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে।

অবশ্য শুধু সিহাহ সিত্তায় যেসব সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত আছে তাদের সংখ্যা মিযযীকৃত তুহ্ফাতুল আশরাফের ভূমিকায় টিকাকারের ভাষ্যমতে ৯৯৫ জন। বস্তুত সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মতামত থাকলেও তাদের সংখ্যা ১৫০০ এর মত বলে যাহাবী যে মন্তব্য করেছেন সেটিই অধিক বস্তুনিষ্ঠ মত বলে মনে হয়।

হাদীসের যে বিশাল ভাণ্ডার, তার ভিত্তি মূলতঃ এই দেড় হাজার সাহাবীর উপর। এদের মাঝে ৭ জন এমন যারা ১০০০ এর চেয়ে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৮৭০। ৫০০-১০০০ পর্যন্ত যারা

হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা ৪ জন। তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৬২১টি। ১০০-৫০০ পর্যন্ত যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা ২৮ জন। তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৪৫৯টি। ৪০-১০০ পর্যন্ত যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা মোট ৪৫ জন; তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ২৬৪৪। ১০-৪০ টি পর্যন্ত যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা ১১১ জন; তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২১২২ টি। ১টি থেকে ৯টি পর্যন্ত যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা ৯১৬ জন, তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৯৮০টি।

৯ টি	করে বর্ণনা করেছেন	মোট ১১ জন
৮ টি	”	” মোট ২০ জন
৭ টি	”	” মোট ২৮ জন
৬ টি	”	” মোট ২৬ জন
৫ ”	”	” মোট ২৮ জন
৪ ”	”	” মোট ৪৯ জন
৩ ”	”	” মোট ৭৮ জন
২ ”	”	” মোট ১২৩ জন
১ ”	”	” মোট ৪৬৩ জন

আমরা নিম্নে আল্লামা ইবনে হজম জাহেরীকৃত 'আসমাউস সাহাবাহ আর-রুআত' গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের একটি তালিকা, বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাসহ নিম্নে উল্লেখ করলাম।

প্রথম তবাকা :

যারা ১০০০ - ৫০০০ পর্যন্ত কিংবা তার চেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১.	হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)	৫,৩৭৪টি
২.	হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমর (রা.)	২,৬৩০টি
৩.	হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)	২,২৮৬টি
৪.	হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)	২,২১০টি
৫.	হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রা.)	১,৬৬০টি
৬.	হযরত জাবির ইব্নে আবদুল্লাহ (রা.)	১,৫৪০টি
৭.	হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)	১,১৭০টি
		১৬,৮৭০

দ্বিতীয় তবাকা : যারা ৫০০- ১০০০ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন :

১.	হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা.)	৮৪৮টি
২.	হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইবনুল 'আস (রা.)	৭০০টি
৩.	হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)	৫৩৭টি
৪.	হযরত আলী মুরতাযা (রা.)	৫৩৬টি
		২৬২১

তৃতীয় তবাকা : যারা ১০০ - ৫০০ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন :

১.	হযরত উম্মে সালমা (রা.)	৩৭৮টি
২.	হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)	৩৬০টি
৩.	হযরত বারা ইব্‌নে আযিব (রা.)	৩০৫টি
৪.	হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)	২৮১টি
৫.	হযরত সা'দ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাস (রা.)	২৭১টি
৬.	হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.)	২৫০টি
৭.	হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)	২২০টি
৮.	হযরত সাহল ইব্‌নে সা'দ (রা.)	১৮৮টি
৯.	হযরত উবাদা ইব্‌নে সামিত (রা.)	১৮১টি
১০.	হযরত ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা.)	১৮০টি
১১.	হযরত আবুদ দারদা (রা.)	১৭৯টি
১২.	হযরত আবূ কাতাদ আনসারী (রা.)	১৭০টি
১৩.	হযরত বুরায়দা ইবনুল হুসায়ব (রা.)	১৬৭টি
১৪.	হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)	১৬৪টি
১৫.	হযরত মু'আবিয় ইব্‌নে আবি সুফয়ান (রা.)	১৬৩টি
১৬.	হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা.)	১৫৫টি
১৭.	হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)	১৫০টি
১৮.	হযরত উসমান ইব্‌নে আফ্‌ফান (রা.)	১৪৬টি
১৯.	হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.)	১৪৬টি
২০.	হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)	১৪২টি
২১.	হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.)	১৩৬টি
২২.	হযরত আবূ বাকরাহ (রা.)	১৩২টি
২৩.	হযরত সাওবান মাওলান্নবী (রা.)	১২৮টি
২৪.	হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)	১২৮টি
২৫.	হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)	১২৩টি
২৬.	হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.)	১১৪টি
২৭.	হযরত আবূ মাসউদ উকবা ইবনে আমের (রা.)	১০২টি
২৮.	হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা.)	১০০টি
		৫৪৫৯

চতুর্থ তাবাকা : অর্থাৎ যাঁরা ৪০-১০০ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন :

১.	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.)	৯৫টি
২.	হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)	৯২টি
৩.	হযরত আবূ তালহা যায়েদ ইবনে সাহল (রা.)	৯২টি
৪.	হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা.)	৮১টি
৫.	হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.)	৮১টি
৬.	হযরত কা'ব ইবনে মালিক আসলামী (রা.)	৮০টি
৭.	হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.)	৭৮টি
৮.	হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা.)	৭৭টি
৯.	হযরত মায়মূনা (রা.)	৭৬টি
১০.	হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.)	৭১টি
১১.	হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)	৭০টি
১২.	হযরত আবূ রাফে' (রা.)	৬৮টি
১৩.	হযরত আউফ বিন মালিক আশজায়ী (রা.)	৬৭টি
১৪.	হযরত আদী ইবনে হাতেম তায়ী (রা.)	৬৬টি
১৫.	হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)	৬৫টি
১৬.	উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)	৬৫টি
১৭.	হযরত আমর ইবনে আওফ (রা.)	৬২টি
১৮.	হযরত সালমান ফারসী (রা.)	৬৪টি
১৯.	উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)	৬০টি
২০.	হযরত জুবাইর ইবন মুতঈম কারশী (রা.)	৬০টি
২১.	হযরত আসমা বিন্‌তে উমায়শ (রা.)	৬০টি
২২.	হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.)	৫৮টি
২৩.	হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা কিনানী (রা.)	৫৬টি
২৪.	হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী (রা.)	৫৫টি
২৫.	হযরত ফুযালা ইবনে উবায়দ আনসারী (রা.)	৫০টি
২৬.	হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.)	৫০টি
২৭.	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.)	৫০টি
২৮.	হযরত সাঈদ ইবনে যায়দ (রা.)	৪৮টি
২৯.	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা.)	৪৮টি
৩০.	হযরত মিকদাম ইবনে মা'দিকারুব (রা.)	৪৭টি
৩১.	হযরত উমর ইবনে উতবা (রা.)	৪৭টি
৩২.	হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.)	৪৭টি
৩৩.	হযরত ফযলা ইবনে উবায়দ আসলামী (রা.)	৪৬টি

৩৪. হযরত উম্মে হানী বিন্‌তে আবি তালেব (রা.) ৪৬টি
৩৫. হযরত আবু বুরদাহ (রা.) ৪৬টি
৩৬. হযরত আবূ জুহায়ফা ইবনে ওয়াহাব (রা.) ৪৫টি
৩৭. হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ তামীমী (রা.) ৪৪টি
৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) ৪৩টি
৩৯ হযরত জুনদাব ইবনে আব্দিল্লাহ (রা.) ৪৩টি
৪০. হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) ৪২টি
৪১. হযরত মু'আবিয়া ইবনে হাইদাহ (রা.) ৪২টি
৪২. হযরত উম্মে আতিয়া আনসারিয়্যা (রা) ৪১টি
৪৩. হযরত হাকীম ইবনে হিযাম আসাদী (রা.) ৪০টি
৪৪. হযরত সহল ইবনে হুনাইফ আনসারী (রা.) ৪০টি
৪৫. হযরত আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) ৪০টি

২৬৪৪

পঞ্চম তাবাকা : অর্থাৎ যারা ১০-৪০ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন

১. হযরত আমর ইবনুল 'আস ৩৯টি
২. হযরত যুবায়র ইবনে 'আওয়াম (রা.) ৩৮টি
৩. হযরত খুযায়মা ইবনে সাবেত (রা.) ৩৮টি
৪. হযরত তালহা ইবনে উবায়দিল্লাহ (রা.) ৩৮টি
৫. হযরত আমর ইবনে 'আবাসাহ ৩৮টি
৬. হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ৩৫টি
৭. হযরত ফাতিমা বিনতে কায়স (রা.) ৩৪টি
৮. হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার ৩৪টি
৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ৩৩টি
১০. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) ৩২টি
১১. হযরত ইরবায্‌ ইবনে সারিয়্যাহ (রা.) ৩১টি
১২. হযরত ইয়ায ইবনে হাম্মাদ তামীমী (রা.) ৩০টি
১৩. হযরত মু'আয ইবনে আনাস (রা.) ৩০টি
১৪. হযরত সুহায়ব ইবনে সিনান (রা.) ৩০টি
১৫. হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারেস (রা.) ৩০টি
১৬. হযরত উসমান ইবনু আবিল 'আস ২৯টি
১৭. হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়্যাহ (রা.) ২৮টি
১৮. হযরত উত্‌বাহ ইবনে আব্দ (রা.) ২৮টি
১৯. হযরত মালিক ইবনে রাবীয়া সায়েদী (রা.) ২৮টি
২০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক (রা.) ২৭টি

২১.	হযরত আবু মালেক আশ'আরী (রা.)	২৭টি
২২.	হযরত আবু হুমায়দ আস-সা'য়েদী (রা.)	২৬টি
২৩.	হযরত ইয়া'লা ইবনে মুররাহ (রা.)	২৬টি
২৪.	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা.)	২৫টি
২৫.	হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.)	২৫টি
২৬.	হযরত সহ্ল ইবনে আবি হাসমা (রা.)	২৫টি
২৭.	হযরত আবুল মালীহ (রা.)	২৫টি
২৮	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)	২৫টি
২৯	হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.)	২৫টি
৩০.	হযরত আবু ওয়াকেদ আল্‌-লাইসী (রা.)	২৪টি
৩১.	হযরত রিফা'আহ ইবনে রাফে' (রা.)	২৪টি
৩২.	হযরত উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা.)	২৪টি
৩৩.	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স (রা.)	২৪টি
৩৪.	হযরত আওস ইবনে আওস (রা.)	২৪টি
৩৫.	হযরত শুরায়দ ইবনে সুওয়ায়দ (রা.)	২৪টি
৩৬.	হযরত লকীত্‌ ইবনে আমের (রা.)	২৪টি
৩৭.	হযরত কুররা ইবনে আয়াস (রা.)	২২টি
৩৮	হযরত আমের ইবনে রাবী'আহ (রা.)	২২টি
৩৯.	হযরত সায়েব ইবনে খাল্লাদ (রা.)	২২টি
৪০.	হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.)	২১টি
৪১.	হযরত রুবাইয়্যি বিন্‌তে মুআওয়ায (রা.)	২১টি
৪২.	হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রা.)	২০টি
৪৩.	হযরত আবু শুরায়হ্‌ আল-কা'বী (রা.)	২০টি
৪৪.	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাররাদ (রা.)	২০টি
৪৫.	হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.)	২০টি
৪৬.	হযরত আমর ইবনে উমাইয়্যাহ আদ-দমিরী (রা.)	২০টি
৪৭.	হযরত সফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.)	২০টি
৪৮.	হযরত সুরাকা ইবনে মালিক (রা.)	১৯টি
৪৯.	হযরত সাবুরা ইবনে মা'বাদ জুহানী (রা.)	১৯টি
৫০.	হযরত তামীম আদ-দারী (রা.)	১৮টি
৫১.	হযরত ফাতেমা বিনতে রাসূল (সা.)	১৮টি
৫২.	হযরত উসায়দ ইবনে হুযায়র আশহালী (রা.)	১৮টি
৫৩.	হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)	১৮টি
৫৪.	হযরত আমর ইবনে হুওয়ায়রিস (রা.)	১৮টি
৫৫.	হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা.)	১৭টি

৫৬.	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা.)	১৭টি
৫৭.	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস (রা.)	১৭টি
৫৮.	হযরত সা'ব (صعب) ইবনে জুছামা (রা.)	১৬টি
৫৯.	হযরত কায়স ইবনে সা'দ (রা.)	১৬টি
৬০.	হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.)	১৬টি
৬১	হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযির (রা.)	১৫টি
৬২.	হযরত সুলায়মান ইবনে চুরদ (রা.)	১৫টি
৬৩.	হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা.)	১৫টি
৬৪.	হযরত তলক ইবনে আলী (রা.)	১৪টি
৬৫	হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবল (রা.)	১৪টি
৬৬.	হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)	১৪টি
৬৭.	হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.)	১৪টি
৬৮.	হযরত হাকাম ইবনে উমায়র (রা.)	১৪টি
৬৯.	হযরত সফীনা মাওলা রাসুলিল্লাহ (রা.)	১৪টি
৭০.	হযরত কা'ব ইবনে মুররাহ (রা.)	১৪টি
৭১	হযরত উম্মে সুলায়ম বিন্তে মিলহান (রা.)	১৪টি
৭২.	হযরত ছাবিত আয্-যাহ্হাক (রা.)	১৪টি
৭৩.	হযরত মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস্-সুলামী (রা.)	১৩টি
৭৪.	হযরত উমারাহ ইবন আবূ জা'দ আসাদী (রা.)	১৩টি
৭৫.	হযরত আবু লায়লা আল-আনসারী (রা.)	১৩টি
৭৬.	হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)	১৩টি
৭৭.	হযরত হুযায়ফা ইবনে উসায়দ গিফারী (রা.)	১৩টি
৭৮.	হযরত সালমান ইবনে আমের (রা.)	১৩টি
৭৯.	হযরত অরওয়া আল-বারেকী (রা.)	১৩টি
৮০.	হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা.)	১৩টি
৮১.	হযরত আবু বসরা আল-গিফারী (রা.)	১২টি
৮২.	হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)	১২টি
৮৩.	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উকায়ম (রা.)	১২টি
৮৪.	হযরত আমর ইবনে আবি সালামাহ (রা.)	১২টি
৮৫.	হযরত আমের ইবনে আবি রবিয়্যাহ (রা.)	১২টি
৮৬.	হযরত সালামা ইবনিল মুহাব্বাক (রা.)	১২টি
৮৭.	হযরত শিফা বিনতে আব্দিল্লাহ (রা.)	১২টি
৮৮.	হযরত সুবায়'আহ আল-আসলামী (রা.)	১২টি
৮৯.	হযরত নুবায়শাহ ইবনে আমর (রা.)	১১টি

৯০.	হযরত আবু কাবাশাহ আল-আনমারী (রা.)	১১টি
৯১.	হযরত আমর ইবনিল হামিক (রা.)	১১টি
৯২.	হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবি সুফরা (রা.)	১১টি
৯৩.	হযরত ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ (রা.)	১১টি
৯৪.	হযরত আবুল ইয়াসার (রা.)	১১টি
৯৫.	হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)	১১টি
৯৬.	হযরত দুবা'আহ বিনতে যুবায়র (রা.)	১১টি
৯৭.	হযরত বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা.)	১১টি
৯৮.	হযরত উরওয়া ইবনে মিকদাম (রা.)	১০টি
৯৯.	হযরত মুজাম্মে' ইবনে জারিয়্যাহ (রা.)	১০টি
১০০.	হযরত সফিয়্যাহ উম্মুল মু'মেনীন (রা.)	১০টি
১০১.	হযরত উম্মু হিশাম বিনতে হারেসাহ (রা.)	১০টি
১০২.	হযরত উম্মু মুবাশ্শির (রা.)	১০টি
১০৩.	হযরত উম্মু কুলসুম (রা.)	১০টি
১০৪.	হযরত উম্মু কুরয্ (রা.)	১০টি
১০৫.	হযরত উম্মু মা'কাল (রা.)	১০টি
১০৬.	হযরত ইতবান ইবনে মালিক (রা.)	১০টি
১০৭.	হযরত অরওয়া ইবনে মুদাররিস (রা.)	১০টি
১০৮.	হযরত নূ'আয়ম ইবনে হিমার (রা.)	১০টি
১০৯.	হযরত আবু মাহ্যূরা (রা.)	১০টি
১১০.	হযরত খুরায়েম ইবনে ফাতেক (রা.)	১০টি
১১১.	হযরত আদী ইবনে উমায়র (রা.)	১০টি
১১২.	হযরত উমায়র মাওলা আবিল্ লাহ্ম (রা.)	১০টি
		২১২২ টি

৯	টি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন	১১জন	=	৯৯টি
৮	" " "	২০জন	=	১৬০টি
৭	" " "	২৮জন	=	১৯৬টি
৬	" " "	২৬জন	=	১৫৬টি
৫	" " "	২৮জন	=	১৪০টি
৪	" " "	৪৯জন	=	১৯৬টি
৩	" " "	৭৮জন	=	২৩৪টি
২	" " "	১২৩জন	=	২৪৬টি
১	" " "	৪৬৩ জন	=	৪৬৩টি
		পরিশিষ্টে ৯০ জন	=	৯০টি
				১৯৮০ টি

বর্ণনাকারীদের সর্বমোট সংখ্যা= ১১১১ জন।

তাঁদের সর্বমোট বর্ণিত হাদীস= ৩১,৬৯৬ টি।

এছাড়াও আরো কিছু সাহাবী হাদীস বর্ণনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যাদের নাম এই তালিকায় উল্লেখ করা হয়নি। যাদের অনেকের নাম পরিচয় উদ্ঘাটন করাও সম্ভব হয়নি। ইলমে হাদীসের যে বিশান জ্ঞান ভান্ডার রয়েছে তা মূলত উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগণেরই অবদানের ফসল বলা চলে।[১] এই পরিসংখ্যানে কোন্ সাহাবী কতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন তাই দেখানো হয়েছে। একজন যা বর্ণনা করেছেন তা অন্যজন বর্ণনা করেননি এরূপ নয়। বরং একই হাদীস একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

ড. মুস্তফা আল-'আযমী উল্লেখ করেছেন যে, আসহাবে রাসূলের মাঝে মোট ৫২ জন সাহাবী এমন ছিলেন যাদের কাছে তৎকর্তৃক সংগৃহীত হাদীসগুলো লিখিত ছিল; কিংবা নিজ স্মৃতিতে ধারণকৃত হাদীসসমূহ তারা আপন শাগরেদদেরকে লিখিয়ে দিয়ে ছিলেন। আর তাবেয়ীনদের এমন ৯৯ জনের নাম ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের কাছে হাদীসের লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল। হিজরী প্রথম শতক ও দ্বিতীয় শতকের শুরুর দিকে যেসব ব্যক্তিবর্গের নিকট হাদীসের লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল তাদের সংখ্যা ছিল ২৫২ জন। তাবয়ে তাবেয়ীনদের শেষ যুগ পর্যন্ত এসে মোট ৪০৩ জন ব্যক্তি হাদীস লিখন ও লিখিত সংকলন তৈরীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

উল্লিখিত ব্যক্তিরা হাদীসের দরস ও শিক্ষাদানের কাজেও নিরত ছিলেন। তাদের ছাত্ররা তাদের প্রস্তুতকৃত এই সংকলনের কপি করে নিত। অনেকের পাণ্ডুলিপির ৮টি কপি করা হয়েছে, কারোটির ১০টি কপি তৈরী করা হয়েছে, আবার কারোটি ১৬টি পর্যন্ত কপি তৈরী করা হয়েছে বলে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত আছে। সুতরাং প্রথম শতকে যেসব সংকলন তৈরী হয়েছিল সেগুলোর যদি গড়ে ১০টি করেও কপি তৈরী হয়ে থাকে তাহলে তার সংখ্যা দাঁড়াবে (৫২+৯৯ = ১৫১×১০) ১৫১০টি। প্রতিটি সংকলনের কপিতে যদি গড়ে ১০০টি হাদীসও থেকে থাকে তাহলে মোট সংকলিত হাদীসের সংখ্যা দাড়াবে (১৫১০×১০০=) ১,৫১,০০০টি। আর যদি তাবেয়ীনদের পূর্ণযুগকে মিলিয়ে হিসাব করা হয় তাহলে সংকলিত হাদীসের সংখ্যা দাঁড়াবে (২৫২×১০=২৫২০×১০০=) ২,৫২,৮০০টি।

---

[১] আসমাউস সাহাবাহ্ আর রুয়াত (ইবনে হযম জাহেরীকৃত)-এর তথ্যাবলম্বনে।

[২] দিরাসাত ফী হাদীসিন্ নববী খ: ১

তাবেয়ীনদের যুগকে প্রথম শতাব্দীর হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট করার একটি যুক্তিসঙ্গত দিক রয়েছে। কেননা তাবেয়ীনদের যুগের সূচনা হয়েছে ১১ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়ালের পর অর্থাৎ রাসূল সা.-এর ইন্তিকালের পর থেকেই। কারণ তাবেয়ী বলা হয় যারা ঈমানের হালে সাহাবীদের সাক্ষাত লাভ করেছেন; কিন্তু রাসুল সা. এর সাক্ষাত পাননি। বস্তুতঃ রাসূল সা.-এর ইন্তিকালের পর তাঁর সাক্ষাত লাভের সুযোগ অবশিষ্ট থাকেনি। সুতরাং রাসূলের ইন্তিকালের পর মূহুর্ত থেকেই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা যদি সাহাবীর সান্নিধ্য লাভ করে থাকেন, তাহলে তারা তাবেয়ী বলে গণ্য হবেন। তাই তাবেয়ীনদের যুগের সূচনা ১০০ হিজরীর পর থেকে হয়েছে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঠিক নয়। যেরূপ ইউরোপের অনেক অমুসলিম গবেষক এহেন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কেননা তাবেয়ীনদের যুগের সূচনা হওয়ার জন্য সমস্ত সাহাবীর দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যেতে হবে- এরূপ ধারণা করা ভুল। বাস্তবে তাবেয়ীনদের যুগের সূচনা রাসূলের ওফাতের পর থেকেই হয়েছে। অবশ্য সরকারীভাবে হাদীসের লিপিবদ্ধ সংকলন ১০০ হিজরীর পরে হয়েছে একথা সঠিক।

এছাড়াও রাসূল সা.-এর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে লিখানো চিঠি-পত্র, রাষ্ট্রীয় ফরমান, ঘোষণাপত্র, চুক্তিনামা, নিরাপত্তানামা ইত্যাদির সংখ্যাও অনেক ছিল। এগুলোও মূলতঃ হাদীস হিসাবে গণ্য হয়। আব্দুর রহীম টুংকী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, রাসুল সা.-এর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে লিখানো দলীল-দস্তাবেজের সংখ্যা ছিল ২৫০টি। কেবলমাত্র মদীনা সনদেই ৫৩ টি ধারা ছিল, যার একেকটি ধারা এক একটি হাদীসের মর্যাদা রাখে।

এভাবে হিসাব করলে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে মিলিয়ে রাসূল সা.এর আহাদীসের এক বিরাট অংশ নবীর জীবদ্দশায় এবং সাহাবীদের যুগ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং যারা মনে করেন যে, হাদীস লিখিতভাবে সংকলন করা হয়েছে ১০০ হিজরীর পর হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর নির্দেশে। তারা মূলতঃ এক ধরণের ভুলের মাঝে রয়েছেন। বস্তুতঃ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. সরকারীভাবে ব্যক্তি বিশেষের কাছে সংরক্ষিত ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকলন ও হাফেজে হাদীসগণের স্মৃতিতে সংরক্ষিত নবী সা.-এর হাদীসসমূহকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন তৈরী করে হাদীসে রাসূলকে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এটিকে লিখিতভাবে হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্যোগ বলা যায়।

তৃতীয় পর্যায়ের লিখিত সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সিহাহ সিত্তাসহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের সংকলকগণ। এতদসংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের আলোকে এ কথা সুস্পষ্টভাবেই বোধগম্য হয়।

কিন্তু উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ.-এর এ উদ্যোগকে লিখিতভাবে হাদীস সংকলনের প্রথম উদ্যোগ বলে ধরে নিয়ে ইসলামবিদ্বেষী মহল এরূপ একটি প্রচারণা খুব জোরেশোরে চালিয়ে থাকেন যে, যেহেতু ১০০ বৎসর পর হাদীসগুলো সংকলন করা হয়েছে অতএব তাতে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হাদীস সংকলনের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অবগত নয় এমন অনেক সাধারণ জ্ঞানীজনরাও পাশ্চাত্যের ইসলামবিদ্বেষী মহলের দরদমাখা এহেন অনুযোগের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিও এহেন ফাঁদে পা দিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

সার কথা এই যে, সাহাবায়ে কিরামের যুগে হাদীস লিপিবদ্ধ আকারে ছিল না একথা সঠিক নয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে না হলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বহু হাদীস লিপিবদ্ধ আকারে বিদ্যমান ছিল এবং রাষ্ট্রীয় ফরমান ও দলীল দস্তাবেজ ইত্যাদির মাধ্যমে বহু হাদীস লিখিতভাবে সংরক্ষিত ছিল। আর বেশ কিছু হাদীস সাহাবায়ে কিরাম স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছিলেন।

এতদসত্ত্বেও সাহাবাগণের যুগে লিখিতভাবে হাদীস সংকলনের কাজ ব্যাপকভাবে হয়নি বলা চলে। কারণ তাদের মাঝে লিখতে জানতেন না অনেকেই। তাছাড়া স্মৃতির উপরই তারা নির্ভর করতেন বেশী। যেহেতু হাদীসগুলো কুরআনেরই ব্যাখ্যা ছিল; আর তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ করেছিলেন জীবনের পথে আলোর দিশা হিসাবে। সুতরাং তাঁরা হাদীসগুলোকে স্মৃতিতে ধারণ করতেন স্বযতনে। তবে নিজস্ব উদ্যোগে ও আবেগে অনেকেই লিখে রেখেছিলেন কিংবা তাদের শাগরেদরা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল, এমন কতিপয় সংকলনের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

সাহাবীদের যুগে হাদীসের লিখিত সংকলন :

১. الصحيفة الصادقة : ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ-এর সূত্রে বুখারীতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা: (মৃত্যু: ৬৫ হি:) এর সংকলন। তিনি বলতেন : ما يرغبنى في الحياة الاالصادقة والوهط তার প্রৌত্র আমর ইবনে শু'আয়ব এর দরস দিতেন।

২. صحيفة علي رض : ইমাম মুসলিম এ সহীফার কথা মুসলিম শরীফে উল্লেখ করেছেন। এতে যাকাত, হত্যার বিধান, গোলাম আযাদকরণ, কাফিরের বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা না করার বিধান, মদীনার হেরেমের সীমারেখা ও তার বিধান, অন্যকে পিতা হিসাবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা, ভূমির প্রাচীন নিদর্শন সমূহ

ধ্বংস করার নিন্দা ইত্যাদি বহু বিষয়ের হাদীস উল্লেখ ছিল। বুখারী শরীফের باب الإعتصام بالكتاب والسنة অধ্যায়ে এর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে এই সংকলনটি অনেক বিস্তারিত ও দীর্ঘ ছিল বলে মনে হয়।

৩. تاليف عمرو بن حزم رض : হযরত আমর ইবনে হাযমকে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় নবী সা. তাকে একটি লিখিত হিদায়াতনামা দিয়ে ছিলেন; যাতে বিভিন্ন বিধি-বিধান ও ধর্মীয় হিদায়াতের কথা উল্লেখ ছিল। তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে তা হিফাজত করেন এবং অন্যান্য গোত্রের নিকট প্রেরিত নবী সা. এর বিভিন্ন চিঠি-পত্র ও ফরমানসমূহকে তার সাথে সংশ্লিষ্ট করেন।

৪. رسالة سمرة بن جندب رض : আল্লামা ইবনে হজর উল্লেখ করেছেন যে, সামূরা রা. এর ছেলে সুলায়মান তার পিতা কর্তৃক সংকলিত বৃহৎ পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।

৫. صحيفة سعد بن عبادة رض : যার উল্লেখ তিরমিযী শরীফে রয়েছে। তার ছেলে সেই সহীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।

৬. صحيفة جابر بن عبدالله رض : হজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে তিনি একটি সংকলন তৈরী করেছিলেন বলে মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে উল্লেখ আছে।

৭. مجموعة مغيرة بن شعبة رض : বুখারীতে (باب الذكر بعد الصلاة) -এ এর উল্লেখ আছে যে, হযরত মুগীরা রা. কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়ে হযরত মুয়াবিয়া রা. এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

৮. مسند أبي هريرة رض : হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের পিতা আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান - যিনি মিশরের গভর্ণর ছিলেন- তাঁর নিকট এই সংকলনটি ছিল। তিনি একবার কাছীর ইবনে মুররাহকে লিখে পাঠালেন যে, নবী সা. এর যে সব হাদীস তোমার কাছে রয়েছে তা লিখে পাঠাও। তবে আবু হুরায়রার হাদীসগুলো পাঠানোর প্রয়োজন নেই, কারণ সেগুলো আমার নিকট সংরক্ষিত আছে।-(তবকাতে ইবনে সা'আদ)

৯. تعليق أبي هريرة رض : বশীর ইবনে নাহীক (نهيك) নামে আবু হুরায়রার একজন শিষ্য এটি সংকলন করেন। অতপর তাঁর থেকে বিদায় গ্রহণের সময় এটি তাকে পাঠ করে শুনান এবং বলেন : এসব হাদীস আমি আপনার নিকট থেকে শ্রবণ করেছি। এ শুনে আবু হুরায়রা বলেন : হ্যাঁ। - (দারেমী)

১০. الصحيفة الصحيحة : হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ নামক জনৈক শিষ্যের জন্য আবু হুরায়রা রা.-এর বাছাইকৃত হাদীসের ছোট একটি সংকলন। যাতে ১৫০

টির মত হাদীস ছিল। পূর্বে 'মুসনাদে আবি হুরায়রা'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত এ দু'টোই আবু হুরায়রা রা. এর সংকলন ছিল।

১১. كتاب الصدقة : এ সংকলনটি রাসূল সা. নিজে বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত গভর্ণরদের নিকট প্রেরণের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। এতে মূলত যাকাত, সাদাকাহ, উশর ইত্যাদির বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

১২. صحف انس بن مالك رض : হযরত সাঈদ ইবনে হিলাল বর্ণনা করেন যে, আমরা যখন হযরত আনাস রা. -এর সম্মুখে বেশী বেশী হাদীস বর্ণনা করছিলাম তখন তিনি একটি পাণ্ডুলিপি বের করে আনলেন এবং বললেন যে, এগুলো আমি নবী করীম সা. থেকে শ্রবণ করেছি। -মুসতাদরাক খ: ৩ পৃ: ৫৭৪-৫৭৫

১৩. صحيفة ابن عباس رض : হযরত আবু কুরায়ব যিনি হযরত ইবনে আব্বাসের গোলাম ছিলেন তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের কিতাবাদীর এত বিরাট স্তুপ পেয়ে ছিলেন যা এক উটের বোঝা হবে।

১৪. صحيفة ابن مسعود رض : আল্লামা ইবনে আব্দুল বার জামেউল বায়ানে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের ভাই আব্দুর রহমান ইবনে মাসউদ একটি কিতাব বের করে এনে বললেন যে, আমি কসম করে বলছি যে, এটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের লেখা কিতাব।

১৫. صحيفة عبد الملك بن مروان : আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান এটি হযরত আবু হুরায়রা রা. -এর পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তাথেকে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।

১৬. صحيفة وهب بن منبه : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ১৫৪০টি হাদীস বর্ণনা করতেন। তার এ হাদীসগুলোও লিপিবদ্ধ ছিল। তাঁর শিষ্য ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ সেগুলো লিপিবদ্ধ করে ছিলেন। -ইবনে হজর, আত্-তাহযীব

১৭. صحيفة عروة بن الزبير : হযরত আয়শা ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করতেন। এগুলো তার কাছ থেকে উরওয়া ইবনে যুবায়র লিপিবদ্ধ করে নিয়ে ছিলেন।[১]

একটি প্রশ্ন : উপরে আবু হুরায়রার ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি লিখেননি বরং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস লিখেছেন বলে তিনি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাহলে তিনি সংকলন তৈরী করে ছিলেন, এ বিবরণ কতটা যথার্থ ?

উত্তর : হয়ত তিনি নিজে লিখেননি, অন্যকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, কিংবা অন্যের দেখা দেখি তিনিও হয়ত পরে লিখতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

---

১ তাদবীনে হাদীস পৃ: ৫৩-৬৩।

এই বিবরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের জন্য নির্বাচিত হাদীসসমূহ অনেকেই খণ্ড খণ্ড পুস্তিকা আকারে লিখে রেখেছিলেন। যেগুলো বৃহৎ মানের সংকলন না হলেও লিখিতভাবে সেগুলো ব্যক্তি বিশেষের কাছে সংরক্ষিত ছিল।

হিজরী প্রথম শতকে লিখিতভাবে হাদীস সংকলনের কাজ যতটা হওয়ার হয়েছে। তবে একজন থেকে অন্যজন শ্রবণ করে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে নবী সা. এর হাদীস সংরক্ষণের দায়িত্ব সাহাবীগণ যথাযথভাবেই আঞ্জাম দিয়েছেন। কিছু কিছু হাদীস নবী কারীম সা. বর্ণিত শব্দে অবিকল সংরক্ষণ করা হয়েছে, কোনরূপ শাব্দিক পরিবর্তনও তাতে হয়নি। আবার অনেক হাদীসের শব্দ হুবহু সংরক্ষণ করা না গেলেও তার অর্থ হুবহু সংরক্ষণ করা হয়েছে। অনেক হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দের হেরফের হয়েছে, অর্থাৎ বিভিন্ন সূত্রে সমার্থক বিভিন্ন শব্দে তা বর্ণিত হয়েছে। আবার সাহাবী পরবর্তী যুগে বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতার পার্থক্য হয়েছে। ফলে কিছু কিছু হাদীসে ত্রুটি (علت) দেখা দিয়েছে। অবশ্য হাদীসবিশারদ পন্ডিতব্যক্তিরা মূলনীতির আলোকে এসব হাদীসের বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্যাসত্য যাচাই করে ছেড়েছেন এবং কোন হাদীসের কি পর্যায় তা নির্ণয় করে দিয়েছেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে হাদীস সংকলন

৯৯ হিজরীর সফর মাসে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. খলীফা নিযুক্ত হন। বিভিন্ন কারণে তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. ইসলাম বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার ফলে আরবরা যেমন স্মৃতির উপর নির্ভর করতে পারতো অনারবদের জন্য তা সম্ভব ছিল না। ফলে লিখিতভাবে তাদের সামনে হাদীসসমূহ উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

২. এ সময় খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়সহ ইসলামী উম্মায় বহু নতুন নতুন ফিরকার উদ্ভব হতে শুরু করে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু মুসলমানরা কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোন যুক্তিই গ্রহণ করত না। 'আহলে হক'কে পরাস্ত করার জন্য তারা পারলে কুরআনকেও বিকৃত করতে দ্বিধা করত না। কিন্তু কুরআন সংকলিত ও হাফিজদের অন্তরে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ার কারণে সে সুযোগ তাদের ছিল না। তাই তারা একদিকে কুরআনের ভাব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা নিয়ে অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়। অন্যদিকে হাদীসগুলো গ্রন্থাকারে সংকলিত না থাকার কারণে তারা সুযোগ পেয়ে যায় এবং নিজেদের মতামতকে হাদীসের প্রমাণপুষ্ট করার জন্য জাল হাদীস তৈরী করে

করে, সেগুলোকে রাসূল সা. এর হাদীস বলে জনসমক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রকৃত হাদীসগুলো গ্রন্থাকারে সংকলিত করে ফেলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে সনদ সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরী 'তুহফাতুল আলমাঈ'-তে উল্লেখ করেছেন যে ৫০ হিজরীর পর থেকে হাদীসের সাথে সনদ সংযোজনের প্রবণতা শুরু হয়।

ইমাম মুসলিম ইবনে সিরীন থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে-

اخرج مسلم عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَاد فَلَمَّا وَقَعَت الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إلى أهل السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إلى أهل الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

মানুষের উপর দিয়ে এমন একটা কাল অতিবাহিত হয়েছে, যখন কোন হাদীসের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত না। কিন্তু যখন ফিত্‌নার বিস্তার ঘটল তখন হাদীসের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। তখন এটা লক্ষ্য করা হত যে, বর্ণনাকারী যদি আহ্‌লুস্‌-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী হতেন তাহলে তাঁর হাদীস গ্রহণ করা হত। আর যদি বর্ণনাকারী বিদ'আতের অনুসারী হতেন তাহলে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হত না।[১]

তাই এ যুগে সনদ বিহীন কোন হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হত না। অবশ্য যারা বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজে লিপ্ত ছিল তারাও জাল সনদ তৈরী করে মানুষকে প্রতারিত করতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু সমকালীন মুহাদ্দিসগণ এসব সনদ পরীক্ষা নিরীক্ষা করত: জাল সনদগুলোও সনাক্ত করে দিয়েছেন।

৩, এ সময় নবী সা. এর সঙ্গপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অনেকেই নশ্বর এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে যারা সরাসরি নবী সা. থেকে হাদীস শুনেছিলেন তাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল। খালি হয়ে যাচ্ছিল পৃথিবী এই সব ইলমী দুনিয়ার উজ্জল নক্ষত্রসমূহ থেকে। মুষ্টিমেয় কয়জন প্রবীণ সাহাবী ছাড়া প্রায় সকলেই বিদায় হয়ে গিয়েছিলেন। একারণেও তাদের থেকে যথাসম্ভব নবী সা. এর হাদীসগুলো সংকলিত করে সংরক্ষণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। তা না হলে হয়ত হাদীসের ইলম থেকে পৃথিবী শূন্য হয়ে যেত। এ আশংকা প্রকাশ করেই হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. তাঁর প্রশাসনাধীন অঞ্চলের গভর্ণরদেরকে নবী সা. এর হাদীসসমূহ সংকলন করে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এ বিষয়টির বর্ণনা দিতে গিয়ে আবু নু'আঈম তারীখে ইস্পাহানে উল্লেখ করেছেন যে,

---

১ তাদরীব পৃ: ১৬৫।

كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صــ فاجمعوه.

-উমর ইবনে আব্দুল আযীয বিভিন্ন অঞ্চলে এ মর্মে লিখিত ফরমান পাঠালেন যে, রাসূল সা. এর হাদীসসমূহ অনুসন্ধান কর এবং সেগুলোকে সংকলিত কর।[১]

ইবনে আব্দুল বারও সাঈদ ইবনে জিয়াদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

سمعت ابن شهاب يحدّث سعيد بن إبراهيم- أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترًا دفترًا، فبعث إلى كلّ أرض له عليها سلطان دفترًا

-আমি ইবনে শিহাবকে সাঈদ ইবনে ইব্রাহীমের সঙ্গে এরূপ কথোপকথন করতে শুনেছি যে, উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. আমাদেরকে হাদীসসমূহ সংকলিত করতে নির্দেশ দিলেন। ফলে আমরা এক এক ভ্যালিউম ভ্যালিউম করে তা লিপিবদ্ধ করলাম। পরে তিনি তার শাসনাধীন প্রতি অঞ্চলে তার একেক কপি প্রেরণ করলেন।[২]

কোন কোন বর্ণনায় বুঝা যায় যে, উমর ইবনে আব্দুল আযীয এ নির্দেশ আমর ইবনে হাযমকে দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ রহ. মালেক রহ. এর সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَكَ مِنْ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحَدِيثِ عمر فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ العلماء.

উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. আবু বকর আমর ইবনে হাযমকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, রাসূল সা. এর হাদীস, তাঁর সুন্নত এবং উমর রা. এর হাদীস এবং অনুরূপ বিষয়গুলো অনুসন্ধান কর এবং সেগুলো আমার কাছে লিপিবদ্ধ করে পাঠাও। কেননা আমি ইলমের শিক্ষাদীক্ষা ও উলামাদের তিরোধানের আশংকা করছি।

দারেমীও আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্দুল বার তামহীদ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে হাযম কিতাব লিখা শেষ করার পর উমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট প্রেরণের পূর্বেই উমর ইবনে আব্দুল আযীয ইন্তিকাল করেন।

তবে পূর্বোল্লিখিত ইবনে আব্দুল বার-এর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, ইবনে শিহাব উমর ইবনে আব্দুল আযীযের জীবদ্দশায়ই তার সংকলন সমাপ্ত

---

[১] বুখারী কিতাবুল ইলম ও ফাতহুল বারী ১ম খন্ড ১৭৪ পৃষ্ঠা।

[২] ফাতহুল বারী খ: ১ পৃ: ১৭৬।

করেছিলেন। এ জন্যই ইবনে আব্দুল বার তার জামেউল বায়ানে মালেক ইবনে আনাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে- أول من دون العلم ابن شهاب

সর্বপ্রথম যিনি হাদীস সংকলন করেছিলেন তিনি হলেন ইবনে শিহাব যুহরী।

ইবনে হজর উল্লেখ করেছেন যে, অধ্যায়ের শ্রেণী বিন্যাস করে আল্লামা শা'বী একখানা সংকলন রচনা করে ছিলেন। ইতিহাস বলে যে, শা'বী ইবনে হাযম রহ. ও ইবনে শিহাব রহ. এর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। তিনি যুহরী রহ. এর ১৪ বৎসর পূর্বে ও ইবনে হাযম রহ. এর ১০ বৎসর পূর্বে ইন্তিকাল করেন। যুহরীর মৃত্যু - ১২৪ হিঃ ও ইবনে হাযমের মৃত্যু - ১২০ হিজরীতে, অতএব শা'বীর মৃত্যু ১১০ হিজরীতে। এতে প্রমাণ হয় যে, তিনিও তাদের সমসাময়িককালেই হাদীসের সংকলন রচনা করেছিলেন। সংকলনকারীরা রাসূল সা. এর হাদীসসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সনদসহ হাদীসগুলোকে সংকলন করার কষ্টকর এই মহৎ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

নিম্নোক্ত ছয় জন বিভিন্ন অঞ্চলে হাদীস শাস্ত্রের পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তারা নিজ নিজ অঞ্চলে হাদীস সংকলনের কাজও করেন।

মদীনায়	(১) ইবনে শিহাব যুহরী রহ.	মৃঃ ১২৪ হিঃ
মক্কায়	(২) আমর ইবনে দীনার রহ.	মৃঃ ………
বসরায়	(৩) কাতাদাহ রহ.	মৃঃ ১১৮ হিঃ
”	(৪) ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর রহ.	মৃঃ ১৩২ হিঃ
কুফায়	(৫) আবু ইসহাক সাবিয়ী রহ.	মৃঃ ১২৯ হিঃ
”	(৬) সুলাইমান আল-আ'মাশ রহ.	মৃঃ ১৪৮ হিঃ

সারকথা এই যে, বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন ব্যক্তি সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সুতরাং পূর্বোক্ত তিনজন অর্থাৎ ইবনে হাযম, যুহরী ও শা'বী তারা ছিলেন তাবেয়ীনদের প্রথম সারির মুহাদ্দিস, যারা হাদীস সংকলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীতে এ কাজটি ব্যাপকভাবে শুরু হয় এবং বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন ব্যক্তি সংকলন শুরু করেন।

১. মক্কায়	ইবনে জুরায়জ রহ.	মৃত্যু - ১৫০ হিঃ
২. মদীনায়	রবী ইবনুস সবীহ রহ.	মৃত্যু - ১৬০ হিঃ
৩. বসরায়ও	রবী ইবনুস সবীহ রহ.	মৃত্যু - ১৬০ হিঃ
৪. কূফায়	সুফয়ান সাওরী রহ.	মৃত্যু - ১৬১ হিঃ
৫. শামে	আওযায়ী রহ.	মৃত্যু - ১৫৭ হিঃ
৬. ইয়ামানে	মা'মার রহ.	মৃত্যু - ১৫৩ হিঃ/১৫৪ হিঃ
৭. খোরাসানে	ইবনুল মুবারক রহ.	মৃত্যু - ১৮১ হিঃ

আল্লামা যাহাবী তাজকেরাতুল হুফ্ফাজে উল্লেখ করেছেন যে, ১৩২ হিজরীতে বনী উমাইয়াদের থেকে আব্বাসীরা খেলাফত কেড়ে নেয়, ফলে খোরাসান, ইরাক ও জাজিরাতুল আরবে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। এ সময় বসরায় আমর ইবনে উবায়দ আল-আবেদ এবং ওয়াসেল ইবনে 'আতা আল-গাজাল আত্মপ্রকাশ করে; যারা মানুষকে মু'তাযিলা ও কাদরিয়্যাহ মতাদর্শের প্রতি আহ্বান জানায়। খোরাসানে জহম ইবনে সাফওয়ান নামে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে। সে 'আল্লাহ অথর্ব ও নিষ্ক্রিয়' হওয়ার দর্শনের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানায় এবং খলকে কুরআনের চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটায়।

খোরাসানে মুকাতিল ইবনে সুলায়মান নামে একজন মুফাসসিরের আবির্ভাব ঘটে; যিনি আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহকে মুজাসসাম বলে দাবী করেন। আইম্মায়ে তাবেয়ীন তাদের প্রতিহতকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এইসব ভ্রান্ত মতাদর্শে বিশ্বাসীরা হাদীসের ভাব ও অর্থ বিকৃত করে নিজেদের ভ্রান্ত মতাদর্শের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের হীন তৎপরতায় লিপ্ত হয়। তাই এইসব ভ্রান্ত মতাদর্শে বিশ্বাসীদের হীন তৎপরতাকে প্রতিহত করার জন্য হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। যাতে সাধারণ মানুষের জন্য করণীয় বিষয়টি বেছে নেওয়া সহজ হয়। একারণে প্রথম দিককার এইসব সংকলনে হাদীসসমূহের সাথে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মতামতও উল্লেখ করা হত। অনেকে শুধুমাত্র সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মতামত ও ফতওয়াকেই সংকলন করে কিতাবাকারে প্রকাশ করতেন।

যেমন ইবনে আব্দুল বার মুফাজ্জল ইবনে মুহাম্মদ আল-মাদানীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, মুআত্তার ধাঁচে সর্বপ্রথম যিনি কিতাব রচনা করেছেন, তিনি ছিলেন আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সালামাহ আল-মাজেশুন। সে কিতাবে তিনি মদীনাবাসীরা যেসব বিষয় আমলের জন্য সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছিল তাই উল্লেখ করেছিলেন। ইমাম মালেকের নিকট এই কিতাব পেশ করা হলে তিনি বলেন: কাজটি বড় সুন্দর হয়েছে, তবে আমি হলে প্রথমে হাদীস দিয়ে শুরু করতাম।

প্রথম দিককার এই সময়ে হাদীসের সংকলনগুলোতে অধ্যায় বন্টনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। ইবনে হজর উল্লেখ করেছেন যে -

ان الشعبي قد جمع الأحاديث الواردة في باب واحد فإنه روي عنه انه قال: هذا باب من الطلاق جسيم، وساق فيه الأحاديث.

শা'বী এক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো এক অধ্যায়ে সংকলন করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি শিরোনাম উল্লেখ করতে গিয়ে লিখতেন- هذا

باب من الطلاق অতপর হাদীস সংকলন করতেন। কিন্তু সেটা ব্যাপক ভিত্তিক কিছু ছিল না। বরং ফিকহী অধ্যায়ের প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনে ব্রতী হন ইমাম আবু হানীফা আন-নু'মান রহ. তাঁর كتاب الآثار নামক হাদীস গ্রন্থে।

আল্লামা শা'বী বাব বাব করে বা অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত করে হাদীসগুলো সংকলন করলেও অধ্যায়গুলোকে ফিকহী তারতীবে বিন্যস্ত করেননি। ইমাম আবু হানীফা রহ.ই সর্বপ্রথম অধ্যায়গুলোকে ফেকহী তারতীব অনুসারে বিন্যস্ত করে كتاب الآثار রচনা করেছিলেন।

সদরুল আইম্মা আল-মক্কী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে كتاب الآثار রচনা করেছিলেন। হাফেজ আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়্যাহ রহ. ইয়াহইয়া ইবনে নসর ইবনে হাজেব থেকে উল্লেখ করেছেন যে, আমি আবু হানীফা রহ. কে বলতে শুনেছি যে, আমার নিকট কয়েক সিন্দুক ভরা হাদীসের পান্ডুলিপি রয়েছে। আমি তা থেকে মানুষ লাভবান হতে পারে এমন কতিপয় হাদীসকেই এ গ্রন্থে প্রকাশ করেছি।

আল্লামা শা'রানী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. কোন হাদীসের উপর আমল করার জন্য এই শর্তারোপ করতেন যে, যে সাহাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত, সেই সাহাবী থেকে এক জামাত মুত্তাকী হাদীসটি বর্ণনা করতে হবে। তাথেকে كتاب الآثار বর্ণনা করেছেন ইমাম যুফার, আবু ইউসূফ, মুহাম্মদ ইবনে হাসান, হাসান ইবনে যিয়াদ, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, হাফস ইবনে গিয়াস, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, খালেদ আল-ওয়াসেতী, আব্দুল আযীয ইবনে খালেদ আস-সাগানী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

ইমাম আবু হানীফার অনুসরণে পরবর্তীতে অনেকেই ফিকহী ধারায় অধ্যায় বিন্যস্ত করে হাদীসের সংকলন তৈরী করেন। ইমাম মালিক রহ. মুআত্তায় সে ধারাকেই অনুসরণ করেছেন।[১] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ما تمس إليه الحاجة দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় শতকের শেষ সময় পর্যন্ত হাদীস সংকলনের এই ধারাই অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ তখন হাদীসগুলোকে ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যায়ের আলোকে সংকলন করা হত এবং সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মতামতও তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া হত। এ সময় এ ধরণের বহু হাদীস গ্রন্থ রচিত হয়।

এ সময়ে যে অঞ্চলে যে সাহাবী ও তাবেয়ীর প্রভাব বেশী ছিল সে অঞ্চলের লোকেরা তার মতামতকেই অধিক প্রাধান্য দিতেন। কারণ তার সাথে সংশ্রবের

---

[১] মা তামুস্সু ইলাইহিল হাজাহ -এর তথ্য অবলম্বনে।

কারণে তারা তাকেই সবচেয়ে বড় আলেম মনে করতেন এবং তার মতামতকেই সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে আমলের জন্য গ্রহণ করতেন। কেননা তাঁর প্রতি তাদের অন্তরে আজমত বেশী থাকত। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা তাঁর মতামতের গুরুত্ব বেশী দিতেন এবং তাঁর মত অনুযায়ী আমল করতেন। যেমন হযরত উমর রা. উসমান রা., আয়শা রা., ইবনে উমর রা., ইবনে আব্বাস রা., যায়েদ ইবনে সাবেত রা. এবং তাদের ছাত্ররা যেমন সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, অরওয়া, সালেম, ইকরিমাহ, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মতামত মদীনাবাসীদের নিকট অধিক গ্রহণীয় ছিল।

আবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. এবং তাঁর ছাত্রবৃন্দ, হযরত আলী রা. এর বিচার বিভাগীয় মতামত এবং কাজী শূরাইহ, শা'বী, ইবরাহীম নখয়ী প্রমুখের মতামত কূফাবাসীদের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য ছিল। এভাবেই মাযাহিবের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণের দু'টি শ্রেণী ছিলঃ

ইবনে কাইয়্যিম বলেন, এ সময় হাদীস বর্ণনা কারীদের দু'টি শ্রেণী ছিল। যথা :

(১) যারা হাদীস মুখস্থ করতেন এবং সংরক্ষণ করতেন আবার তা অন্যের কাছে বর্ণনা করতেন। কিন্তু তারা হাদীসসমূহ থেকে মাসায়িল ইসতিমবাতের প্রতি মোটেও লক্ষ্য দিতেন না এবং এ ব্যাপারে গবেষণাও করতেন না। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- ১. মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর, ২. সাঈদ ইবনে আবি আরুবাহ, ৩. বুনদর- মুহাম্মদ ইবনে বাশশার, ৪. আমর আন্-নাকেদ, ৫. আব্দুর রাজ্জাক ৬. ইবনে ওয়ারাহ, ৭. আবু যুরআহ, ৮. আবু হাতেম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

(২) যারা সংগৃহীত হাদীসগুলো নিয়ে গবেষণা করতেন এবং মাসায়িল ইসতিমবাত করতেন তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- * ইমাম আবু হানীফা, * ইমাম মালেক * শাফেয়ী * আওযায়ী * ইসহাক * আহমাদ ইবনে হাম্বল * ইমাম বুখারী * আবু দাউদ * তিরমিযী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

এ সময় ফিকাহ শাস্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ ধরণের ব্যক্তিরা ফিকাহবিদ হিসাবে সুখ্যাত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে এরূপ একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তারা হাদীস সম্পর্কে জানতেন না।

ইমাম বুখারী রহ., হুমায়দী থেকে উল্লেখ করেন যে, আমার উস্তাদ হুমায়দী বলতেন, আবু হানীফা বলেন যে, মক্কায় আমি একজন ক্ষৌরকার থেকে তিনটি হাদীস সংগ্রহ করি। আমি যখন তার সামনে বসলাম তখন সে বলল: পশ্চিমমুখী হয়ে বসুন। যখন সে আমার চুল কাটতে শুরু করল তখন মাথার ডান দিক

থেকে শুরু করল এবং আমার মাথার পিছনের দুই হাড় পর্যন্ত কামাল।

এ প্রেক্ষিতে হুমায়দী ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, যে লোক নবী সা. ও তার সাহাবীদের মানাসিক (অর্থাৎ হজ্জের বিধি-বিধান) সমূহের হাদীসগুলোই জানেনা আহকামে দ্বীনের ব্যাপারে তার অনুসরণ কিভাবে করা যেতে পারে ?

অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল্-ঈজলী ইমাম শাফেয়ী রহ. সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, 'তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, সাহেবে রায় এবং সাহেবে কালামও বটে। তবে কথা কি তাঁর নিকট হাদীস নেই'। এধরণের অনেক মন্তব্য পাওয়া যাবে, যা মূলত বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের উপর ভিত্তিশীল কোন মন্তব্য নয়।

দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকের সংকলনগুলোতে হাদীসের সঙ্গে ফিক্হী মতামতগুলো এত ব্যাপক ভিত্তিতে সংযোজিত হতে শুরু করে যে, তখন অনেকেই এইসব ফিকহী মতামতগুলো বাদ দিয়ে কেবলমাত্র রাসূল সা.-এর হাদীসমূহ যা সূত্র পরম্পরায় সংকলক পর্যন্ত পৌঁছেছে, সনদ সহকারে কেবলমাত্র সেইসব হাদীসের সংকলন রচনা করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। যেমন- মুসনাদে উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা আল-আবাসী, মৃঃ ২১৩ হিঃ, মুসনাদে মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ আল-বসরী, মৃঃ ২১৩ হিঃ, মুসনাদে আসাদ ইবনে মূসা, মুসনাদে নু'আয়েম ইবনে হাম্মাদ আল-খুযায়ী ছাড়াও অনেকেই মুসনাদ নামে এধরণের হাদীসগ্রন্থ রচনা করেন।[১] এরপরে অনেকেই তাদের অনুসরণ করেন। এমনকি হাদীসের হাফিযদের মাঝে কম ব্যক্তিই এ যুগে ছিলেন- যারা مسند গ্রন্থ রচনা করেননি।

এইসব মুসনাদ গ্রন্থের মাঝে ইমাম আহ্মদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হে, উসমান ইবনে আবি শায়বার মুসনাদ উল্লেখযোগ্য।

অনেকেই ফিকহী অধ্যায় অনুসারে তাদের মুসনাদসমূহকে বিন্যস্ত করেছেন। আবার অনেকেই মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীগণের তারতীব অনুসারেও বিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ কেউ কেউ অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়ে এ ব্যাপারে যে সব সাহাবী থেকে মুসনাদ হাদীস পাওয়া যায় তা সংকলন করে দিয়েছেন। সেগুলোকে বলা হয় আবওয়াব। আর অনেকেই কোন এক সাহাবী থেকে বর্ণিত সব মুসনাদ হাদীসকে জমা করেছেন, পরে অন্য আরেক সাহাবীর নামকে শিরোনাম বানিয়ে তৎকর্তৃক বর্ণিত মুসনাদ হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন। সেগুলোকে বলা হয় তারাজিম। বিভিন্নজন বিভিন্ন ভিত্তিতে সাহাবীদের তারতীব দিয়েছেন।

---

[১] মুকাদ্দামায়ে ফতহুল মুলহিম পৃ: ২৫৭ নতুন এডিশন -১৪১২ হি: করাচী।

যেমন কারো শিরোনাম ছিল: باب ذكر ما ثبت عن رسول الله صـــ في الطهارة

আবার কেউ হয়ত শিরোনাম দিয়েছেন: باب ذكر ما ثبت عن أبي بكر رض من احاديث النبيّ صـــ

আবার কেউ হয়ত শিরোনাম দিয়েছেন: باب ما ذكر قيس عن أبي بكر من أحاديث النبيّ صـــ

আবার অনেকেই অধ্যায় ও বর্ণনাকারীর উভয় দিকের সমন্বয় করে মুসনাদ রচনা করেছেন। যেমন: আবু বকর ইবনে আবি-শায়বাহ- এর মুসনাদ।

দ্বিতীয় শতকের উল্লেখযোগ্য হাদীসের গ্রন্থসমূহ

(١) كتاب الأثار – لإبي حنيفة – المتوفي هـــ ١٥٠

(٢) جامع سفيان الثورى – لسفيان الثورى – المتوفي هـــ ١٦١

(٣) مصنف الليث بن سعد – المتوفي هـــ ١٧٥

(٤) مؤطأ لإمام مالك – لمالك بن أنس – المتوفي هـــ ١٧٩

(٥) كتاب الزهد والرقائق – لعبدالله بن المبارك – المتوفي هـــ ١٨١

(٦) مؤطأ لإمام محمد – لمحمد بن الحسن الشيبانى – المتوفي هـــ ١٨٩

(٧) مصنف سفيان بن عيينة – المتوفي هـــ ١٩٨

(٨) مسند أبى داؤد الطيالسى – المتوفي هـــ ٢٠٣

(٩) مسند الإمام الشافعى – المتوفي هـــ ٢٠٤

(١٠) مصنف عبدالرزاق – المتوفي هـــ ٢١١

হাদীস সংকলন : তৃতীয় শতকে

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিভিন্ন বাতিল ফিরকার উদ্ভব হওয়ার কারণে হাদীসের সনদ উল্লেখ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। যে কারণে এ শতকে হাদীসের সাথে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের ফতওয়া সংযোজনের বিষয়টি বাদ দিয়ে সনদ সহকারে শুধুমাত্র রাসূল সা.-এর বানীসমূহ সংকলনের প্রবণতা শুরু হয়। আবার বিভিন্ন মাজাহিবের উৎপত্তির কারণে প্রত্যেক মাজহাবের অনুসারীরা তাদের মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক সনদে হাদীসটি পেশ করার প্রবণতায় লিপ্ত হন। কারণ একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার অর্থই হল হাদীসটি সম্পর্কে অনেকেই অবগত আছেন। সুতরাং তা আমলযোগ্য। এমনকি আপন মাজহাবের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য قلتين এর হাদীসকে ইমাম দারাকুতনী ৫৪টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সময় হাদীসের মতনের চেয়ে সনদের প্রতি গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা হাদীস বর্ণনা করতে সনদ অবশ্যই বর্ণনা করতেন। তবে

সবধরণের সনদকে বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই বর্ণনা করে দিতেন। তাদের ধারণা ছিল, যেহেতু হাদীসটি সনদসহ বর্ণনা করে দেওয়া হল অতএব গ্রহণকারীর জন্য হাদীসটির পর্যায় নির্ণয় করা কোন কষ্টকর বিষয় থাকল না। সুতরাং হাদীস সংরক্ষণের যে ঈমানী দায়িত্ব ছিল তাথেকে তারা উৎরে গেলেন।

আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী লিসানুল মীযানে উল্লেখ করেছেন যে-

اكثر المحدثين في الاعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرا اذا ساقوا الحديث باسناده اعتقدوا انهم برؤا من عهدتهم

দুইশত হিজরী ও তৎপরবর্তীকালের অধিকাংশ মুহাদ্দিস যখন কোন হাদীস সনদসহ বর্ণনা করে দিতেন তখন মনে করতেন যে, তারা নিজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন।

তাছাড়া দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হাদীসসমূহের সূত্রগুলো বিচার বিশ্লেষণের তেমন প্রয়োজনও হত না। কারণ :

* তখন পর্যন্ত আহরণকারী ও রাসূল সা. এর মাঝে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান সূচিত হয়নি।
* বর্ণনাকারীদের সাথে আহরণকারীদের সংশ্রবের কারণে তাদের পরিচিতি সম্পর্কে অধিকাংশ আহরণকারীই অবগত ছিলেন।
* বর্ণনাকারীগণ মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি হওয়ার কারণে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের যুগে হাদীস বর্ণনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে সর্বসাধারণ সাধারণভাবেই অবগত ছিলেন।
* হাদীস বর্ণনাকারীগণ তখন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়টি নগরীতেই অবস্থানরত ছিলেন। তাদের অধিকাংশই ছিলেন : হিজায, ইরাক, সিরিয়া ও মিশরে। সে নগরগুলো পাশাপাশি থাকার কারণে তাদের পরিচয় লাভ করার জন্য তেমন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হত না। কারণ এসব নগরীতে অবাধ যাতায়াত চলত। সুতরাং তাদের ব্যক্তি-জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে অবগতি অর্জন সহজসাধ্য ছিল।
* তাছাড়া নবী সা:–এর ভাষ্য- خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হল আমার যুগ, অতপর তৎসংশ্লিষ্ট যুগ, অতপর তৎসংশ্লিষ্ট যুগ-এর আলোকে এ সময়ের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ এবং কুরআন হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত আমানতদার ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। ফলে সূত্রসমূহের বিচার-বিশ্লেষণের এবং বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে যাচাই-বাছাইয়ের তেমন একটা প্রয়োজন পড়েনি।

কিন্তু তৃতীয় শতকের এ সময়ে এসে সনদের বিষয়টি জটিল হয়ে উঠে। কারণ:

* আহরণকারী ও রাসূল সা.-এর মাঝে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের কারণে সূত্র দীর্ঘায়িত হয়, যাদের সকলের সাথে আহরণকারীর সংশ্রব ঘটত না।
* ইসলাম বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার কারণে সকল বর্ণনাকারীর পরিচয় লাভ করা সহজসাধ্য থাকেনি।
* বাতিল মতাদর্শের অধিকারী কেউ নিজের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জাল হাদীস বর্ণনা করল কি না? সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সনদের যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দেয়।
* খায়রুল কূরুন তথা গ্যারান্টিপ্রাপ্ত যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বস্ততায় কিছুটা হলেও ভাটা পড়ে।
* স্মৃতিদৌর্বল্য জনিত কারণে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নানা ধরণের জটিলতা দেখা দেয়।

এ সকল কারণে সনদের বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৃতীয় শতকের এ দিকে হাদীসের সূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিচরিত্র, ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান-পাণ্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি ও মেধার বিষয়টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়। এভাবেই জরাহ ও তা'দীল এবং আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। অবশ্য জরাহ ও তা'দীলের বিষয়টি সাহাবীগণের যুগ থেকেই কিছু কিছু শুরু হয়েছিল। যেমন: আবু দাউদ তায়ালিসী মকহুলের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আয়শা রা. কে বলা হল যে,

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صـــ: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ

আবু হুরায়রা বলেন যে, রাসূল সা. বলেছেন যে, অশুভতা তিন বস্তুতে রয়েছে; বাড়ীতে, রমণীতে, ঘোড়ায়।

হযরত আয়শা বললেন: আবু হুরায়রা পূর্ণ হাদীসটি সংরক্ষণ করতে পারেনি। কেননা সে যখন দরবারে প্রবেশ করছিল তখন নবী সা. বলছিলেন:

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، يَقُولُونَ : الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ : الدَّارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْفَرَسُ

আল্লাহ ইয়াহুদীদেরকে ধ্বংস করুক, কেননা তারা বলে থাকে যে, অশুভতা তিন বস্তুতে রয়েছে- বাড়ীতে, রমণীতে ও ঘোড়ায়।

আবু হুরায়ইরা শেষ অংশ শুনতে পেয়েছে কিন্তু শুরু অংশ শুনতে পায়নি। রমণীকে বিড়াল বেধে রাখার জন্য শাস্তি দেওয়ার হাদীসটিতেও এমন অংশবিশেষ শুনার মন্তব্য রয়েছে। যদিও সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মাঝে দূর্বল বর্ণনাকারী খুব কমই ছিলেন। কারণ সাহাবীগণতো (عدول) বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। যারা সাহাবী ছিলেন না তারাও নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তাদের মাঝেও কদাচিৎ দুই একজনই সে রকম পাওয়া যেত যারা নির্ভরযোগ্য বলে

বিবেচিত হতেন না। যেমন: হারেস আল আ'ওয়াব, মুখতার আল-কাযযাব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

ইবনে আদী কামিলের মুকাদ্দামায় সাহাবীদের মাঝে توثيق وتجريح নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য এবং ভুল ও শুদ্ধ নির্ণয়ে পারদর্শী কতিপয়ের নাম উল্লেখ করেছেন; যথা : উমর রা., আলী রা., ইবনে আব্বাস রা., আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা., উবাদাহ ইবনে সামেত রা., আনাস রা., আয়শা রা.। তাবেয়ীনদের মাঝে এ বিষয়ে পারদর্শী যাদের নাম কামিলের মুকাদ্দামায় উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মাঝে রয়েছেন শা'বী, ইবনে সিরীন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবনে জুবায়র (جبير)। তাবেয়ীনদের প্রথম যুগ পর্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী খুব বেশী একটা ছিল না। যারা ছিল তাদের অধিকাংশের দুর্বলতার মূল কারণ ছিল ضبط وتحمل এর দুর্বলতা। অর্থাৎ স্মৃতিদৌর্বল্যের জন্য তারা দুর্বল বর্ণনাকারী বলে গণ্য হয়েছেন, অন্য কারণে নয়।

স্মৃতিদৌর্বল্যের কারণে তারা মরফু হাদীসকে মওকুফ করে বর্ণনা করতেন, অথবা মওকূফকে মরফূ করে ফেলতেন। কিংবা মধ্যবর্তী বর্ণনা কারীদের বাদ দিয়ে ফেলতেন। এ ধরণের আরও ভুল তাদের হত। যেমন: আবু হারুন আল আবাদী ছিলেন তাদের একজন। তাবেয়ীনদের শেষ যুগেই ব্যাপকভাবে বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতার উপর মন্তব্য করা শুরু হয়। যেমন- জাবের জু'ফী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম আবু হানীফা বলেন - ما رأيت اكذب من جابر الجعفي জাবের জু'ফীর চেয়ে মিথ্যাবাদী কাউকে আমি দেখিনি।

আ'মাশও বেশ কিছু বর্ণনাকারী সম্পর্কে দুর্বল হওয়ার মন্তব্য করেছেন, আবার কিছু বর্ণনাকারী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্যও করেছেন। শূ'বাও এ বিষয়ে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; তবে তিনি এ ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। কেবলমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া তিনি অন্যদের থেকে হাদীস গ্রহণই করতেন না। ইমাম মালেকের নামও এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ যুগে এসে যাদের মন্তব্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা হত তাদের মাঝে মা'মার, হিশাম দাসতুয়ায়ী, আওযায়ী, সুফয়ান সাওরী, ইবনে মাজেশুন, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ, লাইস ইবনে সা'আদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

তার পরবর্তী যুগে এ বিষয়ে প্রখ্যাত ছিলেন ইবনুল মুবারক, হুশায়ম, আবু ইসহাক আল-ফাযারী, মু'আফা ইবনে ইমরান, বিশ্‌র ইবনে মুফাযযল, ইবনে উয়ায়নাহ প্রমুখ। এ যুগের পরবর্তী তবকায় এ বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন ইবনে উলাইয়্যা, ইবনে ওয়াহাব, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ। অত:পর যে দু'জন এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফলতা দেখিয়েছেন তারা হলেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল

কাত্তান ও ইবনে মাহদী। এ দু'জন যাদের সমালোচনা করেছেন তারা দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। আর যাকে তারা নির্ভরযোগ্য বলে সার্টিফাই করেছেন তারা নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ সকল جارحين বা ব্যক্তি চরিত্রের ত্রুটি নির্দেশকারীরাই ব্যক্তির বিচার-বিশ্লেষণ এবং সনদের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে হাদীসগুলোকে সহীহ, হাসান, যয়ীফ, মুরসাল, মুনকাতে, মু'দাল, সাজ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন। তবে পূর্বসূরীদের কাছে হাদীসের এ ধরণের শ্রেণীবিভাজন ছিল না।

এর ফলে বহু হাদীস যা পূর্বসূরীদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য ছিল, তা এই যুগে এসে বাতিল ও প্রমাণ গ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

এ কারণেই প্রথম যুগের ফিকহের গ্রন্থসমূহে যে সব হাদীস দিয়ে দলীল দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর কোন কোনটি সম্পর্কে পরবর্তী টিকাকাররা দুর্বল, সাজ ইত্যাদি মন্তব্য করেছেন।

এহেন প্রেক্ষাপটে সনদের প্রেক্ষিতে পারিভাষিকভাবে সহীহ হাদীসসমূহ সংকলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমান্বয়ে সহীহ হাদীসের গ্রন্থাবলী রচিত হয়। সহীহ হাদীস সংকলনের পথ ধরেই সিহাহ সিত্তা সংকলিত হয়।

অবশ্য সহীহ-এর মাঝেও স্তরভেদ রয়েছে। এক একজন একেক স্তরের সহীহকে সংকলন করেছেন। ইমাম হাযেমীর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাবী বা বর্ণনাকারীগণের ৫টি স্তর রয়েছে।

(১) قويّ الضبط كثيرالملازمة (প্রখর স্মৃতিশক্তি ও উস্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সংস্রব।)

(২) قويّ الضبط قليل الملازمة (প্রখর স্মৃতিশক্তি ও স্বল্প সংস্রব।)

(৩) قليل الضبط كثيرالملازمة (দুর্বল স্মৃতিশক্তি ও দীর্ঘ সংস্রব।)

(৪) قليل الضبط قليل الملازمة (দুর্বল স্মৃতিশক্তি ও স্বল্প সংস্রব।)

(৫) مجاهيل وضعفاء مع غوائل الجرح (অজ্ঞাত পরিচয়, নিতান্ত দুর্বল তদুপরি সমালোচিত।)

সংকলনকারীরা হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন স্তর পর্যন্ত রাবীদের থেকে হাদীস সংকলন করেছেন সে হিসাবেই তাদের স্তর বিন্যাস হয়েছে।[১]

১. ইমাম বুখারী :

প্রথম শ্রেণীর যে কোন রাবী থেকেই (বুখারী শরীফে) হাদীস সংকলন করেছেন। তবে কখনো কখনো দ্বিতীয় তবকার রাবীদের থেকেও যাঁচাই-বাছাই করে হাদীস

---

[১] শুরুতুল আইম্মাতিল-খামসাহ -পৃ: ৪৩।

সংকলন করেছেন। তবে বুখারী প্রথম শ্রেণীর সকল রাবী থেকেই (استيعابا) হাদীস সংকলন করেননি। অর্থাৎ তিনি استيعاب طبقه أولى -এর সংকল্প করেননি বা প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের থেকে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলো বুখারী শরীফে সংকলিত করেননি। ইমাম আবু বকর আল-হাযেমী তার সনদে বুখারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে-

أنه قال لم أخرج في هذا الكتاب الاّ صحيحًا وما تركتُ من الصّحيح اكثر

এই কিতাবে আমি কেবলমাত্র সহীহ হাদীসই সংকলন করেছি। আর যেসব সহীহ হাদীস আমি এই গ্রন্থে সংকলন করিনি- তার সংখ্যাও অনেক।

তবে ইমাম বুখারী বুখারী শরীফে কদাচিৎ এমন ব্যক্তিদের থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন যারা (ضعيف) বা দুর্বল রাবীদের অন্তর্ভূক্ত। যেমন : আইয়্যুব ইবনে আয়েজ, সাবেত ইবনে মুহাম্মদ আল-কূফী, যুহায়র ইবনে মুহাম্মদ আত্-তায়মী, যিয়াদ ইবনুর রবী, সাঈদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আস-সাকাফী, 'আব্বাদ ইবনে রাশেদ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ, মিকসাম মাওলা ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ।

সম্ভবত এ সকল ব্যক্তিবর্গ অনেকের কাছে নির্ভরযোগ্য ছিলেন, আবার অনেকের কাছে দুর্বল ছিলেন। হয়ত ইমাম বুখারীর ইজতিহাদ অনুসারে এরা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়েছেন, তাই বুখারী শরীফে তিনি এহেন ব্যক্তিদের থেকে হাদীস সংকলন করেছেন।

কিংবা হাদীসটি হয়ত তাঁর নিকট বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ছিল। যার কোন সূত্র হয়ত অন্যটির তুলনায় সবল ছিল। কিন্তু সহীহ সনদটি দীর্ঘসূত্রী হওয়ার কারণে তিনি তা রেখে স্বল্পমাধ্যম বিশিষ্ট সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করার জন্য এই দুর্বল সূত্রটি অবলম্বন করেছেন। কিংবা অন্য কোন কারণও থাকতে পারে।

২. ইমাম মুসলিম :

প্রথম ও দ্বিতীয় তবকার বর্ণনাকারীদের হাদীসকেই তিনি সহীহ মুসলিম শরীফে সংকলন করেছেন। তবে তৃতীয় তবকার বর্ণনা কারীদের থেকেও যাঁচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম মুসলিমও তার দৃষ্টিতে যত হাদীস সহীহ ছিল, তার সব এই গ্রন্থে সংকলন করেননি। মুসলিম শরীফে তিনি উল্লেখ করেছেন:

ليس كلّ شيئ عندي صحيح وضعتُه ههنا انما وضعتُ ههنا ما اجمعوا عليه (أي أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، عثمان بن أبي شيبة، سعيد بن منصور الخرسانيّ)

আমার নিকট যত হাদীস সহীহ বলে গণ্য তার সবগুলো আমি এ গ্রন্থে উল্লেখ করিনি। বরং এ গ্রন্থে আমি ঐ সকল হাদীস সংকলন করেছি যেগুলোর সহীহ হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা (অর্থাৎ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহ্ইয়া ইবনে

মাঈন, উসমান ইবনে আবি শায়বা ও সাঈদ ইবনে মানসূর) ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।[১]

খতীব বাগদাদী সাঈদ ইবনে আমর আল-বারযায়ীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আমি একদা আবু যুর'আহ আল-রাযীর দরবারে বসা ছিলাম, জনৈক ব্যক্তি মুসলিম কর্তৃক সংকলিত সহীর একটি কপি নিয়ে আসলেন। আবু যুর'আহ তাতে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলেন যে, তিনি আসবাত ইবনে নসর থেকেও হাদীস সংকলন করেছেন। এ দেখে আবু যুর'আহ্ বললেন: এও এক সহীহ্ অথচ এতে আসবাত ইবনে নসরের রিওয়ায়াত সংকলন করা হয়েছে। এ ছাড়াও কুতন ইবনে নুসায়র ও আহমদ ইবনে ঈসার ন্যায় দুর্বল ও মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হাদীস নকল করার জন্য আবু যুর'আহ মুসলিমের সমালোচনা করে বললেন: এ ধরণের দুর্বল বর্ণনাকারীদের হাদীস সংকলন করা হয়েছে অথচ আহমাদ ইবনে আজলানের ন্যায় ব্যক্তিদের বর্ণিত রিওয়ায়াতকে এতে স্থান দেওয়া হয়নি। ফলে বিদ'আতীদের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে যে, ঐ সকল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের হাদীস দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা হলে তারা বলবে যে, সহীহ্ গ্রন্থে এ হাদীস নেই।

সাঈদ বলেন- পরে আমি নিশাপুরে গেলে এই সূত্রগুলো সম্পর্কে আবু যুর'আর বক্তব্য ইমাম মুসলিমকে বর্ণনা করি। এ শুনে তিনি বললেন: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সূত্রে আমার নিকট এ হাদীসগুলো সংরক্ষিত আছে, তবে সনদের মাধ্যম কম বলে এই সূত্রে আমি হাদীসটি বর্ণনা করেছি। এ থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিমও দুর্বল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন; যার কারণ আমরা এই মাত্র উল্লেখ করেছি।

তবে বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে যে বলা হয় - أَصَحُّ كُتُبِ الحديث এর অর্থ এই নয় যে, এ গ্রন্থদ্বয়ের সব হাদীস أصحُّ الأسانيد বা বিশুদ্ধতম সূত্রে বর্ণিত।

কেননা বুখারী ও মুসলিম কেউই তাঁদের গ্রন্থ সম্পর্কে أصحيّة বা বিশুদ্ধতম হাদীসের সংকলন হওয়ার দাবী করেননি বরং তারা সহীহ্ হাদীস সংকলনের দাবী করেছেন। বরং এ কথার অর্থ হলো এ গ্রন্থদ্বয় সামগ্রিকভাবে সনদের বিচারে শীর্ষস্থানীয়; প্রতিটি হাদীসের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়।

মুসলিম শরীফে তাফসীর সংক্রান্ত রিওয়ায়াত নিতান্ত কম থাকার কারণে অনেকেই একে জামে' (الجامع) বলে স্বীকার করতে না চাইলেও অধিকাংশের মতে এটি জামে' (الجامع)।

---

[১] ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭৪, বাবুত-তাশাহহুদ ফিস সালাত।

৩. নাসায়ী ও আবু দাঊদ :

প্রথম তিন তবকা থেকে নির্দ্বিধায় হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর চতুর্থ তবকার বর্ণনাকারীদের থেকেও যাঁচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম আবু আব্দুর রহমান আন-নাসায়ী সনদের মাধ্যম কমানোর জন্য দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন- যা বুখারী ও মুসলিম করেছেন। এ কারণে পশ্চিমাঞ্চলীয় অনেক মুহাদ্দিস নাসায়ীকে বুখারীর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন বলে আল্লামা সাখাবী ফাতহুল মুগীসে উল্লেখ করেছেন।

আর আবু দাঊদ আহকাম সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে একত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। বলতে গেলে ফিকাহবিদগণ যেসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এ ধরণের সকল সহীহ, হাসান এবং আমলযোগ্য হাদীসকেই তিনি সংকলন করেছেন। তিনি দাবী করে বলেছেন -

وليس في كتابي السنن الذي صنّفتُه عن رجل متروك الحديث شيئٌ وإذا كان فيه حديث منكر بيّنتُ أنّه منكرٌ. وما كان في كتابي من حديث فيه وَهْن شديدٌ فقد بينتُه وما فيه ما لايصحُّ سندُه. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالحٌ. وبعضُها اصحُ من بعضٍ .

আমি যে সুনান গ্রন্থ রচনা করেছি তাতে মাত্‌রুকুল হাদীস পর্যায়ের কোন রাবীর বর্ণিত কোন হাদীস নেই। যদি তাতে কোন মুনকার হাদীস পরিবেশন করা হয়ে থাকে তাহলে সেটি যে মুনকার তা আমি উল্লেখ করে দিয়েছি। আমার পরিবেশিত হাদীসসমূহের কোনটিতে যদি মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বলতা থেকে থাকে, কিংবা যদি এমন কোন হাদীস থেকে থাকে যার সনদ সহীহ নয়, তাহলে তাও আমি উল্লেখ করে দিয়েছি। আর যেসব হাদীস সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করিনি সেগুলো ক্রুটি মুক্ত। সেগুলোর কোনটি কোনটির চেয়ে অধিক সহীহ। যদিও ইমাম আবু দাউদ দাবী করেছেন যে, যেসব হাদীস সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করেননি, সেগুলো صالح বা ক্রুটিমুক্ত। কিন্তু এদ্বারা হাদীসটি পারিভাষিকভাবে সহীহ হওয়া অপরিহার্য নয়। পরবর্তী গবেষকগণ বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং তারা মন্তব্য করেছেন যে, سكوت أبي داؤد لايدلُّ على صحّة الحديث আবু দাঊদের নিরবতা দ্বারা হাদীসটি পারিভাষিকভাবে সহীহ- এ কথা বুঝায় না।

৪. তিরমিযী :

চার তবকার রাবীদের থেকেই তিনি নির্দ্বিধায় হাদীস গ্রহণ করেছেন। কখনো কখনো ৫ম তবকার রাবীদের রিওয়ায়াতও তিনি গ্রহণ করেছেন। ইমাম তিরমিযীও আবু দাঊদের মত ফিকাহবিদদের কাছে প্রমাণযোগ্য হাদীসগুলোকে

সংকলন করতে চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি আহকামাতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেননি বরং বুখারীর ন্যায় সব অধ্যায়ের হাদীসই সংকলন করেছেন।

তিনি বাবের অধীনে একটি হাদীস উদ্ধৃত করে এ বাবের অপরাপর হদীসগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে গেছেন وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو এরূপ সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মাধ্যমে। তাছাড়া তিনি হাদীসটি কোন পর্যায়ের, সহীহ কি হাসান কি যয়ীফ তাও উল্লেখ করে দিয়েছেন। কিতাবুল ইলাল-এ তিনি দাবী করেছেন:

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين.

এই কিতাবে যত হাদীস রয়েছে তার মাঝে দু'টি ছাড়া আর সবগুলোই এমন যার উপর কেউ না কেউ আমল করে থাকে এবং আহলে ইলমদের কিছু লোক তা গ্রহণ করে নিয়েছেন।

৫. ইমাম ইবনে মাজাহ :

তিনিও ইমাম তিরমিযীর পন্থা অবলম্বন করেছেন, অবশ্য ইবনে মাজাহ শরীফ রচনার বেলায় তিনি ফিকহী অধ্যায়ের বিন্যাসের ক্ষেত্রে তার উস্তাদ ইবনু আবি শায়বার ধারাকে অবলম্বন করেছেন। তবে ইবনু আবি শায়বা তাঁর সংকলনে সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফতওয়াগুলো উল্লেখ করলেও ইবনে মাজাহ তা করেননি। নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁন ইবনে মাজাহ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে,

وفي الواقع الذي فيه من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاقتصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب، وقد شهد ابو زرعة على صحته .

বাস্তবে এই গ্রন্থে যে সুন্দর বিন্যাস, পূনরুক্তি ব্যতীত যেভাবে সংক্ষেপে হাদীস পরিবেশন করা হয়েছে তা অন্যকোন গ্রন্থে নেই। গ্রন্থটি সহীহ হাদীসের গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে আবু যুর'আহ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এ সকল সংকলকদের ব্যাপারে যে সব শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এই ভিত্তিতে হাদীস সংকলন করেছেন; এগুলো এসতেকরায়ী অথাৎ পরবর্তী গবেষকদের অনুসন্ধানী সিদ্ধান্ত। কিন্তু সংকলকরা এ মর্মে কোন বক্তব্য পেশ করেননি।

অনুরূপভাবে ইবনুস সালাহ যে এমর্মে দাবী করেছেন যে, সর্বোৎকৃষ্ট সহীহ হাদীস হল যা বুখারী ও মুসলিম উভয়ে যৌথভাবে সংকলন করেছেন। অতপর বুখারী এককভাবে যা সংকলন করেছেন, অতপর মুসলিম এককভাবে যা সংকলন করেছেন, অতপর যারা বুখারী ও মুসলিমের সমন্বিত শর্তে হাদীস সংকলন করেছেন, অতপর কেবল বুখারীর শর্তে যা সংকলিত হয়েছে, অতপর মুসলিমের শর্তে যা সংকলিত হয়েছে, অতপর অন্যান্যদের সংকলিত সহীহ সমূহ- এ দাবীও

যথার্থ নয়। কেননা ইবনুস সালাহ-এর পূর্বে এরূপ দাবী কেউ করেননি।[১] তাছাড়া ইবনুস সালাহ-এর এই বিভাজন বিভিন্ন করণেই সঙ্গত নয়। এ সম্পর্কে সহীহ্ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর ইবনুস সালাহ-এর 'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থের সংক্ষেপণ করতে গিয়ে এ বিষয়টি উপস্থাপন করেননি বরং তিনি বলেছেন:

يُوجد فِي مسندِ الإمام أحمد مِن الأسانيد والمتون شيئٌ كثير مِمَّا يُوازِي كثيرًا من أحاديث مسلم بل البخاريِّ أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة.

মুসনাদে ইমাম আহমদে বহু সনদ ও মতন এমন পাওয়া যায়, যা ইমাম মুসলিম সংকলিত বহু হাদীসের সমমানের; বরং বলা যায় যে, বুখারী কর্তৃক সংকলিত হাদীসেরও সমমানের। কিন্তু তাঁরা যৌথভাবেও তা সংকলন করেননি কিংবা তাঁদের কোন একজন এককভাবেও তা সংকলন করেননি। এমনকি সুনানে আরবা'আর সংকলকদের কেউই তা সংকলন করেননি।

আল্লামা ইবনুল হুমামও ফাতহুল কাদীরে এ বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছেন যে, মূলত গ্রন্থের কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল রাবীদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে। অতএব বুখারী মুসলিম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে যদি সেই মানের রাবী কর্তৃক বর্ণিত কোন হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে কি তাকে বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সংকলিত হাদীসের সমমানের বলা যাবে না?

তৃতীয় শতকে রচিত হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ

(১)	মুসনাদ	আবু দাউদ তায়ালেসী, মৃত্যু: ২০৪ হি:
(২)	মুসনাদে হুমায়দী	আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের হুমায়দী-মৃত্যু-২১৯হি:
(৩)	মুসনাদে ইবনে আবি শায়বা	আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি শায়বা মৃত্যু-২৩৫ হি:
(৪)	মুসনাদ	ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াহ্, মৃত্যু: ২৩৮ হি:
(৫)	মুসনাদ	উসমান ইবনে আবিশায়বা, মৃত্যু: ২৩৯ হি:
(৬)	মুসনাদ	আহমদ ইবনে হাম্বল, মৃত্যু: ২৪১ হি:
(৭)	মুসনাদ	আব্দ বিন হুমায়দ, মৃতু: ২৪৯ হি:
(৮)	মুসনাদে দারেমী	আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ- মৃত্যু- ২৫৫ হি:
(৯)	সহীহ্ বুখারী	মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী- মৃত্যু- ২৫৬ হি:
(১০)	সহীহ্ মুসলিম	মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশায়রী- মৃত্যু- ২৬১ হি:
(১১)	মুসনাদ	ইয়াকূব ইবনে শায়বাহ, মৃত্যু ২৬২ হি:

[১] অবশ্য মাইয়্যানিশীর আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনিও সহীর বিভাজনের প্রবক্তা ছিলেন। তবে তার বিভাজন পূর্ণতা লাভ করেনি।

(১২)	জামিউত্-তিরমিযী	আবু ঈসা আত-তিরমিযী, মৃত্যু- ২৭৯/২৭৫ হিঃ
(১৩)	সুনানে ইবনে মাযাহ	মুহাম্মদ আবু আব্দুল্লাহ, মৃত্যু- ২৭৩/২৭৫ হিঃ
(১৪)	মুসনাদ	বকী ইবনে মাখলাদ, মৃত্যুঃ ২৭৬ হিঃ
(১৫)	কিতাবুদ দু'আ	ইবনু আবিদদুনিয়া- মৃত্যু- ২৮১ হিঃ
(১৬)	মুসনাদে হারেস	ইবনে আবি উসামা- মৃত্যু- ২৮১ হিঃ
(১৭)	মুসনাদে বাযযার	আবু বকর আহমাদ- মৃত্যু- ২৮৮ হিঃ
(১৮)	সুনানে আবু মুসলিম	আবু মুসলিম ইবরাহীম- মৃত্যু- ২৯২ হিঃ
(১৯)	সুনানে আবু দাউদ	সুলায়মান ইবনে আশআস আসসিজিস্থানী মৃত্যু ৩০৩ হি
(২০)	সুনানে নাসায়ী	আবু আব্দুর রহমান- মৃত্যু- ৩০৩ হিঃ
(২১)	মুসনাদে আবু ইয়া'লা	আহমদ ইবনে আলী, মৃত্যু- ৩০৭ হিঃ
(২২)	সহীহ ইবনে খুযায়মা	আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক- মৃত্যু- ৩১১ হিঃ
(২৩)	সহীহ আবু আওয়ানাহ	ইয়াকুব ইবনে ইসহাক, মৃত্যু- ৩১৬ হিঃ
(২৪)	মুসনাদ	আবু বকর ইবনে শায়বাহ্, মৃত্যুঃ ....
(২৫)	মুসনাদ	মুহাম্মদ ইবনে মাহদী

হাদীসের গ্রন্থাবলীর প্রকারভেদ

বিভিন্ন মনীষী হাদীসের উপর বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন। ফলে হাদীসের উপর বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। এ পর্যন্ত হাদীসের উপর যত ধরণের গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তা প্রায় ত্রিশোর্ধ প্রকার হবে। আমরা নিম্নে প্রায় ৩২ ধরণের হাদীসের গ্রন্থের পরিচিতি এবং একেক ধরণের কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে দিলাম।

১. আল-জাওয়ামে' (الجوامع) :

جوامــع মূলতঃ আরবী جــامع শব্দের বহুবচন। যে গ্রন্থে আটটি বিষয় যথা সীরাতুন্নবী, আদব বা শিষ্টাচার, তাফসীর বা কুরআনের ব্যাখ্যা, আকায়েদ বা বিশ্বাস, ফিতান বা ঐসব বড় বড় ঘটনা- যা রাসূল সা. বর্ণনা করেছেন, আশরাত বা কিয়ামতের আলামত, আহকাম বা শরয়ী বিধি-বিধান ও মানাকেব বা সাহাবা এবং বিভিন্ন শাখার মর্যাদা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্রিত করা হয়েছে, পরিভাষায় তাকে الجامع বলে। একটি শে'রের মাঝে আটটি বিষয় একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে :

سير وآداب وتفسير و عقائد   فتن و أشراط وأحكام و مناقب

*** কয়েকটি جامع গ্রন্থের নাম :**

১. جامع معمر بن راشد : হযরত মা'মার কর্তৃক প্রথম হিজরীতে সংকলিত।

২. جامع عبد الرزاق : হযরত আব্দুর রাযযাক ইবনে হুমাম আস-সানআনী কর্তৃক দ্বিতীয় হিজরীতে সংকলিত। বর্তমানে এটি مصنف عبد الرزاق নামে প্রসিদ্ধ।

৩. جامع الدارمى ।

৪. جامع البخارى : ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল কর্তৃক সংকলিত সবচে মাকবূল জামে'।

৫. جامع الترمذى : আলামা মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদীর মতে, সহীহ মুসলিমও জামে'র অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মুসলিম শরীফে তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস নিতান্ত কম বলে অনেকে একে জামে'র অন্তর্ভুক্ত করেননি।

২. আস-সুনান (السنن) :

যে সকল গ্রন্থে ফিকহের أبواب বা পরিচ্ছেদের তরতীব অনুসারে হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে, পরিভাষায় সেগুলোকে السنن বলা হয়।

এ প্রকার গ্রন্থগুলোকে সর্বপ্রথম الأبواب এরপর المصنف নামে অভিহিত করা হতো। এখন এগুলোকে السنن নামে অভিহিত করা হয়।

কয়েকটি السنن গ্রন্থের নাম :

১. السنن للنسائى   ২. السنن لأبي داؤد

৩. السنن للترمذى   ৪. السنن لإبن ماجة

৫. السنن للبيهاقى

৩. আল মাসানীদ (المسانيد) :

مسانيد এটা মূলতঃ مسند এর বহুবচন।

যে সকল গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরামের তারতীব অনুসারে (সে তারতীব আরবী বর্ণমালার অনুসারে হোক, বা সাহাবায়ে কিরামের ইসলাম গ্রহণের অগ্রগামীতার ভিত্তিতে হোক, অথবা ফযীলতের ভিত্তিতে হোক কিংবা মুহাজির ও আনসারী হওয়ার ভিত্তিতে হোক) হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়-পরিভাষায় সে ধরণের গ্রন্থকে المسند বলা হয়।

কয়েকটি مسند গ্রন্থের নাম :

১. مسند نعيم بن حماد

২. مسند البزار

৩. مسند أبي داؤد الطيالسي

৪. مسند الإمام الأحمد

৪. আল-মু'জাম (المعجم) :

المعجم এর সাধারণ প্রচলিত সংজ্ঞা হল : যে গ্রন্থে কোন মুহাদ্দিস আপন শায়খ ও উস্তাযবৃন্দের থেকে শোনা হাদীসসমূহ শায়খ ও উস্তাযের মাঝে তারতীব রক্ষা করে সংকলন করেন, পরিভাষায় তাকে আল-মু'জাম/المعجم বলা হয়।

শায়খ যাকারিয়া রহ.-এর ভাষ্যানুসারে : যে গ্রন্থে আরবী বর্ণমালার তরতীব অনুপাতে হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়, তাকে পরিভাষায় المعجم বলে। তা সাহাবায়ে কেরামের নামের তরতীব রক্ষা করেই হোক, বা শায়খদের নামের তরতীব রক্ষা করেই সংকলন করা হোক।

কয়েকটি আল-মু'জাম গ্রন্থের নাম :

১. معجم إسماعيل
২. معجم إبن الغوطى

৩. المعجم الكبير - للطبرانى
৪. المعجم الأوسط - للطبرانى

৫. المعجم الصغير - للطبراني

৫. আল-মুসতাদরাক (المستدرك) :

যে গ্রন্থে অপর কোন হাদীসগ্রন্থের শর্ত মোতাবেক ছুটে যাওয়া হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়, পরিভাষায় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলা হয়।

কয়েকটি মুসতাদরাক গ্রন্থের নাম :

১. المستدرك على الصحيحين - للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري

২. المستدرك على الصحيحين - للحافظ أبي ذر عبد

৩. كتاب الالزامات - للدارقطني

আল-মুসতাখরাজ (المستخرج) :

যে গ্রন্থে অন্য আরেকটি হাদীসগ্রন্থের হাদীসসমূহ- সেই গ্রন্থের লেখকের সনদ বাদ দিয়ে নিজের সনদে সংকলন করে দেয়া হয়, পরিভাষায় তাকে আল-মুসতাখরাজ (المستخرج) বলা হয়।

কয়েকটি মুসতাখরাজ গ্রন্থের নাম :

১. مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم

২. مستخرج أبي نعيم على الصحيح لمسلم

৭. আল-জুয (الجزء) :

যে গ্রন্থে কোন একটি শাখাগত মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত সকল হাদীস একত্রে সংকলন করা হয়, পরিভাষায় তাকে الجزء বলে।

কয়েকটি জুয গ্রন্থের নাম :

১. جزء القرائة – للإمام البخاري

২. جزء رفع اليدين – للإمام البخاري

৩. جزء الجهر بيسم الله – للدارقطني

৪. التصريح بما تواتر في نزول المسيح – للعلامة الكشميري

৫. جزء حجة الوداع – للشيخ زكريا

৮. আল-মাশীখা (المشيخة) :

যে গ্রন্থে শুধু একজন শায়খের বা কয়েক জন শায়খ (থেকে শোনা) হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়, পরিভাষায় তাকে আল-মাশীখা বলা হয়।

কয়েকটি মাশীখা গ্রন্থের নাম :

১. مشيخة إبن البخاري و عليها ذيل للحافظ المذى

২. مشيخة شاذان الكبرى

৩. مشيخة إبن القاري

৯. আল-ইফরাদ ওয়াল গারায়েব (الإفراد والغرائب) :

যে গ্রন্থে শুধু কোন এক শায়খের তাফাররুদাত বা একক বর্ণনাসমূহ সংকলন করা হয়, তাকে পরিভাষায় আল-ইফরাদ ওয়াল গারায়েব বলে।

এধরণের গ্রন্থ হল : كتاب الإفراد للدارقطني

১০. আত-তাজরীদ (التجريد) :

হাদীসের কোন গ্রন্থ থেকে সনদ ও তাকরার ফেলে দিয়ে শুধু সাহাবীর নাম এবং হাদীসের মতন বর্ণনা করা হলে পরিভাষায় সে গ্রন্থকে التجريد বলা হয়।

কয়েকটি তাজরীদগ্রন্থের নাম :

১. تجريد البخاري – للزبيدي

২. تجريد مسلم – للقرطبي

৩. تجريد الصحيحين

১১. আত-তাখরীজ (التخريج) :

যে গ্রন্থে অপর কোন গ্রন্থের معلق বা সূত্র ছাড়া বর্ণিত হাদীসসমূহের সনদ ও সূত্র উল্লেখ করে দেয়া হয়, পরিভাষায় তাকে আত-তাখরীজ বলে।

কয়েকটি তাখরীজ গ্রন্থের নাম :

১. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية – للزيلعي

২. الدراية في تخريج أحاديث الهداية – للحافظ إبن حجر

৩. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير– للحافظ إبن حجر

৪. الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف – للحافظ إبن حجر

৫. تخريج إحياء علوم الدين – للحافظ زين الدين العراقي

১২. কুতুবুল জাময়ি' (كتب الجمع) :

যে সকল গ্রন্থে একাধিক হাদীসের কিতাবের রিওয়ায়াতগুলো তাকরার না করে সংকলন করা হয় أصول الحديث এর পরিভাষায় সেগুলোকে كتاب الجمع বলে।

কয়েকটি كتاب الجمع এর নাম :

১. الجمع بين الصحيحين – للإمام الحميدي

২. جامع الأصول – للحافظ إبن الأثير الجزري

৩. تجريد الصحاح الستة – للحافظ رزين بن معاوية

৪. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد – للعلامة نور الدين الهيثمي

৫. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال – للعلامة علي المتقي

১৩. আল-ফাহারেস (الفهارس) :

যে সকল গ্রন্থে এক বা একাধিক হাদীসগ্রন্থের হাদীসসমূহ সহজে বের করার জন্য সূচীপত্র/ইনডেক্স তৈরী করে দেয়া হয়, পরিভাষায় সেগুলোকে আল-ফাহারিস বলে।

কয়েকটি ফাহারেস গ্রন্থের নাম :

১. فهارس البخاري

২. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف

৩. مفتاح كنوز السنة – للدكتور وينسنك

১৪. আল–আতরাফ (الأطراف) :

যে সকল গ্রন্থে হাদীসসমূহ চেনার জন্য শুধু তার শুরু বা শেষ অংশ উল্লেখ করা হয় এবং শেষে সে হাদীসের হাওয়ালা/সূত্র উল্লেখ করে দেয়া হয়, পরিভাষায় সেগুলোকে আল–আতরাফ বলে।

কয়েকটি আতরাফ গ্রন্থের নাম :

১. الأشراف في معرفة الأطراف – للحافظ إبن عساكر الدمشقي

২. أطراف الكتب الستة – للحافظ عبد الغني المقدسي

৩. تحفة الأشراف في معرفة الأطراف – اللحافظ المزي

৪. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي – الدكتور وينسنك

৫. مفتاح كنوز السنة – للدكتور وينسنك

১৫. আল–আরবাঈনাত (الأربعينات) :

আল–আরবাঈনাত (الأربعينـــات) মূলত الأربعـــين এর বহুবচন। যা 'চল্লিশ হাদীস'–এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পরিভাষায় যে সকল গ্রন্থে কোন একটি পরিচ্ছদ কিংবা আলোচ্য বিষয়ের অধীনে কিংবা বিভিন্ন পরিচ্ছদে চল্লিশটি হাদীস সংকলন করা হয়, সেগুলোকে الأربعـــين নামে অভিহিত করা হয়।

হাদীসের জ্ঞানভাণ্ডারে الأربعينـــات এর সংখ্যা অনেক। অনেক মুহাদ্দিসই চল্লিশ হাদীস সম্বলিত রচনা করেছেন। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছিলেন তাদের অগ্রপথিক।

১৬. আল–মাউযু'আত (الموضوعات) :

যে সকল গ্রন্থে মাওযু বা জাল হাদীসসমূহ সংকলন করা হয় কিংবা জাল হওয়ার ধারণা প্রসূত হাদীস/আপত্তিকৃত হাদীসসমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়, সেগুলোকে পরিভাষায় আল–মাওযূ'আত বলে।

কয়েকটি মাওযূ গ্রন্থের নাম :

১. الكامل – للحافظ إبن عدي رحــ

২. العلل المتناهية في الأخبار الواهية – للعلامة إبن الجوزي

৩. الموضوعات الكبرى– لملاّ علي القاري

৪. تذكرة الموضوعات– للعلامة طاهر البتنوي

৫. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة

১৭. কুতুবুল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ (كتب الأحاديث المشتهرة) :

যে সব গ্রন্থে এমন প্রসিদ্ধ ও লোকমূখে প্রচলিত হাদীস নিয়ে গবেষণা ও তাহকীক/পর্যালোচনা করা হয় যেগুলোর সনদ অজ্ঞাত কিংবা অপ্রশিদ্ধ সেসব গ্রন্থকে পরিভাষায় কুতুবুল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ বলে।

কয়েকটি কুতুবুল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ-এর নাম :

১. المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة – للسخاوي

২. التذكرة في الأحاديث المشتهرة – للعلامة الزركشي

৩. اللآلي المنثورة في الأحاديث المشتهرة – للحافظ إبن حجر

৪. الدرر المنثورة في الأحاديث المشتهرة – للعلامة السيوطي

৫. اثناء المطالب في أحاديث مختلفة المراتب – للعلامة إبن درويش

১৮. গারীবুল হাদীস (غريب الحديث) :

যে সব গ্রন্থে হাদীসসমূহে বর্ণিত দুর্বোধ্য শব্দসমূহের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয় পরিভাষায় সেগুলোকে غريب الحديث বলে।

কয়েকটি غريب الحديث গ্রন্থের নাম :

১. غريب الحديث – للإمام أبي عبيد قاسم بن سلام

২. النهاية في غريب الحديث والآثار – للعلامة مجد الدين إبن الأثير الجزري

৩. مجمع الغرائب – لعبد الغافر الفارسي

৪. غريب الحديث – لقاسم السرقسطي

৫. مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار – للعلامة طاهر البتنوي

১৯. মুশকিলুল হাদীস (مشكل الحديث) :

যে গ্রন্থে পরস্পরবিরোধী হাদীস–যেগুলোর মাঝে সমন্বয় করা কঠিন–সেগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করা হয় এবং তার মর্মার্থ নির্ণয় করা হয়, পরিভাষায় তাকেই মুশকিলুল হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।

প্রচলিত দু'টি মুশকিলুল হাদীসগ্রন্থের নাম :

১. مشكل الآثار – للإمام أبي جعفر الطحاوي

২. مشكل الحديث – للعلامة أبي بكر الفورك

২০. আসবাবুল হাদীস (أسباب الحديث) :

যে গ্রন্থে قولي হাদীসসমূহের বর্ণনার প্রেক্ষাপট ও কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় পরিভাষায় তাকে أسباب الحديث বলে।

এধরণের একটি প্রচলিত গ্রন্থ হল :

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف – لإبن حمزة الحسيني الدمشقي الحنفي

২১. আত-তারতীব (الترتيب) :

যে গ্রন্থে অপর কোন অবিন্যস্ত গ্রন্থের হাদীসসমূহ কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসে সংকলন করা হয়, পরিভাষায় তাকে الترتيب বলে।

কয়েকটি তারতীব গ্রন্থের নাম :

১. ترتيب مسند بن حنبل على الحروف لإبن كثير

২. ترتيب مسند احمد بن حنبل على الحروف لإبن مجيب

৩. الترتيب الرباني لترتيب مسند الإمام احمد الشيباني

২২. আয-যাওয়ায়েদ (الزوائد) :

যে গ্রন্থে অপর কোন হাদীসগ্রন্থের শুধু ঐ সকল হাদীসগুলো সংকলন করা হয় যা সহীহাইনে বিদ্যমান নেই, পরিভাষায় সে গ্রন্থকে الزوائد বলে।

কয়েকটি الزوائد গ্রন্থের নাম :

১. موارد الظمآن إلى زوائد إبن حبان للعلامة نورالدين الزركشي

২. زوائد ابن حبان على الصحيحين للعلامة الحافظ المغلطائي

কখনো الزوائد শব্দকে المستدرك এর সমার্থক মনে করা হয়। زوائد مسند أحمد لعبد الله بن أحمد সে অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

২৩. আল-ইলাল (العلل) :

হাদীসের ঐসব গ্রন্থসমূহ; যাতে সনদের উপর আপত্তিকৃত হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে, পরিভাষায় সেগুলোকে العلل নামে অভিহিত করা হয়।

কয়েকটি العلل গ্রন্থের নাম :

১. كتاب العلل – للإمام البخاري

২. كتاب العلل للإمام مسلم

৩. كتاب العلل الصغير والكبير للترمذي

৪. كتاب العلل للدارقطني

৫. كتاب العلل لإبن أبي حاتم

আল-আমালী (الأمالي) :

(হাদীসের গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হওয়ার আগে) আপন মুখস্থকৃত হাদীসগুলো থেকে উসতায কর্তৃক তার শাগরেদদেরকে লিখানোর ধারা প্রচলিত ছিল। এভাবে যে সংকলন তৈরী হত, তাকেই পরিভাষায় উসতাযের الأمالي বলা হত।

হাফেয ইবনে হজর রহ.-এর আমালী এক্ষেত্রে সবচে' প্রশিদ্ধি লাভ করেছে। বর্তমানে সকল হাদীসই গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়ে যাওয়ার কারণে এখন আর উসতাযের লিখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বর্তমানে উসতায কর্তৃক হাদীসের ব্যাখ্যা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় লিপিবদ্ধ করানো হলে তাকেই এখন পরিভাষায় الأمالي বলে।

কয়েকটি আল-আমালী গ্রন্থের নাম :

১. فيض الباري لأمالي الكشميري على البخاري

২. لامع الدراري

৩. العرف الشذي لأمالي الكشميري على الترمذي

৪. الكوكب الدري

২৫. আত-তারাজিম (التراجم) :

যেসব গ্রন্থে এক সনদের সকল হাদীস একই বাবের/পরিচ্ছদের অধীনে সংকলন করা হয়, পরিভাষায় সেসব গ্রন্থকে التراجم বলা হয়।

যেমন, باب আনা হল : ذكر ما روى مالك عن نافع عن إبـــن عمـــر رضـــ এবং এই সনদে বর্ণিত সকল হাদীসই এর অধীনে উল্লেখ করে দেয়া হল।

২৬. আস-সুলাসিয়্যাত (الثلاثية) :

যেসব গ্রন্থে লেখকের থেকে মাত্র তিনটি واسطة বা মাধ্যমে রাসূল সা. পর্যন্ত পৌঁছা হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়, পরিভাষায় সেসব গ্রন্থকে الثلاثية বলে।

কয়েকটি الثلاثية গ্রন্থের নাম :

১. ثلاثية البخاري

২. ثلاثية الدارمي

৩. ثلاثية عبد بن حميد

২৭. আল-ওয়াহদান (الوحدان) :

যেসব গ্রন্থে একটি মাত্র হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়, তাকে পরিভাষায় الوحدان বলে।

২৮. শুরুহুল হাদীস (شروح الحديث) :

যেসব গ্রন্থে কোন একটি হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয় সেসব গ্রন্থকে পরিভাষায় شروح الحديث বলে।

কয়েকটি شروح الحديث এর নাম :

১. فتح الباري للعلامة إبن حجر

২. عمدة القاري للعلامة العيني

৩. كشف الباري للعلامة سليم الله خان

৪. فتح الملهم للعلامة شبير احمد العثماني

৫. تكملة فتح الملهم للعلامة تقي العثماني

২৯. আল-আযকার (الأذكار) :

যেসব গ্রন্থে রাসূল সা. থেকে বর্ণিত দু'আর হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়, পরিভাষায় সেগুলোকে الأذكار বলা হয়।

দুটি الأذكار গ্রন্থের নাম :

১. كتاب الأذكار للإمام النبوي

২. الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم

৩০. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (الترغيب والترهيب) :

হাদীসের ঐসকল গ্রন্থ; যাতে শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতিপ্রদর্শনমূলক হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে, পরিভাষায় সেগুলোকে الترغيب والترهيب নামে নামকরণ করা হয়।

এধরণের একটি পরিপূর্ণগ্রন্থ হল : الترغيب والترهيب للحافظ المنذري

৩১. কুতুবুল মাসাহিফ (كتب المصاحف) :

যেসকল গ্রন্থে কুরআনে কারীমের একত্রিতকরণ ও বিন্যাসকরণ এবং কিরা'আত ও নাসখের/নুসখের ইতিহাস সম্বলিত হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়, পরিভাষায় সেগুলোকে كتب المصاحف বলে।

কয়েকটি كتب المصاحف এর নাম :

১. كتاب المصاحف لإبن عامر

২. كتاب المصاحف لإبن أبي داؤد

৩. كتاب المصاحف لإبن الأنباري

৩২. আল-মুসালসালাত (المسلسلات) :

যেসকল গ্রন্থে এমন ধরণের হাদীসগুলো সংকলন করা হয়, যেগুলোর বর্ণনার সময় সূত্রে উল্লেখিত সকল রাবী কোন একটি গুণে বা কোন একটি নির্দিষ্ট শব্দে বা কোন একটি নির্দিষ্ট কর্মের ব্যাপারে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন, পরিভাষায় সেসকল গ্রন্থকে المسلسلات বলে। যেমন, কোন হাদীসের সকল রাবী ফকীহ ছিলেন কিংবা মুহাদ্দিস ছিলেন কিংবা সকল রাবীই হাদীস বর্ণনা করার সময় মুসাফাহা করেছিলেন অথবা খেজুর বিতরণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উলূমুল হাদীসের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বস্তুতঃ উলূমুল হাদীস বলতে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা ও নীতিমালার সমষ্টিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সনদ, মতন, বর্ণনাকারীদের ইতিহাস, তাদের সাথে সম্পর্কিত আলোচনা-সমালোচনা, তাদের বিশ্বস্ততা- অবিশ্বস্ততা, বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা ইত্যকার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যে আলোচনা; তার সূত্রপাত হিজরী প্রথম শতকের মধ্যভাগ থেকেই শুরু হয়। তবে তা পৃথক একটি বিষয় হিসাবে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হতে প্রায় অষ্টম-নবম শতাব্দী পর্যন্ত সময় লেগে যায়।

বস্তুত রাসূল সা.এর হাদীসসমূহ বর্ণনা ও আহরণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ যে সতর্কতা ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন, সেগুলোই ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মূলনীতি হিসাবে অনুসৃত হয়েছে। সেই সব মূলনীতি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়ে এক সময় তা স্বতন্ত্র নীতিমালা রূপে পরিগণিত হয়েছে। পরে তা খণ্ড খণ্ড পুস্তিকা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এক কালে সেটি উসূলে হাদীস বা হাদীস আহরণ ও অধ্যয়নের মূলনীতি নামে একটি পৃথক বিষয়ের রূপ লাভ করেছে।

হাদীস বর্ণনা ও আহরণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই-এর বিষয়টি সাহাবীগণের যুগেই সূচিত হয়। যেমন হযরত উমর রা. ও হযরত আবু মূসা রা. এর মাঝে ঘটে যাওয়া সালাম সংক্রান্ত ঘটনাটি এ বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীগণের শুদ্ধা-শুদ্ধি যাচাইয়ের বিষয়টি সাহাবীগণের যুগেই সূচিত হয়েছিল বলা যায়। যেমন আবু দাউদ তায়ালেসী মকহুলের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আয়শা রা. কে বলা হল যে:

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صـــ الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ

এ শুনে হযরত আয়শা রা. বললেন, আবু হুরায়রা হাদীসটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারেনি। কেননা সে যখন দরবারে প্রবেশ করছিল তখন রাসূল সা. বলছিলেন-قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، يَقُولُونَ : الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ : الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ

আবু হুরায়রা হাদীসের শেষ অংশ শুনতে পেয়েছে, তবে শুরু অংশ শুনতে পায়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কেউ কোন রূপ ভুল করলে সে ভুল সনাক্ত করার ক্ষেত্রে তারা মোটেই কার্পণ্য করতেন না।

সাহাবীগণ যেহেতু সকলেই عدول বা সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততার প্রতীক ছিলেন তাই বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার বিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য করার প্রয়োজন তখন ছিল না। তবে শব্দ বর্ণনায় কেউ ভুল করলে কিংবা ভাব বর্ণনায় কেউ অজ্ঞাতসারে কোন ভুল করে বসলে সেগুলো চিহ্নিত করতে তারা সদা তৎপর ছিলেন।

তাবেয়ীনদের মাঝেও দুর্বল বর্ণনাকারীর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। যেমন- হারেস আল-আ'ওয়াব, মুখতার আল-কাযযাব। বস্তুত তাদের অধিকাংশই ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তাদের মাঝে অনেকেই আবার ভুল-শুদ্ধ নিরূপণের ক্ষেত্রে খুবই পারদর্শী ছিলেন।

ইবনে আদী কামিলের মুকাদ্দামায় সাহাবীদের মাঝে যারা ব্যক্তির নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাই (توثيق وتجريح) ও ভুল-শুদ্ধ নিরূপণে পারদর্শী ছিলেন, তাদের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। যথা : হযরত উমর রা. হযরত আলী রা. ইবনে আব্বাস রা. আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. উবাদাহ ইবনুস সামেত রা. আনাস রা. আয়শা রা. প্রমুখ।

আর তাবেয়ীনদের মাঝে যারা এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তাদের মাঝে শা'বী, ইবনে সিরীন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও ইবনুয যুবায়র রহ. প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাবেয়ীনদের প্রথম যুগে দুর্বল বর্ণনাকারীর সংখ্যা তেমন একটা পরিলক্ষিত না হলেও তাবেয়ীনদের মধ্যযুগে বেশ কিছু দুর্বল বর্ণনাকারীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে তাদের দুর্বলতার বিষয়টি ছিল ضبط وتحمل বা স্মৃতিদৌর্বল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট।

বস্তুতঃ তাবেয়ীনদের শেষযুগ থেকেই বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাই এবং তাদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে মন্তব্য করা শুরু হয়। যেমন ইমাম আবু হানীফা বলতেন: ما رأيتُ أكذبَ من جابر الجعفيِّ আ'মাশও বেশ কিছু বর্ণনাকারী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। শু'বাও এ বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন। ইমাম মালেকের নামও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

এ যুগে যাদের মন্তব্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা হত, তাদের মাঝে মা'মার, হিশাম দাসতুয়ায়ী, আওযায়ী, সুফয়ান সওরী, ইবনে মাজেশুন, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ, লাইস ইবনে সা'দ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্ণনাকরীদের যাচাই-বাছাই ও আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়েই কিছু কিছু নীতিমালা গড়ে উঠে এবং কিছু কিছু পরিভাষার জন্ম হয়।

উলূমুল হাদীসের উপর সর্বপ্রথম সংকলিত গ্রন্থাবলী :

বস্তুত শুরুর দিকে এইসব নীতিমালা মৌখিকভাবে আলোচিত হত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। তবে এগুলোর লিখিত কোন গ্রন্থ ছিল না।

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে এ সকল নীতিমালার কিছু কিছু অধ্যায় পৃথক পুস্তিকা আকারে লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়। প্রতি এক অধ্যায় সংক্রান্ত আলোচনাকে একটি বা দুইটি খণ্ড পুস্তিকা আকারে তখন লিপিবদ্ধ করা হত। তারিখে বাগদাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (মৃত্যু : ১৮২হি:) এ সম্পর্কে একটি রিসালাহ সংকলন করেছিলেন। বলা যায় যে, এটিই এ বিষয়ে লিখা প্রথম গ্রন্থ। ইমাম শাফেয়ী রা. (মৃত্যু: ২০৪হি:), যিনি হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় মূলনীতিগত আলোচনা তাঁর “রিসালাহ” নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আকারে পেশ করেছিলেন। তিনি তার সেই পুস্তিকায় মূলনীতি সংক্রান্ত প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনাই পেশ করেছিলেন। যেমন তাঁর উল্লিখিত বিষয়সমূহের মাঝে ছিল - ১. হাদীস প্রমাণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী ২. বর্ণনাকারীর হিফযের শর্তাবলী ৩. রিওয়ায়াত বিল মা'না বা হাদীসের অর্থ বর্ণনার বিধান ৪. মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে কি না ইত্যাদি। এ ছাড়াও তিনি খবরে ওয়াহিদ কাকে বলে, খবরে ওয়াহিদ প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে, মুদাল্লিস নয় এমন ব্যক্তি عن فلان শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং মুদাল্লিস হলে حدثني বা سمعتُ শব্দযোগে বর্ণনা না করলে তা গ্রহণ না করা, যার ভুল বেশী হয় তার হাদীস গ্রহণ করা না করা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত নীতিমালা তিনি তাঁর ঐ পুস্তিকায় উল্লেখ করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ীর সমকালীন ব্যক্তি ঈসা ইবনে আবানেরও এসংক্রান্ত একটি পুস্তিকা ছিল বলে আল্লামা জাসসাস তার 'আল-ফুসূল'-এ উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী বসরী (জন্ম - ১৬১ মৃত্যু- ২৩৪ হি.) উলুমূল হাদীসের প্রায় সকল অধ্যায় সম্পর্কেই ভিন্ন ভিন্ন পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। আলী ইবনুল মাদিনী উলুমূল হাদীসের কোন্ কোন্ অধ্যায় সম্পর্কে পুস্তিকা তৈরী করেছিলেন, তার বিবরণ দিতে গিয়ে হাকেম আবু আব্দুল্লাহ রহ. তাঁর معرفة علوم الحديث গ্রন্থে কাজী আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল-হাশেমীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, আলী ইবনুল মাদিনীর এতদ্‌সংক্রান্ত রচিত পুস্তিকাগুলোর শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ:

(١) كتاب الاسامي والكنى جـ ٨

(٢) كتاب الضعفاء جـ ١٠

(٣) كتاب المدلسين جـ ٥

(٤) كتاب أوّل من نظر في الرجال جـ ١

(٥) كتاب الطبقات جـ ١٠

(٦) كتاب علل المسند جـ ٣٠

(٧) كتاب العلل لإسماعيل القاضي جـ ١٤

(٨) كتاب عِلل حديث إبن عُيينة جـ١٣

(٩) كتاب من لا يحتجّ بحديثه جـ ٢

(١٠) كتاب الكُنى جـ٥

(١١) كتاب الوهم والخطأ جـ٥

(١٢) كتاب قبائل العرب جـ ١٠

(١٣) كتاب من نزل من الصحابة سائرالبلدان جـ ٥

(١٤) كتاب التاريخ جـ١٠

(١٥) كتاب العرض على المحدّث جـ ٢

(١٦) كتاب من حدّث ثم رجع عنه جـ ٢

(١٧) كتاب يحيى و عبد الرحمن جـ ٥

(١٨) كتاب سؤالات يحيى جـ ٢

(١٩) كتاب الثقات والمتثبتين جـ ١٠

(٢٠) كتاب اختلاف الحديث جـ ٥

(٢١) كتاب الأسامى الشاذّة جـ ٣

(٢٢) كتاب الأشربة جـ ٣

(٢٣) كتاب تفسير غريب الحديث جـ ٥

(٢٤) كتاب الإخوة والأخوات جـ ٣

(٢٥) كتاب من يعرف بإسمه دون إسم أبيه جـ ٢

(٢٦) كتاب من يعرف باللقب جـ ١

(٢٧) كتاب العلل المتفرقة جـ ٣٠

(٢٨) كتاب مذاهب المحدثين جـ ٢

উপরোল্লিখিত শিরোনামগুলো থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়ে যায় যে, উলুমূল হাদীসের ক্ষেত্রে আলী ইবনুল মাদিনীর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য এবং এ বিষয়ে তার জ্ঞানের ব্যাপকতা কত ছিল।

অবশ্য খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন যে, আলী ইবনুল মাদিনীর এ সকল গ্রন্থাবলীর মাঝে চার পাঁচটি ছাড়া অবশিষ্টগুলোর কোন সন্ধান আমরা লাভ করতে পারিনি। অথচ তাঁর লিখা গ্রন্থসমূহের খণ্ড সংখ্যা দুইশতের অধিক ছিল (২৯ টি কিতাব মোট ২০৪ খন্ডে ছিল)।

শুরুর দিকে ইলমে হাদীসের প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য একটি করে পৃথক গ্রন্থ তৈরী করার প্রবণতা ছিল। পরে যখন বিষয়টি পরিপক্কতা লাভ করে এবং পরিভাষাগুলো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন এ বিষয়ের প্রতিটি আলোচনাকে এক একটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করে গ্রন্থ তৈরী করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। যেমন ইবনুস সালাহ রচিত معرفة أنواع علم الحديث গ্রন্থে এ প্রবণতাটি লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয় শতকের শুরুর দিকে এ বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনায় বিস্তৃতি ঘটে। তৃতীয় শতকে যারা ব্যক্তির নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের মাঝে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন- মৃত্যুঃ ২৩৩ হিঃ, আলী ইবনুল মাদিনী- মৃত্যুঃ ২৩৪ হিঃ, আহমদ ইবনে হাম্বল- মৃত্যুঃ ২৪১ হিঃ, ইমাম বুখারী মৃত্যুঃ ২৫৬ হিঃ, আবু জা'ফর মুখাররামী মৃত্যুঃ ২৪২ হিঃ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদেরকে ছাড়াও আরো অনেকেই এ বিষয়ে অবদান রেখেছেন।

এ যুগের অনেকেই হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করতে গিয়ে হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। তাদের মাঝে হাফেয মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমায়ের কুফী (মৃত্যুঃ ২৩৪ হিঃ) ও হাফেয ইয়াকুব ইবনে শায়বা বসরী (মৃত্যুঃ ২৬২ হিঃ) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁরা তাদের গ্রন্থে هذا حديث حسن الإسناد অথবা هو صحيح অথবা إسناده وسط অথবা هو صالح أو صالح الإسناد কিংবা ليس بالثابت ولا بالساقط ইত্যাদি ধরণের মন্তব্য করেছেন।

বস্তুতঃ তৃতীয় শতকে বিষয়টি বলতে গেলে যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করে। এবং এ বিষয় সংক্রান্ত আলোচনাগুলো হাদীসের গ্রন্থসমূহে, রিজালের গ্রন্থসমূহে কিংবা এ বিষয়ের প্রতি অধ্যায়ের উপর লিখা পৃথক গ্রন্থসমূহের আলোচনায় এসে গিয়েছিল।

এ ধরণের আলোচনা যাদের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে তাদের মাঝে আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দারেমী (জন্মঃ ১৮১হিঃ মৃত্যুঃ ২৫৫হিঃ) অন্যতম। তিনি মূলত ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু হাতেম রাযী প্রমুখ জগৎবিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের উস্তাদ ছিলেন। তিনি তার কিতাব 'সুনানে দারেমী'র মুকাদ্দামায় এমন বেশ কিছু অধ্যায় উল্লেখ করেছেন, যেগুলো মৌলিকভাবে উলুমূল হাদীসের সাথেই সংশ্লিষ্ট। পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে উক্ত গ্রন্থের মুকাদ্দামায় উল্লিখিত কতিপয় শিরোনাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(١) باب من هاب الفتيا مخافة السقط (اي الخطأ) .

(٢) باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى.

(٣) باب في توقير العلماء.

(٤) باب في الحديث عن الثقات.

(٥) باب من لم ير كتابة الحديث.

(٦) باب من رخّص في كتابة العلم .

(٧) باب البلاغ عن رسول الله صـــ وتعليم السنن.

(٨) باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه.

(٩) باب السنة قاضية على الكتاب .

(١٠) باب تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(١١) باب مذاكرة العلم .

(١٢) باب في العرض.

এসব শিরোনাম থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, উলুমূল হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ের প্রতিই তিনি তাঁর মুকাদ্দামায় আলোকপাত করেছেন।

ইমাম বুখারীর অন্যতম উস্তাদ হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়র আল হুমাইদীও (মৃ:২১৯ হি:) পরিভাষা সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। আবু বকর আল খতীব হুমাইদী থেকে এ ধরণের বেশ কিছু মূলনীতি 'কিফায়া ফি ইলমির রিওয়ায়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ মৃ: ২৬১হি: ও তাঁর মুকাদ্দামায় উলুমূল হাদীস সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন। আল্লামা কাওসারী মাকালাতে কাওসারীতে উল্লেখ করেছেন :

ومقدّمة صحيح مسلم من أقدم ما سطره أئمة الحديث في التمهيد لقواعد المصطلح ككتاب التمييز لمسلم .

মূলত হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ পরিভাষা সংক্রান্ত যেসব নিয়মনীতি ও ভূমিকা মূলক রচনা গ্রন্থবদ্ধ করেছেন মুসলিমের মুকাদ্দামা বা ভূমিকা তার প্রথম সারির একটি।

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী রহ. (জন্ম: ১৯৪হি: মৃত্যু: ২৫৬হি:) তাঁর সহীহ বুখারীতেও উলুমূল হাদীস সংক্রান্ত কিছু কিছু বাক্য উপস্থাপন করেছেন, যা হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া তাঁর কিতাবুত তারীখ ও কিতাবুয যু'আফাতেও এতদসংক্রান্ত খণ্ড খণ্ড আলোচনা রয়েছে।

এমনিভাবে আবুল হাসান আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ আল-ঈজলী (মৃত্যু: ২৬১হি:) রচিত الثقات নামক গ্রন্থেও জরাহ, তা'দীল ও হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত বেশ কিছু বাক্য বিদ্যমান রয়েছে।

অনুরূপভাবে ইমাম আবু যুর'আহ আদ-দামেশকী (জন্ম: ২০০ হিজরীর পূর্বে মৃত্যু: ২৮১হি:) রচিত তারীখে আবু যুর'আহতেও রিজাল ও হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত বহু আলোচনা রয়েছে।

তাছাড়া উক্ত গ্রন্থে প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী (মৃত্যু: ১২৪ হি:) ইমাম আওযায়ী (মৃত্যু: ১৫৭ হি:) ইমাম মালেক (মৃত্যু: ১৭৯ হি:) সহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের বহু মনীষীর হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত বক্তব্যের উদ্ধৃতি রয়েছে।

এ সকল মনীষীদের বক্তব্যে নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য রাবীদের সনাক্ত করণ, তাদের ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচনা, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকরীদের কতিপয়ের উপর কতিপয়ের প্রাধান্য, হাফেয ও আহফাযের মাঝে এবং ফকীহ ও গায়র ফকীহ- এর মাঝে মর্যাদাগত পার্থক্য, তাহদীস, ইখবার , ইজাযত, উস্তাদের সামনে পঠন, উস্তাদ থেকে শ্রবণ, এ ক্ষেত্রে বর্ণনার পদ্ধতি, কিছু কিছু মুহাদ্দিসদের ব্যক্তিগত পরিভাষা, সাহাবীদেরকে সনাক্তকরণ, কারা নবীর সঙ্গপ্রাপ্ত, কারা সঙ্গপ্রাপ্ত নয়, বর্ণনাকারীদের বংশ পরিচয়, তাদের উপনাম, খেতাবী নাম, তাদের জন্ম-মৃত্যু তারিখ, তাদের উস্তাদগণের নাম এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার সমালোচনা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে।

এছাড়াও ইমাম ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান (মৃত্যু: ২৭৭ হি:) ও আবু বকর আহমদ ইবনে আমর আল-বাযযার (মৃত্যু: ২৯০ হি:) প্রমুখ মনীষীদের গ্রন্থেও হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাদের গ্রন্থে হাদীসের ফাঁকে ফাঁকে যে সব মন্তব্য করেছেন, সেই সব মন্তব্যের মাঝেও কিছু কিছু মূলনীতির দিকে ইশারা রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর কিতাবের শেষে আল-ইলাল নামে এতদ্সংক্রান্ত একটি পরিশিষ্ট সংযোজন করে দিয়েছেন; যাতে উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. রচিত مسند أحمد নামক গ্রন্থেও হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় শতকের শেষের দিকে এবং চতুর্থ শতকের শুরু ভাগের অনেক মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদ হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা সংক্রান্ত পৃথক পৃথক এক একটি বিষয় নিয়ে খণ্ড খণ্ড বহু পুস্তিকা রচনা করেন। যেমন ইমাম আবু জা'ফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তাহাভী (মিশরী) (জন্ম: ২৩৯হি: মৃত্যু: ৩২১হি:)- এর উলূমুল

হাদীস সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা ছিল; যাতে তিনি حدثنا ও اخبرنا এ দুই'য়ের মাঝে যে কোন পার্থক্য নেই এবং উস্তাদ থেকে শ্রবণ কিংবা উস্তাদের সন্মুখে পঠন এই উভয় ক্ষেত্রে حدثنا ও أخبرنا এ দুই'য়ের যে কোন একটি যে ব্যবহার করা যায় একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

এভাবে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত পরিভাষা সংক্রান্ত একেকটি বিষয়ের উপর আলোচনা সম্বলিত বহু পুস্তক রচিত হয় এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে তা রচনা করা হয়। এসকল রচনার মাঝ দিয়ে বহু মূলনীতি স্বীকৃত হয়ে পড়ে এবং সেগুলো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মূলনীতি ও তার শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত আলোচনাও বহু বিস্তৃত হয়ে পড়ে। চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে এসে এসকল বিষয় ভিত্তিক পুস্তিকা ও বিক্ষিপ্ত নীতিমালাসমূহকে একত্রিত করে এ বিষয়ে ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে সর্ব প্রথম যিনি পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক বর্ণনা সমৃদ্ধ সুবিন্যস্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি হলেন কাজী আবু মুহাম্মদ আল-হাসান ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে খাল্লাদ রামাহুরমুযী (জন্মঃ ২৬৫ হিঃ মৃত্যুঃ৩৬০ হিঃ আনুমানিক)। তিনি তাঁর এই প্রখ্যাত গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي বস্তুত তিনি তাঁর এই গ্রন্থে বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এতদ্সংক্রান্ত মাসাইলগুলো একত্রিত করেছিলেন এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমত্য রয়েছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাদের মতানৈক্য রয়েছে তাও উল্লেখ করেছিলেন।

তার পরবর্তীতে অনেকেই এধরণের গ্রন্থ তৈরীর প্রতি মনোনিবেশ করেন। হাফিয সিবত ইবনে আ'জমী উল্লেখ করেছেন যে, হাফেয আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মানদাহ (মৃত্যুঃ৩৯৫ হিঃ)-এরও একটি ছোট গ্রন্থ ছিল। যাতে তিনি কিরা'আত (قراة) ও সামা (سماع)-র ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের শর্তসমূহ এবং ইজাযত ও মুনাওয়ালাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।

তার পরবর্তীতে হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (জন্মঃ৩২১হিঃ মৃত্যুঃ৪০৫ হিঃ) معرفة علوم الحديث নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

তারপর হাফেয আবু নু'আয়ম ইস্পাহানী (জন্মঃ ৩৩৬ হিঃ - মৃত্যুঃ ৪৩০ হিঃ) علوم الحديثনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আল্লামা سير أعلام النبلاء নামক গ্রন্থে এ কিতাবটির কথা উল্লেখ করেছেন।

তার পরবর্তীতে হাফেয আবু বকর আহমদ ইবনে আলী (জন্মঃ৩৯২ হিঃ মৃত্যুঃ ৪৬৩ হিঃ) যিনি খতীব বাগদাদী নামে খ্যাত; তিনি الكفاية في علم الرواية এবং الجامع لأخلاق الراوي وآداب السمع নামের দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ তৈরী করেছিলেন। তিনি

বিষয়টিকে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গরূপে সংকলিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন এবং আলোচ্য বিষয়গুলোকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। বলা যায়, তিনিই বিষয়টিকে প্রাথমিকভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। উলূমুল হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর মাঝে খুব কম বিষয়ই ছিল, যে ব্যাপারে খতীব বাগদাদী একটি করে পৃথক কিতাব রচনা করেন নি। হাফেয আবু বকর ইবনে নুকতা যথার্থই বলেছেন যে :

كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه –

বস্তুতঃ যারা ইনসাফের সাথে সবকিছু বিবেচনা করেন তারা জানেন যে, খতীব বাগদাদীর পরবর্তী সকল মুহাদ্দিসই তাঁর কাছে ঋণী।

একই সময়ে ইমাম আবু উমর ইউসূফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল বার (জন্মঃ ৩৬৮ হিঃ মৃত্যুঃ ৪৬৩ হিঃ) যিনি ইমাম ইবনে আব্দুল বার আন্দোলুসী নামে খ্যাত; তিনি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -এর ভূমিকায় এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হাফেয ইবনুস সালাহ তাঁর علوم الحديث গ্রন্থে হাফেয ইবনু আব্দিল বার থেকে পরিভাষা সংক্রান্ত বহু উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। তথাপিও ইবনে হজর ইবনে আব্দুল বারের নাম তার তালিকায় উল্লেখ করেননি।

তার পরবর্তীকালে কাজী ইয়ায ইবনে মূসা আল-মাগরেবী (জন্মঃ ৪৭৯ হিঃ - মৃত্যুঃ ৫৪৪ হিঃ) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السّماع- নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

তার পরবর্তীতে আবু হাফস উমর ইবনে আব্দুল মজীদ মাইয়্যানিশী (মৃত্যুঃ৫৮১ হিঃ) ما لايسعُ المحدّثُ جهلَه নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার এই গ্রন্থে যথেষ্ট ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সে হিসাবে এটি তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ না হলেও আল্লামা ইবনে হজর তাকে লেখকদের তালিকাভুক্ত করেছেন। আর সে কারণেই তিনি উল্লেখযোগ্যদের কাতারে শামিল হয়ে গেছেন।

তার পরবর্তীতে ইমাম মাজদুদ্দীন আবুস্‌-সা'আদাত মুবারক ইবনে মুহাম্মদ (জন্মঃ ৫৪৪ হিঃ - মৃত্যুঃ ৬০৬ হিঃ) যিনি ইবনুল আসীর নামে খ্যাত; তিনি তার جامع الأصول في أحاديث الرسول صــ নামক গ্রন্থের মুকাদ্দামায় الباب الثالث في بيان أصول الحديث واحكامها وما يتعلق بها শিরোনামে প্রায় ১১১ পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি তার এই গ্রন্থতুল্য অধ্যায়ে হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব বিষয়ের প্রতিই আলোকপাত করেছেন। মূলত তিনি ইমাম তিরমিযী, হাকেম, খতীব বাগদাদী এবং ইমাম গাযালী প্রমুখ মনীষী থেকে তথ্য আহরণ করে তা সংক্ষেপায়ন করেছেন। যদিও তার কিতাবে

কোথায়ও কোথায়ও সামান্য দুর্বলতা রয়েছে এবং এই দুর্বলতাগুলো হাকেমের অনুসরণ করতে গিয়ে হয়েছে; তথাপি তার এই গ্রন্থতুল্য অধ্যায়টি এ বিষয়ে অত্যন্ত গোছালো ও প্রাঞ্জল একটি আলোচনা বটে।

ইবনে হজর তার দেওয়া তালিকায় মাইয়্যানিশীর ন্যায় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলেও ইবনুল আসীরের নাম উল্লেখ করেননি।

ইবনুল সালাহ্ -এর মুকাদ্দামাহ্ :

তার পরবর্তীতে আবু আমর উসমান ইবনে আব্দুর রহমান আশ-শাহরাযুরী (জন্মঃ ৫৭৭ হিঃ- মৃত্যুঃ ৬৪৩ হিঃ) যিনি ইবনুস সালাহ নামে অধিক খ্যাত; তিনি معرفة أنواع علم الحديث নামে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থটি مقدمة إبن الصلاح নামেই অধিক খ্যাত।

দামেশকের দারুল হাদীস আল-আশরাফিয়্যাহ্তে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি এ গ্রন্থটি তৈরী করেন। ছাত্রদেরকে পাঠদানের মধ্যদিয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে এ গ্রন্থটি বিন্যাস করেন। ফলে বিন্যাসের ক্ষেত্রে পূনঃ বিবেচনার প্রয়োজন থাকলেও তিনি তা করেননি। কেননা বহু ছাত্রই তাথেকে উক্ত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিল। পূনঃবিন্যাস করতে গেলে তাদের পাণ্ডুলিপির সাথে গড়মিল হয়ে যাবে মনে করে তিনি তা করেননি। ফলে বিন্যাসে কিছু জটিলতা থাকলেও তার এ গ্রন্থটি পূর্ববর্তীদের রচিত গ্রন্থাবলীর তুলনায় অত্যন্ত ব্যাপক, বিস্তৃত ও সুন্দর হওয়ার কারণে এ গ্রন্থ জনসমক্ষে আসার পর খতীবে বাগদাদীর রচনাবলীর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পায়। লোকেরা এ গ্রন্থটিকেই পঠন-পাঠনের জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রহণ করে। ফলে উলূমুল হাদীসের উপর গ্রন্থ রচনার যে ধারা চলে আসছিল তা থেমে যায়। পরবর্তী কালের লোকেরা এ গ্রন্থটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ তৈরী, সংক্ষেপায়ন, টিকা তৈরী, এবং কবিতার ছন্দে এ গ্রন্থে বর্ণিত নীতিমালাগুলো উপস্থাপনের চেষ্টায় ব্রতী হয়। পরবর্তীতে যারা এ গ্রন্থটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ তৈরী করেছেন তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের নাম ও গ্রন্থের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

* যারা এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তৈরী করেছেন :

১. ইয্যুদ্দীন............ ইবনে জামা'আহ (জন্মঃ ৬৯৩ হিঃ মৃত্যুঃ৭৬৭ হিঃ)

الجواهر الصحاح في شرح علوم الحديث لإبن الصلاح

২. বুরহানুদ্দীন আবু ইসহাক ইবনে মূসা (জন্মঃ ৭২৫ হিঃ মৃত্যুঃ৮০২ হিঃ)

الشذا الفياح من علوم إبن الصلاح

৩. সিরাজুদ্দীন আবু হাফস উমর ইবনু রাসলান (জন্মঃ৭২৪ হিঃ - মৃত্যু ৮০৫ হিঃ)

محاسن الإصطلاح وتضمين كتاب إبن الصلاح

* যারা এ গ্রন্থকে সংক্ষেপায়ন করেছেন :

১. মুহীউদ্দীন আন-নববী (জন্ম: ৬৩১হি:-মৃত্যু: ৬৭৬ হি:) তিনি মূল গ্রন্থটিকে দুইবার সংক্ষেপ করেছেন। প্রথমবার সংক্ষেপ করে নাম দিয়েছিলেন:

ارشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق

দ্বিতীয়বার সংক্ষেপ করে নাম দিয়েছিলেন : التقريب والتيسير في سنن البشير النذير

এরই ব্যাখ্যা করেছেন আল্লামা সুয়ূতী (জন্ম: ৮৪৯ হি: - মৃত্যু: ৯১১ হি:) তাদরীবুর রাবী ফী শরহে তাকরীবিন নববী নামে।

২. ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনু জামা'আহ (জন্ম: ৬৩৯ হি: মৃত্যু: ৭৩৩ হি:) مختصر مقدمة ابن الصلاح في شرح علوم الحديث

৩. শরফুদ্দীন হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ত্বীবী (মৃত্যু: ৭৪৩ হি:) الخلاصة في معرفة الحديث

৪. আলাউদ্দীন মারদেনী (জন্ম: ৬৮৩ হি: - মৃত্যু: ৭৫০ হি:) (ইবনুত-তুরকমানী নামে খ্যাত) তার গ্রন্থের নাম - المنتخب في علوم الحديث

৫. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (জন্ম: ৭০১ হি: - মৃত্যু: ৭৭৪ হি:)

৬. হাফেজ সিরাজুদ্দীন উমর ইবনে আলী (জন্ম: ৭২৩ হি: -মৃত্যু: ৮০৪ হি:) المقنع في علوم الحديث

* যারা এ গ্রন্থের টিকা রচনা করেছেন :

১. বদরুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ যরকাশী (জন্ম:৭৪৫ হি: - মৃত্যু: ৭৯৪ হি:) النكت على كتاب ابن الصلاح

২. যইনুদ্দীন আল-ইরাকী (জন্ম:৭২৫ হি: - মৃত্যু: ৮০৬ হি:) التقييد والايضاح لما اطلق واغلق من كتاب ابن الصلاح

৩. আলাউদ্দীন মুগলতায়ী (জন্ম:৬৮৯ হি: - মৃত্যু৭৬২ হি:) إصلاح ابن الصلاح

৪. শিহাব উদ্দীন ইবনে হজর আসকালানী (জন্ম:৭৭৩ হি: -মৃত্যু ৮৫২ হি:) النكت على كتاب ابن الصلاح

* যারা এ গ্রন্থকে পদ্যাকারে রচনা করেছেন :

১. যইনুদ্দীন ইবনে হাবীব (মৃত্যু ৮০৮ হি:) ইনি মূলত বুলকেনী কৃত محاسن الإصطلاح নামক গ্রন্থটিকে পদ্যাকারে রচনা করেছিলেন।

২. শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবনে খলীল (জন্ম: ৬২৬ হি: - মৃত্যু ৬৯৯ হি:) أقصى الأمل والسؤول في علوم أحاديث الرسول

এ গ্রন্থটি منظومة ابن خليل নামে খ্যাত।

৩. যইনুদ্দীন আল-ইরাকী (জন্ম: ৭২৫ হি:- মৃত্যু: ৮০৬ হি:)

আলফিয়ায়ে ইরাকী ও তার শরাহ : التبصرة والتذكرة

আত্-তাবসেরা ওয়াত তাযকেরা নামক এই গ্রন্থটি কাব্যাকারে রচিত এবং আলফিয়ায়ে ইরাকী নামে খ্যাত। তিনি নিজেই এ কাব্য গ্রন্থটির ব্যাখ্যা তৈরী করেন। সেটি شرح الألفية নামে খ্যাত। পরবর্তীতে شرح ألفية العراقي যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। পরবর্তী কালের লোকেরা ইরাকীর আলফিয়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ, সংক্ষেপায়ন, টিকা এবং তার পদ্যাকার রচনায় প্রবৃত্ত হয়।

* ইরাকীর কাব্যগ্রন্থের ব্যাখ্যাকারদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন :

১. ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে জামা'আহ (৮২৫ হিঃ - ৮৬১হিঃ)
২. আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আল-আইনী (৮৩৮ হিঃ - ৮৯৩ হিঃ)
৩. কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আয-যুবায়দী (৮২১ হিঃ - ৮৯৪ হিঃ)
৪. হাফেয শামসুদ্দীন আস-সাখাভী (৮৩১ হিঃ - ৯০২ হিঃ)
৫. হাফেয জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (৮৪৯ হিঃ - ৯১১ হিঃ)
৬. কাজী যাকারিয়্যাহ (৮২৩ হিঃ - ৯২৬ হিঃ)
৭. বুরহান উদ্দীন ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ হালাবী (৮৬৫ হিঃ - ৯৫৬ হিঃ)

* এ গ্রন্থের টিকাকারদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন :

১. আল্লামা যইনুদ্দীন কাসেম ইবনে কুতলুবোগা (৮০২ হিঃ - ৮৭৯ হিঃ)
২. হাফেজ বুরহান উদ্দীন আল-বেকাই (৮০৯ হিঃ - ৮৮৫ হিঃ)
৩. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে কাসেম (৮৫৯ হিঃ -৯১৮ হিঃ)

* ইরাকীর শরহে আলফিয়ার সংক্ষেপায়ন করেছেন :

১. সাইয়্যিদ শরীফ মুহাম্মদ আমীন (মৃত্যু- ৯৮৭হিঃ)

এ ছাড়াও ইরাকীর আলফিয়ার উপর বহু ব্যক্তি বহু ধরণের কাজ করেছেন। বস্তুতঃ পরবর্তী প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত ইবনুস-সালাহ রচিত معرفة أنواع علم الحديث গ্রন্থটি এতদসংক্রান্ত জ্ঞানের উৎসগ্রন্থ হিসাবে কাজ করে। কালে আল্লামা ইরাকীর শরহে আলফিয়া এবিষয়ের উৎসগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়।

ইবনে হজর রচিত নুখবাতুল ফিকার :

অতপর আল্লামা ইবনে হজর আস্‌কালানী (জন্মঃ ৭৭৩ হিঃ মৃত্যুঃ ৮৫২ হিঃ) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر নামে একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ তৈরী করেন। পরে তিনি নিজেই এ গ্রন্থটির একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر নামে রচনা করেন।

এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর আলেম উলামাদের দৃষ্টি এ গ্রন্থটির উপরই নিবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এটিকেই পঠন-পাঠনের জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। ফলে এ গ্রন্থের উপর টিকা সংযোজন, এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তৈরী, এটিকে বিন্যস্ত করণ ও এটিকে সংক্ষেপায়ন এবং এর কাব্যানুবাদ তৈরী ব্যাপক ভিত্তিতে শুরু হয়। বলতে গেলে মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ -এর উপর যত কাজ হয়েছে এ গ্রন্থের উপরও তার সমপর্যায়ের কাজ হয়েছে।

*** নুখবাতুল ফিকারের যারা ব্যাখ্যাগ্রন্থ তৈরী করেছেন :**

১. মুহাদ্দিস কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আত্-তামিমী মালেকী (জন্ম: ৭৬৬ হি: মৃত্যু ৮২১ হি:) তার গ্রন্থের নাম- نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر

২. ইমাম জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মূসা (জন্ম:৭৮৯হি: মৃত্যু: ৯২৩হি:) ইনি ইবনে মূসা নামে খ্যাত, ইবনে হজরের ছাত্র।

৩. ইমাম শিহাব উদ্দিন আবুল ফযল আহমদ ইবনে সাদাকাহ (জন্ম: ৮২৯হি: মৃ: ৯০৫)। তিনি ইবনুস সায়রাফী নামে খ্যাত। তার গ্রন্থের নাম- عنوان معاني نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

৪. ইমাম যয়নূদ্দীন মুহাম্মদ আব্দুর রউফ ইবনে আলী আল-মুনাবী। তার একটি গ্রন্থের নাম- نتيجة الفكر في شرح نخبة الفكر তার আরেকটি গ্রন্থের নাম خلاصة الأثر

৫. শায়খ ইসমাঈল ইবনে মুস্তফা ইস্তাম্বুলী হানাফী (জন্ম: ১০৬৩ হি: মৃত্যু: ১১৩৮ হি:)

৬. শায়খ শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান (হানাফী) (জন্ম: ১০৯১ মৃ: ১১৭৫)। তিনি ইবনে হিম্মাত যাদাহ দামেশকী নামে খ্যাত।

*** শরহে নুখবার ব্যাখ্যাকারদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন :**

১. আল্লামা নূর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ হানাফী ইনি মুল্লা আলী কারী নামে খ্যাত (মৃ: ১০১৪ হি:) তার গ্রন্থের নাম- مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر

২. ইমাম যয়নুদ্দীন আল-মুনাবী, (জন্ম: ৯৫২ হি: মৃত্যু-১০৩১ হি:) তাঁর গ্রন্থের নাম - اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر

৩. ইমাম বুরহানুদ্দীন আবু ইসহাক ইবরাহীম (মৃ: ১০৪১ হি:)। তার গ্রন্থের নাম- قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر

৪. কাজী মুহা: আকরাম ইবনে আব্দুর রহমান সিন্ধী, (হানাফী) তিনি হিজরী একাদশ শতকের শুরুভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তার কিতাবের নাম: إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر

৫. শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন গুজরাটি মৃঃ ৯৯৮হিঃ তার গ্রন্থের নাম- شرح على شرح النخبة
৬. শায়খ আব্দুন্ নবী গুজরাটি
৭. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে সাবের টুংকী
৮. শায়খ মুহাম্মদ হুসাইন হাজারভী (ফার্সী ভাষায় রচিত)
৯. শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুস সালাম হাজারভী -
استجلاء البصر من شرح نخبة الفكر

*** শরহে নুখবার কাব্যকারদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন :**

১. আল্লামা কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ, যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
২. ইমাম শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ (জন্মঃ ৮৪৭ হিঃ মৃত্যুঃ৮৯৩ হিঃ)।
৩. কাজী বুরহান উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-মাকদেসী, (মৃত্যুঃ ৯০০ হিঃ)।
৪. ইমাম শিহাব উদ্দীন আবুল ফযল আহমদ ইবনে সাদাকাহ, যার আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
৫. কাজী রাজী উদ্দীন আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ দামেশকী (মৃত্যুঃ ৯৩৫ হিঃ)।
৬. মুহাদ্দিস মনসুর আত্-তাবলাভী, (জন্মঃ .... মৃত্যুঃ ১০১৪ হিঃ)।
৭. আবু হামেদ ইবনে আবিল মাহাসিন- মৃত্যু : ১০৫২ হি : عقد الدرر في نظم نخبة الفكر
৮. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল-ইয়ামানী, (জন্ম : ১১০৫ হিঃ মৃত্যুঃ ১১৯৬ হিঃ)

*** শরহে নুখবার টিকাকারদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন :**

১. ইমাম যয়নূদ্দীন কাসেম ইবনে কুতলুবোগা, (জন্মঃ ৮০৬ হিঃ মৃঃ ৮৭৯ হিঃ)।
২. ইমাম কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ, (জন্মঃ ৮২২ হিঃ মৃঃ৯০৬ হিঃ)
৩. ইমাম রাজী উদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম হানাফী। ইনি ইবনুল হাম্বলী নামে অধিক খ্যাত (জন্মঃ ৯০৮ হিঃ মৃঃ ৯৭১ হিঃ)।
৪. ফকীহ যয়নুল আবেদীন আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ (মৃঃ১০৬৬ হিঃ)।
৫. ইয্যুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আস্-সানআনী (জন্মঃ ১০৯হিঃ মৃঃ১১৮২ হিঃ) তিনি আমীর সানআনী নামে খ্যাত।

এছাড়াও বহু ব্যক্তি শরহে নুখবার উপর কাজ করেছেন। বিভিন্ন ভাষায় এ গ্রন্থটির অনুবাদ হয়েছে। বহু দেশে এটি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। দেওবন্দের উস্তাদুল হাদীস হযরত মাও. সাঈদ আহমদ পালনপুরী (মাঃদাঃ) تحفة الدرر নামে এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ উর্দূ ভাষায় তৈরী করেছেন। যে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি উক্ত কিতাবের ভাব অনুধাবনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে বলে মনে করা হয়।

বাংলাদেশে মারকাযুদ দাওয়াহ আল্ ইসলামিয়ার শিক্ষা পরিচালক মাও. আব্দুল মালেকও নুখবার একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আরবী ভাষায় তৈরী করেছেন যা যন্ত্রস্থ।

শরহে নুখবার পরবর্তীতে চরিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ :

* নূখবা ও শরহে নূখবার পর বর্তমান কাল পর্যন্ত এ বিষয়ের উপর পৃথকভাবে তেমন একটা কাজ না হলেও যা হয়েছে তাও সংখ্যায় কম নয়। নিম্নে এ ধরণের কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা গেল।

১. تنقيح الأنظار في تنقيد الأخبار أوعلوم الآثار লেখক: শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম। তিনি ইবনূল ওয়াযীর নামে খ্যাত (মৃত্যু ৮৪০হি:)

২. تدريب الراوي লেখক: আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (জন্ম: ৮৪৯ মৃ:৯১১হি:)

৩. قفو الأثر في صفوعلوم الأثر। লেখক: আল্লামা রাজী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম (হানাফী)। তিনি ইবনূল হাম্বলী নামে খ্যাত (জন্ম: ৯০৮ মৃ: ৯৭১ হি.)

৪. المنهج শায়খ নিজাম উদ্দীন কাকুরী (ভারত) মৃ: ৯৮১ হি:

৫. بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب লেখক : আল্লামা মুরতাযা হুসাইনী আয্-যুবায়দী (জন্ম: ১১৪৫ মৃ: ১২০৫ হি:)।

৬. المختصر في علوم الحديث শায়খ সালামুল্লাহ দেহলভী মৃ: ১২২৯ হি:।

৭. منهج الوصول في إصطلاح أحاديث الرسول সিদ্দিক হুসাইন কনূজী মৃ: ১৩০৭ হি:।

৮. عمدة الأصول في أحاديث الرسول শায়খ মুহাম্মদ শাহ দেহলভী।

৯. توجيه النظر إلى أصول الاثر লেখক: আল্লামা তাহের আল্-জাযায়েরী আদ্-দামেশকী (জন্ম: ১২৬৮হি: মৃ: ১৩৩৮ হি:)।

১০. تيسير مصطلح الحديث লেখক : ডক্টর শায়খ মাহমূদ ইবনে আহমদ আত্-তাহ্হান প্রথম এডিশান-১৩৯৭ হি:।

১১. تيسيرعلوم الحديث للمبتدئين লেখক: আবু আব্দুর রহমান আমর ইবনে আব্দুল মুনঈম ইবনে সলীম

১২. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث লেখক: মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন কাসেমী, ১ম সংস্করণ-১৩৯৯ হি:।

১৩. نظرات جديدة في علوم الحديث লেখক: হামযাহ মাল্ইয়াবারী।

১৪. المنهج المقترح لفهم المصطلح লেখক: শরীফ হাতেম আল-'আওয়ানী।

১৫. نهج الحديث في مختصر علوم الحديث লেখক: ডক্টর আলী মুহাম্মদ নাসার ।

১৬. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي লেখক: মুস্তফা আস-সিবাঈ।

১৭. السنة النبوية লেখক: আব্বাস মুতাওয়াল্লী হাম্মাদাহ, ১ম সংস্করণ- ১৩৮৪হি:।

১৮. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول লেখক : মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ্-শাওকানী ১ম সংস্করণ ১৩৫৬ হি: এটি মূলত উসূলে ফিকার কিতাব হলেও সুন্নাহ অধ্যায়ে উসূলে হাদীসের সুন্দর আলোচনা রয়েছে।

১৯. منهج الحديث في علوم الحديث লেখক : ড. মুহাম্মদ আস্-সামাহী।

২০. منهج النقد في علوم الحديث লেখক : ড. নূরউদ্দীন।

২১. علوم الحديث লেখক : ডক্টর সুবহী আস্-সালেহ

২২. الحديث والمحدثون লেখক : মুহা: আবুয্-যাহু

২৩. علم رجال الحديث লেখক : আল্লামা তকী উদ্দিন নদভী, ১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি:

২৪. تاريخ علم الحديث লেখক: সাইয়্যিদ আমীমুল ইহ্সান (জন্ম-১৩২৯ হি: মৃ:১৩৯৪ হি

২৫. تدوين حديث লেখক : মানাযির আহ্সান গিলানী

২৬. السنة قبل التدوين লেখক : ডক্টর মুহাম্মদ আজায আল্-খতীব, ১ম সংস্করণ ১৩৮৩ হি:

২৭. دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه লেখক : ড. মুস্তফা আল-আ'যাম

২৮. لمحات من تاريخ السنة আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

উলূমুল হাদীস সম্পর্কে ভারতীয় উলামারা যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন :

আমাদের ভারতীয় মুহাদ্দিসগণও এ বিষয়ের উপর যথেষ্ট কাজ করেছেন বলা চলে। তাঁরা এ বিষেয়ে পৃথক গ্রন্থ খুব বেশী রচনা না করলেও হাদীসের গ্রন্থাবলীর উপর তাঁরা যে সব শরাহ্ শুরুহাত রচনা করেছেন সেগুলোর ভূমিকায় উলূমুল হাদীস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তাদের সেই ভূমিকাগুলো এক একটি পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার দাবী রাখে। উলূমুল হাদীস সম্পর্কে ভারতীয় উলামারা যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. مقدمة مشكاة المصابيح আব্দুল হক দেহলভী (৯৫৮ -১০৫২হি:)

২. مقدمة مسوى لشرح مؤطأ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (১১১৪-১১৭৬) কর্তৃক রচিত

৩. العجالة النافعة শাহ আব্দুল আযীয (রাহ.) মৃ: ১২৩৯ হি: কর্তৃক রচিত

৪. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ও ظفر الأماني আব্দুল হাই লখনভী কর্তৃক রচিত

৫. تحفة الأحوذي-এর ভূমিকা, আব্দুর রহমান মুবারকপূরী রচিত (জন্ম: ১২৮৩ হি: মৃত্যু : ১৩৫৩ হি:)

৬. مبادئ علم الحديث وأصوله (مقدمة فتح الملهم) লেখক : শাব্বীর আহ্মদ উসমানী মৃত্যু: ১৩৬৯ হি: ।

৭. قواعد في علوم الحديث এ'লাউস সুনানের ভূমিকা, যফর আহমদ উসমানী (জন্ম: ১৩1০ হি: - মৃত্যু : ১৩৯৪ হি:)

৮. بذل المجهود-এর ভূমিকা, ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী (মৃত্যু: ১৩৮৭হি:)

৯. أوجز المسالك-এর ভূমিকা, শায়খ যাকারিয়্যাহ ।

১০. ما تمسّ إليه الحاجة لمن يطالع إبن ماجة আঃ রশিদ নূ'মানী কৃত

১১. تدوين حديث মানাযির আহসান গিলানী কৃত ।

১২. تاريخ علم الحديث সাইয়্যিদ আমীমুল ইহ্সান কৃত ।

১৩. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, মাও. নূর মুহাম্মদ 'আজমী কৃত ।

১৪. দরসে তিরমিযীর ভূমিকা, তকী উসমানী দাঃ বাঃ কৃত

১৫. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাও. আব্দুর রহীম কৃত ।

১৬. الدرر الثمينة মাও. আব্দুল মতীন কৃত ।

১৭. تنقيح الفكر والنظر شرح نخبة الفكر মাও. আব্দুল মালেক কৃত ।

১৮. উলূমুল হাদীস, ড. মাও. মুশতাক আহমদ কৃত ।

১৯. রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, ড. মুহাঃ জামাল উদ্দিন কৃত ।

২০. উলূমুল হাদীস মাও. ইসহাক় সম্পাদিত ।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

তৃতীয় অধ্যায়

ইলমে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় পরিভাষা

হাদীস (الحديث)

আভিধানিক অর্থ :

হাদীস শব্দটি অভিধানে الجديد من الأشياء অর্থাৎ নতুন বস্তু বা নবসৃষ্ট বিষয় কিংবা বস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর বহুবচন হয় حُدَاثٌ ও حُدَثَاءٌ -যার বিপরীত শব্দ হল কাদীম (قديم) বা পুরাতন, অনাদি-অনন্ত। যেহেতু কালামুল্লাহ বা আল্লাহর বাণী অনাদি-অনন্ত, তাই রাসূল সা.-এর বাণীকে হাদীস বলে নামকরণ করা হয়েছে। যাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূল সা.-এর বাণী আল্লাহর কালামের ন্যায় অনাদি-অনন্ত নয়।

আবার হাদীস শব্দটি অভিধানে কথা বা বাণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর বহুবচন হয় احاديث। সম্ভবত حديث الرسول বা 'রাসূলের কথা' এই সম্বন্ধ পদটির বহুল ব্যবহারের কারণে মুযাফ ইলাইহে-কে ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র حديث শব্দটি উল্লেখ করে "হাদীসে রাসূল" বুঝানোর প্রবণতা থেকে হাদীস শব্দটি রাসূলের বাণীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও যে কোন ব্যক্তির কথাকেই আভিধানিকভাবে হাদীস বলা যায়; এমনকি স্বপ্নের বিবরণকেও কুরআনে কারীমে হাদীস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ অর্থাৎ স্বপ্নের কথার ব্যাখ্যা আপনিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।[১]

তথাপি অন্য মানুষের কথার তুলনায় রাসূলের কথা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে তাঁর কথাকেই মূলত কথার মত কথা বলা যায়। তাই হাদীস বলে তাঁর কথাকেই বিশেষভাবে বুঝানো হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ما أضيفَ إلى النبيِّ صلّى الله عليه وَسلمَ مِن قولٍ أوفعلٍ أوتقريرٍ أوصفةٍ حتىّ الحرَكاتِ والسّكناتِ في اليقظةِ والمنامِ.

---

[১] সূরা: ১২ আয়াত: ১০১।

রাসূল সা.-এর কথা, কাজ, মৌন অনুমোদন, তাঁর গুণাবলী[১] এমনকি নিদ্রা ও জাগরণের যাবতীয় আচার-আচরণকে [২] হাদীস বলা হয়।

কেউ কেউ হাদীসের সংজ্ঞা আরো বিস্তারিতভাবে প্রদান করেছেন। তাদের মতে الحديث: هو أقوالُ النبيِّ ﷺ وأفعالُه وسهوُه وتقاريرُه وتروكُه وما هَمَّ به ففعلَه أو لم يفعلْه، وأحوالُه وشمائلُه وصفاتُه الخَلقيّة والخُلُقيَّة حتىّ الحرَكات والسَّكَنات فِي اليَقظَةِ وَالمَنام سَواءٌ كانَ كلُّ ذلك قبلَ البعثة أو بعدَها .

নবী কারীম সা.-এর কথা, কাজ, ভুল, মৌন অনুমোদন, বর্জন এবং তিনি যা করতে ইচ্ছা করেছেন তা বাস্তবায়ন করে থাকুন বা না করে থাকুন এবং তাঁর অবস্থাসমূহ, জীবনচরিত, তাঁর দৈহিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এমনকি তাঁর নিদ্রা-জাগরণের যাবতীয় আচার-আচরণকে হাদীস বলে; তা নবুয়তের পূর্বের হোক বা পরের।[৩]

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. উল্লেখ করেছেন যে, সাহাবী ও তাবেঈনদের কথা, কাজ, ও সমর্থনকে এবং তাদের ফতওয়াকেও হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।[৪]

আল্লামা ইবনে হজরও উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বযুগীয় মনীষীগণ অবশ্য সাহাবী, তাবেঈন এবং তাবয়ে তাবেঈনদের কথা কাজের বিবরণ এবং তাঁদের ফতওয়া সমূহের উপরও হাদীস শব্দটি ব্যবহার করতেন।

সুন্নাহ (السنة)

আভিধানিক অর্থ :

সুন্নাহ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল চলার পথ, পন্থা, আদর্শ, কর্মধারা, কর্ম পদ্ধতি ইত্যাদি। [৫] ভাল মন্দ উভয় ধরণের বিষয়ই এর অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ ভালপথ বা মন্দপথ দু'টোকেই আভিধানিক ভাবে সুন্নত বলা যাবে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা অনুসারে সুন্নাহ শব্দটি হাদীসের সমার্থক।

অনেক মুহাদ্দিস ও উসূলবিদ যখন হাদীসকে সুন্নাহর অর্থে প্রয়োগ করেছেন তখন তার সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন :

---

[১] তাইসিরু মুসাতালাহিল হাদীস পৃ: ১৫।

[২] ফতহুল মুগীস সাখাবী কৃত খ: ১ পৃ: ১০

[৩] ফাতহুল মুগীস সাখাবী কৃত খ: ১ পৃ: ৪৬

[৪] মুকাদ্দামায়ে মিশকাত পৃ: ৩

[৫] আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরীঈল ইসলামী-পৃ: ৪৭ ও হাদীস সংকলনের ইতিহাস- ১৩-১৪।

هُو أقوالُ النبيِّ صــ وأفعالُه وتروكُه وتقاريرُه وَمَا هَمَّ بِه وأحوالُه وشمائلُه وسائرُ ما يتعلَّق بِشُؤونه بَعدَ بِعثَته مِمَّا يُطالبُ به التأسِّي أو يمكن أن يُؤخذَ منه حُكمٌ شرعيٌّ–

নবুওয়াত লাভের পরবর্তীকালে রাসূল সা. এর কথা, কাজ, বর্জন, ও মৌন অনুমোদন, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর হালাতসমূহ, তাঁর জীবন চরিত এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়– যাথেকে কোন আদর্শ আহরণ করা যায় কিংবা তাথেকে যদি কোন বিধি-বিধান প্রবর্তন করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাকে হাদীস বা সুন্নাহ বলে।[১]

সুতরাং নবী সা.-এর সকল কথা, কাজ, অনুমোদন এবং নিদ্রায় জাগরণে তাঁর অবলম্বিত সকল আচার-আচরণই সুন্নত। অন্যকথায় নবী সা. আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দ্বীন নিয়ে এসে ছিলেন, দীর্ঘ ২৩ বৎসরের নবুওয়্যতী জিন্দেগীতে তা যে ভাবে বাস্তবায়ন করে গেছেন তাকেই মূলত সুন্নত বলা হয়। অবশ্য অনেকেই নবী সা.- এর কথা কাজ, অনুমোদন এবং তার দৈহিক গঠন, চারিত্রিক গুণাবলী, অন্যকথায় তাঁর সমগ্র জীবন চরিতকে (নবুওয়াতের পূর্বের হোক কিংবা পরের) সুন্নত বলা হয় বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

মুস্তফা আস-সিবাঈ উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন ছাড়া রাসূল সা.- এর ঐসব কথা, কাজ ও অনুমোদনকে 'সুন্নাহ' বলা হয়- যা দ্বারা কোন শরঈ বিধান প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩]

ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় সুন্নত শব্দটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। তাদের মতে সুন্নত বলতে এমন বিধি-বিধানকে বুঝানো হয় যা দলীলে যন্নী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যা ওয়াজিব নয়; আবার নবী সা. কখনো কখনো করেছেন এমনও নয়। কারণ এ ধরণের কাজকে তারা মুস্তাহাব বলেন। অর্থাৎ শরীয়তে বৈধ কর্মের পাঁচটি স্তর (যথাঃ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, মুবাহ)- এর একটি হল "সুন্নত"।

ভারতীয় আলেমগণের বর্ণনা ধারা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল সা. ও সাহাবাগণের কথা, কাজ ও অনুমোদনের শাব্দিক ও আক্ষরিক বর্ণনা যা সূত্র পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে বলা হয় 'হাদীস'। আর রাসূল সা. এবং সাহাবায়ে কিরামের কথা, কাজ, অনুমোদন ও দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণের আলোকে নি:সৃত কর্মপন্থার নাম 'সুন্নাহ'।

---

১ তাওজীহুল নযর, হুজ্জিয়তুস সুন্নাহ।

২ আস-সুন্নাতুন নববিয়্যাহ - আব্বাস মুতাওয়াল্লী কৃত- পৃ: ২৩।

৩ ইরশাদুল ফাহুল - মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী কৃত - পৃ: ৩৩।

আবার অনেকের মতে রাসুল সা.এর কথা-কাজ ও অনুমোদনগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ ১. جائز الإتباع বা অনুসরণযোগ্য। ২. حرام الإتباع বা যার অনুসরণ নিষিদ্ধ (যেমন, এক সঙ্গে ৯ জন স্ত্রী রাখা কিংবা ইফ্‌তার না করে লাগাতার রোযা রাখা)। এ দু'ধরণের কর্মের বিবরণকেই হাদীস বলা হয়। কিন্তু সুন্নত বলতে কেবল অনুসরণযোগ্য বিষয়কেই বুঝায়। এ প্রেক্ষিতে হাদীস ও সুন্নতের মাঝে সম্পর্ক হল عام خاص مطلق -এর। অর্থাৎ সকল সুন্নতই হাদীস তবে সকল হাদীসই সুন্নত নয়।[১]

সুন্নাহ শব্দটির ব্যবহার সাহাবীগণের অনুসৃত কর্মনীতির উপরও করা হয়।[২] আবার শরীয়তের প্রমাণচতুষ্ঠয় (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) এর একটি হল সুন্নাহ। আবার বিদ'আতের বিপরীতেও সুন্নাহ শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। [৩]

সারকথা এই যে, সুন্নাহ শব্দটি হাদীসের সমার্থক বা তারই কাছাকাছি অর্থ বহন করে। তবে মুহাদ্দিসগণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। আর উসূলবিদ ও ফিকাহবিদগণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

খবর (الخبر)

আভিধানিক অর্থ :

খবর (الخبر) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল : সংবাদ, বিবরণ, বর্ণনা ইত্যাদি। বস্তুত.পরবর্তী বর্ণনাকারীগণ হাদীস বর্ণনা করার মাধ্যমে রাসূল সা., সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনদের কথা, কাজ ও অনুমোদনের সংবাদ দিয়েছেন, এ জন্য একে খবর বলা যুক্তিসঙ্গত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

খবরের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিন ধরণের মতামত পাওয়া যায়।[৪] যথাঃ

১. খবর শব্দটি হাদীসের সমার্থক, অতএব খবরের সংজ্ঞা হবে হাদীসের সংজ্ঞার অনুরূপ।

---

[১] মা তামুস্‌সু ইলাইহিল হাজাহ

[২] হাদীস সংকলনের ইতিহাস পৃঃ ১৭ ও ....

[৩] আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফীত্‌-তাশরী - পৃঃ ৪৮

[৪] তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস - পৃঃ ১৫ ও শরহে নুখবা আল্লামা ইবনে হজরকৃত।

২. খবর শব্দটি হাদীসের চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক। এ মতের প্রবক্তারা খবরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন -

الخبرُ: مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعَن غَيْرِه مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِم، وَالحَدِيثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صـــ

নবী করীম সা., সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন কিংবা অন্য কারো থেকে যা বর্ণিত তাকে খবর বলে। আর কেবলমাত্র নবী কারীম সা. থেকে যা বর্ণিত তাকে হাদীস বলে।

৩. খবর শব্দটি হাদীসের চেয়ে ভিন্ন অর্থবোধক। এ মতের প্রবক্তারা খবরের সংজ্ঞা এভাবে দিয়ে থাকেন যে- الخَبَر : مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِ النَّبِيِّ صـــ وَالحَدِيْثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ

রাসূল সা. ব্যতীত অন্যদের থেকে যা বর্ণিত তাকে খবর বলে। আর রাসূল সা. থেকে যা বর্ণিত তাকে হাদীস বলে।[১]

একারণেই যারা রাসূল সা. এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণনা করেন তাদেরকে মুহাদ্দিস বলা হয়। আর যারা রাসূল ব্যতীত অন্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণনা করেন তাদেরকে আখবারী, মুয়াররিখ বা ইতিহাসবিদ বলা হয়।[২]

আসার (الآثار)

আভিধানিক অর্থ :

آثار শব্দের আভিধানিক অর্থ হল ধ্বংসাবশেষ, নিদর্শন, শেষচিহ্ন, অবশিষ্টাংশ।[৩] باب نصر থেকে أثر-يأثر অর্থ বর্ণনা করা। এ অর্থের প্রেক্ষিতেই নবী, সাহাবী ও তাবেঈনদের কথা, কাজ ও অনুমোদনের বর্ণনাকে আসার বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

আসার এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে দুই ধরণের অভিমত পাওয়া যায়।

১. আসার শব্দটি হাদীসের সমার্থক। অতএব এর সংজ্ঞা হাদীসের সংজ্ঞার অনুরূপ হবে। এটি অধিকাংশ মুহাদ্দিসের অভিমত। এ অর্থের প্রেক্ষিতেই ইমাম ত্বাহাবী তাঁর কিতাবের নামকরণ করেছেন شرح معاني الآثار কেননা নবী সা.-এর

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস - পৃ: ১৫ - ১৬ (সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনসহ)

[২] আদ-দুরারুস সামিনাহ পৃ: ১৪ ও শরহে নুখবা

[৩] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ও দুরারুস-সামিনাহ -১৪

হাদীসসমূহ সংকলন ও তার ব্যাখ্যাই এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। যদিও তাতে সাহাবী ও তাবেঈনদের বর্ণনাও রয়েছে।[১]

২. খোরাসানী ফিকাহবিদদের অভিমত অনুসারে আসার শব্দটির সংজ্ঞা হল:

ما أضِيفَ إلى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنَ الْأقوَالِ وَالأفْعَالِ ــ

অর্থাৎ সাহাবী ও তাবেঈনদের কথা ও কাজের বিবরণকে আসার বলা হয়।[২]

এ মতটি খবরের তৃতীয় সংজ্ঞার সমার্থক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ খবরের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তৃতীয় যে মতটি উল্লেখ করা হয়েছে, আর খোরাসানী ফিকাহ্‌বিদগণ আসারের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে খবর ও আসার সমার্থক হয়ে পড়ে। এ ভিত্তিতেই ইমাম আবু হানীফা রাহ. তাঁর কিতাবের নামকরণ করেছেন- كتاب الآثار।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, হাদীসের সংজ্ঞায় সাহাবী ও তাবেঈনদের কথা, কাজ ও ফত্‌ওয়াও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। অতএব সারকথা এই দাঁড়ায় যে, خبر، سنة، حديث ও آثار মূলত সমার্থবোধক। যদিও কারো কারো মতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

তবে আমরা মনে করি যে, রাসূল সা., সাহাবী ও তাবেঈনদের কথা, কাজ ও অনুমোদন কে যদিও সাধারণভাবে হাদীস নামে অভিহিত করা হয়; তথাপি নবী, সাহাবী ও তাবেঈনদের মর্যাদার দিক বিবেচনায় এগুলোর মাঝে পার্থক্য থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

সম্ভবত এজন্যই মুহাদ্দিসগণ ব্যাপক অর্থে নবী, সাহাবী ও তাবেঈনদের কথা ও কাজ অনুমোদন সংক্রান্ত বর্ণনাকে হাদীস বললেও প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক নাম নির্ধারণ করেছেন। তাই রাসূল সা.- এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীসে মরফু বলা হয়। আর সাহাবীদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীসে মওকূফ বলা হয়। পক্ষান্তরে তাবেঈনদের কথা ও কাজ, অনুমোদনকে হাদীসে মকতূ ও ফত্‌ওয়া বলা হয়।[৩]

---

[১] দুরারুস্‌-সামীনাহ - ১৪

[২] প্রাগুক্ত .... ১৪ ও মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস্‌সুনান - ২৫-২৬

[৩] গ্রন্থকার।

সনদ (السَّند)

আভিধানিক অর্থ :

সনদ শব্দের আভিধানিক অর্থ ভিত্তি, নির্ভর, প্রমাণ ইত্যাদি। যেহেতু হাদীসটির শুদ্ধাশুদ্ধি বর্ণনা সূত্রের উপর ভিত্তিশীল একারণেই বর্ণনা-সূত্রকে সনদ নামে নামকরণ করা হয়েছে। [১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

السَّنَدُ : الطَّرِيقُ المُوصِلَةُ إلى الْمَتنِ أي أسْمَاءِ رُوَاته مُرتَّبة –

যে সূত্র পরম্পরায় মূল হাদীস পর্যন্ত পৌঁছা যায় তাকে সনদ বলে। অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিক বর্ণনাই মূলত সনদ। [২]

ইসনাদ (الإسناد)

আভিধানিক অর্থ :

ইসনাদ (الأسناد) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল: ভিত্তি রাখা, নির্ভর করা, প্রমাণ ভিত্তিক করা, নির্ভরযোগ্য করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : حكايَةُ طريقِ المتنِ

মূল হাদীসের সূত্রপরম্পরাকে উল্লেখ করা বা বর্ণনা করা অর্থাৎ মূল হাদীসের ধারাবাহিক সূত্রকে বর্ণনা করা [৩]। কেউ কেউ এর সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবেও দিয়েছেন عَزوُ الكلامِ إلى قائله مُسندا কোন কথাকে সূত্রপরম্পরায় তার বলনেওয়ালা পর্যন্ত পৌঁছানো। [৪]

মুহাদ্দিসগণ ইসনাদ শব্দটিকে সনদের অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। এ নিরিখে তার সংজ্ঞা দাঁড়ায় - سِلسِلةُ الرِّجال المُوصلة إلى المَتن মূল হদীস পর্যন্ত পৌঁছার জন্য বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক সূত্র। [৫]

সনদকে প্রধানত: দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. মুত্তাসিল (المتصل) ২. মুনকাতে' (المنقطع)

---

[১] শরহে নুখবা পাণ্ডুলিপি (মাও. আব্দুল মালেক কৃত)
[২] মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস্‌সুনান - ২৬
[৩] মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস্‌সুনান - ২৬
[৪] তাইসিরু মুসতালাহিল হাদীস - ১৬
[৫] মুকাদ্দামায়ে এ'লাউসসুনান - ২৬ ও আল-ওয়াযাউ ফিল হাদীস (ড. উমর ইবনে হাসান) -৮

* **মুত্তাসিল :** مَا اتَّصَلَ سَنَدُه سَوَاءً كَانَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ أو مَوقُوفًا أو نَحوَه যে হাদীস অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত (মরফূ হোক কিংবা মওকূফ) তাকে মুত্তাসিল বলে। (অর্থাৎ যে হাদীসের সূত্র থেকে কোন রাবী বাদ পড়েনি)। [১]

* **মুনকাতে' :** مَا حُذِفَ مِن وَسط إسناده যে সনদ থেকে কোন রাবীকে ফেলে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে মুনকাতে' বলে।
অর্থাৎ কোন হাদীসের সনদ থেকে কোন বর্ণনাকারী যদি বাদ পড়ে যায়, যার ফলে সনদের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সেই সনদকে মুনকাতে' বলে।[২]

মুসনাদ (المسند)

আভিধানিক অর্থ :

মুসনাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল: সনদযুক্ত, প্রমাণপুষ্ট, দলীলসমৃদ্ধ ইত্যাদি। এর বহুবচন মাসানীদ। এর তিনটি প্রেক্ষিত রয়েছে অর্থাৎ মুসনাদ শব্দটি তিন ধরণের অর্থের জন্য প্রয়োগ করা হয়। প্রথম অর্থের ক্ষেত্রে তিন ধরণের অভিমত রয়েছে। যথা:

১. ক الحديثُ الذي اتَّصَلَ سَنَدُه مِن رَاوِيه إلى مُنتَهَاهُ

যে হাদীসের সূত্র সংকলনকারী থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত আছে তাকে মুসনাদ বলে। এ সংজ্ঞানুসারে মরফূ (রাসূল থেকে বর্ণিত) মওকুফ (সাহাবী থেকে বর্ণিত) এই সব ধরণের হাদীসই যদি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে তা হলে তাকে মুসনাদ বলা হবে।

১. খ الحديثُ المرفوعُ إلى النبي سواءً كان متصلاً أو منقطعًا– واختاره ابن عبد البر

রাসূল সা.-এর কথা, কাজ ও মৌন অনুমোদন সংক্রান্ত বর্ণনাকে মুসনাদ বলে; তাঁর বর্ণনাসূত্র বিচ্ছিন্ন হোক বা অবিচ্ছিন্ন। এটি ইবনু আব্দিল বার -এর অভিমত। এ সূত্র অনুসারে মরফূ ও মুস্নাদ সমার্থবোধক হয়ে পড়ে।

১.গ الحديثُ المرفوعُ إلى النبيِّ إذا رُوِيَ بِسَنَد متّصلٍ

নবী সা.-এর কথা, কাজ ও মৌন অনুমোদনের বর্ণনা যদি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে তাকে মুসনাদ বলে। এটি হাকেম আবু আব্দুল্লাহ, ইবনে হজর আসকালানী, আবু আমর আদ্-দানী ও ইবনু দাকীকিল ঈদ প্রমুখ মনীষী ও

---

[১] মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস্সুনান - পৃ: ৩৮। মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস্সুনান - ২৬ ও আল-ওয়াযাউ ফিল হাদীস
(ড. উমর ইবনে হাসান) -৮।

[২] মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস্সুনান - পৃ: ৩৯

মুহাদ্দিসীনের অভিমত। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। [১] এই সংজ্ঞানুসারে মুসনাদ মরফূ'র চেয়েও সংকোচিত অর্থবোধক হবে।

২. দ্বিতীয় ধরণের অর্থ : كلُّ كتاب جُمِعَ فِيه مَروِيّاتُ كلِّ صحابِيٍّ على حِدَة

প্রত্যেক এমন হাদীসের গ্রন্থকে মুসনাদ বলা হয় যাতে রাসূল সা. থেকে প্রত্যেক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহকে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে (সনদসহ) উল্লেখ করা হয়।[২]

৩. তৃতীয় ধরণের অর্থঃ মুসনাদ শব্দটি সনদের সমার্থবোধক। তখন মুসনাদ শব্দটিকে (مصدر ميمى) বলে গণ্য করতে হবে। [৩]

মুসনিদ (المُسْنِد) :

আভিধানিক অর্থ :

এটি ইসমে ফায়েলের সীগা অর্থাৎ সনদ সংযুক্তকারী, প্রমাণ সংযুক্তকারী।

পারিভাষিক অর্থ :

مَن يروي الحديثَ بسنده سواءً كان عندَه علمٌ به أم ليْسَ له إلاّ مجرّد روايَة

যিনি সনদসহ হাদীস বর্ণনা করেন তাকে মুসনিদ বলা হয়। হাদীস ও সনদ সম্পর্কে তার জ্ঞান থাক বা না থাক।[৪] অবশ্য মুসনিদ শব্দটি নির্ভরযোগ্যতার অর্থ জ্ঞাপকরূপে মুহাদ্দিসগণের বিশেষ উপাধি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

সনদে আলী : রাসূল সা. পর্যন্ত পৌছতে ক্রমধারায় বর্ণিত সনদ যদি সংক্ষিপ্ত হয় তাহলে তাকে 'সনদে আলী' বা উঁচু দরজার সনদ বলা হয়। অতএব যে সংগ্রহকারী যত কম মধ্যস্থতায় রাসূল সা. থেকে হাদীস সংগ্রহ করবেন তার সনদ তত আলী বা উঁচু বলে গণ্য হবে।

সনদে নাযিল : রাসূল সা. পর্যন্ত পৌছতে সনদের ক্রমধারা দীর্ঘ হলে তাকে 'সনদে নাযিল' বা সাফেল বলে।

অতএব কোন সংগ্রহকারীর সনদের ক্রমধারায় রাবীগণের সংখ্যা যত কম হবে তার সনদ তত আলী হবে। আর যার সনদের ক্রমধারায় রাবীর সংখ্যা যত বেশী হবে তার সনদ তত নাযিল হবে। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সনদ আলী বা নাযিল হওয়ার বিয়য়টি সম্পূর্ণ অপাক্ষিক।

মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস্সুনান -পৃঃ ২৬

তাইসীরু মুসাতলাহিল হাদীস - পৃঃ ১৭

তাইসীরু মুসাতলাহিল হাদীস - পৃঃ ১৭

তাইসীরু মুসাতলাহিল হাদীস - পৃঃ ১৭

কেননা যিনি চারজন বর্ণনাকারীর মধ্যস্থতায় রাসূল সা. পর্যন্ত পৌছবেন তার সনদ পাঁচ জনের মধ্যস্থতায় আহরণকারীর তুলনায় আলী হবে; আবার তিন জনের মধ্যস্থতায় আহরণকারীর তুলনায় নাযিল হবে।

মতন (المتن)

আভিধানিক অর্থ :

মতন শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল: শক্ত, মজবুত, ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের উঁচু অংশ, শক্ত অংশ। মানুষের পৃষ্ঠদেশকেও মতন (المتن) বলা হয়। কেননা পৃষ্ঠদেশকে শক্তির উৎস মনে করা হয়।

কোন ভাষ্যগ্রন্থের মূল বক্তব্যকেও মতন বলা হয়। কেননা সেটুকুই গ্রন্থের মূলকথা বা শক্তিশালী অংশ। আর তার ব্যাখ্যা হিসাবে যা উল্লেখ করা হয় তাকে শরাহ বলা হয়। যেহেতু একটি হাদীসের সনদ বর্ণনার পর যে বক্তব্যটুকু উল্লেখ করা হয় তাই হাদীসের মূল বক্তব্য; সে কারণেই তাকে মতন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : مَا انتَهى إليهِ السَّند

অর্থাৎ সনদ যেখানে গিয়ে শেষ হয় তার পরবর্তী অংশকে মতন বলে।[১]

সনদ ও মতন মিলেই একটি পূর্ণাঙ্গ হাদীস হয়। একই মতন কয়েক সনদে বর্ণিত হলে প্রত্যেক সনদের প্রেক্ষিতে তাকে এক একটি ভিন্ন হাদীস বলে গণ্য করা হবে, না সব সনদে বর্ণিত হাদীসকে সম্মিলিতভাবে একটি হাদীস মনে করা হবে এ ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে, একটি হাদীস বহু সনদে বর্ণিত হলেও সবগুলো সম্মিলিতভাবে একটি হাদীস বলে গণ্য হবে। তবে এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত এই যে, একই মতন যত সনদেই বর্ণিত হোক প্রত্যেকটি একটি পৃথক হাদীস বলে গণ্য হবে।

রাবী (الراوي)

আভিধানিক অর্থ :

راوي শব্দটি (روى) শব্দ থেকে উদ্ভূত ইসমে ফায়েলের সীগাহ। এর মূল অর্থ হল ভূমিকে পানি দ্বারা সিক্ত করা, পানি সরবরাহ করা, পানি সিঞ্চন করা, পিপাসা নিবারণ করা। তাই রাবীর অর্থ হল পানি সরবরাহকারী, পিপাসা নিবারণকারী। যেহেতু কোন বিষয়ের বর্ণনা দানকারীরাও শ্রোতাদের ঔৎসৌক্য জনিত পিপাসা

---

[১] তারীখে ইলমে হাদীস- মুফতী আমীমুল ইহসান কৃত - পৃ: ৯

নিবারণ করেন, তাই পরবর্তী ব্যবহারে (راوي) শব্দটি বর্ণনাকারীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবহারে রাবী শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ণনাকারী, বিবরণ দাতা, কাহিনীকার ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে এই শেষোক্ত অর্থের প্রেক্ষিতেই রাবী হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। তবে ইলমে হাদীসের পরিভাষায় যারা কেবলমাত্র রাসূল সা. সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনদের কথা, কাজ ও অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়াদী বর্ণনা করেন তাদেরকেই রাবী বলা হয়। অন্য কারো কাছ থেকে কোন কিছু বর্ণনা করলে তাকে সাধারণত: রাবী বলা হয় না।[১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

هُوالذي ينْقلُ الحديثَ بإسناده سواءٌ كان رجلاً ام امرأةً .

যিনি সূত্রসহ হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী বলা হয়; তিনি পুরুষ কিংবা নারী যেই হোক না কেন।[২]

কোন কোন মুহাদ্দিস রাবীর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে,

هوَ الذي يرْوي الحدِيثَ بسَنده مَعَ رِعَايَة القَوَاعد سَوَاءٌ كَانَ عندَه علمٌ به أمْ لَا –

অর্থাৎ যিনি সনদসহ হাদীস বর্ণনার যথাপদ্ধতি অনুসরণ করে হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী বলে। বর্ণিত বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য থাক বা না থাক।

অর্থাৎ যিনি কোন উস্তাদ থেকে ইজাযত বা অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতিসমূহের যে কোন এক পদ্ধতিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে হাদীস বর্ণনা করেন এবং যে ধরণের অনুমতির ক্ষেত্রে যে ধরণের শব্দ ব্যবহার করার প্রচলন মুহাদ্দিসগণের রয়েছে সে ক্ষেত্রে সে ধরণের শব্দাবলী প্রয়োগ করেই হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী বলা হবে। হাদীসের ব্যাপারে তার পাণ্ডিত্য থাক বা না থাক।

রিওয়ায়াহ (الرِّوَايَة)

আভিধানিক অর্থ :

রিওয়ায়াহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল: কোন ঘটনার বিবরণ, বর্ণনা, কাহিনী ইত্যাদি। বস্তুত হাদীসের বর্ণনাকারীগণও রাসূল সা., সাহাবায়ে কিরাম কিংবা তাবেঈনদের কথা, কাজ, অথবা অনুমোদনের খণ্ড খণ্ড বর্ণনা পেশ করে থাকেন। এ হিসাবেই তাদের বর্ণিত বিষয়কে 'রিওয়ায়াহ' বলা হয়ে থাকে।

---

[১] আলী মুহাম্মদ নসর কৃত আন্ নাহজুল হাদীস পৃ: ২২

[২] সুবহী আস-সালেহ কৃত: উলূমুল হাদীস - পৃ: ১০৬

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

سردُ الحَديث بأصُول مُسلَّمة وَ بألفَاظ مُستَعْمَلَة لِروَايَة الْحَديْث.

হাদীস বর্ণনার জন্য নির্ধারিত নিয়ম-কানূন ও শব্দাবলী ব্যবহার করে সনদ ও মতন বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াহ বলা হয়।[১]

অর্থাৎ হাদীস আহরণের যে কোন পন্থায় হাদীস আহরণ করার পর অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে; যেধরণের আহরণ পদ্ধতির জন্য যেধরণের শব্দ (যেমন : قرأة عليه وَأنا أسمَعُ، أخبَرَنَا حَدَّثَنَا ইত্যাদি) ব্যবহার করা বিধিসম্মত, সেই মুতাবিক হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াহ বলা হয়। তবে রাসূল সা. সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে বর্ণিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই রিওয়ায়াহ শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অবশ্য কোন কোন সময় হাদীসকেও রিওয়ায়াহ বলা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে যে 'এ সম্পর্কে একটি রিওয়ায়াত আছে'।

মরফূ' (المَرفُوع)

আভিধানিক অর্থ :

মরফূ' মূলত رَفَعَ- يَرْفَعُ থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। এর অর্থ কোন জিনিষকে উর্ধ্বে উত্তোলন করা, উপরে উঠানো। সুতরাং মরফূ' শব্দের অর্থ হবে উর্ধ্বে উত্তোলিত বা স্থাপিত। যে হাদীসের সম্পর্ক রাসূল সা. এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের সাথে, সেগুলিকে মরফূ বলে এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, হাদীসটির সম্পর্ক এমন এক সত্তার সাথে স্থাপন করা হয়েছে যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ফলে হাদীসটি মর্যাদার দিক থেকে অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে কিংবা হাদীসটি সর্বোচ্চ অধিষ্ঠানে পৌঁছে গেছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

مَا أضِيفَ إلى النبيّ صلى الله عليه وَسَلَّم مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ أو تَقْرِيرٍ أو صِفَة.

যে বর্ণনার সম্পর্ক রাসূল সা.-এর কথা, কাজ, অনুমোদন কিংবা তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে তাকে হাদীসে মরফূ' বলা হয়।[২]

অর্থাৎ রাসূল সা.-এর সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বর্ণনা- সেটি তাঁর বক্তব্য সম্পর্কিত হোক, বা কর্ম ও আচরণ সম্পর্কিত হোক, কিংবা তার অনুমোদন সম্পর্কিত হোক, অথবা তাঁর গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কিত হোক:

---

[১] গ্রন্থকার।

[২] তাইসীরু মুসতালহিল হাদীস- পৃ: ১২৮-১২৯।

আর এর বর্ণনাকারী কোন সাহাবী হোক, কিংবা তাঁদের পরবর্তী কোন ব্যক্তি হোক; বর্ণনাসূত্র বিচ্ছিন্ন হোক বা অবিচ্ছিন্ন হোক; মোট কথায় রাসূল সা. সম্পর্কিত সকল বর্ণনাকেই মরফূ' বলা হয়। এই সংজ্ঞানুসারে সহীহ, হাসান, যয়ীফ, মুত্তাসিল, মুনকাতে', মুরসাল, মুআ'ল্লাক সবই মরফূ'র অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। খারাসানী ফিকাহবিদরা হাদীসে মরফূ'কে "খবর" নামেও অভিহিত করে থাকেন।[১]

কোন কোন হাদীসের সূত্রকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে বর্ণনাকারী বলেন : – رواية ينميه – يبلغ به – يرفع الحديث। বস্তুত সাহাবীর পরে এ ধরণের শব্দ উল্লেখ থাকলে তাও সরাসরি মরফূ' হাদীস বলে গণ্য হবে। ইবনুস সালাহ এরূপই উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীসে এ ধরণের হাদীস حكما مرفوع -এর অন্তর্ভূক্ত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

মরফূ-এর প্রকারভেদ :

১. مرفوع قولي অর্থাৎ রাসূল সা.- এর বক্তব্য সম্পর্কিত বর্ণনা। যেমনঃ কোন সাহাবী বা অন্য কেউ বলবেন যে, রাসূল সা. এরূপ বলেছেন।

২. مرفوع فعلي অর্থাৎ রাসূল সা.-এর কর্ম সম্পর্কিত বিবরণ। যেমনঃ কোন সাহাবী বা অন্য কেউ বলবেন যে, রাসূল সা. এরূপ করেছেন।

৩. مرفوع تقريري অর্থাৎ রাসূল সা.- এর মৌন অনুমোদন সম্পর্কিত বর্ণনা। যেমনঃ কোন সাহাবী বা অন্য কেউ বলবেন যে, রাসূল সা. এর সম্মুখে এরূপ করা হয়েছে। কিন্তু এর পরে রাসূল সা. এর অস্বীকৃতি সম্পর্কিত কোন কিছু উল্লেখ থাকবে না।

৪. مرفوع وصفي রাসূল সা.-এর গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী সংক্রান্ত বর্ণনা। যেমনঃ কোন সাহাবী বা অন্য কেউ বলবেন যে, রাসূল সা. এমন ছিলেন।

* মরফূ' হাদীসের হুকুম :

মরফূ'র সংজ্ঞা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুত্তাসিল, মুনকাতে, মুরসাল, মু'আল্লাক সবধরণের হাদীসই মরফূ'র অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। সুতরাং কোন হাদীস মরফূ' হলেই তা হুজ্জত বা প্রামাণিক ভিত্তি বলে গণ্য হবে না।

কিন্তু যদি কোন মরফূ' হাদীস সহীহ বা হাসান স্তরের হয় এবং অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়, তাহলে তা শরীয়তের হুজ্জত বা প্রামাণিক ভিত্তি বলে গণ্য হবে। আর

---

১. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস- পৃ: ১৩১।
২. তাইসীরু মুসাতলাহিল হাদীস- পৃ: ১৩২ - ১৩৩।

যদি যয়ীফ হয় এবং যয়ীফ হাদীস প্রমাণযোগ্য হওয়ার যে সব শর্ত-শারায়েত রয়েছে তা তাতে বিদ্যমান থাকে, তাহলেও তা প্রামাণিক ভিত্তি রূপে গণ্য হবে। যে সব হাদীস সূত্রের বিচারে মওকূফ অথচ হুকমান মরফূ'; তার বিধানও মরফূ'র বিধানের অনুরূপ হবে।

* যদি অন্য কোন কওলী বর্ণনা না থাকে তাহলে মরফূ' ফেইলী হাদীস দ্বারা কোন বিষয় ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হয় না।[১]

মওকূফ (الموقوف)

আভিধানিক অর্থ :

মওকূফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল থেমে যাওয়া, স্থির থাকা, বিরতি দেওয়া ইত্যাদি। এটি باب ضرب -এর ইসমে মাফউলের সীগাহ।

সাহাবীর কথা, কাজ ও অনুমোদন সংক্রান্ত বর্ণনাকে এ জন্য মওকূফ বলা হয় যে, বর্ণনাকারী যেন সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেলেন, সামনে অগ্রসর হলেন না।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ما اضِيفَ إلى الصحابي من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ

যে বর্ণনা সাহাবীর কথা, কাজ ও অনুমোদনের সাথে সম্পর্কিত তাকে মওকূফ বলে।[২]

অর্থাৎ যে বর্ণনার সম্পর্ক সাহাবীর সঙ্গে; তা সাহাবীর বক্তব্য সম্পর্কিতই হোক বা তাঁর কর্ম ও আচরণ সংক্রান্তই হোক কিংবা তাঁর অনুমোদন সংক্রান্তই হোক; সেই বর্ণনা বিচ্ছিন্ন সূত্রেই বর্ণিত হোক কিংবা অবিচ্ছিন্ন সূত্রেই বর্ণিত হোক সবই হাদীসে মওকূফ বলে গণ্য হবে।

মওকূফের প্রকারভেদ :

১. موقوف قولي সাহাবীর বক্তব্য সম্পর্কিত বর্ণনা। যেমনঃ কোন বর্ণনাকারী বলবেন, হযরত আলী রা. বলেছেনঃ

حدّثوا الناسَ بِمَا يعرفون، أتريدون أن يكذّب الله ورسوله

মানুষের সঙ্গে কথা বলতে তাদের বোধের নিরিখে কথা বলো। তোমরা কি চাও যে লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন করুক।[৩]

---

১ কাওয়ায়েদ লি উলূমিল হাদীস।

২ তাইসীর মুসতালাহিল হাদীস- পৃঃ ১৩০।

৩ বুখারী শরীফ।

২. موقوف فعلي সাহাবীর কর্ম সম্পর্কিত বর্ণনা। যেমন ইমাম বুখারী বলেছেন:

وأَمَّ إبن عباس وهو متيمّم

ইবনে আব্বাস রা. তায়াম্মুমকৃত অবস্থায় ইমামতি করেছেন।[১]

৩. موقوف تقريري সাহাবীর মৌন অনুমোদন সংক্রান্ত বর্ণনা। যেমন: কোন তাবেঈ বললেন যে : فعَلتُ كذا أمامَ ابنِ عبّاسٍ ولم يُنكِرْ عَليَّ

আমি ইবনে আব্বাসের সম্মুখে অমুক কাজটি করেছি; তিনি আমার কাজে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি।

মওকূফ শব্দটি কোন কোন সময় সাহাবী ছাড়া অন্যদের যেমন: তাবেঈ, তাবয়ে তাবেঈদের সাথে সংশ্লিষ্ট বর্ণনার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে তা সাধারণভাবে নয় বরং বর্ণনা সাপেক্ষে। যেমন বলা হল -

هذَا حَديثٌ وَقفه فلانٌ عَلى الزّهريِّ أو عَلى عَطاء

এই হাদীসটিকে অমুক বর্ণনাকারী যুহরীর কিংবা ‘আতার উপর মওকূফ করে বর্ণনা করেছেন।

মওকূফ হাদীস বিভিন্ন কারণে মরফূ’ বলে গণ্য হয়

মওকূফ হাদীসের বেশ কিছু এমন রয়েছে যা শাব্দিক ও বর্ণনাসূত্রের বিচারে মওকূফের শ্রেণীভুক্ত হলেও তার বাস্তবতা নিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই বোধগম্য হয়ে যায় যে, হাদীসটি মরফূ’ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। একারণে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এধরণের মওকূফ হাদীসকে مرفوع حكمًا বা ‘মরফূ’র পর্যায়ভুক্ত’ বলে নামকরণ করেছেন। অর্থাৎ শাব্দিকভাবে এগুলো মওকূফ হলেও বিধানগত দিক বিচারে এগুলো মরফূ’-এর পর্যায়ভুক্ত। অতএব মরফূ’ হাদীসের উপর প্রযোজ্য বিধি-বিধান এ ধরণের মওকূফ হাদীসের উপর প্রযোজ্য হবে।

مرفوع حكما বা মরফূ’র পর্যায়ভুক্ত হাদীসসমূহকেও তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

১. مرفوع قولي বেশ কিছু বিষয় এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। যেমন :

ক. যে সাহাবী আহলে কিতাব থেকে কোন বর্ণনা আহরণ করেছেন বলে জানা যায় না, তিনি যদি এমন কোন বিষয় বর্ণনা করেন, যাতে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই এবং তা যদি আভিধানিক বিশ্লেষণ বা দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত না হয়, তাহলে তার এই ধরণের বর্ণনাকে মরফূ’র পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে। যেমন:

---

[১] বুখারী কিতাবুত-তায়াম্মুম।

* তিনি যদি অতীতের কোন বিষয়ের বর্ণনা পেশ করেন। যেমনঃ সৃষ্টির সূচনা সংক্রান্ত কোন আলোচনা পেশ করলেন।
* তিনি যদি ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কোন বিষয়ের বর্ণনা পেশ করেন। যেমন: কিয়ামতের পূর্বেকার ফিতনা-ফাসাদ, সংঘাত-সংঘর্ষ ও ভয়ংকরতার বর্ণনা পেশ করলেন।
* কিংবা তিনি যদি কোন কাজের নির্ধারিত সাওয়াব বা নির্ধারিত শাস্তির কথা বর্ণনা করেন।

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরাম দ্বীন ও শরীয়ত সংক্রান্ত কোন কথা ইসরাঈলী বিবরণ থেকে আহরণ করতেন না। তবে অতীতের ইতিহাস কিসসা কিংবা কাহিনী সংক্রান্ত বিষয় হলে তা ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে আহরণ করতেন। তাই দ্বীন ও শরয়ী বিধি-বিধান সম্পর্কে যদি তারা এমন কোন কথা বর্ণনা করেন যা কিয়াস বা যুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবন করা সম্ভব নয় তাহলে সেগুলো নিঃসন্দেহে حكما مرفوع বলে গণ্য হবে।

খ. কোন সাহাবী যদি বলেন যে, তাঁরা রাসূল সা.-এর যুগে এরূপ বলতেন।

গ. কিংবা তিনি যদি বলেন যে, আমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন- হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে :

أمرَ بِلاَلٌ أن يشفعَ الآذانَ ويؤترَ الإقامةَ - متفق عليه

বেলালকে আযানের শব্দগুলো দু'বার দু'বার করে এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার একবার করে বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘ. বা আমাদেরকে এ মর্মে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন- উম্মে আতিয়্যাহ বলেন:

نُهينا عَن اتّباعِ الجنائزِ وَلَم يعزم عَلينَا - متفق عليه

আমাদেরকে জানাযার পিছনে পিছনে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এটা অবশ্য অনুসরণীয় পর্যায়ের বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ঙ. বা কোন সাহাবী যদি বলেন, এ কাজটি সুন্নত من السنة كذا। যেমন- হযরত আলী রা. বলেন : مِنَ السُّنَّة وضعُ الكفِّ عَلى الكَفِّ تَحْتَ السرَّة ـــ أبو داؤد
নামাযে এক হাত আরেক হাতের উপর স্থাপন করে নাভির নিচে বাঁধা সুন্নত।

চ. কিংবা যদি তিনি কুরআনের কোন আয়তের শানে নুযূল সম্পর্কে কোন বর্ণনা পেশ করেন। যাতে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। তাহলে এগুলো সবই حكما مرفوع قولي বলে গণ্য হবে।

২. مرفوع فعلي - যেমন: সাহাবী যদি এমন কোন কাজ করেন যাতে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। তাহলে তা حكما مرفوع فعلي বলে গণ্য হবে।

* কিংবা যদি সাহাবী বলেন যে, আমরা নবী কারীম সা.-এর যামানায় এরূপ করতাম। যেমন হযরত জাবের বলেন যে -

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -بخارى و مسلم

আমরা নবী কারীম সা.-এর যুগে আযল বা যোনীর বাহিরে বীর্যস্খলন করতাম। এ ধরণের ক্ষেত্রে যদি বিষয়টিকে রাসূল সা.-এর যামানার দিকে নিসবত করে উল্লেখ করা হয় তাহলেই সেটি মরফূ'র পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি বিষয়টি রাসূলের যামানার সাথে সংশ্লিষ্ট না করে উল্লেখ করা হয়; যেমন হযরত জাবের রা. বলেন: كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا- بخارى তাহলে সেটি সকলের মতেই মওকূফ বলে গণ্য হবে।

৩. مرفوع تقريري যেমন :

* কোন সাহাবী যদি বলেন যে, সাহাবীগণ নবী কারীম সা.-এর যুগে এরূপ করতেন।

* কিংবা যদি কোন বিষয়ের ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করেন যে, নবী কারীম সা. -এর যুগে এরূপ করতে আমরা কোন অসুবিধা মনে করতাম না।

* কিংবা যদি এরূপ মন্তব্য করেন যে, আমরা এরূপ করতাম অথচ তিনি আমাদের সামনেই ছিলেন কিংবা আমাদের মাঝেই ছিলেন। তাহলে এধরণের বর্ণনা حكما مرفوع বলে গণ্য হবে।

মওকূফ হাদীস প্রমাণযোগ্য কিনা?

কোন সাহাবীর কথা কিংবা কাজ যদি অন্যান্য সাহাবীগণ অনুমোদন করেন তাহলে তা শরয়ী প্রমাণ বলে গণ্য হবে। কেননা তখন এটি সাহাবীগণের সুস্পষ্ট ইজমা الإجماع الصريح অথবা নিরবতা জনিত ইজমা الإجماع السكوتي বলে গণ্য হবে।

আর যদি কোন বিষয়ের ব্যাপারে সাহাবীগণের মাঝে দ্বিমত থাকে তাহলে তাদের মাঝে যদি কারো বক্তব্য এমন পাওয়া যায়- যা কিয়াস দ্বারা উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়, তাহলে তাঁর বক্তব্যও সর্বসম্মতভাবে শরয়ী প্রমাণ বলে গণ্য হবে। তবে এ ক্ষেত্রে অনেকেই এরূপ শর্তারোপ করেছেন যে, সেই সাহাবীকে অবশ্যই এমন ব্যক্তি হতে হবে যিনি ইসরাঈলী রিওয়ায়াত গ্রহণ করেন না।

আর যদি সাহাবীর বক্তব্যটি এমন হয়, যাতে সেটি তাঁর ইজতিহাদ বা নিজস্ব মতামত হওয়ার অবকাশ আছে, তাহলে তা শরয়ী প্রমাণ হওয়ার ব্যাপারে

হানাফী ঈমামগণের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম কারখী রহ. সহ বেশ কিছু হানাফী মতাবলম্বী পন্ডিত ব্যক্তির অভিমত এই যে, এ ধরণের বক্তব্য শরয়ী প্রমাণ বলে গণ্য হবে না। কাজী আবু যায়েদ দাবুসী রহ. এর অভিমতও অনুরূপ।[১]

তবে আল্লামা ফখরুল ইসলাম বয্দবী রাহ.-এর অভিমত এই যে, সাহাবীগণের বক্তব্য কিয়াসের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তা অন্যদের কিয়াসের চেয়ে প্রাধান্য পাবে। এটি আবু সাঈদ বারদাঈরও অভিমত। আর হানাফীদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত মূলত এটিই।

কিন্তু যদি কোন সাহাবীর বক্তব্যের পরিপন্থী কোন মরফূ' হাদীস বিদ্যমান থাকে তাহলে তা সর্বসম্মত ভাবেই শরয়ী প্রমাণ বলে গণ্য হবে না।[২]

তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী রহ.[৩] এবং ইমাম শাতবী মালেকী রহ.[৪] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ.[৫] এর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সাহাবীগণের ফত্ওয়ার উপর আমল করা সর্বসম্মত একটি বিষয়।

এছাড়া আল্লামা আবু-যাহরাহ সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন[৬] যে, সাহাবায়ে কিরামের ফত্ওয়ার উপর আমল করা চার মাজহাবের ইমামগণের সর্বসম্মত মত।

সুতরাং হাদীসে মওকূফ শরয়ী প্রমাণ বলে গণ্য হবে, যদি গ্রহণযোগ্য হওয়ার অন্যান্য শর্ত তাতে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ যদি তার সূত্র নির্ভরযোগ্য হয় এবং অন্য কোন জটিলতা তাতে বিদ্যমান না থাকে।

মক্তূ' (المقطوع)

আভিধানিক অর্থ :

মক্তূ' শব্দটি বাবে فتح থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ; যার অর্থ কর্তিত, বিচ্ছিন্ন। তাবেয়ী ও তৎপরবর্তীদের কথা রাসূল সা.-এর সাথে সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত নয়; তাই এগুলো যেন বিচ্ছিন্ন বক্তব্য। এ জন্যই এ ধরণের বক্তব্যকে মক্তূ' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

---

১ তাসীস - ৩০
২ যফরুল আমানী - ১৮২ ও ফত্হুল মুগীস-৫৩
৩ আর-রিসালাহ - ৮১-৮২, কিতাবুল উম্ম খ: ৭: ২৪৬
৪ আল্-মুওয়াফাকাত - খ: পৃ: ৭৪-৮০
৫ এলামুল মুওয়াক্কেয়ীন - খ: ১ পৃ: ২১।
৬ উসূলুল ফিক্হ- পৃ: ২০৩-২০৮

পারিভাষিক সংজ্ঞা : هُو مَا أضِيفَ إلى التابِعِيّ أو إلى مَن دُونَــه مِن قَولٍ أو فعلٍ
;য কথা ও কাজের বিবরণ কোন তাবেঈ বা তৎপরবর্তী ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত তাকে মকতূ' বলে। [১]

মনেকেই শুধুমাত্র তাবেঈর কথা কাজের বিবরণকেই হাদীসে মকতূ' বলেছেন। তৎপরবর্তীদের কথা ও কাজের বিবরণকে মকতূ'র অন্তর্ভুক্ত করেননি।

মনেকেই আবার মকতূ' শব্দটি মুনকাতে' হাদীসের উপরও ব্যবহার করেছেন। যমন ইমাম শাফেয়ী রাহ. তাবরানী রাহ. এর বক্তব্যে এরূপ লক্ষ্য করা যায়।[২]

তবে এ'দুটি পারিভাষিক শব্দের মাঝে যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই বাধগম্য। কেননা মকতূ'র সম্পর্ক মতনের সাথে; আর মুনকাতে'র সম্পর্ক নদের সাথে। কেননা মকতূ' বলা হয় তাবেঈর কথা কাজের বিবরণকে; আর নকাতে' বলা হয় এমন সনদকে যা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ধারাবাহিক নয়।

কতূ'র প্রকার ও উদাহরণ :

. قولي যেমন বিদ'আতীর পিছনে নামায আদায় সম্পর্কে হাসান বসরী রহ. বলেন-

صلِّ عَليه بدعَتُهُ নামায আদায় কর, তার বিদ্আতের পাপ তার উপরই বর্তাবে।[৩]

. فعلي যেমন ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল মুনতাশির বলেন-

كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم

সরুক তার ও তার পরিবারের লোকদের মাঝে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিতেন এবং মাযে নিরত হতেন। আর তারা তাদের দুনিয়াদারী নিয়ে লিপ্ত থাকতেন।[৪]

কতূ'র হুকুম :

তাবেঈ যদি এমন বয়োবৃদ্ধ হন যার ফত্ওয়া সাহাবীগণের যুগে প্রকাশিত হয়েছে, তাহলে তার কথা আমাদের হানাফীদের নিকট সাহাবীদের কথার ন্যায়ই হুজ্জত বা রয়ী প্রমাণ বলে গণ্য হবে।[৫] ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এ'লামুল মুয়াক্কেয়ীন গ্রন্থে ল্লেখ করেছেন যে, কোন কোন শাফেয়ী ও হাম্বলী ইমামেরও এরূপ অভিমত য়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, ইমামগণ ও তাঁদের পরবর্তীদের কিতাবাদী য়ে ঘাটাঘাটি করলে দেখা যাবে যে, তারা তাবেঈদের ব্যাখ্যা দ্বারা বিস্তর ক্ষেত্রে মাণ পেশ করেছেন।

তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস - ১৩৩
দুরারুস-সামিনাহ - ১০১
বুখারী ১ম খন্ড পৃ: ১৫৭
হিলয়াতুল আওলিয়া খ: ২ পৃ: ৯৬
তাওযীহ

যফর আহমদ উসমানী রহ. অবশ্য বলতে চেয়েছেন, কেবল বয়সের দিক থেকে বয়োজেষ্ঠতাই এর মূলভিত্তি নয় বরং জ্ঞান-গরিমার দিক থেকে জেষ্ঠ হলেও তার কথা শরয়ী প্রমাণ বলে গণ্য হবে। যেমন ইব্রাহীম নাখয়ীর কোন কথা, যদি তা নবী ও সাহাবী থেকে বর্ণিত কোন রিওয়ায়াতের পরিপন্থী না হয়, তাহলে তা আমাদের নিকট শরয়ী প্রমাণ বলে গণ্য হয়ে থাকে। যদিও তিনি বয়সের দিক থেকে বড়দের পর্যায়ভুক্ত নন; কিন্তু ফিক্হ ও পাণ্ডিত্যের বিবেচনায় ইমাম আবু হানীফার দৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত বড় মাপের ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি আওযায়ী বলেছেন, ইব্রাহীম সালেমের চেয়েও অধিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।[১]

বয়োজেষ্ঠ না হলে অথবা বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী না হলে সাধরণভাবে তাবেঈনদের কথাকে শরয়ী প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হয় না। বরং তা একজন সাধারণ ইমাম বা পণ্ডিতজনের কথা বা কাজের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়। কিন্তু যদি তাদের কথার সাথে এমন কোন ইশারা-ইঙ্গিত থাকে যা দ্বারা তার বক্তব্যটি রাসূল সা. থেকে আহরিত এমন বুঝা যায়, তাহলে তা শরয়ী প্রমাণ বলে গণ্য হবে- যদি গ্রহণীয়তার অন্যান্য শর্ত তাতে বিদ্যমান থাকে। যেমনঃ কোন কোন বর্ণনাকারী তাবেঈর বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর এরূপ মন্তব্য জুড়ে দেন যে, (كان يرفعه) তিনি এটি রাসূল পর্যন্ত পৌঁছাতেন। তাহলে তখন সেটি 'মরফূ মুরসাল' হাদীসের পর্যায়ভুক্ত হবে।[২] আর মুরসাল হাদীস শরয়ী প্রমাণ হওয়ার যোগ্য কি না তা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

হাদীসে কুদ্সী

আভিধানিক অর্থ :

কুদ্সী শব্দটি কুদ্স (قدس) শব্দের সাথে 'ي' নিস্বতীর সংযোগে গঠিত। কুদ্স শব্দটির অর্থ পূত-পবিত্র, কলুষতাবর্জিত, অপবিত্রতামুক্ত। মহান আল্লাহ তা'আলার দিকে নিসবত করে যেসব কথা ব্যক্ত করা হয় সে গুলোকে এজন্যই হাদীসে কুদ্সী বলা হয় যে, সেগুলোর সম্পর্ক এমন এক সত্ত্বার সাথে যিনি পবিত্র সত্ত্বা ذات قدسيّة। অতএব হাদীসে কুদ্সীর অর্থ হল পবিত্র সত্ত্বার কথা।[৩]

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

الحَديثُ الذي يَروِيْه النبيّ صـــ عَلى أنّه مِن كَلامِ الله

নবী কারীম সা. যে সব হাদীস আল্লাহর কালাম হিসাবে বর্ণনা করেছেন সে গুলোকে হাদীসে কুদ্সী বলা হয়।

---

[১] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস - ৮১।

[২] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ১৩৪।

[৩] আল-আহাদীসুর কুদ্সীয়্যাহ- পৃ: ৫।

অর্থাৎ আল্লাহর দিকে নিসবত করে রাসূল সা. কর্তৃক বর্ণিত যে সকল বর্ণনা সংকলক পর্যন্ত সূত্র পরম্পরায় পৌঁছেছে সেগুলোকে হাদীসে কুদ্সী বলে।[১] হাদীসে কুদসীকে হাদীসে রাব্বানী ও হাদীসে ইলাহীও বলা হয়[২]। বুখারী রহ. তাঁর সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন যে, قال الله تعالى : أنا عِندَ ظَنِّ عَبدِي بِي মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি তারই কাছাকাছি অবস্থান করি'।[৩]

সাধারণত: হাদীসে কুদ্সী বর্ণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

١. قال رسول الله صــ فيما يرويه عن ربه عزّ وجلّ

٢. قال رسول الله صــ قال الله عزّ و جلّ

٣. قال رسول الله صــ يقول الله عزّ وجلّ

٤. قال رسول الله صــ قال ربّى عزّ و جلّ

٥. قال رسول الله صــ قال ربّى عزّ و جلّ بواسطة جبرائيل

٦. قال رسول الله صــ قال جبرائيلُ عن ربى عزّ وجلّ

কুরআন ও হাদীসে কুদ্সীর মাঝে পার্থক্য:

উল্লেখ্য যে, হাদীসে কুদ্সী আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য হলেও কোন অবস্থাতেই একে পবিত্র কুরআন বা তার সমতুল্য মনে করা যাবে না। কুরআন ও হাদীসে কুদ্সীর মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হল :

১. কুরআনের ভাব ও ভাষা দুটোই আল্লাহর। কিন্তু হাদীসে কুদ্সীর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত হলেও বর্ণনার ভাষা রাসুল সা.-এর নিজের।[৪] যদিও তিনি আল্লাহর ভাষ্যেই তা বর্ণনা করেন না কেন।
২. কুরআন নামাযে তিলাওয়াত করা হয়, আর হাদীসে কুদ্সী নামাযে তিলাওয়াত করা হয় না।
৩. কুরআন তিলাওয়াত নিজেই একটি ইবাদত। কিন্তু হাদীসে কুদ্সীর তিলাওয়াত ইবাদত নয়।

---

১ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস- পৃ:১২৭।
২ উলূমুল হাদীস সুবহী সালেহকৃত পৃ: ১২৩।
৩ বুখারী -
৪ উলূমুল হাদীস- পৃ: ১২৪।

৪. অযু বিহীন কুরআন স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু হাদীসে কুদ্সী স্পর্শ করার জন্য অযু থাকার শর্ত নেই।

৫. কুরআন দ্বিধাহীন, সংশয়মুক্ত, নিশ্চিত প্রামাণিক ভিত্তি। কেননা তার প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। অথচ হাদীসে কুদ্সীর প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার বিষয়টি দ্বিধাহীন, সংশয়মুক্ত, নিশ্চিত বিষয় নয়। কেননা তার অধিকাংশই খবরে ওয়াহেদ -এর পর্যায়ভুক্ত।[১]

৬. কেউ কুরআনের কোন একটি আয়াতকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়। কিন্তু হাদীসে কুদ্সীর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যায় না; তাকে ফাসেক বলা হয়।

৭. কুরআন কালামুল্লাহ কাদীম (অনাদি-অনন্ত)। কিন্তু হাদীসে কুদ্সী কাদীম (অনাদি -অনন্ত) নয়।[২]

হাদীস ও হাদীসে কুদ্সীর মাঝে পার্থক্য :

বস্তুতঃ হাদীস ও হাদীসে কুদ্সী দু'টোরই ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল সা.-এর কাছে সরাসরি ইলহাম, ইলকা, স্বপ্নের মাধ্যমে কিংবা জিব্রাঈলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। কেননা কুরআনে কারীমে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ○ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ○

কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাব প্রাপ্ত হয়ে যে হাদীসকে রাসূল সা. নিজের ভাষায় সরাসরি আল্লাহর ভাষ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে হাদীসে কুদ্সী বলা হয়। আর যে হাদীসকে রাসূল সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের ভাষায় নিজের বক্তব্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে হাদীস বলা হয়।[৩]

মুসালসাল (المسلسل)

আভিধানিক অর্থ :

মুসালসাল শব্দটি سلسلة মূলধাতু থেকে গঠিত ইস্‌মে মাফউলের সীগাহ। যার অর্থ অবিরত, ধারাবাহিক, অনবরত ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

وَهُوَ ما تَتابَعَ فيهِ رجالُ الإسنادِ إلى رسولِ اللهِ صــ عندَ روايتِه عَلى حَالَة وَاحِدَة

---

১ আল বা'সুল ইসলামী পত্রিকা এপ্রিল- ১৯৯৩ ইং পৃ: ৬৩।

২ উলূমুল হাদীস পৃ: ১২৫ ও কাওয়ায়েদুত্-তাহদীস পৃ: ৬৪-৬৬।

৩ -গ্রন্থকার

এমন হাদীসকে মুসালসাল বলা হয় যার সূত্রে উল্লিখিত রাসূল সা. পর্যন্ত সকল বর্ণনাকারী হাদীসটি বর্ণনার সময় একই অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন।[১] এর তিনটি প্রকার রয়েছে। যথা:

১. مسلسل قولي অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকেই একই শব্দ ব্যবহার করে সূত্রটি উল্লেখ করেছেন। যেমন:

– سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول –

কিংবা حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا رسول الله صـــ

কিংবা أخبرنيفلان قال أخبرنيفلان قال أخبرنيرسول الله صـــ

২. مسلسل فعلي অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকেই হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে একই আচরণ করেছেন। যেমন: ধরা যাক রাসূল সা. হাদীসটি বর্ণনার সময় যাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন তার হাত ধরে তা বর্ণনা করেছিলেন; তাহলে প্রত্যেক বর্ণনাকারী হাদীসটি বর্ণনার সময় শাগরেদের হাত ধরে হাদীসটি বর্ণনা করবেন। কিংবা রাসূল সা. হাদীসটি বর্ণনার সময় হেসে ছিলেন। তাই প্রত্যেক বর্ণনাকারী হাদীসটি বর্ণনার সময় হাসবেন।

৩. مسلسل قولي وفعلي : অর্থাৎ হাদীসটি বর্ণনার সময় রাসূল সা. যা করেছিলেন এবং যা বলেছিলেন বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকেই হাদীসটি বর্ণনা করার সময় সেই কাজ করে ও সেই কথা বলে হাদীসটি বর্ণনা করবেন। যেমন: আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে বর্ণনাকারী বলেন যে,

أخذ رسولُ اللهِ صـــ بيدى فقال اني أحبّك فقل اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

রাসূল সা. আমার হাতে ধরলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে ভালবাসি; অতএব তুমি বল, হে আল্লাহ! আপনার যিকর করার এবং শুকর আদায় করার এবং উত্তমভাবে আপনার ইবাদত করার ক্ষেত্রে আপনি আমাকে সহযোগিতা করুন।

এভাবে প্রত্যেক বর্ণনাকারী যার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করবেন তিনি তার হাত ধরে প্রথমে বলবেন, আমি তোমাকে মুহাব্বত করি। অতএব তুমি বল, হে আল্লাহ! ....।

বস্তুতঃ রাসূল সা.-এর প্রতি অনুরাগ ও ভক্তির আধিক্যের কারণে তার হুবহু অনুকরণের প্রবণতা থেকে এ ধরণের মুসালসালাত বর্ণনার পন্থা অনুসৃত হয়ে আসছে। এ ধরণের অনুকরণকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে

---

[১] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস -পৃ: ৪০ ও যফরুল আমানী পৃ: ৩১১।

মনে করা হয়।[1] অবশ্য অনেক মুসালসাল হাদীস থেকে তাসালসুলের বৈশিষ্ট্যটি অনেক সময় বাদ পড়ে যায়। যে কারণে সেটি আর মুসালসাল বলে গণ্য হয় না। আবার অনেকে নিজেথেকে কোন হাদীসের সাথে তাসালসুলের বৈশিষ্ট্য জুড়ে দেন। অনেকেই মুসালসাল হাদীস নিজেথেকে বানিয়েও বর্ণনা করে থাকেন। তবে নিজের মনগড়া হাদীস বর্ণনা করে তাসালসুলের বরকত লাভের আশা কি করে করা যায়।

মু‘আন‘আন (المعنعن)

আভিধানিক অর্থ :

معنعن শব্দটি عنعنة শব্দ থেকে গঠিত ইসমে মাফউলের সীগাহ। عنعنة শব্দটি عن শব্দ থেকে উদ্গত; যার অর্থ: হইতে, থেকে ইত্যাদি। معنعن অর্থ যা عن শব্দযোগে বর্ণিত। এর ইসমে ফায়েল হল مُعنعِن অর্থাৎ যিনি عن শব্দ ব্যবহার করেন বা عن শব্দযোগে বর্ণনা করেন ।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : الحديثُ الذي يقولُ الرّاوي عندَ رِوَايتِه عَن فُلانٍ عن فلانٍ

যে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী (عن فلان) অমুক থেকে (عن فلان) অমুক থেকে শব্দটি ব্যবহার করেন।[2] যেমন:

روى مالكٌ عَن ابنِ شِهابٍ عَن ابنِ المسيّبِ عَن أبِي هُريرَةَ أن رسولَ اللهِ صــ قالَ : إذا أمّنَ الإمامُ فأمِّنوا–

মু‘আন্‘আন বা عن যোগে বর্ণিত হাদীসের হুকুম :

এ সম্পর্কে ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, عن শব্দযোগে বর্ণিত হাদীসকে মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীস বলে গণ্য করা হবে। তবে শর্ত এই যে, যিনি عن শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করবেন, তাকে তাদলীসের অভিযোগে অভিযুক্ত না হতে হবে। এই শর্তটি সকলের নিকটই অপরিহার্য শর্ত। অবশ্য অনেকেই এ শর্তটি ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত শর্ত যোগ করেছেন। যেমন:

ক. যাথেকে তিনি عن যোগে হাদীস বর্ণনা করবেন তাথেকে তিনি সাধারণত: হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, এ বিষয়টি সর্বজন বিদিত হতে হবে। -এটি আবু আমর আদ্-দানীর অভিমত।

---

[1] মুসালসাল সমপর্কে বিস্তারিত জানার জন্য যফরুল আমানী ২৬৮-৩১৮ পৃ: দ্রষ্টব্য

[2] আদ্‌দুরারুস সামিনাহ - পৃ: ৬৯।

খ. যাথেকে তিনি عن যোগে হাদীস বর্ণনা করবেন তার সাথে বর্ণনাকারীর দীর্ঘ সংশ্রব (সুহবত) থাকতে হবে। এটি আবু মুযাফ্‌ফর আস্-সাম'আনীর অভিমত।

গ. যাথেকে তিনি عن যোগে হাদীস বর্ণনা করবেন তার সাথে বর্ণনাকারীর সাক্ষাত হয়েছিল, তা সর্বজন বিদিত থাকতে হবে। এটি ইমাম কাবেসীর অভিমত।

ঘ. যাথেকে তিনি عن যোগে হাদীস বর্ণনা করবেন তার সাথে বর্ণনাকারীর সাক্ষাত কোন একবার ঘটেছিল, তা প্রমাণিত হতে হবে। এটি ইমাম বুখারী, আলী ইবনুল মাদিনীসহ অনেক মুহাদ্দিসের অভিমত।

ঙ. যাথেকে তিনি عن যোগে হাদীস বর্ণনা করবেন তার সাথে তার দেখা হওয়া সম্ভব বলে প্রতীয়মান হলেই চলবে।[১] এটি ইমাম মুসলিমসহ জমহুরের অভিমত।

মুআন্নান : (المؤنّن)

আভিধানিক অর্থ :

أن শব্দ থেকে انّنَ শব্দটির উৎপত্তি ; যার অর্থ হল أنّ শব্দটি বলা। مؤنن হল ইসমে মাফউলের সীগাহ। এর অর্থ হল যে বর্ণনায় أنّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মুআন্নিন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি أنّ শব্দটি ব্যবহার করেন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

الحديثُ الذي قالَ الرّاوي فِي إسناده حَدّثَنا فلانٌ أنّ فلاناً قالَ كَذَا

যে হাদীসের বর্ণনাকারী أنّ শব্দযোগে সনদ বর্ণনা করেন সেই হাদীসকে মুআন্নান (مؤنن) বলা হয়।

মুআন্নানের বিধান :

জমহুরের অভিমত এই যে, মুআন্নান হাদীসের বিধান মু'আন্'আনের (معنعن) মতই অর্থাৎ এ ধরণের বর্ণনাকে সাধারণভাবে মুত্তাসিল বলে গণ্য করা হবে।
যদিও ইয়াকূব ইবনে শায়বা ও আবু বকর বারদিজীসহ এক জামাতের মত এই যে, এ ধরণের হাদীস মুনকাতে' বা বিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত বলে গণ্য হবে। তবে অন্য কোন উপায়ে যদি বর্ণনাকারী যাথেকে বর্ণনা করছেন তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত হয় তখন তাকে মুত্তাসিল বলে গণ্য করা যাবে।

---

[১] আদদুরারুস-সামিনাহ - পৃ: ৬৯ ও তাদ্‌বীর।

মুহ্‌কাম (المحكم)

আভিধানিক অর্থ :

মুহকাম শব্দটি মূলত باب إفعال এর ইসমে মাফউলের সীগাহ। যার অর্থ সুদৃঢ়, মজবুত ও নির্ভরযোগ্য।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : هُوَ الحَدِيثُ المَقبُولُ الذِي سَلِمَ مِن مُعَارَضَةِ حدِيثٍ آخَرَ مِثلَهُ.

মকবুল হিসাবে বিবেচ্য যেকোন হাদীস যদি অন্যকোন মকবুল হাদীসের সাথে অর্থের দিক থেকে সাংঘর্ষিক বা পরস্পর বিরোধী না হয় তাহলে এ ধরণের হাদীসকে মুহকাম বলা হয়।[১] অধিকাংশ মকবুল হাদীসই মুহকাম।

মুখ্‌তালিফুল হাদীস (مختلف الحديث) :

আভিধানিক অর্থ :

মুখতালিফুন (مختلف) শব্দটি باب افتعال এর ইসমে ফায়েলের সীগাহ; যার অর্থ বিরোধী, সাংঘর্ষিক। সুতরাং মুখতালিফুল হাদীস এর অর্থ হবে যে হাদীস অন্য হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক বা অন্য হাদীসের পরিপন্থী; অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী হাদীস।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

هوَ الحديثُ المقبولُ الذي عارضَه حديثٌ آخر مثلَه ويمكنُ الجمعُ بينَهمَا بِغيرِ تعسفٍ

এমন মকবুল হাদীস যার বিপরীতার্থক অন্য একটি মকবুল হাদীস বিদ্যমান রয়েছে, তবে কোনরূপ হঠধর্মীতার আশ্রয় না নিয়েই হাদীস দু'টির মাঝে সমন্বয় বিধান করা সম্ভব।[২]

তবে কাফউল আসারে এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে যে-

إنما هو الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهراً

এমন দুটি মকবুল হাদীস যা অর্থের দিক থেকে বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী।

উদাহরণ : এক হাদীসে আছে لا عدوى ولا طيرة অর্থাৎ সংক্রমণ বলতে কিছু নেই এবং পাখি উড়িয়ে সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ গ্রহণেরও কিছু নেই।[৩] এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে সংক্রমণের ধারণায় ইসলাম বিশ্বাসী নয়।

---

[১] কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস পৃ: ৪৬ ইষৎ পরিবর্তিত

[২] গ্রন্থকার

[৩] মুসলিম শরীফ।

আরেকটি হাদীসে আছে: لا يورد ممرض على مصح কোন অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে যাবে না।(১)

অন্য একটি হাদীসে আছে فرّ من المجذوم فرارَك مِن الأسد কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি থেকে পলায়ন কর যেভাবে তুমি বাঘ থেকে পলায়ন করে থাক।(২)

পরের দু'টি হাদীস থেকেই বুঝা যায় যে, রোগ-ব্যাধিতে সংক্রমণের আশংকা রয়েছে- ইসলাম এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী। সুতরাং এদু'টি হাদীসের ভাবার্থ প্রথমোক্ত হাদীসের সম্পূর্ন বিপরীত। সুতরাং প্রথমোক্ত হাদীস ও পরবর্তী দু'টি হাদীস মুখতালিফুল হাদীস বা পরস্পরবিরোধী।

পরস্পরবিরোধী হাদীসের ক্ষেত্রে করণীয়:

১. যদি দু'টি হাদীস পরস্পর বিরোধী হয় তাহলে প্রথমে ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তের বিচারে একটি অন্যটি দ্বারা মনসূখ হয়ে গিয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি একটি দ্বারা অন্যটি মনসূখ বা রহিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে রহিতটি বর্জন করে অন্যটির উপর আমল করতে হবে।

২. রহিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত না হলে, যদি পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীসের মাঝে সমন্বয় বিধান করা সম্ভব হয় তাহলে তাই করতে হবে এবং উভয় হাদীসের উপর আমল করা অপরিহার্য বলে গণ্য হবে।

যেমন: পূর্বোক্ত দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মাঝে বহু মনীষী বিভিন্নভাবে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে আল্লামা ইবনূল কাইয়্যিম যেভাবে সমন্বয় করেছেন, তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হওয়ায় নিম্নে আমরা সেটিই উল্লেখ করলাম।

তিনি বলেন لاعدوى বা 'সংক্রমণ নেই' বলে একটি অপবিশ্বাসের অপনোদন করা হয়েছে। সংক্রমণকেই যে রোগ বিস্তারের প্রকৃত কারণ মনে করা হয় (আল্লাহর এতে কোন হাত আছে বলে মনে করা হয় না) এই অপবিশ্বাসের অপনোদনই উপরোক্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য। (কেননা সব কিছুর পিছনেই আল্লাহর কুদরতের হাত কাজ করে, তার বাহ্যিক কারণ যাই হোক না কোন।)

আর لا يورد ممرض على مصح কিংবা فرّ من المجزوم فرارَك مِن الأسد বলে বাহ্যিক কার্যকারণ হিসাবে রোগ জীবাণু (ও ভাইরাসের) প্রভাবকে স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে উঠা-বসা করলে বাহ্যিক কার্যকারণ হিসাবে রোগ জীবাণুর সংক্রমণের বিষয়টি রোগ সৃষ্টি হওয়ার পিছনে

---

১ মুসলিম শরীফ।

২ বুখারী।

কাজ করতে পারে।[১] (তবে এক্ষেত্রেও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর তাক্বিনী বিধানে এভাবে রোগাক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত ছিল বলেই সে আক্রান্ত হয়েছে।)

এ কারণেই সেই ব্যক্তি, যে উটের চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে রাসূল সা.-এর সামনে এভাবে যুক্তি পেশ করেছিল,

انَّ البعيرَ الجربَ يكونُ بينَ الإبلِ الصحيحةِ فيُخالطُها فتجرب.

কোন চর্মরোগাক্রান্ত উট যদি সুস্থ উটের মাঝে থাকে এবং সুস্থ উটের সাথে মেলামেশা করে তাহলে সুস্থ উটটিও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সংক্রমণ না থাকলে এটি কিভাবে হয় ?

এর জবাবে রাসূল সা. বললেন... প্রথমটিকে কে চর্মরোগে আক্রান্ত করল ? অর্থাৎ প্রথমটিতে রোগ কিভাবে হল ? এর অর্থ হল- ঐ অপবিশ্বাসের অপনোদন করা যে, সংক্রমণই রোগ বিস্তারের মূল কারণ। কেননা কারণ ছাড়াও যেমন আল্লাহ কাউকে রোগাক্রান্ত করতে পারেন তেমনি বাহ্যিক কার্যকারণের আওতায়ও কাউকে রোগাক্রান্ত করতে পারেন। সংক্রমণ হল একটি বাহ্যিক কার্যকারণ। আর প্রকৃত কারণ হল আল্লাহর ফয়সালা।

কেউ যদি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে উঠাবসা করে, আর সে আক্রান্ত হয়, তাহলে হয়ত আল্লার বিধানের বিষয়টি বিস্মৃত হয়ে সে সংক্রমণকেই আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণ মনে করে বসতে পারে। সে জন্য সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে এবং সরে থাকতে বলা হয়েছে। অপরপক্ষে এ ধরণের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ জনপদে গমন করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

৩. যদি তথ্য উপাত্তের বিচারে পরস্পর বিরোধী হাদীসদ্বয়ের কোন একটি রহিত হয়েছে বলে কোন প্রমাণ না পাওয়া যায় এবং হাদীস দু'টির মাঝে সমন্বয় সাধন করাও সম্ভব না হয় তাহলে দু'টি হাদীসের কোন একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়ার যে বিধি-বিধান রয়েছে সেই বিধি-বিধান মুতাবিক একটিকে প্রাধান্য দিয়ে তার উপর আমল করতে হবে। (প্রাধান্য দেওয়ার বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।)

৪. যদি কোন একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার কোন পথ খুঁজে না পাওয়া যায় (যদিও এরূপ হওয়া খুবই দুরূহ) তাহলে এ ক্ষেত্রে আমল থেকে

---

[১] ইবনে কাইয়্যিমকৃত কিতাবুররুহ - পৃঃ ১৯৭।

বিরত থাকতে হবে। যতক্ষণ না কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার কোন উপায় বেরিয়ে আসে। তবে অনেকেই এই তরতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন।

নাসেখ ও মনসূখ (الناسخ والمنسوخ)

আভিধানিক অর্থ :

নস্‌খুন (نسخ) মূলধাতু থেকে এই শব্দ দু'টির উৎপত্তি। যার অর্থ দূরিভূত করা, সরিয়ে ফেলা, বাতিল করা, এর অন্য একটি অর্থ হল অনুলিখন করা, কপি করা। নাসেখ শব্দটি মূলত ইস্‌মে ফায়েলের সীগাহ; যার অর্থ বাতিলকারী রহিতকারী। আর মনসূখ শব্দটি ইসমে মফউলের সীগাহ; যার অর্থ বাতিলকৃত বা রহিতকৃত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

بيانُ انتهاءِ حُكمٍ شَرعِيٍّ بطريقٍ (أي بحكم) شَرعِيٍّ متأخِّرٍ عَنهُ

কোন একটি শরয়ী বিধানকে পরবর্তীতে আসা অন্য আরেকটি শরয়ী বিধান দ্বারা রহিত করাকে নস্‌খ বলে।[১]

পরবর্তীতে আসা যে বিধান দ্বারা পূর্ববর্তী বিধানটিকে রহিত করা হয় তাকে নাসেখ (ناسخ) বা রহিতকারী বিধান বলে। আর পূর্ববর্তী যে বিধানটিকে রহিত করা হয় তাকে মনসূখ (منسوخ) বা রহিতকৃত বিধান বলে।

অবশ্য মুতাকাদ্দেমীন নস্‌খ শব্দটিকে আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ তারা কোন ব্যাপক বিধানকে সীমিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ কিংবা কোন কোন সীমিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানকে ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ, শর্তহীন (مطلق) বিধানকে শর্তযুক্ত (مقيد) করণ; কিংবা কোন শর্তযুক্ত বিধানকে শর্তহীনভাবে প্রয়োগ, কিংবা কোন সাধারণ বিধানকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে প্রয়োগ ইত্যাদি ধরণের যে সব পরিবর্তন শারে'-এর পক্ষ থেকে হয়েছে (অর্থাৎ বিধানটি সম্পূর্ণ রূপে রহিত হয়ে যায়নি, আংশিক পরিমার্জন বা সংশোধন হয়েছে মাত্র, সেগুলোকেও নসখের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন।[২]

তাই মুতাকাদ্দেমীনদের কিতাবাদীতে ব্যবহৃত নসখ শব্দ দেখে মুতাআখখেরীনদের দৃষ্টিতে যাকে নসখ বলা হয় তা মনে করা উচিৎ নয়।

---

১ নিহায়াতুস-সূল শরহু মিনহাজিল উসূল খ: ২ পৃ: ৩৩। জামাল আল-ইসনাভীকৃত।

২ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ইতকান ফি উসূমিল কুরআন, আল ফাউজুল কাবীর।

নাসেখ মন্‌সূখ চিনার উপায় :

১. রাসূল সা. নিজেই যদি বিধানটি রহিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে থাকেন। যেমনঃ বুরায়দা রা. এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে আছে -

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ.

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। তবে এখন (বলছি যে) তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১]

হযরত সাবুরা রা. বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, তিনি রাসূল সা. এর সঙ্গে ছিলেন। রাসূল সা. বললেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. الحديث

হে লোকসকল! আমি তোমাদের সাময়িক কালের চুক্তিতে রমনীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যৌন মিলনের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত সেটি হারাম করে দিয়েছেন।[২]

২. কোন সাহাবীর বক্তব্য থেকেও তা জানা যায়। যেমনঃ হযরত জাবের রা. বলেন যে - كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللّه صــ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

আগুন স্পর্শ করেছে এমন বস্তু আহারের পর অযূ করা না করার ক্ষেত্রে রাসূল সা. এর শেষ আমল ছিল অযূ না করা।[৩]

৩. হাদীসটির সময়-ক্ষণের বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নাসেখ মনসূখ চিনা যায়। যেমনঃ সাদ্দাদ ইবনে আউস রা. বর্ণিত এক হাদীসে আছে :

أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ

যে শিংগা লাগাবে এবং যার গায়ে লাগাবে দু'জনেরই রোযা ভেঙ্গে যাবে।[৪]

আবার ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত হাদীসে আছে যে,

إِنَّ النبيّ صــ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِم صَائم

নবী সা. ইহ্‌রামের হালে রোযা থাকা অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।[৫]

শাদ্দাদ রা. বর্ণিত হাদীসটির কোন কোন সূত্রে উল্লেখ আছে যে- إن ذالك زمن الفتح

---

[১] মুসলিম।

[২] মুসলিম।

[৩] তিরমিযী, আবু দাউদ।

[৪] আবু দাউদ।

[৫] মুসলিম।

অর্থাৎ أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ এই বক্তব্যটি ছিল মক্কাবিজয়ের সময়ের। আর ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত ঘটনাটি ছিল বিদায় হজ্জের। সুতরাং এই পরস্পর বিরোধী দু'টি বর্ণনার মাঝে পূর্বের বিধানটি পরবর্তী আমলের দ্বারা রহিত হয়ে গেছে বলে সাব্যস্ত হবে।

৪. সাহাবীগণের ইজমা দ্বারাও বুঝা যাবে। যেমন : এক হাদীসে আছে

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.

কেউ যদি শরাব পান করে তাহলে তাকে চাবুক মার। এভাবে তিনবার প্রহার করার পরও যদি সে চতুর্থবার পান করে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেল।[১]

এই বিধানটি কার্যকর না করার ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা বা ঐক্যমত্য রয়েছে। অতএব বুঝা যায় যে, বিধানটি রহিত হওয়ার বিষয়ে তারা অবহিত ছিলেন। তা না হলে কেউ না কেউ এর প্রতিবাদ করতেন। আল্লামা নববী বলেছেন: دلّ الإجماعُ على نسخه সাহাবীগণের ইজমা প্রমাণ করছে, বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। অবশ্য ইজমা কোন বিধানকে রহিত করতে পারে না। এক্ষেত্রেও ইজমা বিধানটিকে রহিত করেনি। তবে ইজমা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বিধানটি রহিত হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এমন কোন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত কোন রিওয়ায়াত যদি তার পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী কোন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তৎকর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতকে কেবলমাত্র পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এই ভিত্তিতে নাসেখ সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা হতে পারে তিনি রিওয়ায়াতটি এমন কোন সাহাবীর মধ্যস্থতায় শ্রবণ করেছেন যিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বর্ণনার সময় সেই সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে অর্থাৎ (إرسال) ইরসাল করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তবে হ্যাঁ যদি তার বর্ণনায় সরাসরি রাসূল সা. থেকে শুনেছেন এমন কোন শব্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তাহলে তার এই বর্ণনাকে নাসেখ বলে সাব্যস্ত করা যাবে নিম্নোক্ত শর্তে।

শর্তসমূহ :

ক. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যদি তিনি রাসূল সা. এর কোন বক্তব্য শ্রবণ না করে থাকেন।

---

[১] আবূ দাউদ, তিরমিযী

খ. তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিটি মৃত্যুবরণ করে থাকলে।

গ. অথবা মৃত্যুবরণ না করলেও পরে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের পর তিনি (পূর্ববর্তী ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি) রাসূল সা. থেকে কোন বক্তব্য শ্রবণ করেননি একথা প্রমাণিত হলে।

৫. কোন সাহাবী তার বর্ণিত কোন রিওয়ায়াতের বিপরীতে কোন আমল করেছেন বলে যদি উল্লেখ পাওয়া যায়, আর তার আমল ছাড়া অন্য কোন বিশেষ কারণের কথা যদি উল্লেখ না পাওয়া যায়, আর মুজতাহিদ যদি বর্ণনার বিপরীত এহেন আমল করার পক্ষে কোন প্রমাণ উদ্ঘাটন করতে না পারেন; তাহলে তার এই আমল পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতটি মনসূখ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা কোন সাহাবী স্বজ্ঞানে তার বর্ণিত রিওয়ায়াতের বিপরীতে আমল করতে পারেন না। কিন্তু তিনি যেহেতু এরূপ করেছেন, অতএব বুঝা যায় যে, পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতটি মনসূখ হওয়ার কোন প্রমাণ তার কাছে ছিল। আল্লামা ইবনুল হুমাম এরূপই উল্লেখ করেছেন।

রাজেহ/মারজুহ (الرّاجح والمرجُوح)

আভিধানিক অর্থ :

راجح শব্দটি باب فتح থেকে ইসমে ফায়েলের সীগাহ। যার অর্থ ভারী হওয়া, ঝুকে পড়া, পরিপক্ক হওয়া, প্রাধান্য পাওয়া। সুতরাং রাজেহ অর্থ প্রাধান্যপ্রাপ্ত। এ থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ (مرجوح) মারজুহ, অর্থাৎ যার উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

যখন পরস্পর বিরোধী দু'টি রিওয়ায়াত পাওয়া যায়, আর সে দু'টি রিওয়ায়াতের মাঝে নাসেখ মনসূখ চিহ্নিত করা কিংবা সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয়, তখন একটিকে আরেকটির উপর যথানিয়মে প্রাধান্য দিয়ে তার উপর আমল করতে হবে। যে রিওয়ায়াতটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তাকে বলা হবে (راجح) রাজেহ। আর যেটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে সেটিকে বলা হবে (مرجوح) মারজুহ। সুতরাং রাজেহ -এর সংজ্ঞা হবে নিম্নরূপ:

هُوَ الحديثُ الذي ترجَّحَ عَلى مُعارِضه بِوَجْه مِّن وُجُوه التَّرجِيح –

রাজেহ ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যাকে তার সাথে সাংঘর্ষিক অন্য একটি রিওয়ায়াতের উপর- প্রাধান্য দেওয়ার কোন এক পদ্ধতিতে- প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

আর মরজুহ এর সংজ্ঞা হবে নিম্নরূপ :

هُوَ الحَدِيثُ الذي ترجَّحَ عَليهِ مُعارِضُه بِوَجْه مِّن وُجُوه التَّرجِيح -

মারজুহ ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যার উপর তার সাথে সাংঘর্ষিক অন্য একটি রিওয়ায়াতকে- প্রাধান্য দেওয়ার কোন এক পদ্ধতিতে- প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

* (وجوه الترجيح) প্রাধান্য দেওয়ার পন্থাসমূহ :

উসূলের কিতাবগুলোতে প্রাধান্য দেওয়ার পন্থাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা হাযেমী তাঁর 'আল-এ'তেবার' নামক গ্রন্থে এধরণের পঞ্চাশটি পন্থার উল্লেখ করেছেন।[১] আল্লামা ইরাকী সেগুলোর সাথে আরো বেশ কিছু পন্থা সংযোজন করে তা ১১০–এর কোঠায় পৌঁছিয়েছেন।[২] আল্লামা সুয়ূতী তাদরীবুর রাবীতে সেগুলোকে সংক্ষেপায়ন করে পেশ করেছেন।[৩] নিম্নে কতিপয় পন্থা উল্লেখ করা গেল।

১. যে সনদের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই, সেই সনদকে প্রাধান্য দিতে হবে ঐ সনদের উপর যার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে মতভিন্নতা আছে।
২. যে রিওয়ায়াতে কোন জটিলতা (علة) নেই তাকে প্রাধান্য দিতে হবে ঐ রিওয়ায়াতের উপর যাতে প্রচ্ছন্ন জটিলতা (علة خفيّة) আছে।
৩. বৈধ প্রমাণকারী রিওয়ায়াতের উপর অবৈধ হওয়ার আশংকা আছে এরূপ রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিতে হবে।
৪. যে বর্ণনায় অধিক সতর্কতা আছে সেটিকে সতর্কতা নেই এমন বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিতে হবে।
৫. অধিক শক্তিশালী সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিতে হবে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতের উপর ।
৬. যে বর্ণনা দ্বারা হদ্দ বা শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি রহিত হয়ে যায় তাকে প্রাধান্য দিতে হবে এমন বর্ণনার উপর যা গ্রহণ করলে শাস্তি অবধারিত হয়ে পড়ে।
৭. কুরআন কিংবা অন্য হাদীসের সাথে যে রিওয়ায়াত সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিয়াসের অনুকূল, অথবা উম্মতের আমলের সাথে বা খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে প্রাধ্যন্য দিতে হবে, উল্লিখিত বিষয়সমূহের সাথে সামঞ্জস্য নেই এমন রিওয়ায়াতের উপর।
৮. মৌখিক বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে হবে কর্মদ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের উপর ।

---

[১] আল-এ'তেবার পৃ: ৮ - ২২
[২] শরহুল ইরাকী আলা মুকাদ্দামাতে ইবনিস-সালাহ- ২৪৫-২৫০।
[৩] তাদরীবুর-রাবী - ১৯৮-২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯. ইতিবাচক বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে হবে নেতিবাচক বর্ণনার উপর ।
১০. বিশ্লেষণসমৃদ্ধ সুস্পষ্ট বর্ণনাকে সংক্ষেপ ও অস্পষ্ট বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিতে হবে।
১১. বিষয়ের উপর যে বক্তব্যে দৃঢ়তা আছে তাকে প্রাধান্য দিতে হবে বিষয়ের উপর বক্তব্য তত সুদৃঢ় নয় তার উপর।
১২. শব্দের শরয়ী অর্থকে প্রাধান্য দিতে হবে আভিধানিক অর্থের উপর।
১৩. নবী সা. এর বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে হবে রাবীর ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, বুঝ-সমজ ও ফাহ্‌মের উপর।
১৪. যে হাদীসে বর্ণনার প্রেক্ষাপট উল্লেখ আছে তাকে প্রাধান্য দিতে হবে প্রেক্ষাপট বর্ণিত নেই এমন রিওয়ায়াতের উপর।
১৫. যে রিওয়ায়াতের বর্ণনাকারী অন্যের উপর কটাক্ষ করেননি সেই রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিতে হবে যে রিওয়ায়াতের বর্ণনাকারী অন্যের উপর কটাক্ষ করেছেন তার উপর।
১৬. খাস বা সীমিত অর্থবোধক বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে হবে ‘আম বা ব্যাপক অর্থবোধক বক্তব্যের উপর।
১৭. কোন রিওয়ায়াতের সরাসরি অর্থকে প্রাধান্য দিতে হবে অন্য রিওয়ায়াতের প্রতিফলিত অর্থের উপর।
১৮. সনদে ‘আলীকে প্রাধান্য দিতে হবে নাযেল সনদের উপর।
১৯. যে সূত্রের বর্ণনাকারী গভীর প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ সেই সূত্রকে প্রাধান্য দিতে হবে সনদে আলী উপর।
২০. বয়স্ক সাহাবীদের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে হবে কম বয়স্ক সাহাবীদের বর্ণনার উপর।

সারকথা এই, প্রাধান্য দেওয়ার যে কোন একটি কারণ দেখিয়ে পরস্পর বিরোধী দু’টি রিওয়ায়াতের একটিকে আমলের জন্য গ্রহণ করতে হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দু’টি হাদীসের মাঝে যদি কোন ভাবেই একটিকে প্রাধান্য দেওয়া না যায় তাহলে উভয় হাদীসের বক্তব্যের উপর আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে- যতক্ষণ না প্রাধান্য দেওয়ার কোন একটি পথ উদ্ভাসিত হয়।

আদালত (العدالة)

আভিধানিক অর্থ :

আদালত অর্থ বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ, নিরপেক্ষ মতামত, বিচারালয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : هِيَ الْمَلَكَةُ الَّتِي تَحْمِلُ الإِنسَانَ عَلَى مُلاَزَمَةِ التَّقْوِي وَالْمُرُوْنَة
এমন সুদৃঢ় আত্মশক্তি যা মানুষকে তাকওয়া[১] ও মরুওয়াত[২] অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে।

অর্থাৎ আত্মিকভাবে মানুষের এতটা উন্নত পর্যায়ে পৌঁছা যে, ন্যায়কে অবলম্বন করা এবং অন্যায়, মিথ্যা, অসদাচরণ ও অশোভন কাজ থেকে বিরত থাকা তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় এবং উন্নত নৈতিক বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী কোন কাজ করতে তার বিবেকে বাধে। ফলে তার বিবেক তাকে তাকওয়া অবলম্বন করতে এবং উন্নত নৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলি অনুসরণ করে চলতে অনুপ্রাণিত করে। ফলে সে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় কাজ থেকে যেমন বেঁচে থাকে, তেমনি সমাজের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় আচরণ থেকেও বিরত থাকে। মানুষের মধ্যকার এধরণের এক অবস্থাকে আদালত বলে। আর যে ব্যক্তির মাঝে এধরণের অবস্থা বিদ্যমান থাকে তাকে আদেল বা আদ্ল বলা হয়।

কেউ কেউ আদালতের সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন :

هِيَ أن يَّكُونَ الإنسَانُ مُتَّصِفًا بِكَوْنِه مُسلِمًا بَالِغًا عَاقِلاً سَالِمًا مِّن أسبَابِ الفِسْقِ وَخَوَارِمِ المُرُوْئَةِ .

একজন মানুষের মুসলমান হওয়া, বালেগ হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়াসহ সকল ধরণের ফিস্ক, পাপাচার এবং মরুওয়াত বা উন্নত নৈতিক বৈশিষ্ট্য বিপন্ন করে এমন কাজে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ মুক্ত থাকাকে আদালত বলে।[৩]

---

১ **তাকওয়া:** তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ: পরহেজ করা ও বেঁচে থাকা। পরিভাষায় আল্লাহর ভয় ও পরকালে জবাবদিহিতার চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় বিষয়াসয় থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলে। এ প্রেক্ষিতে শিরক, বিদআত, ফিসক ইত্যাদি কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সগীরাহ গুনায় পূন: পূন: লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা তাকওয়ার পরিমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

২ **মরুওয়াত:** মরুওয়াত শব্দটির আভিধানিক অর্থ মনুষ্যত্ববোধ, মানবিক নীতিবোধ। পরিভাষায়: সমাজ যাকে নিন্দনীয় ও অশোভন বলে মনে করে; শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ হলেও তাথেকে বেঁচে থাকাকে মরুওয়াত বলে। কেননা সমাজ যাকে অশোভন মনে করে তা করা মানবীয় নীতিবোধের পরিপন্থী। তবে যদি কোন বিষয় শরীয়তের প্রত্যাশিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সমাজ অশোভন মনে করলেও সেটি বাস্তবায়ন করতে হবে। সুতরাং মুরুওয়াত বলতে এমন উন্নত নৈতিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়, যার বিপরীত আচরণ সমাজের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। যেমন- খোলা জায়গায় বা হাটে বাজারে পানাহার করা, রাস্তার পাশে বসে প্রস্রাব করা, উচ্চস্বরে চিল্লা-চিল্লি করা, হাটতে হাটতে কিছু খাওয়া ইত্যাদি বিষয়- যেগুলোকে উন্নত নৈতিক বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী মনে করা হয়।

৩ আদ-দুরারুস-সামিনাহ পৃ: ৩৪।

যবত (الضبط)

আভিধানিক অর্থ :

পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণ করা, ভালভাবে হিফয করা, দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, মজবুত করা, সুদৃঢ় করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

هوَ حِفظُ ما سمعَه مِن شيخِه بِحَيثُ يصُونُه مِن الإضاعةِ والأهلاكِ ويستمكَّنُ عَلى استحضارِه متى شَاء.

পরিভাষায় যবত বলা হয় উস্তাদ থেকে শ্রবণ করা কোন বিষয়কে এমন সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা যাতে তা বিস্মৃতি ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পায় এবং প্রয়োজনের মূহুর্তে তা যথাযথভাবে পেশ করা যায়।

হাদীসের ক্ষেত্রে এই যবত্ বা সংরক্ষণ দু'ভাবে করা হয়ে থাকে। যথা:

১. ضبط الصدر স্মৃতিতে সংরক্ষণ।

২. ضبط الكتاب পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ।

স্মৃতিতে সংরক্ষণ বা (ضبط الصدر) :

هوَ أن يثبتَ مَا سمعَه بحَيثُ يتمكَّنُ مِن استحضارِه متى شَاءَ

এর অর্থ হল বর্ণনাকারী তার উস্তাদ থেকে যে হাদীস যে শব্দে এবং যে সূত্রে শ্রবণ করেছে তা হুবহু স্মৃতিতে এমন সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা যাতে যখন ইচ্ছা তখন সে হাদীসটি হুবহু উপস্থাপন করতে পারে।[১]

পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ (ضبط الكتاب) :

هُوَ صِيانتُه لَديْه مُذْ سَمِعَ فيه وَصحَّحَه إلى أن يؤدِّيَه منْه.

এর অর্থ হল বর্ণনাকারী তার উস্তাদ থেকে হাদীস শ্রবণের মূহুর্তে যে পাণ্ডুলিপিতে তা লিপিবদ্ধ করেছিল, উস্তাদের পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে যথাযথ পরিশুদ্ধ করণের পর নিজের কাছে হাদীস বর্ণনার সময় পর্যন্ত তা এভাবে সংরক্ষণ করা যে, চাওয়া মাত্রই সেই পাণ্ডুলিপি সে উপস্থিত করতে পারে।[২]

যার মাঝে সংরক্ষণের এই গুণ পূর্ণমাত্রায় রয়েছে তাকে ضابط বা সংরক্ষণকারী বলে।

---

[১] কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস।

[২] পাগুক্ত - পৃ: ৩৪- টিকা দ্রষ্টব্য।

সিকাহ (الثقة)

আভিধানিক অর্থ :

সিকাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত। বাবে তাফয়ীলের মাসদার توثيق -এর অর্থ হল- কাউকে বিশ্বস্ত বলে সনাক্ত করা, বিশ্বস্ত প্রতিপন্ন করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : هُوَ الراوي الذي فِيه عَدالةٌ وضبطٌ تامٌّ

যে বর্ণনাকারীর মাঝে আদালত (অর্থাৎ তাকওয়া ও মরুওয়াত) এবং যব্‌ত (সংরক্ষণ)- এর গুণ পূর্ণমাত্রায় রয়েছে তাকে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলা হয়।

কখনো কখনো সিকাহ রাবীকে সাবিত (ثابت) ও সব্‌ত (ثبت)ও বলা হয়।

রিজাল (الرجال)

আভিধানিক অর্থ :

রিজাল শব্দটি رجل রাজুলুন্ -এর বহুবচন: যার অর্থ ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : الرجال هو رواة الحديث

হাদীস বর্ণনাকারীগণকেই রিজাল বা রিজালুল হাদীস (رجال الحديث) বলা হয়।
আর যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাকে علم اسماء الرجال বা রিজালশাস্ত্র বলা হয়।

রিজালে হাদীসের বিভিন্ন খেতাব :

১. তালেব (طالب الحديث/ المبتدئ/حديثي) **:** هُوَ المُبتَدِئُ الرّاغبُ فِيه

হাদীস শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার্থী যিনি হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানাহরণে আগ্রহী, এমন ব্যক্তিকে তালেবুল হাদীস বা হাদীসী কিংবা মুবতাদী বলা হয়।

২. মুসনিদ বা রাবী مسند / راوي **:**

هو مَن يَروي الحديثَ بِسنده سوَاءٌ كانَ عندَه علم به أم لَيسَ لَه إلاّ مجرّد الرواية

যিনি সনদসহ হাদীস বর্ণনা করেন, হাদীস বা সনদ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান থাক বা বর্ণনা করা ছাড়া তার কোন জ্ঞান না থাক।

৩. মুহাদ্দিস (المحدث) :

هوَ مَن يشتَغلُ بعلْمِ الحديثِ روايةً ودرايةً يَطلع عَلى كثيرٍ منَ الرِّوايات وأحوال رُواتها.

যিনি হাদীসচর্চায় (রিওয়ায়াত সম্পর্কিত হোক বা দিরায়াত সম্পর্কিত হোক) সবসময় নিরত থাকেন এবং বহু রিওয়ায়াত ও তার রাবীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত তাকে মুহাদ্দিস বলে।[১]

মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস-সুনানের টিকায় যফর আহমদ উসমানী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের যুগে মুহাদ্দিস বলা হয় :

مَن كانَ كثيرَ الإشتغالِ بمُطالعة كتبِ الحديثِ ودرسِه و تدريسِه بإجازةِ الشيوخِ له مَع معرفة معاني الحديثِ روايةً ودرايةً.

যিনি হাদীসের কিতাবাদী অধ্যয়নে ব্যাপক ভিত্তিতে নিরত এবং এক বা একাধিক শায়খের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে হাদীসের দরস ও তাদরীসে নিরত আছেন এবং হাদীসের অর্থসহ রিওয়ায়াত ও দিরায়াত সম্পর্কে অবগত আছেন তাকে মুহাদ্দিস বলে।[২]

আল্লামা জাযায়েরী অবশ্য বলেছেন যে, যিনি সনদসহ হাদীস বর্ণনা করেন এবং মতন সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখেন তাকে মুহাদ্দিস বলা হয়।[৩]

এছাড়াও বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে মুহাদ্দিসের সংজ্ঞা দিয়েছেন এর কারণ আমরা এই আলোচনার শেষে উল্লেখ করব।

৪. হাফিয (الحافظ) :

هوَ الذي إذا سمعَ الحديثَ عرفَ أنَّه في الصحاحِ أم في غيرِها، وكانَ حفظَ ألفَ حديثٍ فصاعدًا بالمعنى –

যিনি কোন হাদীস শোনার পর বুঝতে পারেন যে, এটি সিহাহ সিত্তায় আছে না অন্যকোন কিতাবে আছে। তৎসঙ্গে এক হাজার কিংবা তার চেয়েও বেশী হাদীস তার মুখস্ত আছে। (হুবহু শব্দে না হলেও অর্থ মুখস্ত আছে) তাকে হাফিয বলা হয়।[৪]

অনেকেই এক লক্ষ হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের অবস্থাসহ মুখস্ত থাকার শর্ত লাগিয়েছেন। তবে নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদীস মুখস্ত থাকার শর্তটি এ বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে গ্রহণীয় নয়।

---

[১] তাইসীরু মুসাতালাহিল হাদীস - ১৭।

[২] মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস-সুনানের টিকা -পৃ:২৮।

[৩] আলী মুহাম্মদ নসরকৃত - আন্-নাহজুল হাদীস পৃ: ২২।

[৪] মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস-সুনান- ২৮ পৃ:টিকা দ্রষ্টব্য।

অনেকেই হাফিযের সংজ্ঞায় বলেছেন:

هو أرفع درجة من المحدث بحيث ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله –

হাফিযের স্তর মুহাদ্দিসের চেয়ে উর্ধ্বে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরের যেসব বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে তিনি জানেন তাদের সংখ্যা, যাদের সম্পর্কে জানেন না তাদের তুলনায় বেশী।(১)

৫. হুজ্জাত (الحجة) :

هو الذي كان قوله "إنّ في الحديث كذا" حجة بين أقرانه ولا ينكرونه عليه

এমন ব্যক্তিকে হুজ্জাত বলা হয় যিনি কোন হাদীস সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলে তা সমকালীন ব্যক্তিদের নিকট হুজ্জাত বলে গণ্য হয়; কেউ তার মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে না।

অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, যিনি সনদ ও মতনের যাবতীয় বৃত্তান্তসহ তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত বলা হয়। (২)

৬. হাকেম (الحاكم) :

هوَ الذي أحاطَ علمًا بجميعِ الأحاديثِ حَتى لايفوتُه منهَا إلاّ اليسيرُ.

যিনি প্রায় সকল হাদীস এমনভাবে আয়ত্ব করে ফেলেছেন যে, তাথেকে যৎসামান্য হয়ত বাদ পড়তে পারে, তাকে হাকেম বলা হয়।(৩)

কেউ কেউ হাকেমের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে:

هو الذي أحاط علمُه بجميعِ الأحاديث سندًا ومتناً، وأحوال الرواة جرحاً وتعديلاً وتاريخاً.

যিনি সমস্ত হাদীস সনদ, মতন, রাবীদের অবস্থা, তাদের সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনা ও হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তসহ আয়ত্ব করে ফেলেছেন, তাকে হাকেম বলা হয়। (৪) অনেকে আবার এর সঙ্গে আট লাখ হাদীস মুখস্ত থাকার শর্তারোপ করেছেন। তবে অনেকেই মুহাদ্দিসদের উপাধির তালিকায় হাকেম শব্দটি উল্লেখই করেননি। কারণ তাদের মতে হাকেম হাফিযে হাদীসদের কোন উপাধিই নয়।

৭. আমীরুল মু'মিনীনা ফিল হাদীস :

কেউ কেউ বলেছেন যে, হুজ্জাতের পর হাকেমের পূর্বে এর স্থান। তবে অধমের মতে সকল হাদীসের সবদিক সম্পর্কে যার অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে তাকে 'আমীরুল

---

১ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস - পৃঃ- ১৭।
তারীখে ইলমে হাদীস আমীমুল ইহসানকৃত, আন্-নাহজুল হাদীস ড. আলী মুহাম্মদ নসরকৃত- পৃঃ ২৩
২ তাইসীরু মুসাতালাহিল হাদীস -১৭
৩ আদদুরারুস-সামিনাহ ১৬

মু'মিনীনা ফিল হাদীস' বলা উচিত। এবং হাকেমের পরে তার অবস্থান হওয়া উচিত।

অবশ্য ড. আলী মুহাম্মদ নসর আন-নাহজুল হাদীসে 'আমীরুল মু'মিনীনা ফিল হাদীসকে রাবীগণের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞার সারসংক্ষেপ এই যে, যিনি রিওয়ায়াত ও দিরায়াত, জরাহ ও তা'দীল এবং রিজালশাস্ত্র তথা এ বিষয়ের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয় এবং সঠিক মর্মার্থসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত্ব করেছেন তাকে 'আমীরুল মু'মিনীনা ফিল হাদীস' বলা হয়।[১]

রিজালে হাদীস বা রাবীদের যে সব আলকাব ও খেতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলোর সংজ্ঞায় সে সব শর্ত-শারায়েত উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো সবই পরবর্তীদের উদ্ভাবিত বিষয়। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ বলেন যে, আমি শায়খ আল্লামা যাহেদ কাওসারী রাহ. কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, হাফেয, হাকেম, হুজ্জাত ইত্যাদি শব্দের সংজ্ঞায় যে সব শর্ত-শারায়েত উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো কোত্থেকে আসল এবং এগুলোর উৎস কি ? জবাবে তিনি বললেন যে, এগুলো পরবর্তীদের উদ্ভাবিত পরিভাষা। মুতাকাদ্দেমীনদের ব্যবহারে এগুলো দেখা যায় না। আল্লামা যাহাবী রহ. তার গ্রন্থের নামকরণ করেছেন তাযকেরাতুল হুফ্ফায। উক্ত গ্রন্থে সাহাবী ও তৎপরবর্তীদের অনেকের জীবনেতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের অনেকেই এমন আছেন, যারা হাফেয হুজ্জাত ইত্যাদির জন্য যে পরিমাণ হাদীস মুখস্ত থাকার শর্ত করা হয়েছে, তার একদশমাংশ পরিমাণ হাদীসও বর্ণনা করেননি।

এ ব্যাপারে সংক্ষেপ কথা এইযে, এসকল শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা যুগ প্রেক্ষিতে। এগুলোর মূলভিত্তি হল যুগ-প্রচলনের উপর। অর্থাৎ এক যুগে যাকে হাফেয বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে ইলমী ইনহিতাতের কারণে তার চেয়েও নিম্ন স্তরের ব্যক্তিকে হাফেয বলা হয়েছে এবং সে প্রেক্ষিতে নতুন করে সংজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে।[২]

বরং বলা যায় যে, একেক জনের জ্ঞান-পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে সমকালীন লোকেরা একেক জনকে একেক খেতাবে ভূষিত করেছে। প্রকৃত পক্ষে এগুলো সংজ্ঞায়িত করার মত কোন বিষয় নয়।[৩]

---

১ নাহজুল হাদীস - পৃঃ ২৩

২ কাওয়ায়েদ লিউলূমিল হাদীস পৃঃ ২৮ ও -এর টিকার তথ্য অবলম্বনে।

৩ গ্রন্থকার।

حدثنا أو أخبرنا ইত্যাদির ব্যবহারিক পার্থক্য ও সংক্ষেপায়নের পদ্ধতি

হাদীস আহরণের মোট ৫টি পন্থা রয়েছে। যথা:

১. السماع : অর্থাৎ উস্তাদ পাঠ করবে, ছাত্র শ্রবণ করবে।

২. القرائة على الشيخ : অর্থাৎ ছাত্র উস্তাদের সামনে পাঠ করবে, উস্তাদ শ্রবণ করবে।

৩. المراسلة بالمكاتبة : অর্থাৎ উস্তাদ চিঠির মাধ্যমে শাগরেদের নিকট হাদীস প্রেরণ করবেন।

৪. المناولة : অর্থাৎ উস্তাদ তার পাণ্ডুলিপি বা পাণ্ডুলিপির কপি, অথবা তাঁর অংশ বিশেষের কপি ছাত্রকে সরবরাহ করবেন।

৫. الوجادة : অর্থাৎ কোন মুহাদ্দিসের পাণ্ডুলিপি কোনভাবে কারো হস্তগত হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ সেই মুহাদ্দিস থেকে উক্ত ব্যক্তি সরাসরি তা লাভ করেনি, তবে অন্য কারো কাছ থেকে তা তার হস্তগত হয়েছে।

যদি উস্তাদ পাঠ করেন, আর ছাত্র শ্রবণ করে হাদীস আরহণ করে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে অন্যের নিকট উক্ত হাদীসটি বর্ণনার সময় سمعت فلاناً يقول، حدثني ، أخبرني ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে কারো কারো মতে এ ধরণের ক্ষেত্রে سمعت فلاناً يقول ব্যবহার করা উত্তম, আর কারো কারো মতে حدثني ব্যবহার করা উত্তম। অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ حدثني শব্দটিই অধিক ব্যবহার করে থাকেন। তবে শ্রবণের সময় তার সঙ্গে অন্য ছাত্র থাকলে حدثنا বা اخبرنا শব্দ বলা বাঞ্ছনীয়।

আর যখন শাগরেদ উস্তাদের সম্মুখে পাঠ করেন, আর উস্তাদ শ্রবণ করেন, সেক্ষেত্রে ছাত্র একা হলে, এই হাদীস অন্যের নিকট বর্ণনার সময় أخبرني وانبأني বলা হয়ে থাকে। আর ছাত্রের সংখ্যা একাধিক হলে اخبرنا ও انبأنا শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অবশ্য যে ছাত্র নিজে পাঠ করেন, তিনি قرأت عليه শব্দটিও উল্লেখ করে থাকেন।

অনেকেই এক্ষেত্রে এরূপ পার্থক্য করে থাকেন, যে ছাত্র নিজে পাঠ করে সে একা হলে أخبرني আর তার সঙ্গে অন্যান্যরা উপস্থিত থাকলে اخبرنا শব্দ ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যে নিজে পাঠ করেনি বরং অন্য ছাত্র পাঠ করেছে, সে সঙ্গে থেকে শ্রবণ করেছে, সে ব্যক্তি انبأنا শব্দ ব্যবহার করবে। তবে এ ধরণের ছাত্রের জন্য قرائةً عليه وأنا أسمع শব্দটি বর্ধিত করে দেওয়া উত্তম।[১]

---

[১] দরসে তিরমিযী তকী উসমানীকৃত পৃ: ৭৯।

ইমাম আবু হানীফা রহ-এর নিকট উস্তাদের সন্মুখে নিজে পাঠ করা এবং এপদ্ধতিতে হাদীস আহরণ করা হাদীস আহরণের সর্বোত্তম পন্থা। কেননা এ পন্থায় হাদীস আহরণে ছাত্র কোথায়ও ভুল করলে উস্তাদ তা শুধরিয়ে দিতে পারে। ফলে এ পন্থায় হাদীস আহরণ নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তবে ইমাম শাফেয়ী ও মালেক রহ. এর নিকট سماع অর্থাৎ শ্রবণ করে আহরণ করা উত্তম।

আর চিঠি (مكاتبة)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত কিংবা পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর (مناولة)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা করার জন্য উস্তাদ থেকে সুস্পষ্ট অনুমতির প্রয়োজন হবে বলে অনেকেই মতামত পেশ করলেও এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত এই যে, যদি ছাত্র চিঠির লেখা দেখে নিশ্চিত হতে পারে যে, এটি তার উস্তাদেরই চিঠি; কিংবা পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করার দ্বারা যদি শাগরেদ এব্যাপারে আশ্বস্ত হয় যে, উস্তাদ তাকে এটি অন্যের নিকট বর্ণনা করার জন্যই সরবরাহ করেছেন, তাহলে সুস্পষ্ট অনুমতি না থাকলেও তাথেকে হাদীস বর্ণনা করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে أخبرني বা حدثني ধরণের শব্দ ব্যবহার করা বৈধ হবে না। চিঠির ক্ষেত্রে كاتبني বা كتب إليّ বা أرسل إليّ এধরণের শব্দ ব্যবহার করতে হবে। আর পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে ناولني শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

আর (الوجادة) বা কারো পাণ্ডুলিপি অন্যের মাধ্যমে হস্তগত হলে তাথেকে حدثنا وأخبرنا বলে হাদীস বর্ণনা করা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে বৈধ নয়। অবশ্য যদি উক্ত ব্যক্তির হস্তাক্ষর তাঁর নিকট জ্ঞাত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে وجدت بخط فلان শব্দ ব্যবহার করে তাতে বিদ্যমান হাদীস অন্যের নিকট বর্ণনা করা যাবে।[১]

সংক্ষেপায়ণ পদ্ধতি :

হাদীসের পাণ্ডুলিপি বা গ্রন্থ তৈরীর ক্ষেত্রে حدثنا ও أنبأنا ইত্যাদি শব্দগুলো যেহেতু বার বার আসে এবং একই সনদে একাধিক বার ব্যবহৃত হয়, সে কারণে পূর্ণশব্দটি বার বার লিখতে গেলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে যায়। এ জন্য গ্রন্থকারগণ এ শব্দ দু'টিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু সংক্ষেপায়নের ক্ষেত্রে সকলেই এক ধরণের রীতি অনুসরণ করেননি। ফলে এই সংক্ষেপায়নের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। আল্লামা সুয়ূতী তাদরীবুর রাবীতে এসম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

---

[১] দরসে তিরমিযী -তকী উসমানীকৃত: ৭৮-৮০ পৃষ্ঠার ভাব অবলম্বনে

১. অনেকেই حدثنا থেকে حد কে ফেলে দিয়ে শুধু ثنا উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকে ث কেও ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র نا উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকেই শুধু "ح" কে ফেলে দিয়ে دثنا উল্লেখ করেছেন।
আল্লামা ইরাকী উল্লেখ করেছেন যে, অনেকেই حدثنا এর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য "ق" অক্ষরটি ব্যবহার করেছেন। পরে অনেকেই এই (ق) অক্ষরটিকে حدثنا -এর সংক্ষেপ ثنا -এর সাথে মিলিয়ে ফেলে قثنا এভাবে লিখেছেন এবং এদ্বারা قال حدثنا বুঝিয়েছেন। আবার অনেকেই ق ثنا এভাবে পৃথক করে লিখেছেন। এটি অবশ্য বর্জিত ব্যবহার।
তবে ইবনুস সালাহ বলেছেন যে, ق অক্ষরটি قال -এর সংক্ষেপ হিসাবে লিখায় উল্লেখ করার প্রচলন বর্তমানে না থাকলেও পাঠের সময় حدثنا -এর পূর্বে অবশ্যই قال শব্দটি পাঠ করতে হবে।

২. اخبرنا কে সংক্ষেপায়ন করে অনেকেই أنا উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ইমাম বায়হাকী اخبرنا কে সংক্ষেপে بنا উল্লেখ করেছেন। তবে এটি অন্যদের দৃষ্টিতে পসন্দনীয় হয়নি। কেননা حدثنا এর সংক্ষেপ ثنا এর সাথে এটি দৃশ্যত: একাকার হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।
আবার পশ্চিমাঞ্চলীয় মুহাদ্দেসীন اخبرنا -এর সংক্ষেপণ করতে গিয়ে কেউ ارنا উল্লেখ করেছেন, আবার অনেকেই اخنا উল্লেখ করেছেন।
আর حدثني শব্দটি অনেকেই সংক্ষেপে ثني অথবা دثني লিখে থাকেন। তবে أخبرني এবং انبأني এবং انبأنا এগুলোর কোন সংক্ষেপরূপ ব্যবহার করা হয় না।(১)

تحويل الإسناد বা সনদের ধারা পরিবর্তন

একটি হাদীস যখন মুহাদ্দিসগণ একাধিক সূত্রে উল্লেখ করেন, তখন প্রতিটি সূত্র উল্লেখ করার পর পর মতনটি উল্লেখ করে থাকেন। এক্ষেত্রে যদি কোন একজন বর্ণনাকারী থেকে হাদীসটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়, তাহলে যাথেকে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হল তাকে বলা হয় مدار السند বা সনদের উৎসমূখ। ঐ মদারে সনদ থেকে যে কয়টি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়, যদি সংগ্রহকারী সেই সূত্রগুলোর মাঝে একাধিক সূত্রে হাদীসটি সংগ্রহ করে থাকেন তাহলে মদারে সনদ পর্যন্ত সূত্রগুলো আগে একের পর এক বর্ণনা করার পর মদারে সনদ থেকে পরবর্তী সূত্রটি এক সাথে বর্ণনা করে থাকেন। এরপর মতনটি উল্লেখ করেন।

তাদরীব।

এধরণের ক্ষেত্রে একটি সূত্র উল্লেখ করার পর অন্য আরেকটি সূত্র শুরু করার পূর্বে তারা "ح" অক্ষরটি লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এই "ح" অক্ষরটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কেও কয়েকটি মতামত রয়েছে। আল্লামা নববী তাকরীবে উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ববর্তীদের কারো কাছ থেকে এর কোন ব্যাখ্যা উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অনেক হাফেযে হাদীস বলেছেন যে, এই "ح" অক্ষরটি صَحَّ এর স্থলে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হল "ح" অক্ষরটি صح অর্থাৎ সূত্রটি সহীহ -এর প্রতি ইঙ্গিত বাচক। ইবনুস সালাহ বলেছেন যে, صح শব্দটি এজন্য উল্লেখ করা হয় যে, বর্ণনাকারী যেহেতু একাধিক সূত্র উল্লেখ করেছেন, তাই এ দ্বারা পাঠকরা যেন এই সন্দেহে না পড়ে যায় যে, সনদটি হয়ত নির্ভরযোগ্য নয়। তাই صح বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয় যে, সনদটি সহীহ। কিংবা এ জন্যও উল্লেখ করা হতে পারে যে, পাঠক যাতে পূর্বের সনদকে পরের সনদের সাথে মিলিয়ে একাকার না করে ফেলে। অর্থাৎ দু'টি সনদের মাঝে পার্থক্য সূচিত করার জন্যই "ح" অক্ষরটি উল্লেখ করা হয়।

কেউ কেউ বলেছেন, এটি التحويل من اسناد إلى اسناد। অর্থাৎ 'এক সনদ থেকে অন্য সনদের দিকে গমন'-এই বাক্যের প্রতি ইঙ্গিতবহ। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি حائل শব্দের সংক্ষেপ অর্থাৎ দুই সনদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টিকারী। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি মূলত হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনার পর الحديث। বলে এমর্মে যে ইঙ্গিত করা হয় যে, 'হাদীসটির শেষ পর্যন্ত'- তারই সংক্ষেপ। অর্থাৎ এই সনদে হাদীসটির শেষ পর্যন্ত।

অনেকেই মনে করেন যে, এই "ح" অক্ষরটি পাঠের সময় উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। তবে আল্লামা নববী রহ. মনে করেন যে, "حا" উচ্চারণ করে পাঠ করাই গ্রহণযোগ্য অভিমত।[১]

(الرواية بالمعنى) হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনার বিধান

ইবনুল মুতাহহার 'নেহায়াতুল উসূল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রিওয়ায়াত বিল মা'না বা হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ কি না এ নিয়ে মনীষীদের মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. ইমাম মালিক রহ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ইমাম হাসান বসরী রহ. সহ অধিকাংশ ফিকাহবিদ ও বহু মুহাদ্দিসীন তিনটি শর্তে হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনাকে বৈধ বলেছেন। শর্ত তিনটি হল -

---

১ তাদরীবুর রাবী দ্রষ্টব্য।

১. ভাষান্তরটি অবশ্যই হাদীসটির মূল অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ না হতে হবে।
২. ভাষান্তরের ক্ষেত্রে কোনরূপ কম বেশী করা যাবে না।
৩. তরজমা অবশ্যই মূলানোগ হতে হবে। যেখানে যতটুকু স্পস্ট বা অস্পষ্ট আছে সেটাকে হুবহু সেরূপই রাখতে হবে। কেননা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বর্ণনার মাঝে কোন হিকমত নীহিত থাকতে পারে। তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না।[১]

আব্দুল হক দেহলভী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশের মতে হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ। তবে তা এমন ব্যক্তির জন্য বৈধ যিনি-

ক. আরবী ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ।
খ. বাক্যের গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত।
গ. বাক্যের তরকীব ও বিন্যাসের বিভিন্ন প্রেক্ষিত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন।
ঘ. বক্তব্যের ভাব অনুধাবনের বিষয়ে প্রাজ্ঞ।

এধরণের ব্যক্তিরা ভাবার্থ বর্ণনা করলে ভুল করার কিংবা কম বেশী করে ফেলার সম্ভবনা থাকে না।

অনেকেই বলেছেন শব্দের ভাষান্তর কিংবা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা বৈধ হলেও বাক্যের গঠন প্রকৃতির কোন পরিবর্তন করা যাবে না।

আবার অনেকেই বলেছেন হাদীসটি হুবহু শব্দে যার কাছে সংরক্ষিত আছে তিনি ভাবার্থ বর্ণনা করতে পারবেন। কেননা মূল হাদীসটি সংরক্ষিত থাকলেই যথযথ ভাবার্থ বর্ণনা করা সম্ভব হবে।

আবার অনেকেই বলেছেন হাদীসের অর্থ যার হুবহু মনে আছে কিন্তু শব্দ ভুলে গেছেন, কোন বিধান আহরণের প্রয়োজনে তিনি ভাবার্থ বর্ণনা করতে পারবেন।[২]

তবে যারা বক্তব্যের ধরণ এবং শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে জাহেল তাদের জন্য হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা বৈধ না হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।[৩]

যারা হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনাকে বৈধ মনে করেন তাদের দলীল

১. অনারবীয়দের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় শরীয়তের ব্যাখ্যা প্রদান করা বৈধ। যখন আরবীকে অনারবীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয় তখন সেটা ভাবার্থ প্রকাশই

---

১ ফতহুল মুলহিম পৃ: ২২০-২২১
২ মুকাদ্দামায়ে মিশকাত
৩ ফতহুল মুলহিম পৃ: ২২১।

হয়ে থাকে। সুতরাং আরবী ভাষায় কেউ যদি হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করে তাহলে তা অবশ্যই বৈধ হবে।

২. সাহাবীগণ একই মজলিশে নবী সা. সংক্রান্ত কোন ঘটনা বিভিন্ন জন বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে কেউ আপত্তি করেন নি। এতে বুঝা যায় যে, তারা একই ভাব বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করার বিষয়টিকে মেনে নিয়েছিলেন।

৩. ইবনে মাসউদ রা. কোন হাদীস বর্ণনা করার পর বলতেন قال رسول الله ﷺ كذا أو نحوه এ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি হুবহু শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। তা না হলে এরূপ বলতেন না।

৪. এক হাদীসে আছে যে, নবী সা. বলেছেন إذا أصبتم المعنى فلا بأس যদি তোমরা অর্থ যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পার তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যদিও ইবনুল জাওযী হাদীসটি মওযূ বলে দাবী করেছেন; কিন্তু আল্লামা সাখাভী তা মেনে নেননি।

৫. মকহুল বলেন, একবার আমরা হযরত ওয়াসেলা রা. এর দরবারে গেলাম এবং তাকে বললাম যে, আপনি আমাদেরকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূল সা. থেকে সরাসরি শ্রবণ করেছেন, যে হাদীসের ব্যাপারে আপনার কোন দ্বিধা-দ্বন্ধ নেই, যা আপনি ভুলেও যাননি এবং যাতে আপনার পক্ষ থেকে কোন পরিবর্ধনও নেই। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি কুরআন পড়েছ? আমরা বললাম হ্যাঁ। তবে আমরা খুব ভাল করে তা হিফয করতে পারি না। অনেক সময় واو কিংবা الف বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে ফেলি। তিনি বললেন, কুরআন তোমাদের সামনে লিপিবদ্ধ আকারে রয়েছে। তাই তোমরা সেভাবে মুখস্ত করতে পার না, কম বেশী করে ফেল। তাহলে সেই হাদীসগুলোর অবস্থা কি হতে পারে যা আমরা নবী সা. থেকে শ্রবণ করেছি। অনেক ক্ষেত্রে হাদীসটি আমরা মাত্র একবারই শুনেছি। অতপর তিনি বললেন- حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى – যদি আমরা কোন হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করি তাহলে তাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।[১]

অবশ্য একদল ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিস রিওয়ায়াত বিল মা'না বা হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করাকে বৈধ মনে করেন না। যারা ভাবার্থ বর্ণনাকে বৈধ মনে করেন না তারাও কোন এক শব্দের স্থলে সমার্থক অন্যশব্দ ব্যবহারকে বৈধ মনে করেন।

---

[১] ফতহুল মুলহীম পৃঃ ২২২।

ইবনে আওন উল্লেখ করেছেন যে, হাসান বসরী, ইব্রাহীম নাখয়ী ও শা‘বী হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করতেন। তবে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, ইবনে সীরীন, রাজা‘ ইবনে হায়ওয়াতা হুবহু শব্দে হাদীস বর্ণনা করতেন।[১]

যারা হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ মনে করেন না তাদের দলীল

১. রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন -

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيَ فوعاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ مبلغ أوْعى مِن سَامِعٍ حَامِلِ فقْهٍ ليسَ بفقيه، وَرُبَّ حَامِلِ فقْهٍ إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব করুন, যে আমার বক্তব্যকে শ্রবণ করেছে, অতপর তা সংরক্ষণ করেছে এবং যেরূপ শ্রবণ করেছিল হুবহু সেইরূপ অন্যের নিকট পৌঁছিয়েছে। বস্তুতঃ অনেক সময় যে সরাসরি শ্রবণ করে তার চেয়ে যার কাছে তা পৌঁছানো হয় সে অধিক সংরক্ষণগুণের মালিক হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বহণকারী নিজে প্রজ্ঞাবান হয় না। আবার অনেক সময় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বাহক তা বহন করে এমন ব্যক্তির কাছে নিয়ে যায়, যে তার চেয়েও অধিক প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে থাকে। এই হাদীস থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, হুবহু শব্দ ধারণ করে তা হুবহু শব্দে বর্ণনা করাই সঙ্গত।

২. অভিজ্ঞতা দ্বারাও বুঝা যায় যে, যদি হাদীসটি নবী সা. থেকে যে শব্দে বর্ণিত হয়েছে, হুবহু সেই শব্দে বর্ণিত হয় তাহলেই পরবর্তীদের জন্য তাথেকে বিভিন্ন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা সম্ভব।

৩. জনৈক সাহাবীকে নিদ্রায় যাওয়ার পূর্বে যে দু‘আ নবী সা. শিখিয়ে ছিলেন, তাতে ونبيك -এর স্থলে উক্ত সাহাবী ورسولك পড়লে নবী সা. তাকে শুধরিয়ে ونبيك পড়তে বলেছিলেন। এ থেকেও বুঝা যায় যে, হুবহু শব্দেই হাদীস বর্ণনা করতে হবে। উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণের ভিন্ন ব্যাখ্যাও রয়েছে। তবে দলীল প্রমাণের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হুবহু শব্দে হাদীস বর্ণনা করার বৈধতা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও হুবহু শব্দে বর্ণনা করা যে উত্তম তাতে কারো দ্বিমত নেই। অনেকেই মনে করেন, এই বিতর্ক গ্রন্থাকারে হাদীসগুলো সংকলিত হয়ে যাওয়ার পূর্বের। গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়ে যাওয়ার পর ভাবার্থ বর্ণনার প্রশ্ন আর থাকেনি। আমাদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য মত নয়। বরং কোন হাদীস লিখিত আকারে পেশ করতে হলে তা অবশ্যই হুবহু শব্দে হতে হবে। কিন্তু বলার ক্ষেত্রে ভাবার্থ বর্ণনার অবকাশ সর্বকালেই থাকবে। তবে ভাবার্থ বর্ণনার জন্য যে শর্ত-শারায়েতের কথা উল্লেখ করা রয়েছে তা অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হবে।

---

[১] ফতহুল মুলহীম খ:১পৃ:১২৭।

কাজী ইয়াজ বলেছেন -

ينبغى سدّ باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن.

যারা যথার্থরূপে ভাবার্থ বর্ণনা করতে পারে না অথচ তারা মনে করে যে তারা পারে, এধরণের লোকদের দৌরাত্ম বন্ধ করার জন্য হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া উচিত।

ইবনুস সালাহ বলেছেন-

ينبغى لمن يروى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال– أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ. كما كان يقول إبن مسعود وأبوالدرداء وأنس رض

যিনি হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করবেন তার উচিত বর্ণনা শেষে أوكما قال -বা এধরণের কোন বাক্য বলা। যেরূপ হযরত ইবনে মাসউদ, আবুদ দারদা ও আনাস রা. প্রমুখ বলতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

মাকবূল হাদীস ও তার শ্রেণী বিভাজন

গ্রহণযোগ্যতার বিচারে হাদীসকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা:
১. মাকবূল - (গ্রহণযোগ্য)। **২.** মারদূদ - (অগ্রহণযোগ্য বা বর্জনীয়)।

মাকবূল (المقبول) :

আভিধানিক অর্থ :

মাকবূল শব্দটি বাবে سمع থেকে ইসমে মফঊলের সীগাহ। যার অর্থ গ্রহণীয়, গ্রহণযোগ্য, সমর্থিত, সর্বজন বরেণ্য ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : الخبرُ الذي يوجدُ فيه شروطُ القبولِ كلّها فهُو المقبولُ.

এমন ধরণের রিওয়ায়াতকে মাকবূল বলা হয়, যাতে রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার যাবতীয় শর্তাবলী বিদ্যমান রয়েছে।[১]

রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত ৪টি :

১. সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন হওয়া।
২. বর্ণনাকারীগণ আদিল (বা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ), যাবিত (বা পূর্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী/সংরক্ষণ গুণের অধিকারী) হওয়া।
৩. রিওয়ায়াতটি শায না হওয়া।[২]
৪. রিওয়ায়তটি মু'আল্লাল বা ত্রুটিযুক্ত না হওয়া।[৩]

* ফতহুল মুলহিমে এর সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে দেওয়া হয়েছে-

هُوَ ما دَلّ دليلٌ عَلى رُجحانِ ثبوتِه فِي نَفسِ الأمرِ .

যে রিওয়ায়াত বাস্তবে বিদ্যমান থাকার দিকটি কোন দলীল দ্বারা প্রাধান্য পেয়েছে। তাকে মাকবূল বলা হয়

---

১ আল-ওয়াযিউ ফিল হাদীস,

২ শায বলা হয় এমন নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে যা তার চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য কোন রাবীর বর্ণিত রেওয়ায়াতের সাথে বৈপরিত্যপূর্ণ।

৩ আল-ওয়াযিউ ফিল হাদীস পৃ: ৫৮-৫৯

মারদূদ (المردود) :

আভিধানিক অর্থ :

মারদূদ শব্দটি باب نصر থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। যার অর্থ প্রত্যাখ্যাত, বর্জিত, অগ্রহণযোগ্য।

পারিভাষিক অর্থ :

الخبرُ الذي لاَ يُوجدُ فيه شرُوطُ القبولِ كلُّها أو بَعضُها فهُوَ المردودُ

যে রিওয়ায়াতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোন একটি শর্ত অথবা সবকটি শর্তই বিদ্যমান না থাকে তাকে মারদূদ বলা হয়।[১]

অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হওয়ার চারটি শর্তের কোন একটি অনুপস্থিত থাকলেও তা মারদূদ বলে গণ্য হবে। আর একাধিক শর্ত অনুপস্থিত থাকলে কিংবা কোন শর্তই বিদ্যমান না থাকলে তা তো অবশ্যই মারদূদ বলে গণ্য হবে।

ফতহুল মুলহিমে এর সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে দেওয়া হয়েছে :

هُوَ ما دَلّ دليلٌ عَلى رُجحانِ عدمِ ثبوتِه فِي نَفسِ الأمرِ .

যে রিওয়ায়াত বাস্তবে বিদ্যমান না থাকার দিকটি কোন দলীল দ্বারা প্রাধান্য পেয়েছে, তাকে মারদূদ বলা হয়। সাধারণত: মারদূদ হাদীসকে যয়ীফ বলা হয়ে থাকে। মারদূদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আসবে।

মাকবূলের প্রকারভেদ :

মাকবূল রিওয়ায়াত সমূহকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ
১. মুতাওয়াতির (বহুসূত্রে বর্ণিত)।
২. খবরে ওয়াহিদ (সীমিত সূত্রে বর্ণিত)।

খবরে মাকবূলের হুকুম : يجب العمل به عند الجمهور

জমহুরের অভিমত অনুসারে খবরে মাকবূলের দ্বারা যে বিষয় প্রমাণিত হবে তা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য।[২]

يجب العمل به "তার উপর আমল করা ওয়াজিব" এর অর্থ এই নয় যে, খবরে মাকবূল দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে তাই ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। কেননা খবরে মাকবূল দ্বারা কোন মুস্তাহাব বা মুবাহ বিষয়ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বরং এর

[১] আল্-ওয়ায্উ ফিল হাদীস পৃ: ৬৩

[২] শরহে নুখবা

অর্থ হল খবরে মাকবূল দ্বারা ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, মুবাহ যাই প্রমাণিত হোক তাকে শরয়ী প্রমাণ-সিদ্ধ বিষয় বলে অবশ্যই গণ্য করতে হবে এবং যথা মর্যাদায় তা বাস্তবায়ন করতে হবে। খবরে মাকবূল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়কে শরয়ী প্রমাণ-সিদ্ধ বিষয় নয় বলে মনে করে উপেক্ষা করা যাবে না। কারণ খবরে মাকবূল শরয়ী প্রমাণসমূহের একটি।

সারকথা এই, খবরে মাকবূলকে অবশ্যই শরয়ী প্রমাণ বলে গণ্য করতে হবে। এবং তা দ্বারা যে বিষয়ের দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে তাকে শরয়ী প্রমাণপুষ্ট বিষয় বলে ধরে নিয়ে যথা মর্যাদায় তা বাস্তবায়ন করতে হবে।[১] খবরে মাকবূল শরয়ী প্রমাণ হওয়ার ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীন এবং তৎপরবর্তী ফিকাহ্‌বিদ ও মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমত্য রয়েছে।[২]

মুতাওয়াতির (المتواتر)

আভিধানিক অর্থ :

মুতাওয়াতির শব্দটি تواتر শব্দ থেকে ইসমে ফায়েলের সীগাহ। যার অর্থ হল কোন কিছু অবিরতভাবে ঘটা, পর্যায়ক্রমে ঘটা, একের পর এক ঘটা। 'অবিরত বর্ষণ হচ্ছে' একথা বুঝাতে আরবরা বলে থাকে تواتر المطر[৩]

যে সকল হাদীস বহুসূত্রে বর্ণিত, সেগুলোর সূত্রকে বৃষ্টিধারার সাথে উপমা দিতেই সম্ভবত সেগুলোকে মুতাওয়াতির নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেন সূত্রগুলো একের পর এক আসতেই থাকে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

الخبرُ الذي ثبتَ بطروقٍ كثيرةٍ بحيثُ تحيلُ العادةُ تواطؤَهم عَلى الكذب.

যে হাদীস এত অধিক সূত্রে বর্ণিত যে, এত মানুষের মিথ্যার উপর ঐক্যমত্যে উপনীত হওয়া স্বভাবত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির বলে।

মুতাওয়াতির প্রধানত দুই প্রকার। যথা:

১. تواتر الإسناد তাওয়াতুরুল ইসনাদ বা সনদের প্রেক্ষিতে মুতাওয়াতির।

২. تواتر الطبقة তাওয়াতুররুত্-তাবকা বা যুগ প্রেক্ষিতে মুতাওয়াতির।

---

[১] শরহে নুখবার টিকা আব্দুলাহ টুঙকীকৃত -এর ভাব অবলম্বনে।

[২] শরহে নুখবার টিকা মাও. আব্দুলাহ টুংকীকৃত।

[৩] মুসতালাহুল হাদীস মাহমূদ আত-তাহহানকৃত পৃ: ১৮

১. তাওয়াতুরে ইসনাদ :

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

مَا رَواه عددٌ كثيرٌ تحِيلُ العادةُ تَواطُؤَهم عَلى الكذبِ (ويكون مستَنَد روايتِهم الحسّ)

যে হাদীস এমন অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যাদের মিথ্যার উপর ঐক্যমত্যে উপনীত হওয়া স্বভাবত অসম্ভব। আর তাদের এই বর্ণনার ভিত্তি হবে ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধির উপর; অর্থাৎ বর্ণনাকারী নিজ চোখে দেখে বা নিজ কানে শুনে সেই সংবাদ পরিবেশন করবেন তাহলে তাকে তাওয়াতুরে ইসনাদ বা সনদের প্রেক্ষিতে মুতাওয়াতির বলা হবে। (তাই যদি কোন কথা বহু সংখ্যক ব্যক্তি বর্ণনা করেন অথচ যদি বিষয়টি চোখে দেখা বা কানে শুনা বা স্পর্শ করে অনুভব করার মত না হয় বরং চিরন্তন সত্য বা বিবেক প্রসূত কোন বিষয় হয় তাহলে তাকে খবরে মুতাওয়াতির বলা হবে না।)

একারণেই আল্লামা জাযায়েরী মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন:

هو خبرٌ عن محسوسٍ أخبَرَ به جماعةٌ بَلغوا في الكثرةِ مَبلغًا تحِيلُ العادةُ تواطؤَهم عَلى الكذب فيه.

ইন্দ্রিয়ানুভূত কোন বিষয়ের সংবাদ যদি এমন সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হয়, যাদের এ ক্ষেত্রে মিথ্যার উপর ঐক্যমত্য গড়ে উঠা স্বভাবত অসম্ভব। তাহলে তাকে খবরে মুতাওয়াতির বলে। [১]

অবশ্য অনেকেই খবরের ভিত্তি ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধির উপর হওয়ার শর্তারোপকে অর্থহীন বলে মনে করেন। কেননা যেহেতু আলোচনার মূল বিষয় হল খবর, বক্তব্য নয়। তাই কোন বিষয়ে খবর দিতে হলে তা চোখে দেখে বা কানে শুনেই দিতে হবে।

তাওয়াতুরে ইসনাদের শর্তসমূহ:

তাওয়াতুরে ইসনাদের উপরোক্ত সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন হাদীস সনদের প্রেক্ষিতে মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত ৪টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে :

১. বর্ণনাকারী নিজের চোখে দেখে কিংবা নিজের কানে শুনে সংবাদটি পরিবেশন করবেন। যেমন সাহাবী বলবেন যে, আমি রাসূল সা. কে এরূপ করতে দেখেছি, বা বলতে শুনেছি। কিন্তু যদি কোন সাহাবী শুনেছি দেখেছি যুক্ত না করে বলেন যে, "জগত পরিবর্তনশীল"। আর এ কথা যদি বহু ব্যক্তি

---

[১] তাওযীহুন নযর পৃ: ৩৩

বলেন যাদের মিথ্যার উপর ঐকমত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব; তাহলেও তা খবরে মুতাওয়াতির বলে গণ্য হবে না। বরং তা চিরন্তন সত্য বলে গণ্য হবে।

২. বিষয়টি বহুসংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হতে হবে।

৩. এই সংখ্যাধিক্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সনদের প্রতি স্তরেই বিদ্যমান থাকতে হবে।

৪. সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি এমন পর্যায়ের হতে হবে যে, সাধারণত এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি পরিকল্পিতভাবে কোন বিষয়ে মিথ্যা উপাখ্যান তৈরীর জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। যেমন তারা বিভিন্ন অঞ্চলের হবেন, ভিন্ন ভাষাভাষী হবেন, বিভিন্ন মতাবলম্বী হবেন, বিভিন্ন যুগের হবেন ইত্যাদি।

* তাওয়াতুরে ইসনাদ দুইভাগে বিভক্ত :

ক. التواتر اللفظي খ. التواتر المعنوي

ক. তাওয়াতুরে লফজীর সংজ্ঞা :

وهوَ ما اتفقَتْ فيه الرواياتُ لفظًا ويصِلُ إلى حَدِّ التواتُر.

যে সংখ্যায় পৌঁছলে রিওয়ায়াতটি মুতাওয়াতির বলে গণ্য হয় তা বিদ্যমান থাকলে এবং তার সবগুলোতেই যদি বর্ণিত হাদীসটি শব্দের দিক থেকে হুবহু একই রূপে বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে তাওয়াতুরে লফজী বলে। যেমন :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ.

যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নাম তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

ইবনুস সালাহ বলেছেন যে, এ রিওয়ায়াতটি ৬২জন সাহাবী থেকে বর্ণিত।[১] এ ছাড়া হাউজে কাউসার সংক্রান্ত হাদীসটি পঞ্চাশোর্ধ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত; মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসটি সত্তর জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। [২]

অবশ্য ফতহুল বারীতে উলেখ করা হয়েছে যে এ হাদীসটি ৩০জন সাহাবী থেকে সহীহ ও হাসান পর্যায়ের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[৩]

---

১ ফতহুল মুলহিম, ১ম খন্ড পৃ: ৫

২ তাদরীবুর রাবী - ২য় খন্ড: পৃ:১৭৭-১৭৯।

৩ ফতহুল মুলহিম, ১ম খন্ড পৃ: ৫ ও পৃ: ১৮১

খ. তাওয়াতুরে মা'নবীর সংজ্ঞা :

وهو ما اختلفت فيه الروايات غير أنها تتفق في أمر مشترك يوجد في جميع الروايات على اختلافها ويصل الروايات إلى حدّ التواتر في ذلك الأمر المشترك ويسمّى هذا القسم من المتواتر "تواتر قدر المشترك" أيضاً –

বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে যদি কোন একটি বিশেষ বিষয়ে ঐক্যমত্য পাওয়া যায়, আর সেই রিওয়ায়াতগুলো যদি সংখ্যায় এত হয় যা তাওয়াতুরের স্তরে পৌঁছে যায় তাহলে তাকে তাওয়াতুরে মা'নবী বলে। তাওয়াতুরের এই প্রকারকে 'তাওয়াতুরে কদরে মুশতারাক' নামেও নামকরণ করা হয়। অর্থাৎ যেসব রিওয়ায়াতে ঐ বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যাবে তা যদি সংখ্যায় তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছে যায় তাহলে ঐ বিশেষ বিষয়টি মুতাওয়াতির বলে গণ্য হবে। যেমন -একজন বর্ণনা করল হাতেম ১০০ উট দান করেছে, আরেকজন বর্ণনা করল হাতেম ১ লাখ দীনার দান করেছে, আরেকজন বর্ণনা করল যে, হাতেম প্রতিদিন ১০জন মিসকীনকে খানা দিতেন, আরেকজন বর্ণনা করল হাতেমের বাড়ীতে মেহমানদারী চলতেই থাকত। এভাবে যেতে যেতে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছে গেল।

এই সব বর্ণনা থেকে একটি বিষয়ে ঐক্যমত্য পাওয়া যায় যে, হাতেম অত্যন্ত দানবীর ছিলেন। যদিও প্রতিটি বর্ণনাই পৃথক অর্থ বহন করে। তবে হাতেমের দানশীল হওয়ার অর্থ সকল বর্ণনাতেই বিদ্যমান আছে এবং এ বিষয়টির ইঙ্গিত সব বর্ণনাতেই রয়েছে। যেহেতু রিওয়ায়াতগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক হলেও একটি বিশেষ বিষয়ে ঐক্যমত্য রয়েছে এবং তা তাওয়াতুরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, এজন্য একে 'তাওয়াতুরে কদরে মুশতারাক' নামেও নামকরণ করা হয়ে থাকে। যদিও এক্ষেত্রে প্রতিটি রিওয়ায়াত পৃথক পৃথকভাবে মুতাওয়াতির পর্যায়ের নয়। তবে ঐ বিশেষ অর্থ বহনের ক্ষেত্রে সবগুলো বর্ণনা মিলে তা সংখ্যায় এত হয়ে গেছে যা মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য প্রয়োজন। তাই ঐ অর্থের ক্ষেত্রে বর্ণনাগুলো সম্মিলিতভাবে মুতাওয়াতির। যেমন: দু'আর সময় রাসূল সা. -এর হাত উঠানোর বর্ণনাটি এর উদাহরণ। আলামা সুয়ূতী রহ. তাদরীবুর রাবীতে উল্লেখ করেছেন যে, দু'আর সময় রাসূল সা.-এর হাত উঠানোর বর্ণনাটি প্রায় একশত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে এতদসংক্রান্ত তার লেখা গ্রন্থ - فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء তে তিনি মোট ৫৫টি হাদীস উল্লেখ করেছেন; যার মাঝে কতিপয় মওকূফ রিওয়ায়াতও রয়েছে।

বর্ণিত হাদীসগুলো বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা বটে, যার প্রত্যেকটি মুতাওয়াতির নয়। তবে দু'আয় হাত উঠানোর বিষয়টুকু সব বর্ণনায় বিদ্যমান রয়েছে। অতএব

দু'আয় হাত উঠানোর বিষয়টি সকল বর্ণনার সমন্বয়ে মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছে গেছে।[১]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যখন কোন রিওয়ায়াত মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছে যায় তখন তার বর্ণনাকারীদের আদিল বা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিষয়টি শর্তরূপে বিবেচ্য হয় না। ইবনুল হাম্বলী উল্লেখ করেছেন: ومن شانه أن لا يشترط عدالة رجاله মুতাওয়াতিরের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তার বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে আদালতের শর্তারোপ করা হয় না।[২]

আল্লামা সুয়ূতী তাদরীবুর রাবীতে উল্লেখ করেছেন : يجب العمل من غير بحث عن رجاله অর্থাৎ যে হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছে যায় তার বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে যাচাই-বাছাই ছাড়াই তার উপর আমল করা ওয়াজিব।[৩]

তাওরাতুরে ইসনাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সংখ্যক সূত্রের শর্ত রয়েছে কি না?

(সকল ব্যাখ্যাকারগণ নূন্যতম পক্ষে কতজন ব্যক্তি থেকে বর্ণিত থাকলে হাদীসটিকে মুতাওয়াতির বলা হবে এতদসংক্রান্ত এই আলোচনাটি তাওয়াতুরের সকল শ্রেণীর সাথেই সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন। তবে আমাদের বিভাজন ও সংজ্ঞা অনুসারে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা সংক্রান্ত এই আলোচনাটি তাওয়াতুরে ইসনাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট হতে পারে। কেননা তাওয়াতুরে তবকার ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির হওয়ার বিষয়টি রাবীদের সংখ্যার সাথে সংশ্লিষ্টই নয়।) -গ্রন্থকার

অনেকেই মনে করেন যে, তাওয়াতুরে ইসনাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি থেকে হাদীসটি বর্ণিত থাকতে হবে। তবে এই সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বহু মতামত রয়েছে। প্রত্যেক মতের প্রবক্তরা কুরআনে কারীমের এমন কোন একটি আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যাতে উক্ত সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে।) যেমন:

১. কাজী বাকেল্লানী বলেন যে, ولايكفي إلاّ أربعة কমপক্ষে চার জন ব্যক্তি থেকে হাদীসটি বর্ণিত থাকতে হবে। কেননা ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ার জন্য ৪জন সাক্ষীর উপস্থিত করার কথা কুরআনে বলা হয়েছে।[৪]

---

[১] মাও. আব্দুল মালেক রচিত শরহে নূখবার পাণ্ডুলিপি থেকে উদৃত।

[২] কাফউল আসার- পৃ: ৪৬

[৩] শরহে নূখবা পাণ্ডুলিপি মাও. আব্দুল মালেককৃত।

[৪] সূরা-২৪ আয়াত -১৩ দ্রষ্টব্য।

২. কারো কারো মতে কমপক্ষে ৫ জন ব্যক্তি থেকে হাদীসটি বর্ণিত থাকতে হবে। কেননা লি'আনের ক্ষেত্রে ৫ সংখ্যাটিকে আল-কুরআনে গ্রহণ করা হয়েছে।(১)

৩. কেউ কেউ সাত জন ব্যক্তি থেকে হাদীসটি বর্ণিত থাকতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা কুরআনে সাক্ষীদের বিভিন্ন পর্যায়ের উল্লেখ রয়েছে। যেমন- কোন ক্ষেত্রে ৪ জন, কোন ক্ষেত্রে ২ জন, কোন ক্ষেত্রে ১ জন। এসবগুলোর সমষ্টি হয় সাত। (২)

৪. আল্লামা ইসতাখরী বলেছেন যে, এর বর্ণনাকারীদের সর্বনিম্ন সংখ্যা হতে হবে দশ।(৩) কেননা জময়ে কাসীর (جمع كثير)-এর প্রথম সংখ্যা ১০। আল্লামা সুয়ূতী রহ. এমতটিকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত বলে মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন تلك عشرة كاملة ।(৪)

৫. কারো মতে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হতে হবে বার।(৫) কেননা আল্লাহ বনী ইসরাঈলে ১২জন নকীব প্রেরণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে- وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا আমি তাদের মাঝ থেকে ১২ জনকে নকীব মনোনীত করেছিলাম।(৬)

৬. কারো মতে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হতে হবে বিশ। কেননা আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ
তোমরা ধৈর্যশীল বিশ জন হলে দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে।(৭)

৭. কারো মতে তাদের সর্বনিম্ন সংখ্যা হতে হবে চল্লিশ।(৮) কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন : حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ তোমার জন্য আল্লাহ এবং যারা তোমার অনুসরণ করে এসব মু'মিনরাই যথেষ্ট।(৯) আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় মু'মিনদের সংখ্যা ছিল ৪০।

---

১ সূরা: নূর, আয়াত: ৭ দ্রষ্টব্য।
২ তাদ্‌রীবুর রাবী - পৃ: ৪৫০
৩ তাদ্‌রীবুর রাবী
৪ সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৯৬।
৫ তাদ্‌রীবুর রাবী
৬ সূরা: মায়েদাহ, আয়াত: ১২।
৭ সূরা: ৬ আয়াত ১২।
৮ তাদরীব - পৃ: ৪৫০
৯ সূরা: আনফাল, আয়াত: ৬৪ দ্রষ্টব্য।

৮. কারো মতে তাদের সংখ্যা হতে হবে ৫০। কেননা মৃত ব্যক্তির মিরাস যারা পাবে বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা হল পঞ্চাশ জন। [১]

৯. কারো কারো মতে তাদের সর্বনিম্ন সংখ্যা হতে হবে সত্তর।[২] কেননা হযরত মূসা আ. তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় সত্তর জন ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে সঙ্গে নিয়েছিলেন।[৩]

১০. কারো মতে এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হতে হবে তিনশত তের। কেননা তিনশত তের জন ছিল তালোতের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা কিংবা বদরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা।[৪]

যেহেতু কুরআন বর্ণিত উপরোক্ত সংখ্যাগুলো আপন স্থানে নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিরূপে গণ্য হয়েছে, এজন্যই এসংখ্যাগুলোর একেকটিকে একেক জন মুতাওয়াতিরের সংখ্যা রূপে গণ্য করেছেন। তবে এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে মুতাওয়াতিরের সংখ্যার উপর প্রমাণ পেশ করা মোটেও যুক্তিযুক্ত কোন বিষয় নয়। কেননা এসকল আয়াতের কোনটিতেই স্পষ্টত: এমন কোন কথা উল্লেখ নেই যে, এই সংখ্যা হলে তা মুতাওয়াতির বলে গণ্য হবে।[৫] তাছাড়া কুরআনে তো এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যার কথাও উল্লেখ আছে। তাই বলে কি সেগুলোকেও মুতাওয়াতিরের সংখ্যা হিসাবে গণ্য করা যাবে?

উপরন্তু কোন ক্ষেত্রে কোন একটি সংখ্যা নিশ্চিত প্রত্যয় সৃষ্টি করলেও সর্বত্রই তা নিশ্চিত প্রত্যয় সৃষ্টি নাও করতে পারে।

তবে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হলো, এমন বহুসংখ্যক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হতে হবে, যাদের মিথ্যার উপর ঐক্যমত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব। বিষয়টি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন রকম হতে পারে। দশ জন আল্লাহ ওয়ালা, বুযুর্গ, প্রাজ্ঞ আলেমের কথায় যে প্রত্যয় জন্মায়, দশ জন সাধারণ মানুষ বা দশ জন ছাত্রের কথায় সে প্রত্যয় জন্মায় না। তাই বিষয়টি কোন সংখ্যায় সীমিত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

আল্লামা সুয়ূতী রাহ. তাদরীবুর রাবীতে উল্লেখ করেছেন যে:

ولا يُعتبر فيه عَددٌ معينٌ في الأصحّ –

বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে এক্ষেত্রে কোন বিশেষ সংখ্যা থাকার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা ইবনে হজর রহ.-এর অভিমতও এটিই। আল্লামা

---

১. শরহে নুখবা মাও. আঃ মালেককৃত পাণ্ডুলিপি।

২. তাদরীব - পৃ: ৪৫০

৩. সূরা: ৬, আয়াত ১৫৫ দ্রষ্টব্য।

৪. তাদরীব - পৃ: ৪৫০

৫. সুবহী আস-সালেহকৃত উলূমুল হাদীস পৃ: ১৪৭-১৪৮।

তাহের জাযায়েরী রহ.ও এ অভিমত পোষণ করেন। এ বিষয়টির উপর তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১]

২. তাওয়াতুরে তবকার সংজ্ঞা :

هوَ مَا تَلقاه كلُّ طبقةٍ نازلةٍ عنِ الطبقة التي فوقَها (و رُواتُه في كلّ طبقةٍ غيرُ محصُورين.

যে বিষয় এক স্তরের লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী স্তরের লোকদের থেকে আহরণ করেছে (প্রত্যেক স্তরে বিষয়টির বর্ণনাকারীর সংখ্যা অসংখ্য-অগণিত) তাকে তাওয়াতুরে তাবকা বলা হয়।[২]

বস্তুতঃ এক্ষেত্রে বিষয়টি কোন সূত্রের উপর ভিত্তিশীল নয়। বরং এক যুগের বহু সংখ্যক মানুষ বিষয়টি জানত বা করত; পরবর্তী যুগে বহু সংখ্যক লোক বিষয়টি পূর্ববর্তীদের মুখে শুনে শুনে জেনেছে বা তাদেরকে দেখে দেখে করেছে। যেমন আমাদের কাছে বিদ্যমান কুরআনই সেই কুরআন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল- এ বিষয়টি কোন নির্ধারিত সূত্রের ভিত্তিতে নয় বরং এক যুগের মানুষ থেকে পরবর্তী যুগের মানুষ জেনেছে। এভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত বিষয়টি এভাবেই এসেছে। সবাই জানে এটি আল্লাহর কালাম যা রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এমনকি মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের নিকটই বিষয়টি স্বীকৃত। একান্ত বিদ্বেষমূলক মনোবৃত্তির অধিকারী ছাড়া কেউ একে অস্বীকার করে না। অনুরূপভাবে নামাযের জন্য অযূ করার বিষয়টিও।

তাওয়াতুরে তবকাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

ক. التواتر بالعمل তাওয়াতুর বিল আমল।

খ. التواتر بمفهوم الخبر তাওয়াতুর বি মফহুমিল খবর।

ক. তাওয়াতুর বিল আমলের সংজ্ঞা :

وهوَ ما تواترَ على سبيل التعاملِ والتوارثِ وتوارثَ ذلك العملَ كلُّ جِيلٍ لاحقٍ أو طبقةٍ لاحقةٍ عْن سابقِها إلى أن ينتهى الأمرُ إلى عهدِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم –

বহু সংখ্যক লোকের আমলের মাধ্যমে যা এক যুগ থেকে অন্য যুগ পর্যন্ত গড়িয়েছে। প্রত্যেক যুগের লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকদেরকে আমল করতে দেখে নিজেরা আমল করেছে। এভাবে বিষয়টি রাসূল সা.-এর যুগ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

---

১ আল-ফুসূল ফিল উসূল:- খ:৩- পৃ: ৫৭।

২ তাদ্‌রীবুর রাবী - ৪৫০

যেমন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার বিষয়টি। এ ব্যাপারে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনা যে, রাসূল সা. ও তাঁর সাহাবীগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করেছেন। পরবর্তীতে তাঁর ধর্মানুসারীরা প্রতিদিন যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছে। এভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানরাই দিনের নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে থাকে। বিষয়টি প্রতি যুগেই এমন পর্যায়ে ছিল যে, এত দেশের এত সংখ্যক মানুষ মিথ্যার উপর কিংবা ভুলের উপর ঐক্যমত্য হয়ে একাজটি এভাবে করছে তা অসম্ভব। এমনিভাবে রোযা, ঈদ, ইত্যাদি সবই তাওয়াতুরে আমলের শ্রেণীভূক্ত।

খ. তাওয়াতুর বি মফহুমিল খবর :

هوَ مَا نَقَلَه أهل الشرقِ والغربِ طبقةً عن طبقة جيلاً عن جيلِ رُواتُه فِي كلّ طبقة غيرُ محصورة

যে বক্তব্য বা বিষয় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্রই, এক যুগ থেকে অন্যযুগ, এক কাল থেকে অন্য কাল পর্যন্ত বর্ণিত ও চর্চিত হয়ে আসছে তাকে তাওয়াতুর বি মফহুমিল খবর বলা হয়।

যেমন কুরআন আল্লাহর কালাম, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল, কাবাগৃহ মক্কায় অবস্থিত; এ ধরণের বিষয়গুলো সকল দেশে সকল শ্রেণীর মানুষ কর্তৃক বর্ণিত ও চর্চিত হয়ে আসছে এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ তা জানে ও বিশ্বাস করে। এভাবে এক কালের মানুষ থেকে পরবর্তী কালের মানুষ তা জেনেছে। তবে নির্ধারিত কোন সূত্রে নয় বরং এক স্তর থেকে অন্য স্তরের মানুষ তা শুনে শুনেই জেনেছে। এ ক্ষেত্রেও বিষয়টি এত মুখে বর্ণিত হয় যে, নির্ধারিত কোন সূত্র না থাকলেও মিথ্যা বর্ণনা বা ভুল বর্ণনার উপর এত মানুষের ঐক্যমত্য গড়ে উঠতে পারে না।

মুতাওয়াতিরের হুকুম : المتواتر يفيد علم الضروري

অর্থাৎ মুতাওয়াতির দ্বারা জরুরী ইলম বা স্বভাবজাত সাধারণ জ্ঞান অর্জিত হয়।

আমাদেরকে জানতে হবে যে, মানুষ যে ইলম অর্জন করে, তা সাধারণত: দুই ধরণের হয়ে থাকে। যথা:

১. العلم الضروري / البدهي : স্বভাবজাত জ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান।

২. العلم النظريِ : যুক্তিনির্ভর জ্ঞান।

১. العلم الضروري স্বভাবজাত জ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান :

স্বভাবজাত জ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান বলতে এমন জ্ঞানকে বুঝানো হয়, যা কোনরূপ গভীর চিন্তা-ভাবনা বা যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে মানুষ অর্জন

করে। এ ধরণের জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষকে কোনরূপ প্রচেষ্টা বা শ্রম ব্যয় করতে হয় না। তবে এধরণের জ্ঞান এতটাই সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় হয়, যাতে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা শুবাহ-সন্দেহ থাকে না। এধরণের জ্ঞান মানুষের অন্তরে এতটাই দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, সেই বিশ্বাস থেকে মানুষকে কোন ভাবেই টলানো সম্ভব নয়। যেহেতু এধরণের জ্ঞান মানুষের চেষ্টা-শ্রম ছাড়াই সাধারণভাবে অর্জিত হয় এজন্য একে العلم البدهي বা 'প্রত্যুৎপন্ন জ্ঞান' বলা হয়। অর্থাৎ যখনই প্রয়োজন হয় তখনই যে জ্ঞান বিবেক সরবরাহ করে।

২. العلم النظري বা যুক্তিনির্ভর জ্ঞান :

যুক্তিনির্ভর জ্ঞান বলতে এমন ধরণের জ্ঞানকে বুঝানো হয়, যা মানুষ গভীর চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। এধরণের জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষের মেহ্নত ও শ্রম ব্যয় হয়। এধরণের অর্জিত জ্ঞানও মানুষের মনে দৃঢ়তার জন্ম দেয়। কোন বিষয়ে এধরণের জ্ঞান অর্জন করতে পারলে মানুষ আত্মতৃপ্ত হয়। কিন্তু পাল্টা যুক্তি দিয়ে বা চিন্তার এঙ্গেল পরিবর্তন করে তা থেকে মানুষকে টলিয়ে ফেলা যায়। তাই দৃঢ়তার প্রশ্নে যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের পর্যায় স্বভাবজাত সাধারণ জ্ঞানের চেয়ে নিম্নে।

অতএব মুতাওয়াতির দ্বারা জরুরী ইলম বা স্বভাবজাত সাধারণ জ্ঞান অর্জন হয়- এর অর্থ হল তাদ্বারা মানুষের মাঝে সাধারণ ভাবেই এমন দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয় এবং এমন নিশ্চিত ইয়াকীন পয়দা হয়ে যায়, যার ফলে মানুষ তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মুতাওয়াতির দ্বারা যে ইলম অর্জিত হয় তা সকল প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও শুবাহ-সন্দেহ মুক্ত। কোন বিষয় কেউ নিজ চোখে দেখলে তাতে যেমন তার কোন দ্বিধা-সন্দেহ থাকে না। মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানও তদ্রুপ অর্থাৎ তাতে কোন শুবাহ-সন্দেহ থাকে না। মুতাওয়াতির দ্বারা অর্জিত জ্ঞান যে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা জ্ঞানের ন্যায় তা আল-কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বুঝা যায়।[১]

সুতরাং মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা যে বিষয়টি প্রমাণিত হবে, তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে কোন শুবাহ-সন্দেহ থাকবে না। বরং তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত বলে গণ্য হবে। কেউ সেটিকে অস্বীকার করলে সে কাফের বলে গণ্য হবে।

তবে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন বিষয় মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলেই তার উপর আমল করা ফরয হয়ে যায় না। কেননা মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা কোন সুন্নত, মুস্তাহাব বা মুবাহ বিষয়ও প্রমাণিত হতে পারে। তবে

---

১. ফতহুল মুলহীম- খ:১ - পৃ: ৫ দ্রষ্টব্য।

মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত কোন মুস্তাহাব বিষয়কেও যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের বলে গণ্য হবে।

অন্যকথায় বললে বলা যায় যে, কোন একটি বর্ণনা বা বিষয় যখন মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছে যায়, তখন তা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে আর কোন সংশয় বা সন্দেহ থাকে না। বিষয়টি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা মুস্তাহাব যাই হোক না কেন। তাই কেউ এধরণের মুতাওয়াতির বিষয়কে অস্বীকার করলে তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে।

যেমন: নামায ফরয, এটি একটি মুতাওয়াতির বিষয়। নামায ফরয হওয়ার বিশ্বাস রাখাও ফরয, নামায আদায় সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণ করাও ফরয, নামায বর্জন করা গুনাহে কবীরা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আবার মিসওয়াক করা সুন্নত। এটিও একটি মুতাওয়াতির বিষয়। এটিকে সুন্নত হিসাবে বিশ্বাস করা ফরয। মিসওয়াক করার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাও সুন্নত, এ সম্পর্কে অজ্ঞতা মারাত্মক বঞ্চনা, এটা বর্জন করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু একে অস্বীকার করা কুফরী।

মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের ইলম العلم الضروري বা স্বভাবজাত সাধারণ জ্ঞাণের পর্যায়ের হলেও কোন একটি বর্ণনা মুতাওয়াতির কি না, এতদসংক্রান্ত জ্ঞান অবশ্যই নযরী বা গভীর চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা অর্জিত জ্ঞান বটে। তবে সব ক্ষেত্রে সমান ভাবনার প্রয়োজন হয় না । কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য ভাবনা দ্বারাই বিষয়টি বোধগম্য হয়ে যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গভীর ভাবনার প্রয়োজন হয়।

মুতাওয়াতির হাদীসের সংখ্যা কত?

আল্লামা জাযায়েরী রহ. উল্লেখ করেছেন, প্রথম পর্যায়ের অনুসন্ধানীরা মনে করতে পারেন যে, শরীয়তে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনা খুব বেশী একটা নেই। কিন্তু যদি তাওয়াতুরের সকল প্রকারের সমন্বয়ে বিষয়টি বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, তা সংখ্যায় অনেক। যার পরিসংখ্যান করাই দু:সাধ্য হয়ে পড়বে।[১]

বাস্তবে তাওয়াতুরে ইসনাদ লফযীর সংখ্যা হয়ত কিছুটা কম। কিন্তু তাওয়াতুরে মা'নবী বা তাওয়াতুরে কদরে মুশতারাক, কিংবা তাওয়াতুরে তবকা ও তাওয়াতুরে আমল ইত্যাদি সংখ্যায় অনেক। তবে যারা কেবলমাত্র তাওয়াতুরে ইসনাদ লফযী নিয়ে ভাববেন তাদের কাছে তাওয়াতুরের সংখ্যা অপ্রতুল মনেই হতে পারে। কেননা তাওয়াতুরে তবকার ক্ষেত্রে সনদ বিদ্যমানই থাকে না। যে

---

১ তাওযীহুন নযর -১: ১৩৬-১৩৭।

কারণে মুহাদ্দেসীন সেগুলোকে পরিসংখ্যানে গণ্যই করেননি।

আর এটাতো খুবই সুস্পষ্ট কথা যে, কোন বিষয় যখন সর্বজনবিদিত হয়ে পড়ে তখন তার সূত্র খুঁজলে পাওয়া যায় না। এমনকি যা সেদিন ঘটে গেছে এমন কোন সর্বজন বিদিত বিষয়ে যে কোন ব্যক্তিকে সূত্র উল্লেখ করতে বললে সে তা বর্ণনা করতে পারবে না। কেননা এধরণের বিষয়ে সূত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে কেউ যত্নশীল হয় না। তা না হলে কে না জানে যে, কুরআন আল্লাহর কিতাব, মুহাম্মদ সা.-এর উপর তা অবতীর্ণ হয়েছে, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরজ, রমযানের রোযা রাখা ফরয, রাসূল সা. সর্বশেষ নবী, তার মাধ্যমে নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়ে গেছে ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় মুতাওয়াতির বটে। যেগুলোর প্রতি আমরা লক্ষ্যই করি না।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, মুতাকাদ্দেমীনের পরিভাষায় মুতাওয়াতির বলে কিছু ছিল না। তারা খবরকে দুই ভাগে ভাগ করতেন। যথা মশহুর ও আহাদ। কিন্তু পরবর্তীতে এ পরিভাষাটি গড়ে উঠেছে। পূর্ববর্তীদের ব্যবহারে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া গেলেও তারা এটিকে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেননি। হিজরী তৃতীয় শতক থেকেই হাদীসবিদদেরকে এ শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে এটি হাদীসের একটি ভিন্ন শ্রেণী হিসাবে এর পারিভাষিক ব্যবহার আরো পরে শুরু হয়।

মুতাওয়াতির হাদীসের উপর লিখিত গ্রন্থাবলী :

১. আল-আযহারুল মুতানাসেরাহ ফিল-আখবারিল মুতাওয়াতিরাহ- সুয়ূতী কৃত।
২. কাত্‌ফুল আয্‌হার- সুয়ূতী কৃত।
৩. নাযমূল মুতানাসেরাহ মিনাল আহাদীসিল মুতাওয়াতিরাহ- মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আল-কাত্তানী কৃত।
৪. আল্‌-লা'আলীল মুতানাসেরাহ ফিল আহাদীসিল মুতাওয়াতিরাহ- মুহাম্মদ ইবনে তুলোন আদ্‌-দামেশকী কৃত।

একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য :

অনেক হানাফী উসূলবিদ আলেম বর্ণনাসূত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে খবরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা :

১. খবরে মুতাওয়াতির
২. খবরে মশহুর
৩. খবরে ওয়াহিদ

(অবশ্য আল্লামা জাস্‌সাস্‌ রহ. খবরে মশহুরকে খবরে মুতাওয়াতিরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর অন্যরা খবরে মশহুরকে খবরে আহাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যারা খবরে মশহুরকে একটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করেছেন তারা খবরে মশহুরের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে :

هو ما كان أحاد الأصل ثم تواتر في القرن الثاني أي التابعين والثالث أي تبع التابعين

যে রিওয়ায়াত উৎসমূলে খবরে ওয়াহিদ ছিল, পরে দ্বিতীয় স্তর (অর্থাৎ তাবেয়ীনদের স্তর) ও তৃতীয় স্তরে (অর্থাৎ তাবয়ে তাবেয়ীনদের স্তরে) এসে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তাকে খবরে মশহুর বলা হয়।

খবরে মশহুর দ্বারা অর্জিত ইলম কোন পর্যায়ের?

যারা মশহুরকে একটি ভিন্ন প্রকার হিসাবে গণ্য করেন, তারা এদ্বারা علم الطمأنية বা পরিতৃপ্ত হওয়ার মত জ্ঞাণ অর্জিত হয় বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ দ্বারা এমন জ্ঞান অর্জিত হয়- যা সত্য হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। এবং এমন ধরণের ইয়াকীন তাদ্বারা পয়দা হয়, যা মুতাওয়াতির দ্বারা অর্জিত ইয়াকীনের সমপর্যায়ের নয়; আবার খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যে ধরণের দৃঢ়তা জন্মে তার মতও নয়। বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি এক ধরণের প্রত্যয় জন্মে- যা খবরে ওয়াহিদের দ্বারা জন্মা প্রত্যয়ের চেয়ে বলিষ্ঠ, তবে মুতাওয়াতিরের দ্বারা জন্মা প্রত্যয়ের চেয়ে সামান্য দুর্বল। এমন পর্যায়ের প্রত্যয় যা দ্বারা কিতাবুল্লার বিধানকে পরিবর্ধিত ও বিধানের ধরণ কি তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এবং ব্যাপক বিধানকে সীমিত ও সীমিত বিধানকে ব্যাপক করা যেতে পারে।

কিন্তু কেউ একে অস্বীকার করলে তাকে কাফের বলা হবে না। তবে তাকে বিভ্রান্ত (ضال) বলা হবে। যেহেতু সূত্রের শুরুতে রিওয়ায়াতটি খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের ছিল, তাই তাতে ভুল হওয়ার, ভুলে যাওয়ার, ভুল বুঝার সম্ভাবনা যৌক্তিকভাবে বিদ্যমান থেকেই যায়। যদিও এটি অমূলক একটি সন্দেহ মাত্র।

খবরুল আহাদ (الخبر الأحاد)

আভিধানিক অর্থ :

(خبرالأحاد) অর্থাৎ সীমিত সূত্রে বর্ণিত খবর। آحاد শব্দটি واحد শব্দের বহুবচন। واحد অর্থ এক। সুতরাং خبر واحد এর আভিধানিক অর্থ হল একব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত খবর। এর পারিভাষিক অর্থ আভিধানিক অর্থের চেয়ে একটু ভিন্নতর। বহু সূত্রের বিপরীত অর্থ বোঝানোর জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সীমিত সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :– وهو ما لم يجمع فيه شروط المتواتر

কোন রিওয়ায়াতে মুতাওয়াতির হওয়ার শর্তাবলী বিদ্যমান না থাকলে তাকে খবরে ওয়াহিদ বলা হয়।[১]

---

১. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ২২, নুযহাতুন-নযর পৃ: ২৬ ও শরহে নুখবা।

অর্থাৎ যে বর্ণনা রাসূল সা. থেকে একজন বা দুইজন কিংবা তদোর্ধ্ব ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন তবে তা সংখ্যায় এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যা মুতাওয়াতির বলে গণ্য হতে পারে। কিংবা বর্ণনাটি আগে পরে বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হলেও কোন এক স্তরে মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য যে সংখ্যা প্রয়োজন তা বিদ্যমান থাকেনি, তাহলে তা খবরে ওয়াহিদ বলে গণ্য হবে। কেননা মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য বর্ণনা সূত্রের সর্বস্তরেই ঐ সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান থাকতে হবে। কোন এক ক্ষেত্রে এই সংখ্যা বিদ্যমান না থাকেল তাকে মুতাওয়াতির বলা হয় না। কারণ এ ক্ষেত্রে লঘিষ্ঠ সংখ্যার ভিত্তিতেই বিষয়টি বিচার্য হয় এবং এরই ভিত্তিতে হাদীসের শ্রেণী নির্ধারণ করা হয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, الأقلُّ حاكمٌ على الأكثرِ। অর্থাৎ হাদীসের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

অর্থাৎ সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠই প্রাধান্য পায়। কিন্তু সনদের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লঘিষ্ঠ সংখ্যার ভিত্তিতেই হাদীসের শ্রেণী নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই যেন এ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

খবরে ওয়াহিদ -এর হুকুম :

وهو يفيد علماً كعلم النظريِّ – أي علم المتوقف على النظر والاستدلال –

খবরে ওয়াহিদের দ্বারা ইলমে নযরীর ন্যায় ইলম অর্জিত হয়; অর্থাৎ এ দ্বারা যে ইলম অর্জন হয় তা গভীর চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি-প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল ইলমের ন্যায়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ ধরণের জ্ঞান সংশয়ের সম্ভাবনা মুক্ত নয়। তাই এ দ্বারা যে বিষয় জানা যাবে তা সত্য হওয়ার এবং শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মালেও এক ধরণের সংশয়ের অবকাশ তাতে বিদ্যমান থাকে। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিকাহবিদ ও উসূলবিদের অভিমত এই যে, খবরে ওয়াহিদের বর্ণনাকারীগণ যদি আদিল ও যাবেত হয় তাহলে তা শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি বলে গণ্য হয় এবং এ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের উপর আমল করা অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এ দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা মুতাওয়াতিরের দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের ন্যায় দ্বিধাহীন ও সুনিশ্চিত নয়। তবে তা 'যন্নে গালিব' এর পর্যায়ের। অর্থাৎ এ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়টি শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি বলে প্রবল ধরাণা জন্মালেও কিছুটা সংশয়ের অবকাশ বিদ্যমান থাকে। তবে তা সংশয়মুক্ত দ্বিধাহীন বিশ্বাসের খুবই কাছাকাছি। এজন্য একে ظنّ غالب বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল এ দ্বারা বর্ণিত বিষয়টি শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার এমন ইয়াকীন এ দ্বারা জন্মায় যা বিষয়টির উপর

আমলের জন্য যথেষ্ট। তবে বিষয়টি যেভাবে প্রমাণিত হয়েছে তাতে এটি শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলে প্রবল ধারণা জন্মালেও দ্বিধার অবকাশ সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল হয়ে যায় না। যৌক্তিকভাবে হলেও তা বিদ্যমান থেকেই যায়। যেহেতু এক বা দুইজন অথবা সীমিত সংখ্যক ব্যক্তির বর্ণনা, তাই তাতে ভুল হওয়ার অবকাশ আছে। কিংবা বর্ণনাকারী নিজেও ভুল বুঝতে পারেন। কিংবা তিনি যা বুঝেছেন তাই বর্ণনা করেছেন বাস্তবে বিষয়টি এমন নাও হতে পারে। এটি প্রমাণহীন একটি সন্দেহের অবকাশ মাত্র। এ জন্যই খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয়কে কেউ অস্বীকার করলে তাকে কাফের বলা হয় না, ضال বা বিভ্রান্ত বলা হয়।

* খবরে ওয়াহিদ প্রামাণিক ভিত্তি :

নির্ভরযোগ্য মত হল, খবরে ওয়াহীদ গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হলে তা শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি হিসাবে গণ্য হবে। অবশ্য মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আবু আলী যুব্বায়ী বলেছেন যে, খবরে ওয়াহিদ যদি একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং দুই বা ততোধিক সূত্রে বর্ণিত হলে তবেই তা গ্রহণযোগ্য হবে ।[১]

শিয়া কাদরিয়্যাহরা বলেন : খবরে ওয়াহিদের উপর আমল করা ওয়াজিব নয়। কারো কারো মতে চারজন করে বর্ণনাকারী সর্বস্তরে বিদ্যমান থাকলে ঐধরণের খবরে ওয়াহিদের উপর আমল করা ওয়াজিব, অন্যথায় নয়। কারো কারো মতে শুধুমাত্র বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত খবরে ওয়াহিদের উপর আমল করা ওয়াজিব। এগুলোর কোনটিই নির্ভরযোগ্য মত নয়।[২]

সাহাবায়ে কিরাম খবরে ওয়াহিদকে প্রামাণিক ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন এমন বহু বিবরণ হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে। যেমন :

১. দাদীর মিরাসের ব্যাপারে মুগীরাহ ইবনে শু'বা ও মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার খবরকে হযরত আবু বকর রা. প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

২. মজুসীদের থেকে জিযিয়া গ্রহণের ব্যাপারে আব্দুর রহমান ইবনে আওফের খবরকে হযরত ওমর রা. প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

৩. অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা (جنين) হত্যার দায়ে غرة বা ক্ষতিপূরণ হিসাবে গোলাম বা বাদী দেওয়ার ব্যাপারে হামল ইবনে মালিক রাহ.-এর খবরকে হযরত ওমর রা. প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

নূরুল আনওয়ার পৃ: ১৭৭ -এর টিকা অবলম্বনে।
জামাল উদ্দীন কাসেমীকৃত কাওয়ায়েদুল হাদীস পৃ:১৪৮-১৫০।

৪. নিহত স্বামীর দিয়্যতে অর্থাৎ হত্যার দায়ে প্রদত্ত্ব ক্ষতিপূরণে স্ত্রীর উত্তরাধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ানের খবরকে হযরত ওমর রা. প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

৫. কারো আঘাতে কারো আঙ্গুল ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আমর ইবনে হজমের খবরকে হযরত উমর রা. প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

৬. মোজার উপর মাসাহ করার বিষয়ে সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর খবরকে হযরত ওমর রা. প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

৭. স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর বাড়িতে স্ত্রীর ইদ্দত পালনের ব্যাপারে ফারি'আহ বিনতে মালিক রা.-এর খবরকে হযরত উসমান রা. প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

৮. রাসূল সা. বুরায়দাহ রা.-এর সাদাকাহ সংক্রান্ত খবরকে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে তোমার জন্য সাদাকাহ হলেও আমাদের জন্য তা হাদিয়া হবে।

৯. সালমান ফারসী রা.-এর খাবারকে রাসূল সা. গ্রহণ করেছেন, যখন তিনি বলেন: هذه هديّة لك يارسولَ الله হে আল্লাহর রাসূল, এগুলো আপনার জন্য হাদিয়া। এধরণের বহু বিবরণ হাদীসের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, খবরে ওয়াহিদ নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হলে তার উপর আমল করা ওয়াজিব। এদ্বারা মনে হয় যেন নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যে আমলের কথাই বর্ণিত হোক তার উপর আমল করা ওয়াজিব। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি এমন নয়। কেননা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোন সুন্নত, মুস্ত াহাব কিংবা মুবাহ বিষয়ও বর্ণিত হতে পারে। তাই 'খবরে ওয়াহিদের উপর আমল করা ওয়াজিব' একথার অর্থ হবে, খবরে ওয়াহিদ নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হলে তাকে আমলের প্রামাণিক ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ বর্ণিত আমলটি এই খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে; তাই এটি শরীয়তের স্বীকৃত একটি বিষয়। তা সুন্নত, মুস্তাহাব কিংবা মুবাহ যাই হোক।

হানাফী ইমামগণের নিকট খবরে ওয়াহিদ কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ যদি কোন খবরে ওয়াহিদ ও কিয়াসের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দেয় আর এই বৈপরীত্য যদি কোনভাবেই নিরসন করা সম্ভব না হয়, তাহলে খবরে ওয়াহিদকেই আমলের জন্য গ্রহণ করা হবে, কিয়াসকে নয়- যতক্ষণ না তা কুরাআন বা কোন মশহুর হাদীসের পরিপন্থী হয়। এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হলেই চলবে। তিনি ফিকাহ্‌বিদ কি না এ বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হবে না। অবশ্য অনেকেই (যেমন ইমাম মালিক রহ.) খবরে

ওয়াহিদ ও কিয়াসের মাঝে বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে কিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছেন। আবার অনেকেই বর্ণনাকারী নিজে ফিকাহ্‌বিদ হলে সে ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, অন্যথায় কিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন ঈসা ইবনে আবান ও কাজী আবু যায়েদ প্রমুখ মনিষী এরূপ মতামত পোষণ করেন।[১]

সর্বজনীন কোন বিষয় সম্পর্কে কোন খবরে ওয়াহিদ পাওয়া গেলে তা প্রথম তিন যুগে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি না পেলে এবং উম্মত ব্যাপক ভিত্তিতে তা গ্রহণ করে না থাকলে, তাদ্বারা যে বিষয়টি প্রমাণিত হবে তা অত্যাবশ্যকীয় পর্যায়ের বলে গণ্য হবে ন; (أي لا يثبت به الوجوب) অর্থাৎ তাদ্বারা কোন বিষয় ওয়াজিব বলে প্রতীয়মান হবে না। এটি হানাফী ইমামগণের সর্ববাদী অভিমত।

অথার্ৎ এমন কোন বিষয় সম্পর্কে যদি কোন খবরে ওয়াহিদ পাওয়া যায়, যা সকলের সাথে সংশ্লিষ্ট, যে বিষয়টি সকলের জন্যই সমানভাবে প্রয়োজনীয়; অথচ তা যদি একটিমাত্র সূত্রে বর্ণিত হয়; তাহলে বর্ণনাসূত্র নির্ভরযোগ্য হলেও এক্ষেত্রে এক ধরণের সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, এমন একটি ব্যাপক বিষয় একক সূত্রে কেন বর্ণিত হল ? অথচ বিষয়টি এমন যা বহু জনের জানা থাকার কথা। তবে হ্যাঁ যদি এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একক সূত্রে বর্ণিত খবরটি ব্যাপক ভিত্তিতে গৃহীত হয় এবং বিষয়টি সর্বজনবিদিত ছিল বলে জানা যায়, তাহলে সেই সন্দেহের নিরসন হয়ে যায়। এ জন্যই ব্যাপক ভিত্তিতে গৃহীত না হলে এ ধরণের খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত বিয়ষটি অত্যাবশ্যকীয় বলে গণ্য হবে না। তবে তাকে একেবারে বর্জনও করা হবে না। বরং তা এমন পর্যায়ে রাখা হবে যা অত্যাবশ্যকীয় নয়। যেমন বুসরা বিনতে সফওয়ান কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأ কেউ লিঙ্গ স্পর্শ করলে সে যেন অযূ করে নেয়।

এ হাদীস দ্বারা 'লিঙ্গ স্পর্শ করলে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অযূ করতে হবে' এ বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা অযূ ভঙ্গ হওয়ার বিষয়টি একটি সর্বজনীন বিষয়। তাই লিঙ্গ স্পর্শ করা দ্বারা যদি অযূ ভঙ্গ হত তাহলে একারণটি সকলেরই জানা থাকত। ফলে তা বহু মুখে বর্ণিত হওয়ার কথা। তাছাড়া বিষয়টি পুরুষের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তা বর্ণনা করছেন জনৈকা রমনী। তাই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিষয়টি সর্বজন বিদিত ছিল না এবং উম্মত তা ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রহণ

---

[১] মুকাদ্দামায়ে ফতহুল মুলহিম - খ: ১ - পৃ: ১১।

করেনি। তাই এদ্বারা 'লিঙ্গ স্পর্শ করলে অযূ করা ওয়াজিব হবে' এরূপ বিধান প্রবর্তন করা যাবে না। তবে হ্যাঁ হাদীসটি থেকে এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাবে যে, এরূপ ক্ষেত্রে অযূ করে নিলে ভাল হবে।[১]

খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লার কোন বিধান পরিবর্ধন কিংবা বিধানটির ধরণ কি তা নির্ধারণ করা যাবে কি না?

এক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে এরূপ মনে করা হয় যে, হানাফীগণ এরূপ করার প্রবক্তা নন। অর্থাৎ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লার কোন বিধানকে পরিবর্ধন করা যাবে, হানাফীগণ এরূপ মনে করেন না। তবে বিষয়টি বাস্তবে এরূপ নয়। বরং তাদের এই বক্তব্যের অর্থ হল খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লার কোন বিধানে পরিবর্ধন করা হলে, সেই বর্ধিত অংশ কিতাবুল্লার বিধান বলে গণ্য হবে না। বরং বর্ধিত বিধান হিসাবে তার উপর আমল করা হবে। এর অর্থ হল এই যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা পরিবর্ধিত বিষয়কে অবশ্যই কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধানের সমমর্যাদায় গণ্য করা যাবে না। এদ্বারা অবশ্যই একথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, বিধানটির পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে কিংবা বিধানটির ধরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদকে গ্রহণই করা যাবে না।[২] বরং এর অর্থ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যে অংশটুকু পরিবর্ধন করা হবে, তা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রবর্তিত বিধানেরই মর্যাদা পাবে। কিতাবুল্লার দ্বারা প্রবর্তিত বিধানের মর্যাদা পাবে না।

খবরে ওয়াহিদ যদি যয়ীফ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয় তাহলে তা আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

রাবীর দুর্বলতা যদি আদালতের ক্ষেত্রে হয় তাহলে তার রিওয়ায়াত কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে তার দুর্বলতা যদি যবতের ক্ষেত্রে হয় সেক্ষেত্রে যদি উক্ত রিওয়ায়াতের কোন শাহেদ বা মুতাবে' পাওয়া যায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে; অন্যথায় নয়।[৩]

খবরে ওয়াহিদ যদি কোন মজহুল রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

কোন খবরে ওয়াহিদ যদি কোন মজহুল রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয় অর্থাৎ যদি রাবী এমন হয় যে, তাথেকে কেবলমাত্র একটি বা দু'টি হাদীস বর্ণিত পাওয়া যায়,

---

[১] মুকাদ্দামায়ে ফাত্হুল মূলহীম -পৃ: ১২ -এর সংক্ষেপায়ন।

[২] ফতহুল মুলহীম - পৃ: ২৪ (মুকাদ্দামা) ও ফয়জুল বারী খ: ১ পৃ: ৪৮

[৩] ফতহুল মুলহীমের মুকাদ্দামা ১৩নং পৃষ্ঠার ভাবালম্বনে।

কিন্তু তার সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না। তাহলে তার বর্ণিত হাদীসটির ৫টি অবস্থা রয়েছে। যথা :

১. তাথেকে পরবর্তী মনীষীগণ ব্যাপক ভিত্তিতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন।
২. কতিপয় গ্রহণ করেছেন, কতিপয় গ্রহণ করেননি
৩. তার ব্যাপারে সমালোচনা থেকে পরবর্তী কালের মনীষীগণ বিরত থেকেছেন। এই তিন অবস্থায় মজহুল রাবীর বর্ণিত হাদীস মা'রুফ হাদীসের ন্যায় গ্রহণযোগ্য হবে।
৪. পরবর্তীকালের মনীষীগণ তার হাদীস সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। এ ধরণের ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।
৫. প্রথম তিন স্তরে হাদীসটি সম্পর্কে জানাজানি হয়নি, ফলে সলফ বা পূর্ববর্তী মনীষীগণের গ্রহণ বর্জন কোনটিই সুস্পষ্ট হয়নি। এমন হাদীসের উপর আমল করা যাবে, তবে এদ্বারা কোন বিষয় ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যকীয় বলে সাব্যস্ত করা যাবে না।[১]

خبرُ الواحدِ يُوجبُ العملَ ولايُوجبُ العلمَ কথাটির তাৎপর্য :

অর্থাৎ খবরে ওয়াহিদ আমলকে ওয়াজিব করলেও ইলমকে ওয়াজিব করে না। একথার অর্থ অবশ্যই এরূপ নয় যে, এদ্বারা কোনরূপ ইলমই অর্জিত হয় না। বরং এই বক্তব্যের অর্থ হল খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যে বিষয় প্রমাণিত হবে তার উপর আমল করা অপরিহার্য বটে। কিন্তু তাদ্বারা অর্জিত ইলম অপরিহার্য পর্যায়ের নয়। অর্থাৎ দ্বিধাহীন, সংশয়মুক্ত নিশ্চিত ইলম তাদ্বারা অর্জিত হয় না, যেরূপ মুতাওয়াতির দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে।

বস্তুত মুতাকাল্লেমীন ইয়াকিনী ইলম তথা দ্বিধাহীন সংশয়মুক্ত নিশ্চিত ইলমকেই ইলম বলতেন। সেই পর্যায়ে না পৌঁছলে তাকে তাঁরা ইলম বলতেন না। আর সে প্রেক্ষিতেই خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم এই মন্তব্যটি করা হয়েছে।[২] অনেকেই এই মন্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন না করেই এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যেহেতু ইলম অর্জিত হয় না অতএব তা দ্বারা যা অর্জিত হয় তা (ظن) বা ধারণা মাত্র বৈ কিছু নয়। আর কুরআনে কারীমে ظن বা ধারণার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে কোন আমল করা বৈধ হবে না।

প্রকৃতপক্ষে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যে ইলম অর্জিত হয় তা ইয়াকিনী বা সংশয় মুক্ত সুনিশ্চিত না হলেও তা علم غالب الرأي বা প্রবল ধারণা পর্যায়ের ইলম অবশ্যই

---

১ নূরুল আনওয়ার পৃ: ১৮০-১৮১।
২ মুকাদ্দামায়ে ফাতহুল মুলহিম- পৃ: ১৮ (নতুন এডিশান) এর ভাবাবলম্বনে।

বটে। কেউ কেউ একে علم الطمانينة বা 'পরিতৃপ্ত হওয়ার মত জ্ঞান' বলেও উল্লেখ করেছেন। আর শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কোন বিষয়ে যদি প্রবল ধারণা জন্মে যে, এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ, তাহলে তার উপর আমল করা বা তা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য।

আর যদি ধরা হয় যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা (ظن) বা ধারণা জন্মায়। তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হল এই যে, ধারণারও দু'টি পর্যায় রয়েছে। এর একটি পর্যায় এমন যে, ধারণাটি খুবই দুর্বল এবং (مرجوح) বা অসমর্থিত। বস্তুতঃ তা (وهم) বা ভাবনা-কল্পনার পর্যায়ের চেয়ে বেশী কিছু নয়।

কিন্তু (ظن) বা ধারণার একটি স্তর এমন রয়েছে, যেখানে ধারণাটি খুবই প্রবল শক্তিশালী এবং তা ইয়াকীনের খুবই কাছাকাছি। এধরণের প্রবল ধারণা ইলমেরই এক প্রকার। কোন শরয়ী বিষয় প্রমাণের জন্য এমন দলীল যথেষ্ট যা দ্বারা বিষয়টি আল্লাহ কিংবা রাসূলের বিধান হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মে। বরং দুনিয়াবী বহু কর্মকাণ্ডও মানুষ এধরণের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। আল্লামা ফখরুল ইসলাম বযদভী রহ. স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে-

فصارَ المتواترُ يُوجِبُ علمَ اليَقِينِ والمَشهورُ علمَ الطمَانية (وهوَ من خَبرِ الوَاحد)

মুতাওয়াতির ইয়াকিনী ইলমকে অপরিহার্য করে। আর মশহুর দ্বারা علم الطمانية বা পরিতৃপ্ত হওয়ার মত ইলম অর্জিত হয়। (বস্তুতঃ মশহুর খবরে ওয়াহিদেরই এক প্রকার)।[১]

খবরে ওয়াহিদের প্রকারভেদ:

বর্ণনা সূত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে খবরে ওয়াহিদ তিন প্রকার। যথা:

১. মশহুর (مشهور)

২. আযীয (عزيز)

৩. গরীব (غريب)

১. মশহুর (المشهور) :

আভিধানিক অর্থ :

مشهور শব্দটি ইসমে মাফউলের সীগাহ, شهرة মূলধাতু থেকে এর উৎপত্তি। যার অর্থ হল খ্যাতি। আরবরা شهرت الأمر বলে আমি বিষয়টি প্রচার করে দিয়েছি,

---

[১] মুকাদ্দামায়ে ফতহুল মুলহিম পৃষ্ঠা-৮ -এর ভাব অবলম্বনে।

সুখ্যাত করে ফেলেছি -এই অর্থ গ্রহণ করে থাকে। অতএব মশহুর অর্থ খ্যাত, প্রসিদ্ধ। যে সব হাদীস তিন বা তিনোর্ধ সূত্রে বর্ণিত, তা যেন ব্যাপকভাবে খ্যাত ও প্রসিদ্ধ। এ হিসাবেই এ ধরণের হাদীসকে মশহুর বলে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

মশহুরের সংজ্ঞা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। তবে আমরা নিম্নে আল্লামা ইবনে মিনদার সংজ্ঞাটি উল্লেখ করলাম-

هو الخبرُ الذي رَواه ثلاثةٌ فصاعدًا في كلِّ طبقة ولم يبلغ حدَّ التواترِ.

মশহুর বলা হয় এমন হাদীসকে যা প্রতিস্তরে তিন বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত। তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেনি।[১]

মশহুরের উদাহরণ :

১: عن انس ان رسول الله صـــ قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان–

اخرجه الشيخان عن سليمان التيمى – عن ابى مجلز عن انس

হযরত আনাস রা. থেকে আবুল মিজলায ছাড়াও আরো অনেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবুল মিজলায থেকে সুলায়মান ছাড়াও আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান থেকে এক জামাত বর্ণনাকারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২: عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صـــ إِنَّ الله لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ – رواه البخاريُّ، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইলমকে বান্দাদের থেকে একবারে অতর্কিত ছিনিয়ে নিবেন না। বরং তিনি তা ছিনিয়ে নিবেন ওলামাদের ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। হাদীসটি বুখারী, মুসলিমসহ অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন।

৩: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صـــ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. هذا الحديثَ روى عن النبيّ صـــ جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة و روى عن أبي هريرة جماعةٌ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের শ্বাস থেকে উদগত। হাদীসটি আবু হুরায়রা রা.সহ এক জামাত বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন।[২]

---

[১] ...সাদ-দুরারুস-সামি...হ পৃ: ২২ ।

[২] ...ত-তামহীদ -খ: ৫ পৃ: ১-২ ।

মশহুরের ব্যতিক্রম ব্যবহার :

উপরোল্লিখিত পারিভাষিক মশহুর ছাড়াও কিছু কিছু হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ هذا حديث مشهور শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। অথচ সংজ্ঞা অনুসারে সেগুলো মশহুরের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সম্ভবত তারা এ ধরণের ক্ষেত্রে মশহুর শব্দটি বলে তার আভিধানিক অর্থ যেমন- খ্যাত, সর্বজন জ্ঞাত, কিংবা বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট খ্যাত ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। এ ধরণের মশহুরের কয়েকটি পর্যায় হতে পারে। যথা :

১. যে হাদীসের একটি মাত্র সূত্র আছে অথচ হাদীসটিকে তারা মশহুর বলেছেন।

২. একাধিক সূত্র আছে, তাকে মশহুর বলেছেন।

৩. যার কোন সূত্রই খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন হাদীসকেও মশহুর বলা হয়েছে। যেমন: নাহবীগণের নিকট একটি বর্ণনা হাদীস হিসাবে খ্যাত আছে। বর্ণনাটি হল : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه এ বর্ণনাটির কোন সূত্রই খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লামা ইরাকীসহ অন্যান্যরা বলেছেন যে, এর কোন ভিত্তি নেই; এই শব্দে হাদীসের কোন গ্রন্থেই এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১] অথচ নাহবীদের নিকট এটি হাদীস বলে খ্যাত একটি মশহুর উপমা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

মুস্তাফীয (المستفيض) :

অনেকেই মশহুরকে মুস্তাফীয নামে নামকরণ করেছেন। বস্তুতঃ মুস্তাফীজ শব্দটি বাবে استفعال এর ইসমে ফায়েলের সীগাহ। فاض الماء থেকে استفاضة শব্দটি আহরিত। যার অর্থ হল পানি প্রবাহিত হওয়া, ছড়িয়ে পড়া। যেহেতু মশহুর রিওয়ায়াতসমূহ এরূপ ব্যাপকতা লাভ করে থাকে যে, যেন তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে; । তাই তাকে মুস্তাফীয নামে নামকরণ করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে মশহুর ও মুস্তাফীযের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে অনেকেই মুস্তাফীযকে মশহুরের একটি ভিন্ন প্রকার বলে গণ্য করেন। তাদের মতানুসারে মুস্তাফীযের সংজ্ঞা হওয়া উচিত নিম্নরূপ:

هُوَ مَا رَوَاه ثلاثة أو أكثر وكانَ عَدد رُواة إسنادِه فِي كلّ طبقةِ عَلى السواء – ما لم يبلُغ حدَّ التواتُرِ –

---

১ তাদরীব পৃ: ৪৪৬।

যে রিওয়ায়াত তিন বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হবে এবং সনদের প্রত্যেক স্তরেই বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা সমান থাকবে, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছবে না; এধরণের রিওয়ায়াতকে মুস্তাফীজ বলা হয়। যেমন যদি প্রথম স্তরে বর্ণনাকারী চার জন হয় তাহলে সনদের সকল স্তরেই চার জন বর্ণনাকারী থাকবে; প্রথম স্তরে তিন জন থাকলে সকল স্তরেই তিন জন থাকবে। এ হিসাবে মশহুর 'আম (عام) বা ব্যাপক অর্থবোধক আর মুস্তাফীয খাস (خاص) বা সীমিত অর্থবোধক বলে গণ্য হবে।

আবার অনেকেই বিষয়টি সম্পূর্ণ এর বিপরীত বলে মনে করেন। অর্থাৎ সনদের সকল স্তরে বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা সমান হওয়ার কথাটি মশহুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু মুস্তাফীযের ক্ষেত্রে এরূপ কোন শর্ত নেই। এ হিসাবে মুস্তাফীয 'আম বা ব্যাপক অর্থবোধক ও মশহুর খাস বা সীমিত অর্থবোধক বলে গণ্য হবে।[১]

আবার অনেকেই মনে করেন, মশহুর শব্দটি মুহাদ্দিসগণ মুস্তাফীযের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেন। তবে মুস্তাফীয শব্দটি কেবলমাত্র পারিভাষিক মশহুরের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেন। ফরদে নিসবী অথবা মশহুর আলাল আলসিনাহ বা লোকমুখে মশহুরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন না।

আল্লামা সাখাভী ফতহুল মুগীসে উল্লেখ করেছেন যে,

إنّ المستفيض ما تلقته الأمّةُ بالقبولِ دون اعتبار عددٍ في رُواته – والمشهورُ يُلاحَظ فيه العدد

মুস্তাফীয বলা হয় এমন রিওয়ায়াতকে যা বর্ণনাকারীদের সংখ্যার বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই সর্বজনের নিকট গৃহীত ও সুবিদিত। কিন্তু মশহুরের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর সংখ্যার বিষয়টি বিবেচ্য হয়।[২] এই সংজ্ঞানুসারে মুস্তাফীয ব্যাপক অর্থবোধক (عام) হয়, আর মশহুর (خاص) খাস বা সীমিত অর্থবোধক হয়। তবে উম্মত যা ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রহণ করে নিয়েছে সেরূপ রিওয়ায়াতের উপর মশহুর শব্দটি ব্যাপক ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

খবরে মশহুরের হুকুম :

মূলত পারিভাষিক খবরে মশহুর খবরে ওয়াহিদেরই এক প্রকার। সুতরাং খবরে ওয়াহিদের যে হুকুম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে খবরে মশহুরের হুকুমও তাই হবে। তবে খবরে ওয়াহিদের অপর দুই প্রকার- আযীয ও গরীবের উপর এর শ্রেষ্ঠত্য

---

১ শরহে নুখবা -ইবনে হজরকৃত - পৃঃ ২৩-২৪ ।, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃঃ২৩। ও জামাল উদ্দীন কাসেমীকৃত কাওয়ায়েদুত্ তাহদীস পৃঃ ১২৪-১২৫।

২ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃঃ ২৫।

অবশ্যই থাকবে এবং বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে খবরে মশহুর প্রাধান্য পাবে।[১]

অবশ্য যারা মশহুরকে পৃথক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করেছেন তাদের নিকট এ দ্বারা ইলমে তামানিয়া বা পরিতৃপ্ত হওয়ার মত ইলম অর্জিত হয় যা মুতাওয়াতির দ্বারা অর্জিত ইলমের খুবই কাছাকাছি। তবে এর অস্বীকারকারীকে তারাও কাফের বলেন না। তাদের মতে এধরণের মশহুর হাদীস বলতে গেলে মুতাওয়াতিরেরই পর্যায়ভুক্ত। এ জন্য এদ্বারা কিতাবুল্লার উপর পরিবর্ধন করা যাবে এবং বিধানটির ধরণ ও নির্ধারণ করা যাবে। অর্থাৎ আমকে খাস করা যাবে, মুতলককে মুকাইয়্যাদ করা যাবে; আবার কিতাবুল্লার জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা হিসাবেও গ্রহণ করা যাবে। এমনকি খবরে মশহুর দ্বারা কিতাবুল্লার উপর পরিবর্ধনও করা যাবে।

মশহুর সম্পর্কীত গ্রন্থাবলী :

মশহুর হাদীসের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন :

১. المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة : আল্লামা সাখাভী রহ. কৃত।

২. كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس : আল্লামা আজলুনী কৃত।

৩. تمييز الطيب من الخبيث في ما يدور على ألسنة الناس من الحديث : ইবনুদ-দায়বা' আশ-শায়বানী কৃত।

৪. التذكرة في الأحاديث المشتهرة : আল্লামা যরকাশী কৃত।

৫. الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة : আল্লামা সুয়ূতী কৃত ।

২. আযীয : (العزيز)

আভিধানিক অর্থ :

عزيز শব্দটি فعيل এর ওজনে সিফাতে মুশাব্বার সীগাহ। সীগাহটি عَزَّ يَعِزُّ বাবে ضرب থেকেও গঠিত হতে পারে; যার অর্থ হল- স্বল্প হওয়া, দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য হওয়া। যেহেতু আযীয শ্রেণীর হাদীস খুবই স্বল্প ও দুর্লভ, একারণে একে আযীয নামে নামকরণ করা হয়েছে। কিংবা এটি عَزَّ يَعَزُّ বাবে فتح থেকেও গঠিত হতে পারে, যার অর্থ হল মজবুত হওয়া, সুদৃঢ় হওয়া ও শক্তিশালী হওয়া। যেহেতু আযীয পর্যায়ের রিওয়ায়াতগুলো সাধারণ গরীব পর্যায়ের রিওয়ায়াতের তুলনায় শক্তিশালী হয়ে থাকে, এ কারণেও একে আযীয নামে নামকরণ করা হয়ে থাকতে পারে।[২]

---

১. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ২৫।

২. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ২৬।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

وهو ما كانت رواته في بعض الطبقات اثنين ولم تنقص في سائرها عن ذلك – (وان زاد فلا حرج)

যে বর্ণনা সূত্রের কোন স্তরে মাত্র দুইজন বর্ণনাকারী থাকে এবং অন্যান্য স্তরে বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুইয়ের চেয়ে কম থাকে না, তাকে আযীয বলা হয়।[১]

অর্থাৎ নূন্যতম পক্ষে দুইজন বর্ণনাকারী সনদের সর্বস্তরেই বিদ্যমান থাকতে হবে, দুইয়ের চেয়ে কম বর্ণনাকারী (অর্থাৎ একজন) সনদের কোন স্তরেই থাকবে না। সকল স্তরে দুইজন করে বর্ণনাকারী বা অধিকাংশ স্তরে দুইজন করে বর্ণনাকারী, এমন কি কোন এক স্তরে দুইজন বর্ণনাকারী থাকলেও হাদীসটি আযীয বলে গণ্য হবে। অপরাপর স্তরে যদি দুইয়ের চেয়ে অধিক বর্ণনাকারী থাকে তাহলেও হাদীসটি আযীয বলেই গণ্য হবে। কেননা সনদের বিচার-বিশ্লেষণ ও হাদীসের শ্রেণী নির্ধারণের ক্ষেত্রে الأقل حاكم على الأكثر। সংখ্যালঘিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্টের ভিত্তিতে হাদীসটির স্তর নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বিঃ দ্রঃ ইবনুস সালাহ্ প্রদত্ত্ব সংজ্ঞায় জটিলতা :

ইবনে মানদার অনুসরণে ইবনুস-সালাহ এবং আল্লামা ইরাকী মশহুর ও আযীযের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে,

ان ما يرويه اثنان أو ثلاثة يسمّى عزيزًا وما يرويه ثلاثة فأكثر يسمّى مشهورًا –

অর্থাৎ যে হাদীস দুইজন কিংবা তিনজন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয় তাকে আযীয বলা হয়, আর যে হাদীস তিনজন কিংবা তিনোর্ধ্ব বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয় তাকে মশহুর বলা হয়।

এই সংজ্ঞায় এক ধরণের জটিলতা রয়েছে। কেননা এ সংজ্ঞা অনুসারে তিনজন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আযীয ও মশহুর দু'টোরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। একারণেই আল্লামা ইবনে হজর রহ. তাদের সংজ্ঞাকে এড়িয়ে গিয়ে নতুনভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন। যে সংজ্ঞা দ্বারা এই জটিলতার নিরসন হয়েছে। সে কারণে পরবর্তীরা ইবনে হজরের সংজ্ঞাকেই অনুসরণ করেছেন। অবশ্য আল্লামা নববী রহ. এ জটিলতার নিরসন এভাবে করেছেন যে, দুই বা তিনজন কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে আযীয বলা হবে। আর তিনোর্ধ্ব ব্যাক্তি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে মশহুর বলা হবে।

আযীযের উদাহরণ :

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা ও আনাস রা. এর সূত্রে এবং মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রা. -সূত্রে বর্ণিত যে-

---

[১] মুকাদ্দামায়ে মতহুল মুলহিম পৃ: ৬, ইবনে হজর ও এরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। যদিও তার শব্দ ভিন্ন।

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِـــنْ وَلَده وَوَالده وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

এ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা ও আনাস রা. নবী কারীম সা. থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস রা. থেকে কাতাদাহ ও আব্দুল আযীয ইবনে সুহায়ব বর্ণনা করেছেন; কাতাদাহ থেকে শু'বা ও সাঈদ বর্ণনা করেছেন, আবার আব্দুল আযীয থেকে ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যাহ এবং আব্দুল ওয়ারিস বর্ণনা করেছেন। পরে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই বহু ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন।[১]

ফলে কোন স্তরেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুইয়ের চেয়ে কম থাকেনি। কোন হাদীস আযীয হওয়ার পরও মশহুর হতে পারে। যেমন নিম্নের হাদীসটি: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة

এহাদীসটি রাসূল সা. থেকে মাত্র দুইজন সাহাবী- হযরত আবু হুরায়রা ও হুযায়ফা ইবনূল ইয়ামান বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবু হুরায়রা রা. থেকে সাতজন রাবী তা বর্ণনা করেছেন। যথা:

أبو سلمة ،أبو حازم ، طاؤس ، الأعرج ،همام ، أبو صالح ، عبد الرحمن مولى أم برثن[২]

বিঃ দ্রঃ আযীয হাদীস সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ অদ্যাবধি তৈরী হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

৩. গরীব : (الغريب)

আভিধানিক অর্থ :

غريب শব্দটি فعيل এর ওজনে সিফাতে মুশাব্বার সীগাহ। غرب يغرب থেকে এর অর্থ নি:সঙ্গ হওয়া, একাকী হওয়া, পরদেশী হওয়া, ডুবে যাওয়ার অর্থেও এটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেহেতু একটি মাত্র সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহ সঙ্গহীন, একাকী; তাই এগুলোকে গরীব বলে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند –

কোন হাদীসের সনদের যে কোন স্তরে যদি একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত হয় তাহেল সেই হাদীসকে গরীব বলে।[৩]

---

১ মুকাদ্দামায়ে ফতহুল মুলহিম - পৃঃ ৬

২ তাদরীবুর-রাবী -৪৫৬।

৩ শরহে নুখবা, মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস সুনান -৩২। ও কাফউল আসর -৪৭।

অর্থাৎ যদি কোন হাদীসের বর্ণনা সূত্রের সকল স্তরে মাত্র একজন করে বর্ণনাকারী থাকে, কিংবা যদি কোন স্তরে বর্ণনাকারীর সংখ্যা একজনে নেমে যায় অথচ অন্যান্য স্তরে বর্ণনাকারীর সংখ্যা একাধিকও থাকে, তাহলেও এধরণের হাদীসকে গরীব বলা হবে। কেননা সনদের সূত্র বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে এবং সে ভিত্তিতেই হাদীসের শ্রেণী নির্ধারণ করা হয়।

গরীবের উদাহরণ :

ইমাম বুখারী যে হাদীস দ্বারা তাঁর কিতাব শুরু করেছেন সেটিই মূলত গরীবের একটি উদাহরণ। হাদীসটি হল: انما الاعمال بالنيات।

হাদীসটি উমর ইবনূল খাত্তাব রা. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তাথেকে একমাত্র আলকামাহ রাহ. বর্ণনা করেছেন। আলকামাহ থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আত্-তাইমী বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম থেকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন।[১]

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী যে হাদীস দিয়ে তার কিতাব শেষ করেছেন সেটিও গরীবের একটি উদাহরণ বলে আল্লামা বেকায়ী উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হল:

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اَللِّسَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى اَلرَّحْمَنِ، ثَقِيلَتَانِ فِي اَلْمِيزَانِ، سُبْحَانَ اَللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْعَظِيمِ.

হাদীসটি রাসূল সা. থেকে হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন। তাথেকে আবু যুর'আহ বর্ণনা করেছেন। আবু যুর'আহ থেকে উমারাহ ইবনূল কা'কা' বর্ণনা করেছেন। উমারাহ থেকে মুহাম্মদ ইবনূল ফুযায়ল বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ থেকে ব্যাপক ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে।[২]

ফরদ : (الفرد)

অনেকেই গরীব ও ফরদকে সমার্থক মনে করেন। তাদের মতে ফরদ গরীবেরই একটি ভিন্ন নামমাত্র। তবে অনেকেই এ দু'টির মাঝে পার্থক্য করেছেন এবং দু'টিকে ভিন্ন দু'টি প্রকার বলে গণ্য করেছেন। অবশ্য ইবনে হজর রহ. এ দু'টি শব্দকে আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় দিক থেকে অভিন্ন ও সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, পরিভাষা বিশেষজ্ঞগণ ব্যবহারের আধিক্য ও স্বল্পতার বিচারে এ দু'টির মাঝে পার্থক্য গড়ে তুলেছেন।

---

১. সুয়ূতীকৃত তাদরীবুর-রাবী -খ:২ পৃ:১৭৮।

২. শরহুল কারী - পৃ: ২০৫, মাও. আঃ মালেকের পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত।

তারা 'গরীবে মুতলাক' এর ক্ষেত্রে ফরদ শব্দটি অধিক ব্যবহার করেন, আর 'গরীবে নিসবী'র ক্ষেত্রে গরীব শব্দটি অধিক ব্যবহার করেন।[১]

গরীবের প্রকারভেদ :

বর্ণনাসূত্রের যে স্থানে বর্ণনাকারী একজন হওয়ার কারণে হাদীসটি গরীব বলে সাব্যস্ত হয়, সেই স্থানের প্রেক্ষিতে গরীবকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. غريب مطلق أو فرد مطلق সাধারণ গরীব।

২. غريب نسبي أو فرد نسبي বিশেষ ব্যক্তির প্রেক্ষিতে গরীব।

১. সাধারণ গরীব (غريب مطلق)

পারিভাষিক সংজ্ঞা : هو ما كانت الغرابة في أصل سنده

বর্ণনা সূত্রের মূলে অর্থাৎ সূচনায় যদি হাদীসটি একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হয় তাহলে তাকে সাধারণ গরীব বা 'গরীবে মুতলাক' বলা হয়। (একে ফরদে মুতলাকও বলা হয়ে থাকে)। সনদের সূচনায় অর্থাৎ সাহাবীগণের স্তরে যদি হাদীসটি একজন মাত্র সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয় তাহলে পরবর্তী স্তরগুলোতে বর্ণনাকারী একজন হোক বা একাধিক হোক সর্বাবস্থায় হাদীসটি সাধারণ গরীব বা গরীবে মুতলাক বলে গণ্য হবে।

পূর্বোল্লিখিত হাদীস إنما الأعمال بالنيات এর একটি উদাহরণ। কেননা সাহাবীদের স্তরে একমাত্র হযরত ওমর রা.-ই এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য যেসব সাহাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে বলে উল্লেখ করা হয় তার কোনটিই নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নেই।

২. বিশেষ প্রেক্ষিতে গরীব (غريب نسبي)

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده

বর্ণনা সূত্রের সূচনায় না হয়ে পরবর্তী যে কোন স্তরে যদি হাদীসটি একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হয় তাহলে তাকে বিশেষ ব্যক্তির প্রেক্ষিতে গরীব বা গরীবে নিসবী বলা হয়।

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস - পৃ: ২৮।

উদাহরণ :

حديث مالك عن الزهرى عن انس رضـــ ان النبيّ صلى الله عليه وسلم دخـــل مكـــة وعلى رأسه المغفر –

এ হাদীসটি হযরত আনাস ছাড়াও অন্য সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত আছে। আনাস থেকে যুহরী ছাড়াও আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন, তবে যুহুরী থেকে একমাত্র মালিকের সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত পাওয়া যায়। এতদভিন্ন অন্য কারো সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি। সুতরাং মালিক কর্তৃক হাদীসটি একক সূত্রে বর্ণিত। এ ধরণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ বলে থাকে : تفرد به مالك عن الزهري

একক সূত্রে বর্ণনার বিষয়টি বিভিন্ন প্রেক্ষিতে হতে পারে। যেমন:

১. تفرد ثقة **নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির একক বর্ণনা :** অর্থাৎ কোন হাদীস একাধিক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হলেও যদি তাদের মাঝে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী একজনই থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে বলা হয়: لم يروه ثقة الاّ فلان অমুক ছাড়া কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেনি। একে تفرد ثقة বলা হয়।

২. تفرد راو معين عن راو معين **কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির একক বর্ণনা:** অর্থাৎ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত থাকলেও কোন এক সূত্রের কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অপর একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি থেকেই বর্ণনা করেন। এ ধরণের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে : تفرد به فلان عن فلان অর্থাৎ এই হাদীসটি অমুক যখন বর্ণনা করেন তখন কেবল অমুক থেকেই বর্ণনা করেন।

৩. تفرد أهل بلد خاصة **কোন এক বিশেষ নগরীর মানুষের একক বর্ণনা:** যেমন বলা হয়ে থাকে تفرد به أهل مكة মক্কা নগরের লোকেরা এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৪. تفرد أهل بلد من أهل بلد أخرى **এক নগরের লোক থেকে আরেক নগরের লোকের একক বর্ণনা:** যেমন বলা হয়ে থাকে : تفرد أهل بصرة من أهل المدينة বসরাবাসীরা মদীনাবাসীদের থেকে এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।[১]

সনদ ও মতন গরীব হওয়ার প্রেক্ষিতে গরীবের প্রকারভেদ :

সনদ যেমন গরীব বা একক হতে পারে, তেমনি মতনও গরীব বা একক হতে পারে। সনদ ও মতন দু'টোই গরীব হতে পারে। আবার সনদ গরীব হলেও

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীসের পৃ: ৩০ এর ভাবাবলম্বনে।

মতন গরীব নাও হতে পারে। অনুরূপভাবে মতন গরীব হলেও সনদ গরীব নাও হতে পারে। সুতরাং এ প্রেক্ষিতে গরীবকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়।

১. غريب إسنادا ومتنا সনদ ও মতন উভয় প্রেক্ষিতে গরীব :

পারিভাষিক সংজ্ঞা :- هو الحديث الذي تفرد برواية متنه رأو واحدٌ

যে হাদীসের মতন কোন একজন রাবী কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাকে সনদ ও মতন উভয় প্রেক্ষিতে গরীব বলা হয়। যেমন: ইবনে আবি হাতেম তার সনদে উল্লেখ করেছেন যে,

إنّ رجلا سأل مالكا عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال له إن شئت خلّل وإن شئت لا تخلل وكان عبدالله بن وهب حاضرًا، فعجب من جواب مالك وذكر له في ذلك حديثا بسند مصريٍّ صحيحٍ وزعم أنه معروف عندهم فاستعاد مالك الحديث، واستعاد السائل، فامر بالتخليل -

জনৈক ব্যক্তি ইমাম মালেক রহ.কে অযূতে পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাকে বললেন তুমি ইচ্ছা করলে খিলাল করতেও পার, নাও করতে পার। আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মালেক রহ.-এর জবাব শুনে আশ্চার্য হলেন এবং তিনি এ সম্পর্কে তাঁকে মিশরীয়দের একটি সহীহ হাদীস শুনালেন। তার ধারণায় হাদীসটি তাদের কাছে মা'রুফ। মালেক রহ. হাদীসটি পূনরায় উল্লেখ করতে বললেন। আর প্রশ্নকারীকে প্রশ্নটি পূনরায় করতে বললেন এবং তাকে খিলাল করার নির্দেশ দিলেন।

হাদীসটির মতন গরীব; কেননা এ হাদীস অন্যকোন সূত্রে বর্ণিত হয়নি। আর মিশরীদের নিকট এর সনদ মা'রুফ থাকলেও ইমাম মালেক রহ. এককভাবেই হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব থেকে গ্রহণ করেছেন। ফলে এর সনদও এ পর্যায়ে এসে গরীব হয়ে গেছে।

হাদীসটি আবু দাউদ ইবনে লাহি'আর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এর উপর মন্তব্য করেছেন যে: غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة

হাদীসটি গরীব; ইবনে লাহি'আর সূত্র ছাড়া অন্যকোন সূত্রে আমরা হাদীসটি সম্পর্কে অবগত নই।[১]

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যদি কোন নির্ভরযোগ্য রাবী সনদে ও মতনে কোন অংশ বর্ধিত করেন তাহলে তাও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

[১] তাদরীবুর রাবী পৃ: ৪৫৫।

২. غريب إسنادا لا متنا : সনদ হিসাবে গরীব তবে মতন হিসাবে গরীব নয়ঃ

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

هو الحديث الذي روى متنه جماعة من الصحابة وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر

কোন একটি হাদীস কতিপয় নির্ধারিত সাহাবী থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে; কিন্তু কোন একজন বর্ণনাকারী হাদীসটি সেই নির্ধারিত সাহাবীদের বাইরে ভিন্ন কোন সাহাবী থেকে যদি বর্ণনা করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে হাদীসটি শেষোক্ত সূত্রে গরীব হয়ে পড়ে।[১] তাই হাদীসটি সনদ হিসাবে গরীব হলেও মতন হিসাবে গরীব হয় না। এ ধরণের হাদীসের ক্ষেত্রেই ইমাম তিরমিযী বলেন-

هذا حديث غريب من هذا الوجه

যেমন- إنما الأعمال بالنيّات হাদীসটি হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত। কিন্তু ইবনে সাইয়্যিদিন-নাস উল্লেখ করেছেন যে,

رواه عبد المجيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات –

হাদীসটির মতন গরীব নয়, তবে আবু সাঈদ খুদরীর সূত্রে এটি গরীব।
তাছাড়া কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী যদি সনদে কোন অংশ বর্ধিত করেন তাহলে তাও এশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ :

حديث رواه الطبراني من رواية عبد العزيز بن محمد الداراوردي و عباد بن منثور كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة –

সূত্রের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য বটে। কিন্তু এ সূত্রটি বুখারী ও মুসলিম নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছেন-

رواه عيسى بن يونس عن هشام عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة –

তাছাড়া ইমাম মুসলিমও সাঈদ ইবনে সালামার সূত্রে হিশাম থেকে অনুরূপ সূত্রে অর্থাৎ عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতএব দারাওয়ারদীর মাধ্যমে যে সনদটি বর্ণিত হয়েছে তা গরীব বলে সাব্যস্ত হবে।[২]

---

১. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৩১।
২. তাদরীবুর-রাবী পৃ: ৪৫৪-৪৫৫।

৩. غريب متنا لا إسنادا মতন হিসাবে গরীব, সনদ হিসাবে নয়:

এ শ্রেণীর হাদীস খুব একটা পাওয়া যায় না। তবে আল্লামা নববী তাকরীবে উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোন রিওয়ায়াত একক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার পর পরবর্তী কোন স্তরে গিয়ে যদি তা মশহুর হয়ে পড়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে সনদ এক হিসাবে মশহুর হলেও মতনটি গরীবই থেকে যাবে।[১]

তাছাড়া কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী যদি মতনে কোন অংশ বর্ধিত করেন। তাহলে সেটিও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

গরীব সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাদী :

١: غرائب مالك للدارقطني ٢: الافراد للدارقطني ٣: السنن التى تفرد بكل سنة منــها أهل بلدة لأبى داؤد السجستاني.

এছাড়াও তাবরানীর মু'জামুল আওসাত ও মুসনাদে বায্যারে গরীব হাদীস যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

মশহুর, আযীয ও গরীব হাদীসকে আমরা যদিও মাকবূলের শ্রেণীভূক্ত করে উল্লেখ করেছি; তবে মশহুর, আযীয বা গরীব হলেই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হওয়া অপরিহার্য নয়। কেননা সনদের বিচার-বিশ্লেষণে যদি তা গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, যয়ীফ হাদীস সাধারণভাবে মারদূদের অন্তর্ভুক্ত হলেও বিভিন্ন কারণে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সেকারণে যয়ীফ হাদীসকে মারদূদের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

---

[১] তাদ্‌রীবুর-রাবী পৃ-৪৫৫

সনদের নির্ভরযোগ্যতার বিচারে মাকবূল হাদীসের প্রকারভেদ

সনদের নির্ভরযোগ্যতার প্রেক্ষিতে মাকবূল হাদীস প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

১. সহীহ (الصحيح)

২. হাসান (الحسن)

সহীহ (الصحيح) :

আভিধানিক অর্থ :

সহীহ শব্দটি سقيم এর বিপরীত অর্থবোধক। سقيم অর্থ অসুস্থ, রুগ্ন। অতএব সহীহ শব্দের অর্থ হবে সুস্থ ও নিরোগ। বস্তুতঃ শারিরীক সুস্থতার জন্যই শব্দটির প্রকৃত প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে রূপকার্থে নির্ভুল কথা ও বিশুদ্ধ উক্তির জন্যও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। যেমন বলা হয় قول صحيح، مذهب صحيح । এ অর্থের প্রেক্ষিতেই ত্রুটি ও দুর্বলতামুক্ত অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসকে সহীহ হাদীস বলে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة –

যে হাদীস অবিচ্ছিন্ন সূত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই পূর্ণ আদিল বা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, দ্বীনদার এবং উন্নত শিষ্টাচারের অধিকারী হবেন এবং পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী বা সংরক্ষণ গুণের মালিক হবেন। আর বর্ণনাটি যদি তাদের চেয়েও নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনার পরিপন্থী না হয়, এবং বর্ণনায় যদি কোন প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্মত্রুটি বিদ্যমান না থাকে তাহলে এ ধরণের হাদীসকে সহীহ বলা হয়।[১]

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ:

উপরোক্ত সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে। যথা :

১. সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন হতে হবে: এর অর্থ হল প্রত্যেক নিম্নস্থ বর্ণনাকারী তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী থেকে সরাসরি হাদীসটি শ্রবণ করেছেন বা গ্রহণ করেছেন এমন হতে হবে। সনদের কোন ক্ষেত্রেই এর ব্যত্যয় ঘটতে পারবে না।

---

১ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস -

২. বর্ণনাকারীদের প্রত্যেককেই আদিল বা বিশ্বস্ত হতে হবে: এর অর্থ হল প্রত্যেক বর্ণনাকারীকে মুসলমান, বালেগ ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে; যিনি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে থাকেন এমন কোন ব্যক্তি হবে না এবং মুরুওয়াত বা উন্নত শিষ্টাচারের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হয়ে থাকেন এমন কোন ব্যক্তিও হবে না।

৩. বর্ণনাকারীদের প্রত্যেককেই পূর্ণ সংরক্ষণ গুণের অধিকারী হতে হবে: এর অর্থ হল, বর্ণনাকারীকে এমন স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে যে, তিনি যা শ্রবণ করেন তা স্মৃতিতে হুবহু সংরক্ষণ করতে পারেন কিংবা তিনি পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করে তা সংরক্ষণের বিষয়ে এমন যত্নশীল যে, যে কোন সময় চাইলে তিনি তার লিখিত পাণ্ডুলিপিটি উপস্থিত করতে পারেন।

৪. বর্ণনাটি شاذ না হতে হবে : অর্থাৎ হাদীসটি তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীতার্থক কিংবা পরিপন্থী না হতে হবে।

৫. ইল্লতমুক্ত হতে হবে : ইল্লত মূলত বলা হয় এমন সূক্ষ্মত্রুটিকে যা হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে, অথচ বাহ্যিকভাবে হাদীসটিকে ত্রুটিমুক্ত মনে হয়। অতএব ইল্লতমুক্ত হওয়ার অর্থ হল এ ধরণের সূক্ষ্মত্রুটি থেকেও হাদীসটি মুক্ত থাকতে হবে -যা সাধারণভাবে বোধগম্য হয় না; অথচ এবিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা তা ধরতে পারেন। যেমন কোন মওকূফ হাদীসকে মরফূ'রূপে বর্ণনা করা, মরফূ'কে মওকূফরূপে বর্ণনা করা ইত্যাদি ধরণের ত্রুটিগুলো তাতে বিদ্যমান না থাকতে হবে।[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য তাতে ৫টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। এর কোন একটি বিদ্যমান না থাকলে সে হাদীসকে সহীহ বলা হবে না। অর্থাৎ যখন বলা হয় যে, 'এ হাদীসটি সহীহ' এর অর্থ হল হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সকল শর্ত বিদ্যমান রয়েছে। আর যখন বলা হয় যে, 'হাদীসটি সহীহ নয়' -এর অর্থ হয় উপরোক্ত শর্তাবলীর কোন এক বা একাধিক শর্ত বা সব ক'টি শর্ত তাতে বিদ্যমান নেই।

কিন্তু 'হাদীসটি সহীহ নয়' এর অর্থ কখনই এরূপ নয় যে, হাদীসটি মিথ্যা, জাল বা বানোয়াট। কেননা বর্ণনা সূত্রটি বিচ্ছিন্ন হলেই হাদীসের বক্তব্যটি রাসূল সা.-এর বাণী নয় একথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না। এমনিভাবে বর্ণনাকারীর স্মৃতিদৌর্বল্য থাকলেও তার বর্ণিত হাদীসটি রাসূল সা.-এর বক্তব্য নয় একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা বিচ্ছিন্ন সূত্রেও রাসূলের বক্তব্য একজনের নিকট পৌঁছতে

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীসের ভাবাবলম্বনে।

পারে। আবার যিনি স্মৃতি-দুর্বলতার শিকার তার সব বর্ণনাই ভুল হবে এমন বলা যায় না।

আবার বর্ণনা সূত্র অবিচ্ছিন্ন এবং বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত, ন্যায়-পরায়ণ ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হলেই তার বর্ণিত বিষয়টি রাসূল সা.-এর বাণী, এ কথাও নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না। কেননা বিশ্বস্থ ব্যক্তিও ভুল করতে পারেন এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তিও ভুলে যেতে পারেন, ভুল করতে পারেন।

সারকথা এই যে, হাদীস সহীহ হওয়ার অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে সবকটি শর্ত বিদ্যমান আছে; আর 'সহীহ নয়' এর অর্থ সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তার কোন একটি বা একাধিক শর্ত তাতে বিদ্যমান নেই।

এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এরূপ একটি ভুল করে থাকে যে, তারা সহীহ হাদীস বলতে রাসূল সা.-এর বাণীকে বুঝে থাকেন। আর হাদীসটি সহীহ নয় বললে হাদীসটিকে মিথ্যা বা জাল হাদীস বলে মনে করেন। জনগণের এই ভুল ধারণাকে পূঁজি করে অনেক সুবিধাবাদীরা আহলুস্‌সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কোন স্বীকৃত আকীদার কোন বিষয়কে জনগণের নিকট ভুল বলে সাব্যস্থ করার জন্য তারা বলে থাকেন যে, 'এটি কোন সহীহ হাদীসে নেই।' কিংবা তারা তাদের কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসকে জনগণের কাছে গ্রহণীয় করার জন্য বলে থাকেন যে, এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কেননা সহীহ হাদীসে নেই বললে জনগণ মনে করে যে, এ ব্যাপারে কোন হাদীস থাকলেও তা সহীহ না অর্থাৎ জাল। আর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বললে জনগণ মনে করে বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; তাই সঠিক। জনগণতো আর জানেনা যে, সহীহ বলে কি বুঝানো হয়, কোন্ কোন্ ধরণের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়। তা ছাড়া কোন হাদীস বর্ণনাসূত্রের বিচারে সহীহ বলে সাব্যস্ত হওয়ার পরও তা মনসূখ বলেও প্রমাণিত হতে পারে। তাই ঐ সকল বিভ্রান্তদের প্রচারণার ব্যাপারে সকলেরই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

তবে এই শব্দটি যখন মওজু' হাদীসের গ্রন্থে কিংবা যয়ীফ হাদীসের বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থে অথবা মতরুক বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে রচিত গ্রন্থে ব্যবহার করা হয় তখন এ দ্বারা জাল হাদীসই বুঝানো হয়ে থাকে।[১]

সহীহ -এর উদাহরণ :

ما أخرجه البخارى في كتابه ، قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صـــ قرأ في المغرب بالطور - بخارى

[১] কাওয়াইদ ফি উলুমিল হাদীস পৃ: ১৭৩।

এ হাদীসটি সহীহ। কেননা-

১. এ হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত। যদিও ইমাম মালিক عن শব্দযোগে ইবনে শিহাব থেকে, তিনি عن শব্দযোগে মুহাম্মদ ইবনে জুবায়র থেকে, তিনি عن শব্দ যোগে জুবায়র ইবনে মুতঈম থেকে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু যেহেতু এদের কেউই তাদলীসের অভিযোগে অভিযুক্ত নন, অতএব তাদের عن শব্দযোগে বর্ণনা মুত্তাসিল বলে গণ্য হবে।

২. হাদীসের র্বণনাকারীদের সকলেই ثقة বা নির্ভরযোগ্য, ন্যায়-পরায়ণ, দ্বীনদার ও উন্নত শিষ্টাচারের অধিকারী।

৩. সকলেই প্রখর স্মৃতিশক্তির মালিক বলে বিবেচিত। যারা ব্যক্তির নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাইয়ে জ্ঞান রাখেন, তাদের দৃষ্টিতে তাঁরা সকলেই বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

৪. এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনাকারী থেকে এর বিপরীত কোন বর্ণনা বিদ্যমান নেই অর্থাৎ হাদীসটি شاذ নয়।

৫. এ হাদীসের সনদে বা মতনে প্রচ্ছন্ন কোন ত্রুটি বা علة বিদ্যমান নেই। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

সহীহ হাদীসের প্রকারভেদ

সহীহকে মূলত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যথাঃ

১. صحيح لذاته স্ব-বৈশিষ্ট্যে সহীহ ।

২. صحيح لغيره অন্যের সমর্থনের কারণে সহীহ।

صحيح لذاته বা স্ব-বৈশিষ্ট্যে সহীহ -এর সংজ্ঞা :

الشروط الخمسة المذكورة للصحيح إن وجد على وجه الكمال والتمام فهو الصحيح لذاته

সহীর সংজ্ঞায় যে পাঁচটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যদি তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে সহীহ লি-জাতিহি বা স্ব-বৈশিষ্ট্যে সহীহ বলা হবে।(১)

صحيح لغيره বা অন্যের সমর্থনের কারণে সহীহ -এর সংজ্ঞা :

ان كان في شروط الضبط نوع خفة أو قصور وباقى الشرائط على حالها و وجد ما يجبره ذلك القصور سواء كان أقوى منه أو مساويا له أو منحطة عنه فهو الصحيح لغيره -

---

১ মুকাদ্দামায়ে শায়খ আব্দুল হক - পৃষ্ঠা: ৫

যদি সহীর শর্তসমূহের মাঝে যব্‌ত বা সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্যে কোন দুর্বলতা থাকে, আর অন্যান্য শর্তাবলী যদি পূর্ববৎ বহাল থাকে এবং অন্য সূত্রে হাদীসটি পাওয়া যাওয়ার কারণে যদি সেই দুর্বলতার নিরসন করা সম্ভব হয়, তাহলে সে হাদীসকে সহীহ লি-গায়রিহি বলা হয়। অন্য যে সূত্রে হাদীসটি পাওয়া যাবে তা এই সূত্রের চেয়ে সবল, বা এর সমমানের কিংবা তার চেয়ে দুর্বলও হতে পারে।[১]

উপরে সহীর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা সহীর সর্বজনবিদিত ও ব্যাপক ভিত্তিতে স্বীকৃত সংজ্ঞা। তবে অনেকে হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য সংজ্ঞায় উল্লিখিত শর্তাবলী ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু শর্তারোপ করেছেন। যেমন:

১. হাকেম বলেছেন যে, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য (সংজ্ঞায় উল্লিখিত শর্তাবলী ছাড়াও) তার বর্ণনাকারীগণকে مشهور بالطلب বা হাদীস আহরণকারী হিসাবে খ্যাত হতে হবে।

২. আল্লামা সাম'আনী মনে করেন যে, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য বর্ণনাকারীদের মাঝে (فهم) বিবেক বুদ্ধি (معرفة) প্রজ্ঞা, (كثرة السماع) বারবার শ্রবণ ও (مذاكرة) এ নিয়ে আলোচনা-পার্যালোচনার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে হবে।

৩. অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নিকট হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য বর্ণনাকারীদেরকে فقيه বা ফিকাহ শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ হতে হবে। (প্রকৃত পক্ষে এই বক্তব্যটির নিসবত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর দিকে করা যথার্থ নয়।)

৪. অনেকেই মনে করেন, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য বর্ণনাকারীগণকে হাদীসের অর্থ সম্পর্কেও অবগত থাকতে হবে। এটি ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অভিমত বলে উল্লেখ করা হয়।

৫. মুতাআখখেরীন মু'তাযিলাদের কেউ কেউ এবং মুহাদ্দিসীনদের কেউ কেউ বলেন যে, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য কমপক্ষে দু'টি সূত্রে তার উল্লেখ থাকতে হবে। তাদের যুক্তি হল, হাদীস বর্ণনা করা মূলত শাহাদাত বা সাক্ষ্য প্রদান-এর সমার্থক। আর শাহাদাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কমপক্ষে দু'জনের সাক্ষ্য দিতে হয়। অবশ্য আবু আলী যুব্বায়ী মনে করেন যে, একজন ব্যক্তির বর্ণনার সাথে অন্য আরেকজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যুক্ত হলে অথবা কিতাবুল্লার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা একব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে সমর্থন করলে হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য হবে। অবশ্য

---

[১] কাফউল আসার পৃ: ৫০।

আবু মনসুর তামিমী আবু আলী যুব্বায়ীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, তার মতে হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য সর্বস্তরে কমপক্ষে চারজন করে বর্ণনাকারী বিদ্যমান থাকতে হবে।

৬. ইমাম মুসলিমের মতে বর্ণনাকারী এবং তিনি যাথেকে বর্ণনা করবেন এই দু'জন সমসাময়িক কালের হতে হবে এবং উভয়ের মাঝে সাক্ষাত ঘটার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকতে হবে।

৭. ইমাম বুখারী মনে করেন যে, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য বর্ণনাকারী যাথেকে বর্ণনা করবেন তার সঙ্গে র্বণনাকরীর সাক্ষাত ঘটেছিল এবং তিনি তার কাছ থেকে হাদীস আহরণ করেছেন, তা প্রমাণিত থাকতে হবে। [১]

অবশ্য অনেকেই মনে করেন যে, এগুলো প্রত্যেক সংকলকের নিজস্ব সংকলনের জন্য আরোপিত শর্ত। এগুলো মূলত হাদীস সহীহ হওয়ার শর্ত নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

উল্লেখ্য, কোন হাদীসের রাবী বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার পরও হাদীসটি সহীহ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকতে হবে। যথা:

১. হাদীসটি কিতাবুল্লার কোন সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী না হতে হবে।
২. ইসলামের স্বীকৃত ও সর্বজনবিদিত কোন আদর্শের পরিপন্থী না হতে হবে।
৩. প্রথম যুগের মনীষীগণ হাদীসটির প্রতি গুরুত্ব দেননি এবং তার উপর 'আমল করেননি -এমন না হতে হবে।
৪. সর্বজন সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের ব্যাপারে হাদীসটি শায্ (الشاذ) বা একক বর্ণনা না হতে হবে। (أي أن لا يكون غريبا فيما تعمّ به البلوى)

উসূলে ফিক্হে এ বিধানগুলো সর্বজন স্বীকৃত। সুতরাং এর জন্য পৃথক কোন দলীলের প্রয়োজন নেই।[২]

সহীহ হাদীসের হুকুম :

কোন হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হলে তা অপরিহার্যভাবে অনুসরণীয়। সকল মুহাদ্দিস, নির্ভরযোগ্য উসূলবিদ ও ফিকাহবিদদের সর্বসম্মত মত বা (إجماع) এই যে, এরূপ হাদীস শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি বলে গণ্য হবে এবং এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান বর্জন করার অবকাশ কোন মুসলমানের নেই।[৩]

---

[১] তাদরীবুর রাবী - পৃ: ৫১-৫২
[২] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ: ১২৬।
[৩] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস- পৃ: ৩৬।

তবে সহীহ-এর দ্বারা যে ইলম অর্জিত হবে তা ইলমে ইয়াকীনীর পর্যায়ের, না ইলমে যন্নীর পর্যায়ের এ ব্যাপারে মনীষীদের মতভিন্নতা রয়েছে।

বস্তুতঃ যে সকল বিষয় মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত তাদ্বারা যে ইলম অর্জিত হবে তা علم ضروري و يقيني অর্থাৎ তা এমন সহজবোধ্য সাধারণ জ্ঞানের ন্যায় -যা যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই এবং কোনরূপ প্রচেষ্টা ছাড়াই অর্জিত হয় এবং তা দ্বারা সুনিশ্চিত দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়। যে হাদীস মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হয়, তার ব্যাপারেও এই দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয় যে, এটি রাসূল সা.-এর মুখ নিঃসৃত বাণী, আর এটি রাসূল সা.-এর বক্তব্য হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সংশয় থাকে না।

আর যে সকল হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত, তবে সনদ মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেনি; সে সকল হাদীসের বেশ কিছু এমন আছে- যার ভিতরে কিংবা বাহিরে এমন কিছু ইশারা ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকে যাদ্বারা বর্ণিত বিষয়টি রাসূল সা.-এর বাণী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত প্রত্যয় সৃষ্টি করে। যেমন সনদে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত তাকওয়া, পরহেজগারী, কথায় কাজে বিশ্বস্ততা, স্মৃতির প্রখরতা, হাদীস আহরণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সচেতনতার কারণে তা মুতাওয়াতির বা যে সংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছলে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়, তার চেয়েও অগ্রগামী হয়ে যায়। ফলে হাদীসটির সূত্র সংখ্যার দিক থেকে মুতাওয়াতিরের পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছলেও তাদের উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে এহেন রাবীদের বর্ণিত বিষয়টি মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ফলে তা দ্বারা যে ইলম অর্জিত হয় তা নজরী বা যুক্তিনির্ভর হলেও তাদ্বারা ইয়াকীনের ফায়দা হাসিল হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদ্বারা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে, এটি সুনিশ্চতভাবেই রাসূল সা.-এর বাণী। একারণেই বলা হয় যে- إنّ الخبر المحتفّ

بالقرائن القويّة الكافية لإفادة اليقين يفيد العلم اليقيني النظري

যে হাদীসে এমন কোন ইশারা ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকে যা দৃঢ়প্রত্যয় জন্মানোর জন্য যথেষ্ট, তাহলে তাদ্বারা যে ইলম অর্জিত হবে তা গভীর চিন্তাভাবনা ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে যে পর্যায়ের ইয়াকীন ও প্রত্যয় জন্মায় তার সমপর্যায়ের ইয়াকীনের ফায়দা দিবে।

আবার যে সকল হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত, তবে সনদ মুতাওয়াতির পর্যায়ের নয় এবং তাতে এমন কোন 'কারীনা' বা ইশারা-ইঙ্গিতও বিদ্যমান নেই, সেগুলোকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১. সে সব হাদীসের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে اجماع قولي পাওয়া যাবে, ২. কিংবা ইজমা কওলীর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমন কোন বিষয় তাতে পাওয়া যাবে; যেমন উম্মত ব্যাপক ভিত্তিতে হাদীসটির উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং হাদীসের বক্তব্যের উপর আমল করে আসছে (অর্থাৎ হাদীসটি ব্যাপক ভিত্তিতে

সহীহ বলে গৃহীত হয়েছে;) তাহলে এদ্বারা যে ইলম অর্জিত হবে তা পূর্ববর্তী দুই শ্রেণীর ন্যায় ইয়াকীনী ইলম হবে কি না, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

মু'তাযিলাদের একদল এবং দাউদ জাহেরী, আল্লামা কারাবেসী, ইবনে হাযম জাহেরী প্রমুখ মনীষীর অভিমত এই যে, এদ্বারা পূর্ববর্তী দুই শ্রেণীর ন্যায় ইলমে নযরী ইয়াকীনী বা যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট ইয়াকীনের ন্যায় ইয়াকীন সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ এ ধরণের সহীহ হাদীসের ব্যাপারেও এই দৃঢ়প্রত্যয় জন্মাবে যে, এটি রাসূল সা.-এর মুখনিঃসৃত বাণী এবং এতে কোন সংশয় থাকবে না।

অবশ্য ইবনুস সালাহ মনে করেন যে, বুখারী মুসলিমে যেসব সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে কেবলমাত্র সেগুলো দ্বারাই এই ইলমে ইয়াকিনী সৃষ্টি হবে। তবে বুখারী মুসলিমের যে সব হাদীসের ব্যাপারে দারাকুতনী প্রমুখ সমালোচনা করেছেন সেগুলো এই নীতির আওতায় আসবে না। এই মতের সাথে অনেকেই ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। যেমন:

১. আবু হামেদ ইসফারায়েনী
২. কাজী আবু তাইয়্যিব
৩. আবু ইসহাক সিরাজী আশ-শাফেয়ী
৪. আল্লামা সারাখসী আল-হানাফী
৫. কাজী আব্দুল ওয়াহ্হাব আল-মালেকী
৬. ইবনুয্-যাগুনী আল-হাম্বলী
৭. আবু ইয়া'লা হাম্বলী
৮. আবুল খাত্তাব -মৃঃ ৫২৫ হিঃ
৯. ইবনে কাসীর -মৃঃ ৭৭৪ হিঃ
১০. আল্লামা ইরাকী-মৃঃ ৮০৬হিঃ
১১. ইবনে হজর মৃঃ ৮৫২ হিঃ প্রমুখ। [১]

ইবনে তাহের মাকদেসীসহ অনেকেই মনে করেন যে, বুখারী, মুসলিম এবং তাদের শর্তে যে সব হদীস বর্ণিত হবে সেগুলোও একই স্তরের বলে গণ্য হবে; যদিও বুখারী ও মুসলিম তা উদ্ধৃত করেন নি।[২]

তবে জমহুর মনে করেন, এ ধরণের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয়ভাবে হাদীসটি সহীহ বলে প্রমাণিত হলেও এবং হাদীসটির নিসবত রাসূল সা.-এর দিকে করা যথার্থ হলেও এ দ্বারা নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মায় না যে, এটি রাসূল সা.-এর মুখ নিঃসৃত বাণী। বরং এদ্বারা (ظنّ غالب) বা প্রবল ধারণা জন্মে যে, এটি রাসূল সা.-এর বাণী।

---

১ আল-ইখতিসার -৩১, তাদরীবুর রাবী -১০৩।

২ তাদরীবুর রাবী ১০৩।

তবে এক ধরণের সংশয় যৌক্তিকভাবে হলেও বিদ্যমান থেকে যায়। যদিও সংশয়টি খুবই দুর্বল। তাই জমহুর মনে করেন যে, এ ধরণের সহীহ দ্বারা যে ইলম অর্জিত হয় তা ظَنِّيٌّ তথা প্রচ্ছন্ন সংশয়যুক্ত প্রবল ধারণা বা ظَنّ غالِب । অবশ্য যন্নে গালিবের উপর আমল করাও ওয়াজিব। তবে যন্নে গালিবের ক্ষেত্রে কখনও কখনও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এদ্বারা যে ইলম অর্জিত হবে তা ইয়াকিনী হবে না।

সনদের প্রেক্ষিতে সহীহ-এর পার্যায়ভুক্ত নয় এমন হাদীসকেও বিভিন্ন কারণে সহীহ -এর পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয় :

সহীর পর্যায়ভুক্ত নয় এমন হাদীসকে বিভিন্ন কারণে সহীর মর্যাদা দেওয়া হয়। কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. যদি হাদীসটির ব্যাপারে এমন কোন করীনা বা ইশারা ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকে যার কারণে হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মায়।

যেমন; হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যদি এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন, যাদের বর্ণনার ব্যাপারে সংশয় থাকেনা কিংবা বাহিরের কোন ইশারা ইঙ্গিতের কারণে যদি হাদীসটি সহীহ হওয়ার প্রত্যয় জন্মায়।

২. হাদীসটিকে যদি উম্মত ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রহণ করে থাকে। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার 'ইসতিযকার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম তিরমিযী থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম বুখারী রহ. البحر هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. –এই হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন। অথচ এ মানের সূত্রকে হাদীস শাস্ত্রবিদরা সহীহ বলে গণ্য করেন না। আমার নিকটও হাদীসটি সহীহ। কেননা উলামাগণ হাদীসটিকে ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

আল্লামা ইবনে হুমাম অবশ্য স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে,

وقد يصحّ الحديث أيضا عمل العلماء على وفقه

কোন হাদীসের উপর উলামাগণের আমল করাও হদীসটিকে সহীহ বলে প্রতিপন্ন করে।[১]

ইমাম মালেক বলেছেন - شهرة الحديث بالمدينة يغني عن صحة سنده

যখন কোন হাদীস মদীনায় ব্যাপক ভিত্তিতে খ্যাত হয়ে পড়ে তখন তার সনদ সহীহ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়।

আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস উল্লেখ করেছেন যে,

---

১ ফতহুল কাদীর খ: ৩ পৃ:১৪৩।

بل الحديثُ إذا تلقته الأمّةُ بالقبولِ فَهُو عِندَنا بالمعنى المتواتر–

যখন কোন হাদীস উম্মত ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রহণ করে নেয় তখন আমাদের দৃষ্টিতে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে।(১)

৩. হাদীসটিকে যদি কোন মুজতাহিদ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। কোন মুজতাহিদ কোন হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করে থাকলে সেটি হাদীসটির সহীহ হওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ।

আল্লামা ইবনে হুমাম আত-তাহরীরে উল্লেখ করেছেন:

ان المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له

কোন মুজতাহিদ যখন কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন তখন হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে যায়। আল্লামা কাওসারীও অনুরূপ বক্তব্য হাজেমীর شروط الائمة الخمسة -এর টিকায় একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।(২)

আল্লামা ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন যে,

إذا أورد الحديث محدث واحتج به حافظ لم يقع في النفس الا أنه صحيح –

যখন কোন মুহাদ্দিস কোন হাদীস বর্ণনা করেন এবং কোন হাফেযে হাদীস তাদ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেন তখন সেটি সহীহ হওয়া ব্যতীত অন্যকোন ধারণাই অন্তরে উদয় হয় না।(৩) আল্লামা শা'রানী'ও মীযানুল কুবরায় অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

আল্লামা সুয়ূতী তাদরীবুর রাবীতে উল্লেখ করেছেন যে-

قال ابو الحسن الحصار في تقريب المدارك : قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به-

আবুল হাসান আল-হাসসার তকরীবুল মাদারেকে উল্লেখ করেছেন যে, যখন সনদে কোন মিথ্যা বর্ণনাকারী না থাকে 'আর হাদীসটি কিতাবুল্লাহর কোন আয়াতের অনুকূল হয় কিংবা যদি তা শরীয়তের কোন মূলনীতির অনুকূল হয়' তখন যিনি ফকীহ তিনি বুঝতে পারেন যে, হাদীসটি সহীহ। তাই তিনি সেটিকে গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন।

৪. যদি কোন হাদীস হাসান পর্যায়ের হয় এবং সূত্রটি যদি বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা ও প্রচ্ছন্ন ত্রুটিমুক্ত হয় এবং যদি তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে

---

১. আহকামূল কুরআন খ:১ পৃ:৩৮৬, কাওয়াইদ ফি উলূমিল হাদীস পৃ: ২৯।

২. তা'লীক আলা শুরুতিল আইম্মা - পৃ: ৫৩-৫৯।

৩. নসবুর রায়াহ খ: ২ পৃ: ১৩৮।

সেটিও সহীর পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়। আবু মনসূর বাগদাদী এরূপই মনে করেন।[১] মুতাআখখেরীন এধরণের হাদীসকে সহীহ লি গায়রিহি নামে আখ্যায়িত করে থাকেন।

৫. যে হাদীস নির্ভরযোগ্য ইমামগণের সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে, তা যদি গরীব পর্যায়ের না হয় তাহলে সেটিও সহীর পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়। যেমন ইমাম আহমদ রহ. ও তাঁর মত অন্যান্য ব্যক্তিরা যদি ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে; ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর মত অন্যান্য ব্যক্তিরা যদি তা ইমাম মালিক রহ. থেকে বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে এ ধরণের সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে সহীহ-এর পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ এদ্বারাও সেরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যেমন সহীহ দ্বারা জন্মায়।[২]

তবে এসব ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে পণ্ডিত ব্যক্তিদেরই ইলম অর্জন হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের নয়।

কোন নির্দিষ্ট সূত্র সম্পর্কে أصحُّ الأسانيد -

এই মন্তব্য করা ঠিক নয় :

কেননা যদি أصحُّ الأسانيد বা বিশুদ্ধতম বর্ণনাসূত্র বলে কোন সূত্রকে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে তা করতে হবে বর্ণনাকারীদের মাঝে সহীহ-এর শর্তসমূহ সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতেই। প্রকৃত পক্ষে একটি বর্ণনাসূত্রের সকল বর্ণনাকারীর মাঝে সকল শর্তই সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান থাকা খুবই দুরুহ ব্যাপার। একারণেই বিশুদ্ধতম সূত্র চিহ্নিত করতে যারা প্রয়াসী হয়েছেন, তাদের মতামতে ঐক্যমত্য পাওয়া যায়নি। বরং তাদের প্রত্যেকেই তার নিজের ধারণা অনুযায়ী যে সূত্রকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মনে করেছেন, সেটিকেই أصحُّ الأسانيد বলে মন্তব্য করেছেন। বিশেষ করে নিজের পরিচিত পরিমণ্ডলের মাঝে যে সব বর্ণনাকারী বিদ্যমান ছিলেন, তাদের সাথে অধিক ঘনিষ্ঠতার ফলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারাই প্রাধান্য পেয়েছেন। একারণেই বিশুদ্ধতম সূত্রকে সনাক্ত করতে গিয়ে গবেষকরা যে মতামতগুলো ব্যক্ত করেছেন সেগুলো সংখ্যায় অনেক হয়ে গেছে। অথচ একজনের মতামত অন্যজনের সঙ্গে মিলেনি।

তাছাড়া এরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য সকল হাদীসের সমস্ত সূত্রকে একত্রিত করে বিচার-বিশ্লেষণ করে তবেই এ সিদ্ধান্তটি বের করতে হবে। যা মূলত খুবই দুরুহ ও দু:সাধ্য একটি বিষয়। তবে হ্যাঁ বিশিষ্ট অঞ্চলের ভিত্তিতে বা বিশেষ ব্যক্তি

---

[১] তাদরীব পৃ: ১০৪

[২] তাদরীবুর রাবী ১০৪ পৃষ্ঠার ভাবাবলম্বনে।

থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে কোনটি বিশুদ্ধতম তা খুঁজে বের করা সম্ভব। এজন্য এরূপ মন্তব্য করাকে হাদীসবিদগণ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন।

যেমন, হাকেম বলেছেন :

ينبغى تخصيص القول في أصحّ الأسانيد بصحابي أو ببلد مخصوص بأن يقال أصح أسانيد فلان، أو فلا نيين كذا، ولا يعمم –

অর্থাৎ أصحُّ الأسانيد বলে কোন বিশেষ সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসের সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র কিংবা কোন বিশেষ নগরের লোকদের থেকে বর্ণিত হাদীসের সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র -এভাবে সীমিত করে বলা প্রয়োজন; সকল সূত্রের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র এমন ব্যাপক ভিত্তিতে বলা ঠিক নয়।[১]

হাকেম আরো বলেছেন যে, হাদীসশাস্ত্রের ইমাম ও হাফিযগণ তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বিবেচনা ও ইজতিহাদ অনুসারে বিশুদ্ধতম সূত্রের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। বস্তুত প্রত্যেক সাহাবী থেকে বহু তাবেয়ীন বর্ণনাকারী রয়েছেন, আবার প্রত্যেক তাবেয়ী থেকে বহু তাবয়ে তাবেয়ীন বর্ণনা করেছেন, যাদের অধিকাংশই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তাই কোন সাহাবীর ভিত্তিতেও أصحّ الإسناد হওয়ার মন্তব্য করা অর্থাৎ অমুক সাহাবী থেকে বর্ণিত সূত্রগুলো أصحّ الإسناد বা বিশুদ্ধতমসূত্র - এরূপ মন্তব্য করাও সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে কোনটি বিশুদ্ধতম সূত্র কিংবা কোন বিশেষ অঞ্চলের লোকদের থেকে বর্ণিত সূত্রসমুহের মাঝে কোনটি বিশুদ্ধতম সূত্র তা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করতে পারি, কেননা এটা সম্ভব। যেমন হাকেম মন্তব্য করেছেন যে,

১. আহলে বায়ত থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল-

جعفربن محمد (بن على بن حسين بن على) عن أبيه عن جده عن علي رض –

তবে ইমাম তিরমিযী সুলায়মান ইবনে দাউদ-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আহলে বায়ত থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে নিম্নোক্ত সূত্রটিকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন- **اعرج عن عبيد الله بن ابى رافع عن علي** رض

২. সিদ্দীকে আকবর থেকে বর্ণিত হাদীসের সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল-

اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن أبى بكر الصديق رض

৩. ইবনে হযম বলেছেন হযরত উমর রা. থেকে যত সূত্র দুনিয়ায় বর্ণিত আছে তার মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল- **زهري عن السائب بن يزيد عن عمر** رض

---

১. তাদরীব পৃ: ৬১।

৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল-

مالك عن نافع عن ابن عمر رض

৫. হাকেমের মতে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল-

زهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرةرض

তবে ইমাম বুখারীর মতে - ابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةرض

অবশ্য আলী ইবনুল মাদিনীর মতে -

حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرةرض

৬. হাকেম বলেন হযরত আয়শা রা. থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল-

عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشةرض

আবার কেউ কেউ বলেন- زهري عن عروة عن رض عائشة

ইবনে মাঈন বলেন - عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رض

৭. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল -

سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودرض

৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল -

مالك عن الزهري عن أنسرض –

৯. সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র -

علي بن الحسين عن سعيد بن المسيّب عن سعد بن ابى وقاصرض

১০. আবু মূসা আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল

شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابي موسى الاشعري – (১)

অঞ্চল ভিত্তিক أصحّ الأسانيد

১. আহমদ ইবনে সালেহ আল-মিসরী বলেন, মদীনাবাসীদের বর্ণিত সবচেয়ে বিশুদ্ধ সূত্র হল: اسماعيل بن ابى حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رض

২. হাকেম বলেন মক্কাবাসীদের সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল:

سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابررض

---

১. তাদরীব -৬০-৬২।

৩. ইয়ামানীদের সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল -

معمر عن همام عن أبي هريرة رض

৪. মিশরীয়দের সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল-

ليث بن سعيد عن يزيد بن ابي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رض

৫. খুরাসানীদের সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল -

حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة رض

৬. সিরিয়াবাসীদের সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল -

أوزاعي عن حسان بن عطية عن احد من الصحابة –

৭. কূফাবাসীদের সূত্রসমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম সূত্র হল -

يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن سليمان التيمى عن الحارث بن سويد عن علي رض

أصحّ شيئ في الباب- এর অর্থঃ

স্মরণযোগ্য যে, হাদীসের গ্রন্থকারগণ কোন অধ্যায়ের হাদীস বর্ণনা করার পর উল্লেখ করে থাকেন যে, هذا أصحُّ شيئ في الباب । 'এটি এই অধ্যায়ের সবচেয়ে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীস'। যেমন, ইমাম তিরমিযী তার কিতাবে বহু জায়গায় এরূপ উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারীও তাঁর তারীখে এরূপ উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা নববী তার কিতাবুল আযকারে এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন -

لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فانهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، مرادهم أرجحه وأقله ضعفاً –

হাদীসবেত্তাগণের এরূপ বক্তব্যের দ্বারা হাদীসটি সহীহ হওয়া অপরিহার্য হয় না। কেননা তাঁরা হাদীসটি যয়ীফ হলেও هذا اصح ما جاء في الباب এরূপ মন্তব্য করে থাকেন। তাদের একথার অর্থ হল এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর মাঝে এটি সনদের বিচারে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ অন্য হাদীসগুলোর তুলনায় এর দুর্বলতা কম।[১]

সহীহ হাদীসের স্তরভেদ :

বর্ণনাকারীদের আদালত ও যবত্ বিশ্বস্ততা, ন্যায়-পরায়ণতা ও স্মৃতির প্রখরতার তারতম্যের কারণে সহীহ হিসাবে স্বীকৃত সনদসমূহের মাঝে মর্যাদাগত তারতম্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সম্ভবত ইবনুস-সালাহ'ই সর্ব প্রথম সহীহ হাদীস

---

[১] তাদরীব পৃ: ৬৪।

সমূহকে ৭টি স্তরে বিভক্ত করেন। অবশ্য মাইয়্যানিশি রহ. সর্বপ্রথম সহীহ হাদীসকে বিভাজনের কথা বলেছেন। তবে তার বিভাজনটি পূর্ণতা পায়নি। ইবনুস্-সালাহ -এর স্তরবিন্যাসটি ছিল নিম্নরূপ।

১নং স্তর : যেসব হাদীস বুখারী মুসলিম যৌথভাবে সংকলন করেছেন।

২নং স্তর : যেসব হাদীস কেবলমাত্র বুখারীতে সংকলিত হয়েছে।

৩নং স্তর : যেসব হাদীস কেবলমাত্র মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

৪নং স্তর : যেসব হাদীস বুখারী মুসলিমে সংকলিত হয়নি অথচ তা বুখারী মুসলিম কর্তৃক যৌথভাবে সংকলিত হাদীসসমূহের সমমানের।

৫নং স্তর : শুধুমাত্র বুখারীতে সংকলিত হাদীসের সমমানের (অথচ ইমাম বুখারী তা সংকলন করেননি)

৬নং স্তর : শুধুমাত্র মুসলিমে সংকলিত হাদীসের সমমানের (অথচ ইমাম মুসলিম তা সংকলন করেননি)

৭নং স্তর : বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক যৌথভাবে সংকলিত হাদীসের সমমানেরও নয়, কিংবা বুখারী বা মুসলিম যেসব হাদীস পৃথক পৃথকভাবে সংকলন করেছেন সেগুলোর সমমানেরও নয়; অথচ সনদ হিসাবে তা সহীহ।

ইবনুস সালাহ-এর অনুসরণে ইবনে হজর রহ.ও একইভাবে এই স্তরবিন্যাস করেছেন। কিন্তু এই স্তরবিন্যাসের উপর আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।

আপত্তির সার সংক্ষেপ এই যে, বুখারী ও মুসলিম সহীহ হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন বলে স্বীকৃত হলেও তাতে বর্ণিত সকল হাদীসের স্তর সমান নয়। কেননা বুখারী ও মুসলিম যে শর্তের ভিত্তিতে হাদীস সংকলন করেছেন বলে মনে করা হয় তাতেই ভিন্নতা রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম হাদীস সংকলন করতে গিয়ে যে শর্ত নিজেদের উপর আরোপ করেছিলেন বলে মনে করা হয়, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা হাযেমী যা উল্লেখ করেছেন, তার সারসংক্ষেপ এই যে, বর্ণনাকারীদের প্রধানত: পাঁচটি স্তর রয়েছে। যথা:

১. قوي الضبط، وكثير الملازمة উস্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সংস্রব ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

২. قوي الضبط و قليل الملازمة প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী, তবে উস্তাদের সঙ্গে সংস্রব স্বল্পকালীন।

৩. قليل الضبط و كثير الملازمة স্মৃতিশক্তি তত প্রখর নয়, তবে উস্তাদের সঙ্গে সংস্রব দীর্ঘ।

৪. قليل الضبط و قليل الملازمة স্মৃতিশক্তিও প্রখর নয় আবার সংস্রবও দীর্ঘ নয়।

৫. قليل الضبط وقليل الملازمة مع غوائل الجرح স্মৃতিশক্তিও প্রখর নয়, সংস্রবও দীর্ঘ নয়। তদুপরি সমালোচিত।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, ইমাম বুখারী প্রথম শ্রেণী থেকে ব্যাপক ভিত্তিতে হাদীস সংকলন করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রয়োজনে বাছাই করে হাদীস সংকলন করেছেন। আর ইমাম মুসলিম প্রথম দুই স্তর থেকে ব্যাপক ভিত্তিতে হাদীস সংকলন করেছেন। তৃতীয় স্তর থেকে প্রয়োজনে বাছাই করে হাদীস সংকলন করেছেন।

এই বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বুখারীর সকল হাদীসের স্তর সমান নয়, সঙ্গত কারণেই মুসলিমের সকল হাদীসের স্তরও সমান হবে না। তাই বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে যে হাদীস সংকলন করেছেন সেগুলোর স্তরও সমান হবে না সঙ্গত কারণেই।

তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম যেহেতু সমগ্র সহীহ হাদীস তাদের গ্রন্থে সংকলন করার সংকল্প করেননি, তাই তাদের সংকলিত হাদীসের বাইরেও বহু সহীহ হাদীস থেকে গেছে। এমনকি বুখারী ও মুসলিম যে শর্তে হাদীস সংকলন করেছেন সেই শর্ত বিদ্যমান আছে এমন বহু সহীহ হাদীসও উক্ত সংকলনদ্বয়ের বাইরে থেকে গেছে - যা পরে مستدرك গ্রন্থসমূহের সংকলকগণ সংকলন করেছেন। সেই সব হাদীস যদি সনদের বিচারে বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত শর্তে উৎরে যায়, তাহলে সেগুলো কেন প্রথম স্তরে শামিল করা হবে না ? বস্তুত কোন গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার কারণে; কিংবা সংকলকের মর্যাদার কারণে হাদীসের সনদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না। বরং সনদের মর্যাদা- সূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মাঝে সহীর শর্তাবলী (যেমন যব্‌ত ও আদালত) কোন পর্যায়ের ছিল- সে প্রেক্ষিতেই নির্ণিত হয়ে থাকে।

এই প্রেক্ষাপটে ইবনুস সালাহ -এর এই স্তর-বিন্যাসের উপর যারা আপত্তি করেছেন তাদের মাঝে -আল্লামা ইবনুল্ হুমাম, আল্লামা ইবনু আমীরিল হাজ্জ, কাসেম ইবনে কুতলুবোগা, আল্লামা ইবনে কাসীর, কাসতালানী, মুল্লা আলী কারী, সাইয়্যিদ আকরাম সিন্ধী, মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভী, আব্দুল লতীফ সিন্ধী, যাহেদ কাওসারী, যফর আহমদ উসমানী, আহমদ শাকের, ইউসূফ বিন্‌নূরী রহ. প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করার জন্য শায়খ আহমদ শাকের রাহ. একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সহীফাহ- যা তাথেকে হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেছেন, হাম্মাম থেকে মা'মার বর্ণনা করেছেন তাথেকে ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ-এর সহীফায় হাদীস ছিল ১৪২টি। এই সহীফা থেকে বুখারী মুসলিম যৌথভাবে ২৩ টি হাদীস সংকলন করেছেন, বুখারী এককভাবে ১৬ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবার ইমাম মুসলিমও এককভাবে ৫৮ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত সহীফার ৪৫ টি হাদীস তাঁরা সংকলন করেননি। এ ক্ষেত্রে সূত্র যেহেতু এক, সুতরাং উক্ত সহীফার সকল হাদীস সমমানের সহীহ।[১]

এ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বুখারী মুসলিম যৌথভাবে যা সংকলন করেছেন সেগুলোও নির্বিচারে তাঁরা এককভাবে যা সংকলন করেছেন তার চেয়ে সব সময় শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। কিংবা তারা যা সংকলন করেননি তার উপরও শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না।

বরং এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হল সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ কতটা পরিপূর্ণ মাত্রায় পাওয়া গেছে। শর্তসমূহ পরিপূর্ণ মাত্রায় যে হাদীসেই পাওয়া যাবে, তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হবে। বুখারী মুসলিম তা সংকলন করুক বা না করুক।

আল্লামা ইবনে হুমামও বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, যারা বলেন যে, সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস হল যা বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে সংকলন করেছে। অতপর যা বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, অতপর যা মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের এই বক্তব্য মোটেই অর্থবহ কোন বক্তব্য নয়। এ ক্ষেত্রে তাদের তাকলীদ বা অনুসরণ করা মোটেও বৈধ হবে না। কেননা এ দুই গ্রন্থের হাদীসসমূহ বিশুদ্ধতম হওয়ার বিষয়টি কেবল এ প্রেক্ষিতেই যে, গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনাকারীগণের মাঝে সেই শর্তসমূহ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে যা তারা শর্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং যদি এই গ্রন্থদ্বয়ের বাইরের কোন বর্ণনাসূত্রে এইসব শর্ত বিদ্যমান পাওয়া যায়, তারপরও এই গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিশুদ্ধতম বলে অভিমত ব্যক্ত করা এক ধরণের হঠধর্মীতা নয় কি ?

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ. মন্তব্য করেছেন, বুখারী মুসলিমের শ্রেষ্ঠত্ব সামগ্রিকতার বিচারে। তবে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ বুখারী মুসলিমে উদ্ধৃত হলেই তা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবে তা ঠিক নয়।

বস্তুত যারাই ইবনুস সালাহ-এর বিভাজনের সমালোচনা করেছেন, তাদের সমালোচনার সারকথা একটিই যে, শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের বিষয়টি গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে সনদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। কেননা কোন একটি গ্রন্থে

---

[১] তুহফাতুল আশরাফ খ: ১০, পৃ: ৩৯৭ ও তাওযীহুন নযর - খ: ১ পৃ: ২৯৩ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত সকল হাদীস এক মানের হয় না।

অতএব বুখারী ও মুসলিমের সকল হাদীস এক স্তরের নয়। কারণ বুখারী ও মুসলিমে এমন হাদীসও রয়েছে যার সনদ সম্পর্কে أصح الأسانيد এর মন্তব্য রয়েছে। আবার সনদের রাবীদের মাঝে সহীর শর্তসমূহ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে এমন সনদে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে, আবার সহীর শর্তাবলী সাধারণভাবে বিদ্যমান আছে এমন বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবার যেসব বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে এমন বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। তদুপরি যেসব হাদীস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে এমন ধরণের হাদীসও বুখারী মুসলিমে সংকলিত হয়েছে। যদিও এসব সমালোচনা যথার্থ নয় বলে গবেষকগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

বুখারীতে বর্ণিত সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা তাকরীবুন নববীর তথ্যানুসারে ৭২৭৫টি।[১] তবে তাকরার বাদে মোট হাদীস ইবনে হজরের তথ্যানুসারে ২৬০২টি।[২] এই ২৬০২টির মাঝে মুসলিমও সংকলন করেছেন এমন মুত্তাফাক আলাইহি রিওয়ায়াতের সংখ্যা ২৩২৬ টি। সুতরাং কেবল বুখারী সংকলন করেছেন এমন রিওয়ায়াত থাকে ২৬০২-২৩২৬ = ২৭৬ টি।[৩]

তবে ফুয়াদ আব্দুল বাকীর তথ্যানুসারে মুত্তাফাক রিওয়ায়াতের সংখ্যা ১৯০৬টি। এ হিসাবে কেবল বুখারী বর্ণনা করেছেন এমন রিওয়ায়াতের সংখ্যা দাড়ায় (২৬০২-১৯০৬) = ৬৯৬টি। তিনি মুকাদ্দামায় উল্লেখ করেছেন যে মুত্তাফাক রিওয়ায়াতের সংখ্যা ২০০৬টি [৪] সুতরাং শুধু বুখারী সংকলন করেছেন এমন রিওয়ায়াতের সংখ্যা এ হিসাব অনুসারে দাঁড়ায় -(২৬০২-২০০৬) = ৫৯৬টি।

এর মাঝে সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা আছে এমন হাদীসের সংখ্যা ৮০টির চেয়ে কম। বুখারী যেসব রাবীদের থেকে হাদীস আহরণ করেছেন তাদের প্রায় অধিকাংশ থেকে মুসলিমও হাদীস আহরণ করেছেন। তবে যাদের থেকে কেবলমাত্র

---

১. অবশ্য ইবনে হজরের মতে -৬২৮২টি এবং শায়খুল ইসলামের মতে ৬৩৯৫টি। (তাদরীব পৃ: ৭৭)

২. তাকরীবের তথ্যানুসারে তাকরার বাদে ৪০০০টি, আল্লামা আমাভির মতে ২৫১৩টি। (তাদরীব পৃ: ৭৭) ইবনে হজরের মতে মূল হাদীস তাকরারসহ ৭৩৯৭টি। তা'লীকাত ১৩৪১টি, যার মাঝে ১৬০টি ছাড়া বাকি গুলো বুখারী সনদসহ উক্ত গ্রন্থের বিভিন্নস্থানে উল্লেখ করেছেন। মুতাবিআতের সংখ্য ৩৪৪টি। (তাইসীরুল বারী পৃ: ৪৫)

৩. ফয়জুল জারী লি হাল্লি সহীহিল-বুখারী পৃ: ২৪।

৪. আল-লু'লু' ওয়াল মারজান ফি মা ইত্তাফাকা আলাইহিশ-শায়খান

বুখারী হাদীস আহরণ করেছেন (মুসলিম আহরণ করেননি) এ ধরণের রাবীর সংখ্যা ৪৩০ জন। এই ৪৩০ জনের মাঝে ৮০ জন সম্পর্কে যয়ীফ হওয়ার সমালোচনা রয়েছে।[১]

মুসলিমে মোট হাদীসের সংখ্যা আহমদ ইবনে সালামার মতে ১২০০০[২] 'তাকরার' বাদে মোট হাদীস ইমাম নববীর মতে ৪০০০ -এর মত। তবে ফুয়াদ আব্দুল বাকীর মতে ৩০৩৩টি। এর মাঝে ৮২০টি ছাড়া বাকীগুলো বুখারীও সংকলন করেছেন।[৩] এ হিসাবে উভয়ে যৌথভাবে সংকলন করেছেন এমন হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৩৩-৮২০=২২১৩ টি।[৪] যেসব রাবী থেকে শুধু মুসলিম হাদীস আহরণ করেছেন (বুখারী করেননি) এমন রাবীর সংখ্যা ৬২০ জন। এদের মাঝে ২৬০ জনের ব্যাপারে যয়ীফ হওয়ার সমালোচনা রয়েছে। মুসলিম এককভাবে যে ৮২০টি হাদীস সংকলন করেছেন, এর মাঝে ১৩০টি হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। এর সার সংক্ষেপ এই যে, বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সংকলিত যেসব হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার সংখ্যা ৮০ + ১৩০ = ২১০টি। আর বুখারী ও মুসলিম যেসব রাবীদের থেকে হাদীস আহরণ কারছেন তাদের মাঝে যয়ীফ হওয়ার সমালোচনা রয়েছে এমন বর্ণনাকারীর সংখ্যা মোট ৮০ + ২৬০ = ৩৪০জন।

এ থেকে পরিস্কার হয়ে যায় যে বুখারী ও মুসলিমের সকল হাদীস এক মানের নয়। তাই বুখারী মুসলিম সংকলন করলেই তাকে প্রথম শ্রেণীর হাদীস বলে গণ্য করা একটি অযৌক্তিক বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

এজন্যই ইবনুল হাম্বলী তার কাফউল আসার গ্রন্থে ইবনুস সালাহ-এর গ্রন্থ ভিত্তিক বিভাজনের ধারাকে ডিঙ্গিয়ে সনদের বিচারে বিভাজনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। তার বিভাজনটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

ইবনুল হাম্বলীর বিভাজন :

যদিও কোন নির্দিষ্ট সূত্র সম্পর্কে أصحُّ الأسانيد হওয়ার মন্তব্য করা নির্ভরযোগ্য মতামতের আলোকে ঠিক নয়, তথাপি যেসব সূত্র সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ أصحُّ

১. তাদরীব পৃ: ৬৮।

২. মাইয়্যানিশীর তথ্যমতে ৮০০০

৩. তাদরীব -পৃ: ৭৮।

৪. অবশ্য অনেকের মতে বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে সংকলন করেছেন এমন হাদীসের সংখ্যা-২৩২৬টি। বস্তুত: হাদীসের সংখ্যা সম্পর্কে যে মতভিন্নতা তা মূলত: গণনার বিভিন্ন প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে। কেউ হয়ত মু'আল্লাকগুলো গণনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কেউ করেননি। ফলে গণনার ফলাফল বিভিন্ন হয়েছে।

الاسانيد হওয়ার মন্তব্য করেছেন (নিঃসন্দেহে সেগুলো নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নে উঁচু স্তরের বলে মনে করা যায়।) তাই সেগুলো সহীর প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

আর যে সূত্রের বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকের মাঝেই সহীহ্-এর সকল শর্ত বিদ্যমান আছে এবং এ প্রশ্নে কারো কোন দ্বিমত নেই এ ধরণের সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বিতীয় স্তরের বলে গণ্য হবে।

যে সূত্রের বর্ণণাকারীদের মাঝে সহীহ্-এর শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকলেও কারো মাঝে কোন শর্ত বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে কারো কারো দ্বিমত রয়েছে, কিংবা কারো মাঝে কোন একটি শর্ত নিশ্চিতভাবেই বিদ্যমান নেই, তবে এই শর্তটি হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য অপরিহার্য কি না, এ বিষয়ে মনীষীগণের মাঝে দ্বিমত থাকার কারণে হাদীসটি কারো দৃষ্টিতে সহীহ্, কারো দৃষ্টিতে সহীহ্ নয়। যেমন تام الضبط এর বৈশিষ্ট্যটি অনেকের কাছে হাদীস সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। আবার اتصال -এর বৈশিষ্ট্যটি হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলেও হানাফী ইমামগণের নিকট প্রথম তিন যুগে অর্থাৎ সাহাবী, তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীনদের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। (অর্থাৎ ঐ তিন যুগে ইত্তিসাল পাওয়া না গেলেও অন্যান্য শর্ত বিদ্যমান থাকলে হানাফীদের নিকট হাদীসটি সহীহ্ বলে গণ্য হবে।) এধরণের হাদীসগুলো তৃতীয় স্তরের বলে গণ্য হবে।

অতপর :

১. যেসব হাদীস বুখারী ও মুসলিম তাদের গ্রন্থে যৌথভাবে সংকলন করেছেন এগুলো বুখারী বা মুসলিমের এককভাবে বর্ণিত হাদীসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পাবে।
২. যেসব হাদীস শুধু বুখারী সংকলন কারছেন তা মুসলিম কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত হাদীসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পাবে।
৩. যেসব হাদীস মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।
৪. যেসব হাদীসে বুখারী মুসলিমের যৌথশর্ত বিদ্যমান রয়েছে অথচ তারা তা সংকলন করেন নি।
৫. যেসব হাদীস কেবলমাত্র বুখারীর শর্তে বিদ্যমান। অথচ বুখারী তা সংকলন করেননি।
৬. যেসব হাদীস কেবলমাত্র মুসলিমের শর্তে বিদ্যমান। অথচ মুসলিম তা সংকলন করেননি।
৭. যেসব হাদীস সহীহ হলেও বুখারী মুসলিমের যৌথশর্তও তাতে বিদ্যমান নেই কিংবা এককভাবে বুখারীর অথবা মুসলিমের শর্তও বিদ্যমান নেই।

তারপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বুখারী মুসলিমের যৌথশর্ত বলতে তারা

যেসব বর্ণনাকারীদের থেকে যৌথভাবে হাদীস বর্ণনা করেছে তাদেরকে বুঝানো হবে এবং বুখারী ও মুসলিমের পৃথক শর্ত বলতে বুখারী এককভাবে যেসব রাবীদের থেকে হাদীস সংকলন করেছেন কিংবা মুসলিম এককভাবে যেসব বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের থেকে হাদীস সংকলন করাকে বুঝাবে। অবশ্য পরে তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, যেসব হাদীসে বুখারী ও মুসলিমের যৌথশর্ত বিদ্যমান এবং তাতে কোন প্রচ্ছন্ন ক্রটি বিদ্যমান নেই সেগুলোর স্থান এককভাবে বুখারী যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তার উর্ধ্বে হবে।[১]

ইবনুল হাম্বলীর এই বিভাজনে বেশ কিছু ঝটিলতা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা তিনি সনদের ভিত্তিতে বিভাজন শুরু করলেও ইবনুস-সালাহ্ বর্ণিত কিতাব ভিত্তিক বিভাজন এবং তার বর্ণিত সাত প্রকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাছাড়া তার এই বিভাজনে স্তরগুলো নাম্বারের ভিত্তিতে সুস্পষ্টও হয়নি। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য তা বুঝতে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

তাছাড়া أصحُّ الأسانيد -এর পরবর্তী স্তরে তিনি যেসব হাদীসকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তার মাঝেও মর্যাদাগত পার্থক্যের স্তর রয়েছে; যা তার এই বিভাজন থেকে সুস্পষ্ট হয়নি।

এ কারণেই আমরা শুধুমাত্র সনদের ভিত্তিতে একটি নতুন বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। এক্ষেত্রে ইবনুল হাম্বলী যে বিভাজন করেছেন, সেটাকে সামনে রেখে এবং আল্লামা হাযেমীর শুরুতুল আইম্মা সংক্রান্ত বিবরণটিকে সমন্বিত করে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বিষয়টি উপস্থাপন করছি। আশা করি গবেষকরা এই নতুন বিন্যাসটি বিবেচনা করে দেখবেন।

নতুন বিভাজন

১. যেসব হাদীসের সনদ সম্পর্কে أصحُّ الأسانيد -এর মন্তব্য রয়েছে, সেগুলো প্রথম স্তরের বলে গণ্য হবে।

২. যেসব হাদীসের সনদে উল্লিখিত রাবীদের মাঝে সহীর শর্তসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, তদুপরি তারা যদি قوي الضبط والعدالة وكثير الملازمة হন তাহলে এধরণের রাবীদের বর্ণিত হাদীস দ্বিতীয় স্তরের বলে গণ্য হবে। এ ধরণের হাদীস বুখারী মুসলিম যৌথভাবে উদ্ধৃত করুন, বা এককভাবে উদ্ধৃত করুন, কিংবা এই মানের হাদীস অন্য যেকোন গ্রন্থে বিদ্যমান থাক সেগুলো এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

৩. যে সকল হাদীসের রাবীগণের মাঝে সহীর শর্তসমূহ সাধারণভাবে বিদ্যমান

---

[১] কাফউল আসার - পৃ: ৫৬।

আছে, তবে কোন একটি বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে কম মাত্রায় বিদ্যমান। যেমন বর্ণনাকারী যদি قوي الضبط وقليل الملازمة অথবা قليل الضبط وكثير الملازمة হয়; তাহলে এ ধরণের বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তৃতীয় স্তরের বলে গণ্য হবে। ইমাম বুখারীও قوي الضبط وقليل الملازمة স্তরের বর্ণনাকারীদের থেকে বাছাই করে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম قوي الضبط وقليل الملازمة স্তরের রাবীদের থেকে সাধারণভাবেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর قليل الضبط وكثير الملازمة স্তরের রাবীদের থেকে বাছাই করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব বুখারী মুসলিমে যৌথভাবে বর্ণিত হোক বা বুখারীতে অথবা মুসলিমে এককভাবে বর্ণিত হোক কিংবা এমানের হাদীস অন্য যেকোন গ্রন্থে বর্ণিত হোক তা এই স্তরের বলে গণ্য হবে।

৪. যে হাদীসের সূত্রে উল্লিখিত রাবীদের কারো মাঝে কোন শর্ত বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে কারো কারো দ্বিমত রয়েছে, সে সব হাদীস চতুর্থ স্তরের বলে গণ্য হবে। অতএব বুখারী ও মুসলিমের যেসব বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে যয়ীফ হওয়ার সমালোচনা রয়েছে সেগুলো এবং এই মানের হাদীস অন্য যে কোন গ্রন্থে বিদ্যমান থাক সেগুলোও এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

৫. যে সব হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কারো কারো দ্বিমত রয়েছে, সে সব হাদীস পঞ্চম স্তরের বলে গণ্য হবে। অতএব বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত যেসব হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে সেগুলো এবং এই মানের হাদীস অন্য যে কোন গ্রন্থে বিদ্যমান থাক তা এই স্তরের বলে গণ্য হবে।

৬. সহীর শর্তের ক্ষেত্রে দ্বিমতের কারণে যে সব হাদীস কারো দৃষ্টিতে সহীহ এবং কারো দৃষ্টিতে সহীহ নয়, এ ধরণের হাদীস ৬ষ্ট স্তরের বলে গণ্য হবে। যেমন تام الضبط কারো নিকট সহীর শর্ত হিসাবে গণ্য হয়। কারো কারো নিকট তা সহীর শর্ত নয়। ফলে বর্ণনাকারীর মাঝে تام الضبط -এর বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকলে যারা تام الضبط কে শর্ত হিসাবে গণ্য করেন না, তাদের কাছে হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য হবে। আর যারা শর্ত হিসাবে গণ্য করেন, তাদের কাছে হাদীসটি সহীহ নয় বলে গণ্য হবে। এই ধরণের হাদীস যে গ্রন্থেই থাক তা এই ৬ষ্ট স্তরের বলে গণ্য হবে।

৭. যেসব হাদীস সংজ্ঞানুসারে সহীহ নয়, তথাপি বিভিন্ন কারণে সেগুলোকে সহীর মর্যাদা দেওয়া হয়; সেগুলো এই সপ্তম স্তরের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

তবে এই বিভাজনের ভিত্তিতে হাদীসের স্তর নির্ধারণ করা ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার উপর ভিত্তিশীল হবে। সম্ভবত এই ব্যাপক অনুসন্ধানের জটিলতা এড়াতেই আল্লামা ইব্নুস সালাহ ও তাঁর অনুসারীরা কিতাব ভিত্তিক বিভাজনের দিকে গিয়েছেন।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা هذا حديث صحيح এবং هذا حديث صحيح الاسناد - এর মাঝে পার্থক্য :

যখন কোন মুহাদ্দিস কোন হাদীস সম্পর্কে هذا حديث صحيح বলে মন্তব্য করেন তখন এ দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, হাদীসটির সনদও সহীহ এবং তার মতনও সবধরণের شذوذ ও علت থেকে মুক্ত। অর্থাৎ তিনি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে হাদীসটি সহীহ হওয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছেন। কিন্তু যখন তিনি বলেন هذا حديث صحيح الاسناد তখন এর অর্থ হয়, হাদীসটি সনদের বিচারে সহীহ, তবে তিনি মতনের ব্যাপারে দায়িত্ব নিচ্ছেন না।

هذا حديث حسن الاسناد এবং هذا حديث حسن এ দু'য়ের মাঝেও পার্থক্য অনুরূপ। অর্থাৎ هذا حديث حسن বললে এর অর্থ হয় হাদীসটি হাসান পর্যায়ের সনদ ও মতনে বিদ্যমান। কিন্তু هذا حديث حسن الاسناد -এর অর্থ হয় হাদীসটির সনদ হাসান হওয়ার পূর্ণ গ্যারান্টি তিনি দিচ্ছেন। তবে তিনি মতনের দায়িত্ব নিচ্ছেন না।[১]

বর্তমানে কোন মুহাদ্দিসের জন্য কোন হাদীস সম্পর্কে সহীহ কিংবা যয়ীফ হওয়ার মন্তব্য করার অধিকার আছে কি নেই?

বর্তমানে কোন হাদীসের ব্যাপারে সহীহ কিংবা যয়ীফ হওয়ার মন্তব্য করার অধিকার কোন মুহাদ্দিসের আছে কি নেই, এব্যাপারে দুই ধরণের মতামত পাওয়া যায়।

১. ইবনুস-সালাহ মনে করেন, এ যুগে সে ধরণের জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তি নেই এবং সে ধরণের যোগ্যতাও নেই। তাই কোন হাদীস সম্পর্কে সহীহ, হাসান বা যয়ীফ হওয়ার মন্তব্য করা কারো জন্য বৈধ হবে না। তাছাড়া পূর্বে যে হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করা হয়েছে, পরবর্তীতে সনদে কোন দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে পরবর্তী গবেষকদের নিকট তা যয়ীফ বলে সাব্যস্ত হতে পারে। তাই পরবর্তীদের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. তবে ইমাম নববী মনে করেন, যদি কারো মাঝে সে ধরণের যোগ্যতা ও জ্ঞান-পাণ্ডিত্য থাকে তাহলে তার জন্য হাদীস সম্পর্কে সহীহ, হাসান বা যয়ীফ হওয়ার মন্তব্য করা বৈধ হবে। কেননা মুতাআখখিরীনদের অনেকেই বহু হাদীস সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য করেছেন, যে হাদীসগুলো সম্পর্কে পূর্ববর্তী কোন মুহাদ্দিস মন্তব্য করেননি।

---

১ আদদুরারুস-সামিনা (শাব্দিক পরিবর্তনসহ) পৃ: ৪২।

পরবর্তীকালে যারা হাদীস সম্পর্কে সহীহ, হাসান, যয়ীফ হওয়ার মন্তব্য করেছেন, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন -

১. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ- যিনি ইবনুল কাত্তান নামে খ্যাত। (মৃঃ ৬২৮হিঃ)
২. হাফেয যিয়াউদ্দীন আল-মাকদেসী (মৃঃ ৬৪৩হি)
৩. হাফেয যকীউদ্দন আল-মুনযেরী (মৃঃ ৬৫৬হিঃ)
৪. আল্লামা নববী (মৃঃ ৬৭৬ হিঃ)
৫. শায়খ শরফুদ্দীন দিমইয়াতী (মৃঃ ৭০৫হিঃ)
৬. আল্লামা মিয্‌যী (মৃঃ ৭৪২হিঃ)
৭. হাফেয ইবনুল মাওওয়াক (মৃঃ .....)
৮. আল্লামা যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮হিঃ)
৯. শায়খ তকীউদ্দীন সুবকী (মৃঃ ৭৫৬হিঃ)
১০. হাফেয ইবনে কাসীর (মৃঃ ৭৭৪হিঃ)
১১. হাফেয যইনূদ্দীন ইরাকী (মৃঃ ৮০৬হি)
১২. আল্লামা ইবনে হজর (মৃঃ ৮৫২হিঃ)
১৩. আল্লামা আইনী (মৃঃ ৮৫৫হিঃ) [১]

অবশ্য আল্লামা সুয়ূতী রাহ. কোন হাদীস সম্পর্কে هذا حديث صحيح এরূপ মন্তব্য না করে هذا حديث صحيح الاسناد এরূপ মন্তব্য করার পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা কোন হাদীস সনদের বিচার-বিশ্লেষণে সহীহ বলে প্রতিভাত হলেও তাতে কোন প্রচ্ছন্ন ত্রুটি থাকতে পারে। যে সম্পর্কে হয়ত পরবর্তী গবেষকরা অবগত হতে পারেন নি।[২]

সহীহ হাদীসের উৎস গ্রন্থসমূহ

শুধুমাত্র সহীহ হাদীস সংকলনের অভিপ্রায় নিয়ে যেসব গ্রন্থ সংকলিত হয়েছের :

১. কিতাবুল আসার : ইমাম আবু হানীফা রহ. (মৃঃ ১৫০হিঃ)।
২. মুআত্তা মালিক : মালিক ইবনে আনাস (মৃঃ ১৭৯হিঃ)।
৩. সহীহ বুখারী : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (মৃঃ ২৫৬হিঃ)।
৪. সহীহ মুসলিম : আবু হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃঃ ২৬১হিঃ)।
৫. আল মুনতাকা মিনাস্ সুনানিল মুসনাদাহ : হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে জারুদ (মৃঃ ৩০৭হিঃ)।

---

১ লামহাত ফী উসূলিল হাদীস ১৩৩ - ১৩৬ ও তাদরীব -১১২-১১৫ পৃষ্ঠার তথ্য অবলম্বনে।

২ তাদরীব পৃঃ ১১৬।

৬. সহীহ ইবনে খুযায়মা : হাফেয আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা (মৃঃ ৩১১হিঃ)।
৭. সহীহ আবু আওয়ানা : ইমাম ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ইস্ফারায়েনী (মৃঃ ৩১৬হিঃ)।
৮. আল মুনতাকা : হাফেয আবু মুহাম্মদ কাসেম ইবনে আসবাগ (মৃঃ ৩৪০হিঃ)।
৯. সহীহ ইবনুস্ সকন : হাফেয আবু আলী সাঈদ ইবনে উসমান ওরফে ইবনুস সকন বাগদাদী (মৃঃ৩৫৩হিঃ)।
১০. সহীহ ইবনে হিব্বান : হাফেয আবু হাতেম মুহা. ইবনে হিব্বান বুস্তী (মৃঃ ৩৫৪হিঃ)।
১১. মুসতাদরাকে হাকেম : আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (মৃঃ ৪০৫হিঃ)।
১২. আল্-মুখতারাহ : হাফেয যিয়াউদ্দীন আল-মাকদেসী (মৃঃ ৬৪৩হিঃ)।

উপরোক্ত ১২টি গ্রন্থের লেখকগণ কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সংকলনের অভিপ্রায় নিয়ে হাদীস সংকলন করলেও তাদের অনেকেই আপন অভিপ্রায়ে পূর্ণাঙ্গ সফল হতে পারেননি।

কেবলমাত্র বুখারী, মুসলিম ও মুআত্তা মালিক ও কিতাবুল আসার -এর সংকলকগণ আপন অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছেন বলে পরবর্তী গবেষকগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অবশ্য বুখারী ও মুসলিমের বেশ কিছু হাদীস সম্পর্কে আল্লামা দারাকুতনী যয়ীফ হওয়ার দাবী করেছেন। কিন্তু পরবর্তী গবেষকগণ এ দাবীর যথার্থতাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। এমনকি তারা যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন যে, দারাকুতনীর এ মন্তব্যের কোন সারবত্তা নেই। অতএব বুখারী ও মুসলিমের সকল হাদীস সম্পর্কে কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই নির্দ্বিধায় সহীহ হওয়ার মন্তব্য করা যায়। তবে যেসব হাদীস বুখারী ও মুসলিম সনদ বিহীন মু'আল্লাক রূপে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ সনদের শুরুর দিকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করে হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন (এ ধরণের উপস্থাপনা সাধারণতঃ শিরোনামেই পাওয়া যায়) সেগুলোর ব্যাপারে আল্লামা নববী রাহ. তাকরীবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যেগুলো বলিষ্ঠতা জ্ঞাপক শব্দে উল্লেখ করেছেন, যেমনঃ

قَالَ، فَعَلَ ، اَمَرَ، رَوى، ذَكَرَ فُلاَنٌ

সেগুলো তিনি যার ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন, তার থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে বলেই ধরা হবে। আর যদি দুর্বলতা জ্ঞাপক শব্দযোগে উল্লেখ করে থাকেন যেমন-

يُروىَ، يُذْكَرُ، يُحْكى، يُقَالُ و رُوِىَ، وذُكِرَ، وحُكِيَ عن فلان

ইত্যাদি শব্দে উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে যার ভাষ্যে তিনি সেগুলো উদ্ধৃত করেছেন তাথেকে সহীহ সনদে তার কাছে বিদ্যমান আছে বলে মনে করা হবে না।[১]

কিতাবুল আসার ও মুআত্তা মালিকের হাদীস সম্পর্কেও নির্বিচারে সহীহ হওয়ার মন্তব্য করা যায় বলে অধিকাংশ গবেষক মনে করেন। যদিও মুআত্তা মালিকের কোন কোন হাদীস সম্পর্কে যয়ীফ হওয়ার মন্তব্য রয়েছে; তবে মন্তব্যগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

এই চারটি ছাড়া উপরোক্ত বারটি গ্রন্থের অপরাপর গ্রন্থে যেসব হাদীস সংকলিত হয়েছে সেগুলো গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে সহীহ হলেও বাস্তবে কোথাও কোথাও এর ব্যত্যয় ঘটেছে।

যেমন মুসতাদরাকে হাকেম সহীহ হাদীসের গ্রন্থ হলেও গ্রন্থকার কোন হাদীসকে সহীহ বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে খুবই নমনীয় নীতি অবলম্বন করেছেন। ফলে তার এই গ্রন্থে বহু যয়ীফ, মুনকার, এমন কি মওযু' (জাল) হাদীসও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। আল্লামা যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, এ গ্রন্থের এক চতুর্থাংশই অতিশয় যয়ীফ, মুনকার ও মওযু' হাদীস। অবশ্য যাহাবীর এই মন্তব্যে কিছুটা অতিশয়োক্তি রয়েছে। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর কাতানী (মৃঃ- ১৩৪৫হিজরী) বলেছেন যে, বস্তুতঃ এ ধরণের দুর্বল হাদীস সন্নিবেশিত হওয়ার কারণ এই যে, তিনি প্রথমে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন, পরবর্তীতে সেগুলো যাচাই-বাছাই করে বস্তুনিষ্ঠ সহীহ হাদীসগুলোই সংকলন করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। এবং সে কাজ তিনি শুরুও করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই পরপারের ডাক এসে যায়; যে কারণে যাচাই-বাছাইয়ের কাজটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই শুরুর দিকে যতটুকু (এক পঞ্চমাংশ) তিনি যাচাই-বাছাই করে ছিলেন সেটুকুতে এই দুর্বলতা কম পরিলক্ষিত হয়।

যাই হোক মুসতাদরাকে হাকেমের সকল হাদীস সম্পর্কে নিশ্চতভাবে সহীহ হওয়ার মন্তব্য করা যাবে না। বরং সনদের বিচার-বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করতে হবে।

অনুরূপভাবে সহীহ ইবনে হিব্বানে যেসব শর্তের ভিত্তিতে হাদীস সংকলন করা হয়েছে তা অত্যন্ত নমনীয় পর্যায়ের বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। কারণ

---

[১] তাকরীব আলাত্ তাদবীর পৃঃ ৮৮-৯২।

ইবনে হিব্বান সহীহ ও হাসানের মাঝে পার্থক্য করতেন না। তাছাড়া কোন মজহুল বা অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর উস্তাদ ও শাগরেদগণ মা'রুফ বা পরিচিত ব্যক্তি হলে মজহুল ব্যক্তি আর মজহুল বা অজ্ঞাত থাকে না বলে তিনি মতামত পোষণ করতেন। ফলে এ কিতাবের সকল হাদীসকেও নির্বিচারে সহীহ বলে মন্তব্য করা যাবে না।

ইবনে খুযায়মা রচিত সহীহ গ্রন্থটি বিশুদ্ধতার বিচারে মুসতাদরাকে হাকেমের চেয়ে উর্ধ্বের হলেও এটিকে সহীর নিখুঁত সংকলন বলে আখ্যায়িত করা যায় না। হাফেয যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, সহীহ ইবনে খুযায়মার সকল হাদীস সহীহ নয়। বরং কতিপয় দুর্বল হাদীসও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

সারকথা এই যে, উপরোক্ত বারটি গ্রন্থ সহীহ হাদীসের প্রথম শ্রেণীর সংকলন হলেও কেবলমাত্র বুখারী, মুসলিম, কিতাবুল আসার ও মুআত্তা মালিক ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থই এমন নয়, যার সকল হাদীস সম্পর্কে নির্বিচারে সহীহ হওয়ার মন্তব্য করা যায়। বরং উপরোল্লিখিত চারটি ছাড়া বাকী সকল গ্রন্থের হাদীস সম্পর্কে সহীহ হওয়ার মন্তব্য করার জন্য সনদের যাচাই-বাছাই ও বর্ণনাকারীদের বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থসমূহ ছাড়াও সনদের যাচাই-বাছাই পূর্বক সহীহ হাদীস আহরণ করা যায় এরূপ উৎস গ্রন্থসমূহের মাঝে নাসাঈ শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, সুনানে বায়হাকী, সুনানে দারেমী, সুনানে দারাকুতনী ইত্যাদি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আরো যে সব গ্রন্থ থেকে সনদের বিচার-বিশ্লেষণের পর সহীহ হাদীস আহরণ করা যায় সেগুলোর মাঝে কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলঃ

১. মুসনাদে তায়ালেসী -মৃঃ ২০৩ হিঃ
২. মুসনাদে আবি জা'ফর মুসনেদী -মৃঃ ২২৯ হিঃ
৩. মুসনাদে আলী ইবনুল মাদিনী -মৃঃ ২৩৪ হিঃ
৪. মুসনাদে আবি বকর ইবনে শায়বা -মৃঃ ২৩৫ হিঃ
৫. মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ -মৃঃ ২৩৮ হিঃ
৬. মুসনাদে উসমান ইবনে শায়বা -মৃঃ ২৩৯ হিঃ
৭. মুসনাদে আহমদ -মৃঃ ২৪১ হিঃ
৮. মুসনাদে ইবনে সানজার -মৃঃ ২৫৮ হিঃ
৯. মুসনাদে ইয়াকুব ইবনে শায়বা -মৃঃ ২৬২ হিঃ
১০. মুসনাদে বায্যার -মৃঃ ২৮৮ হিঃ
১১. মুসনাদে হাসান ইবনে সুফ্য়ান -মৃঃ ৩০৩ হিঃ
১২. মুসনাদে ইবনে আবি গারযাহ -মৃঃ ..... হিঃ

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে কেবলমাত্র মা'রুফ তথা রাসূল সা. থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহই সংকলন করা হয়েছে। এ ধরণের আরো যেসব গ্রন্থে কেবলমাত্র মা'রুফ বা রাসূল সা.-এর হাদীসসমূহই সংকলন করা হয়েছে সেগুলোতেও বহু সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

আবার বেশ কিছু হাদীস গ্রন্থ এমনও রয়েছে যেগুলোতে রাসূল সা.-এর হাদীসের সঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা অভিমত ও মন্তব্য হিসাবে সাহাবী ও তৎপরবর্তী কালের মনীষীগণের মতামতও সংকলন করা হয়েছে। এসকল গ্রন্থও সহীহ হাদীসের উৎসগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সনদের বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে এসব গ্রন্থেও বহু সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে। বরং এ সকল গ্রন্থে বলতে গেলে সহীহ হাদীসের সংখ্যাই বেশী। নিম্নে এ ধরণের কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলঃ

১. মুসান্নাফে হাম্মাদ ইবনে সালামা -মৃঃ ১৬৭ হিঃ
২. মুসান্নাফে ওয়াকী -মৃঃ ১৯৭ হিঃ
৩. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক -মৃঃ ২১১ হিঃ
৪. মুসান্নাফে ফিরইয়াবী মৃঃ ২১২ হিঃ
৫. ফিকহে আবি উবায়দ -মৃঃ ২২৩ হিঃ
৬. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা -মৃঃ ২৩৫ হিঃ
৭. মাসাঈলে ইবনে হাম্বল -মৃঃ ২৪১ হিঃ
৮. কিতাবু মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-মারওয়াযী -মৃঃ ২৯৪ হিঃ
৯. মুসান্নাফে বকী ইবনে মাখলাদ -মৃঃ ৩১৩ হিঃ
১০. কিতাবু ইবনিল মুনযির -মৃঃ ৩১৯ হিঃ
১১. মুসান্নাফে সাঈদ ইবনে মনসূর
১২. মুয়াত্তা ইবনে আবি যি'ব
১৩. মুয়াত্তা ইবনে ওয়াহ্হাব
১৪. ফিকহে আবি সওর

অবশ্য এসকল গ্রন্থের অনেকগুলোই বর্তমানে দুর্লভ।

এছাড়াও শু'বা, সুফ্য়ান, লাইস, আওযায়ী, হুমায়দী, ইবনু মাহদী, মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ প্রমুখ মনীষী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ। উপরোল্লিখিত গ্রন্থসমূহের অনেক গুলোই মুয়াত্তা মালিকের পর্যায়ের গ্রন্থ; যার কোন কোনটিতে সহীহ হাদীসের সংখ্যা মুয়াত্তা মালিক এর সমান, কোনটিতে কম, কোনটিতে বেশী।[১]

---

[১] তাদরীব ৮২-৮৩ আংশিক পরিবর্ধনসহ।

মুসতাখরাজ আলাস-সহীহাইন :

আল্লামা ইরাকী উল্লেখ করেছেন যে মুসতাখরাজ বলতে এমন ধরণের হাদীসের গ্রন্থকে বুঝায়, 'যার রচয়িতা কোন একটি হাদীসের গ্রন্থে উল্লিখিত সকল হাদীসকে নিজ সনদে আপন গ্রন্থে সংকলন করবেন; তবে তার সনদটি যে গ্রন্থকে সামনে রেখে তিনি কাজ করবেন সেই গ্রন্থকারের উস্তাদ কিংবা তার পরবর্তী নিকটতর কোন রাবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যাবে।'

কেবলমাত্র সহীহ বুখারীর উপর যারা মুসতাখরাজ গ্রন্থ তৈরী করেছেন:

১. মুসতাখরাজ : আবু বকর ইসমাঈলী কৃত -মৃঃ ৩৭১ হিঃ
২. মুসতাখরাজ : বরকানী কৃত
৩. মুসতাখরাজ : আবু আহমদ গত্‌রিফী কৃত -মৃঃ ৩৭৭ হিঃ
৪. মুসতাখরাজ : আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আবি যুহ্‌ল কৃত -মৃঃ ৩৭৮ হিঃ
৫. মুসতাখরাজ : আবু বকর ইবনে মার্‌দুবিয়্যাহ কৃত -মৃঃ ৪১৬ হি[১]

শুধুমাত্র মুসলিমের উপর যারা মুসতাখরাজ গ্রন্থ তৈরী করেছেন:

১. মুসতাখরাজ : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে রাজা' নিশাপুরী কৃত -মৃঃ ২৮৬ হিঃ
২. মুসতাখরাজ : আবু জা'ফর ইবনে হামাদান কৃত -মৃঃ ৩১১ হিঃ
৩. মুসতাখরাজ : আবু আওয়ানা কৃত -মৃঃ ৩১৬ হিঃ
৪. মুসতাখরাজ : আবু ইমরান আল-জুওয়ায়নী কৃত -মৃঃ ৩২৩ হিঃ
৫. মুসতাখরাজ : আবু নসর আত্‌-তূসী কৃত -মৃঃ ৩৪৪ হিঃ
৬. মুসতাখরাজ : আবুল ওয়ালীদ আল-কুরাশী কৃত -মৃঃ ৩৪৪ হিঃ
৭. মুসতাখরাজ : আবু সাঈদ ইবনে আবি উসমান কৃত -মৃঃ ৩৫৩ হিঃ
৮. মুসতাখরাজ : আবু হামেদ শারেকী কৃত -মৃঃ ৩৫৫ হিঃ
৯. মুসতাখরাজ : আবু বকর জাওযাকী কৃত -মৃঃ ৩৭৭ হি[২]

বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থের উপর যারা পৃথক পৃথকভাবে মুসতাখরাজ তৈরী করেছেন :

১. আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল আখরাম -মৃঃ ৩৪৪ হিঃ
২. আবু আলী মাসিরজিসী -মৃঃ ৩৬৫ হিঃ
৩. আবু বকর আল-ইয়াযদী -মৃঃ ৪২৮ হিঃ
৪. আবু নু'আয়েম ইস্পাহানী -মৃঃ ৪৩০ হিঃ

---

১ তাদরীব - পৃঃ ৮৩।

২ তাদরীব - পৃঃ ১৪।

৫. আবু মুহাম্মদ আল-খাল্লাল -মৃঃ ৪৩৯ হিঃ
৬. আবু মাসউদ -মৃঃ ৪৭৬ হিঃ
৭. আবু যর আল-হরবী -মৃঃ ..... হিঃ
৮. সুলায়মান ইবনে ইব্‌রাহীম ইস্পাহানী -মৃঃ ..... হি[১]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

একই গ্রন্থে বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থের উপর মুসতাখরাজ তৈরী করেছেন আবু বকর ইবনে আবদান আশ্‌-শিরাজী মৃঃ ৩৭৭ হিঃ।

মুসতাখরাজ গ্রন্থ তৈরীর উদ্দেশ্য

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে, যেহেতু একটি গ্রন্থে হাদীসগুলো সহীহ সনদে সংকলিত হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় সেই হাদীসগুলো নিয়েই আরেকটি গ্রন্থ সংকলন করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? এবং এ ধরণের সংকলনের দ্বারা ফায়দাই বা কি? যেহেতু উভয়ের উস্তাদ ও তৎপরবর্তী সনদ একই।

এ ধরণের মুসতাখরাজ গ্রন্থ সংকলনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও ফায়দা রয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী এ ধরণের গ্রন্থ সংকলনের প্রায় ১০টি ফায়দার কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদ্দেশ্য ও ফায়দার কথা উল্লেখ করছি -

১. নিজের সনদকে 'আলী করার উদ্দেশ্যে

অর্থাৎ যদি মুসতাখরাজের গ্রন্থকার বুখারী কিংবা মুসলিম থেকে হাদীসটি উদ্ধৃত করতেন তাহলে তার সনদ বুখারীর চেয়ে সাফেল বা নিম্ন হয়ে যেতো। অথচ বুখারী যাথেকে হাদীসটি সংকলন করেছেন, তিনিও যদি তাথেকে কিংবা তার সমপর্যায়ের কোন ব্যক্তি থেকে হাদীসটি আহরণ ও সংকলন করতে পারেন, তাহলে তার সনদ বুখারীর সমমানের বলে গণ্য হবে।

২. পরিবর্ধিত অংশের প্রতি আলোকপাতের উদ্দেশ্যে

অর্থাৎ অনেক সময় কোন কোন সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কিছু কিছু শব্দ বর্ধিত থাকে, আবার কোন কোন সূত্রে বর্ণিত হাদীসের শেষে সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট উল্লেখ থাকে- যাদ্বারা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে এবং হাদীসটির ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফায়দা হয়ে থাকে। এ ধরণের ফায়দার প্রতি আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেও এ ধরণের মুসতাখরাজ গ্রন্থ তৈরী করা হয়ে থাকতে পারে।

---

[১] তাদরীব - পৃঃ ৮৪।

৩. সূত্রের আধিক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে

অর্থাৎ যখন বুখারী একটি হাদীস এক উস্তাদ থেকে বর্ণনা করলেন, আর মুসতাখরাজের রচয়িতা সেই উস্তাদ থেকেই উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন তখন হাদীসটি দুই সূত্রে বর্ণিত হল। ফলে সূত্রে আধিক্য সৃষ্টি হল। পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীসের মাঝে কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সূত্রের আধিক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। অর্থাৎ যেটি অধিক সূত্রে বর্ণিত সেটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। অতএব কোন গ্রন্থের উপর মুসতাখরাজ গ্রন্থ তৈরী দ্বারা এই ফায়দাটিও অর্জিত হয়।

তবে মনে রাখতে হবে যে, মুসতাখরাজের রচয়িতাগণ অনেক ক্ষেত্রেই হুবহু শব্দে হাদীসটি সংকলন করেন না। বরং তিনি তার উস্তাদ থেকে যে শব্দে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন সেই শব্দেই তিনি তা উদ্ধৃত করেন। ফলে যে গ্রন্থের উপর মুসতাখরাজ তৈরী করা হয় তাতে উল্লিখিত হাদীসের শব্দ ও মুসতাখরাজ গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসের শব্দের মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়।

তাই কোন মুসতাখরাজ গ্রন্থে কোন হাদীস সম্পর্কে رواه البخاري বা رواه مسلم শব্দ দেখে তাকে বুখারী বা মুসলিমের রিওয়ায়াত বলে রেফারেন্স পেশ করা ঠিক হবে না। বরং তাদের এ ধরণের বক্তব্যের অর্থ হয়ে থাকে যে, হাদীসের মূল ভাষ্যটি বুখারী বা মুসলিমও উদ্ধৃত করেছেন।

তবে যদি মুসতাখরাজের গ্রন্থকার এরূপ মন্তব্য করেন যে, رواه البخاري بلفظه তাহলে বুখারীর রিওয়ায়াত বলে রেফারেন্স দেওয়া যাবে। অন্যথায় বুখারীর রিওয়ায়াতের সাথে মিলিয়ে না দেখে শুধু মুসতাখরাজের উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে এটিকে বুখারীর রিওয়ায়াত বলে রেফারেন্স পেশ করা যাবে না। কেননা উভয় রিওয়ায়াতের মাঝে শাব্দিক পার্থক্য থাকতে পারে।

সহীহাইনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বুখারীর প্রাধান্য

একথা সবর্জন স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে সহীহ হাদীসের যত সংকলন তৈরী হয়েছে তার মাঝে বুখারী ও মুসলিম সর্বশ্রেষ্ঠ দুই গ্রন্থ। কুরআনের পরে এ দু'টি গ্রন্থকে সহীহ হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সংগঠিত হয়েছে। সকলেই এ গ্রন্থদ্বয়কে সহীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌছে গেছে।

ইবনুস সালাহ উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে এ মর্মে যে উক্তি রয়েছে যে - ما أعلم في الارض كتابا ما بعد كتاب الله أصحّ من مؤطا مالك

'আমি পৃথিবীতে আল্লাহর কিতাবের পর মুয়াত্তা মালেকের চেয়ে কোন বিশুদ্ধ কিতাব আছে বলে জানি না।' তাঁর এই উক্তি বুখারী মুসলিম সংকলিত হওয়ার পূর্বেকার উক্তি।[১]

কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের মাঝে বিশুদ্ধতার প্রশ্নে কোনটি শ্রেষ্ঠ, এ প্রশ্নে মনীষীগণের বিভিন্ন ধরণের উক্তি পাওয়া যায়। যেমন:

১. ইবনুল মুলাক্কান উল্লেখ করেছেন যে, আমি মুতাআখ্খেরীনদের কাউকে কাউকে দেখেছি যে, তারা দু'টো গ্রন্থকেই সমান বলে মনে করতেন। ইমাম কুরতুবীও এরূপ অভিমত পোষণ করতেন।[২]

২. আবু আলী নিশাপুরী মন্তব্য করেছেন যে- ما تحت أديم السماء كتاب أصحّ من كتاب مسلم – 'আসমানের নিচে মুসলিম শরীফের চেয়ে বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই।'

অনুরূপভাবে আবু বকর ইবনে খুযায়মা মুসলিম শরীফ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে- ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن اسماعيل

'এই কিতাবে যা কিছু আছে তার সবই মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর গ্রন্থের চেয়ে উত্তম।'

অনরূপভাবে কাজী ইয়ায আবু মারওয়ান আত-তুবনীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলতেন- كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري

'আমার কোন কোন উস্তাদ সহীহ মুসলিমকে সহীহ বুখারীর উপর প্রাধান্য দিতেন।'

এ সকল বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এক শ্রেণীর মুহাদ্দিস বুখারীর উপর মুসলিমকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন।

৩. আল্লামা নববী তাকরীবে উল্লেখ করেছেন যে,

البخارى أصحُّهما وأكثرُهما فوائدا ، وقيل مسلم أصحُّ والصوابُ الأولُ –

'গ্রন্থদ্বয়ের মাঝে বুখারীই বিশুদ্ধতম এবং ফায়দার দিক থেকেও অগ্রগণ্য। কেউ কেউ বলেছেন যে, মুসলিম বিশুদ্ধতম। তবে প্রথম মতটিই সঠিক।'[১] আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন যে, জমহুরের অভিমত এই যে, বুখারীই বিশুদ্ধতম।

---

[১] তাদরীব পৃ ৬৭।

[২] তাদরীব পৃ: ৭১।

[১] তাকরীব আলাত্-তাদরীব পৃ: ৬৮।

বুখারী বিশুদ্ধতম ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার পক্ষে তিনি ৭/৮টি যুক্তি তুলে ধরেছেন। আমরা নিম্নে তা উদ্ধৃত করে দিলামঃ

১. বুখারী এককভাবে যে সব বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীস সংকলন করেছেন (মুসলিম করেননি) তাদের সংখ্যা তিনশত ত্রিশোর্ধ্ব। তাদের মাঝে সমালোচিত রাবীর সংখ্যা হল মাত্র ৮০ জন। অথচ মুসলিম এককভাবে যাদের থেকে হাদীস সংকলন করেছেন (বুখারী করেননি) তাদের সংখ্যা হল ৬২০ জন। তাদের মাঝে সমালোচিত ব্যক্তির সংখ্যা ১৬০ জন ।[২] আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে গ্রন্থে সমালোচিত বর্ণনাকারীর সংখ্যা কম তা শ্রেষ্ঠ।

২. বুখারী এককভাবে যে সব বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীস সংকলন করেছেন তাদের মাঝে যাদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে তাদের থেকে তিনি খুব বেশী হাদীস সংকলন করেননি; এবং তাদের কোন সংকলনের সকল হাদীস বা তার অধিকাংশ হাদীস তিনি সংকলন করেননি। একমাত্র ইকরিমা ইবনে আব্বাসের সূত্রে যা বর্ণনা করেছেন সেগুলো ছাড়া। অথচ মুসলিম এ ধরণের নূসখা বা কপি থেকে অধিকাংশ হাদীস তার গ্রন্থে সংকলন করেছেন। যেমন আবুয্-যুবায়ের হযরত জাবের থেকে যা বর্ণনা করেছেন, সাহল তার পিতা থেকে যা বর্ণনা করেছেন, 'আলা ইবনে আব্দুর রহমান তার পিতা থেকে যা বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হযরত সাবেতের সূত্রে যা বর্ণনা করেছেন- এর অধিকাংশই ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

৩. বুখারী যেসব দুর্বল ব্যক্তিদের থেকে হাদীস সংকলন করেছেন তাদের অধিকাংশই তার উস্তাদ, যাদের সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটেছে, তাদের দরবারে তিনি উঠা বসা করেছেন; তাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন; তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহের ব্যাপারে তার অবগতি ছিল; বর্ণিত হাদীসসমূহের মাঝে কোনগুলো গ্রহণযোগ্য (جيد), কোনগুলো গ্রহণযোগ্য নয়; সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। অথচ মুসলিম যে সব সমালোচিত ব্যক্তি থেকে হাদীস সংকলন করেছেন, তাদের অনেকেই এমন ছিলেন যারা তার পূর্ববর্তী কালের ব্যক্তি। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বর্ণনাকারী তার উস্তাদগণের বর্ণিত হাদীস সহীহ কি যয়ীফ- এ সম্পর্কে যতটা অবগত হবেন, যারা তাদেরও পূর্বেকার ব্যক্তি তাদের হাদীস সম্পর্কে ততটা অবগত হবেন না ।

৪. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বুখারী বর্ণনাকারীদের প্রথম স্তর অর্থাৎ (قوي الضبط وكثير الملازمة) থেকে ব্যাপক ভিত্তিতে হাদীস সংকলন করেছেন। তৎপরবর্তী স্তর থেকে বাছাই করে হাদীস সংকলন করেছেন। অর্থাৎ যারা প্রখর

---

[২] মূলত: সংখ্যাটি ১৬০ না হয়ে ২৬০ হবে যা অন্যান্য বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট।

মেধা ও প্রবল স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং উস্তাদের সঙ্গে যাদের দীর্ঘ সংস্রব ছিল এ ধরণের ব্যক্তিদের কাছাকাছি যাদের অবস্থান, তাদের থেকে হাদীস মুত্তাসিলান বা তা'লীকান সংকলন করেছেন। অথচ মুসলিম প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর থেকে ব্যাপক ভিত্তিতে হাদীস সংকলন করেছেন।

৫. মুসলিম মনে করতেন, মু'আন'আন হাদীসের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী এবং তিনি যাথেকে হাদীস বর্ণনা করবেন তারা দু'জন এক যুগের ব্যক্তি হলেই হাদীসটিকে মুত্তাসিল বলে ধরা হবে। তাদের দু'জনের সাক্ষাতের বিষয়টি প্রমাণিত হোক বা না হোক। অথচ বুখারী এরূপ মনে করতেন না। বরং তিনি মনে করতেন, ঐ দু'জনের মাঝে সাক্ষাত ঘটেছিল তা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের মু'আন'আন রিওয়ায়াত মুত্তাসিল বলে গণ্য হবে।

৬. বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থের যেসব হাদীস সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে তার সংখ্যা ২১০। তবে এর মাঝে বুখারীতে সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা ৮০টি। অতএব মুসলিমের সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা ২১০-৮০=১৩০টি। আর যে গ্রন্থে সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা কম সাধারণভাবেই তা শ্রেষ্ঠ।

৭. উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম বুখারী রহ. ইমাম মুসলিমের চেয়ে হাদীসের তত্ত্ব এবং হাদীসের শুদ্ধা-শুদ্ধি অনুধাবনের ক্ষেত্রে অধিক সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। শায়খুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম বুখারী রহ. ইমাম মুসলিমের তুলনায় ইলমের গভীরতা এবং হাদীসশাস্ত্রের কলাকৌশল সম্পর্কে অধিক অবগত হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের ঐক্যমত্য রয়েছে।

৮. ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম বুখারী রহ.-এর ছাত্র এবং তার সহপাঠী। তিনি সব সময় ইমাম বুখারী থেকে জ্ঞান আহরণ করে উপকৃত হয়েছেন এবং তার পদাংক অনুসরণ করে চলতেন। ফলে ইমাম দারাকুতনী মন্তব্য করেছেন- لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء বুখারী নাহলে মুসলিম চলতে পারতেন না এবং তিনি আত্মপ্রকাশও করতেন না।[১]

তবে যারা মুসলিমকে শ্রেষ্ঠগ্রন্থ বলে মন্তব্য করেছেন, তারা অন্যান্য দিকের বিচারে মন্তব্য করেছেন। যেমন- গোছালো বিন্যাস, হাদীসের শব্দাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসকে একই স্থানে একত্রিত করে উপস্থাপন ইত্যাদি দিকের বিচারে মুসলিমের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বিশুদ্ধতম হওয়ার প্রেক্ষিতে নয়। বিশুদ্ধতম হওয়ার দিক থেকে বুখারীই শ্রেষ্ঠ।

---

[১] তাদরীবুর রাবী পৃ: ৬৭-৬৯।

হাসান (الحسن)

আভিধানিক অর্থ :

حسن শব্দটি মূলত হুসনুন (حُسْنٌ) মূলধাতু থেকে উদ্গত। باب كرم থেকে সিফাতে মুশাব্বাহার সীগাহ। حَسُنَ يَحْسُنُ অর্থ সুন্দর হওয়া, উত্তম হওয়া। অতএব حسن অর্থ সুন্দর, উত্তম। যেহেতু হাদীসটি সহীহ না হলেও গ্রহণযোগ্য হওয়ার মত, তাই যয়ীফের তুলনায় এটি উত্তম ও সুন্দর। এ হিসাবেই এই বিশেষ শ্রেণীর হাদীসকে হাসান নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

বস্তুতঃ হাসানের সংজ্ঞা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। যেমন ইমাম তিরমিযী, ইবনে হজর ও ইমাম খাত্তাবী প্রমূখ হাসানের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তার কোনটিই পূর্ণাঙ্গ মনে হয় না। কেননা তাঁদের উল্লিখিত সংজ্ঞার কোনটিই এমন নয়, যা হাসানের উভয় প্রকারের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। তাই আমরা হাসানের এমন একটি সংজ্ঞা দিয়ে নিচিছ যা তার উভয় প্রকারকে সমন্বিত করে।

হাসানের ইজমালী সংজ্ঞা :

هو الحديث الذي لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح ولم ينحطّ إلى درجة الضعيف، باعتبار السند.

সনদের বিচার-বিশ্লেষণে যে হাদীস সহীর স্তর পর্যন্ত উন্নীত হয় না, কিন্তু যয়ীফের স্তরভুক্ত বলেও গণ্য করা যায় না, এধরণের হাদীসকে হাসান বলা হয়। ইবনে হজর বলেছেন যে, মুতাআখখেরীনের অনেকেই হাসানের সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন -

هو الحديث الذي في رواته مقال ولم يظهر له مقتضى الرد ولا يسلم عن غوائل الرد.

যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তবে তা এমন পর্যায়ের নয় যার দরুন হাদীসটি বর্জনীয় বলে গণ্য হয়। কিন্তু তা একেবারে সমালোচনার উর্ধ্বেও নয়; এমন ধরণের হাদীসকে হাসান বলা হয়।

হাসানের প্রকারভেদ :

হাসান হাদীস মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা:

১. حسن لذاته হাসান লি-যাতিহি বা স্বয়ং স্ববৈশিষ্ট্যে হাসান

২. حسن لغيره হাসান লি-গায়ারিহি বা অন্যের সমর্থনে হাসান

হাসান লি-যাতিহির সংজ্ঞা :

هو الحديث الذِي اتصل سندُه بنقلِ عدلٍ خفّ ضبطُه ولم يكُن الحديث شاذًّا، ولا معلولاً–

যে হাদীস ধারাবাহিক সূত্রে এমন আদিল বা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ রাবী কর্তৃক বর্ণিত, যার সংরক্ষণগুণ তথা স্মৃতিশক্তি সামান্য দুর্বল। এতদ্‌সঙ্গে হাদীসটি শায্[১] বা মা'লূল[২] নয়।[৩]

হাসান লি-গাইরিহির সংজ্ঞা :

هو الحديث الذِي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذًّا ولا معلولاً و يروى من غير وجه –

যে হাদীসের সনদে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন বর্ণনাকারী নেই। হাদীসটি শায্‌ও নয় এবং প্রচ্ছন্ন কোন ত্রুটিও তাতে নেই, তদুপরি একাধিক সূত্রে বর্ণিত, এ ধরণের হাদীসকে হাসান লি গায়রিহী বলা হয়।[৪]

হাসান লি-গাইরিহির সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবেও দেওয়া যায়

هو الحديث الضعيف في الأصل فارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدّد الطرق –

যে হাদীস মূলগত দিক থেকে যয়ীফ, তবে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে এবং হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে, এ ধরণের হাদীসকে হাসান লি গাইরিহি বলা হয়।[৫]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

হাসানকে হাদীসের একটি পৃথক স্তর হিসাবে গণ্য করার ক্ষেত্রে মনীষীদের মতভিন্নতা রয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর পূর্ববর্তী মনীষীগণ হাদীসকে সাধারণত: দুইভাগে ভাগ করতেন। যথা: ১. সহীহ (الصحيح) ২. যয়ীফ (الضعيف)

---

১ **শায:** নির্ভযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত এমন হাদীস, যার বিপরীত অর্থবোধক হাদীস তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত আছে।

২ **মা'লূল:** এমন হাদীস যাতে প্রচ্ছন্ন কোন ত্রুটি আছে।

৩ সংজ্ঞাটি তাইসীর মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৪৬ এবং মাও. আব্দুল মালেকের পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত সংজ্ঞাকে সমন্বিত করে তৈরী করা হয়েছে। -গ্রন্থকার

৪ তিরমিযী - ইলাল অধ্যায়।

৫ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৪৬।

তারা হাসানকে পৃথক কোন প্রকার হিসাবে গণ্য করতেন না। অবশ্য কঠোরপন্থীদের অনেকেই হাসান পর্যায়ের হাদীসকে প্রমাণযোগ্য মনে করতেন না। এর স্বাভাবিক অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তারা হাসান পর্যায়ের হাদীসকে যয়ীফেরই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন। হাসান শব্দটির ব্যবহার ইমাম তিরমিযীর পূর্ববর্তীদের আলোচনায় উল্লেখ থাকলেও তারা শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করেছেন; কিন্তু একটি পৃথক পরিভাষা হিসাবে তারা এর ব্যবহার করেননি। হাসান শব্দটির পারিভাষিক ব্যবহার শুরু হওয়ার পূর্বে যারা এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তারা আভিধানিক অর্থের আলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করেছেন। যেমন:

১. সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রেও হাসান শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে।
২. মুনকার নয় এ অর্থেও হাসান শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে।
৩. অনেক সময় গরীব ও মুনকার হাদীসের উপরও হাসান শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।
৪. অনেকেই মওজু' ও জাল হাদীসের শাব্দিক বিন্যাস ও বাক্যের গঠনের অভিনবত্ব বুঝানোর জন্যও হাসান শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

যেমন আল্লামা ইবনে আব্দুল বার 'জামেউ বায়ানিল ইলম' গ্রন্থে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন:

عن موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم العمى بإسناده أنه عليه السلام قال تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد الخ ، ثم قال هو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قويّ –

আল্লামা ইরাকী মন্তব্য করেছেন যে- اراد ابن عبد البر بالحسن حسن اللفظ قطعا ইবনু আব্দিল বার অবশ্য হাসান বলে শাব্দিক সৌন্দর্যের কথা বুঝিয়েছেন। কেননা বলকাভী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। আর আব্দুর রহীম মতরুকুল হাদীস।

ইমাম তিরমিযীই সর্ব প্রথম হাসানকে একটি পৃথক স্তর হিসাবে গণ্য করেছেন এবং শব্দটির পারিভাষিক ব্যবহারের সূচনা করেছেন। অবশ্য অনেকেই এই বিভাজনের প্রথম সূচনা আল্লামা খাত্তাবী করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস গ্রন্থের টিকায় আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ তার শিষ্য শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম তিরমিযীর পূর্বেও অনেকেই হাসান শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হলেন-

১. ইমাম শাফেয়ী রহ. (জন্ম-১৫০ হি: মৃ: ২০৪হি:)
২. হাফেয মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমায়ের (মৃ: ২৩৪হি:)

৩. ইমাম আবু যুর'আহ রাজী (জন্ম-২০০হি: মৃ:২৬৪হি:)
৪. ইমাম বুখারী (জন্ম- ১৯৪ হি: মৃ- ২৫৬হি:)
৫. আবু হাতেম রাযী (জন্ম-১৯৫ হি: মৃ: ২৭৭হি:)
৬. আলী ইবনুল মাদিনী (মৃ: ২৩৪ হি:)
৭. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃ: ২৪১ হি:) প্রমুখ।

ইবনুস সালাহ উল্লেখ করেছেন যে, অনেকেই হাসানকে পৃথক কোন প্রকার হিসেবে উল্লেখ করেননি। তারা বরং এ ধরণের হাদীসকে সহীর অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে করেন। কেননা এগুলোও এমন হাদীস, যা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়। হাকেম আবু আব্দুল্লার বক্তব্য থেকে, এরূপই বুঝা যায়।[১]

এছাড়া ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান, ইমাম আবু দাউদ, ও ইমাম নাসাঈ প্রমূখও এই মতের প্রবক্তা ছিলেন।[২]

অবশ্য যারা হাসানকে সহীর শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করেন তারাও একথা অস্বীকার করেন না যে, এগুলো পূর্বোল্লেখিত সহীর চেয়ে নিম্নমানের।

বস্তুতঃ মুহাদ্দেসীন যখন সহীহ ও যয়ীফের মাঝে তৃতীয় একটি স্তর নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, তখন অনেকেই দৃষ্টি দিয়েছেন যয়ীফের প্রতি। তাঁরা দেখেছেন যে, যয়ীফ হাদীসের মাঝে কিছু হাদীস এমন আছে, যেগুলো মকবূল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা এগুলোকে যয়ীফের চেয়ে একটু উঁচু স্তরের গণ্য করেছেন এবং সেগুলোর নাম দিয়েছেন হাসান।

আর অনেকেই দৃষ্টি দিয়েছেন সহীর প্রতি। তারা লক্ষ্য করেছেন যে, সহীহ হাদীসের মাঝেও কিছু হাদীস এমন রয়েছে, যেগুলোতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। তাই তারা সেগুলোকে সহীর চেয়ে একটু নিম্নমানের বলে গণ্য করেছেন এবং সেগুলোকে হাসান বলে নামকরণ করেছেন। সুতরাং উভয় ধরণের হাদীস হাসানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সহীর স্তর থেকে সামান্য নিম্ন মানের হাদীসগুলোকে পরবর্তীরা 'হাসান লি যাতিহি' বলে নামকরণ করেছেন এবং যয়ীফ থেকে সামান্য উঁচুস্তরের হাদীসগুলোকে তারা 'হাসান লি গাইরিহি' নামে নামকরণ করেছেন।[১]

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সহীর সর্বনিম্ন স্তর হল হাসানের সর্বোত্তম স্তর। আর যয়ীফের সর্বোত্তম স্তর হল হাসানের সর্বনিম্ন স্তর।[২]

---

[১] যফরুল আমানী -পৃ: ১৪৫।
[২] পাণ্ডুলিপি মাও. আব্দুল মালেককৃত।
[১] তাওযীহুন নযর ইলা উসূলিল আসর, জাযায়েরীকৃত, খ:১ পৃ:৩৬ এর ভাব অবলম্বনে।
[২] পাণ্ডুলিপি মাও. আব্দুল মালেককৃত।

সর্বোত্তম হাসান স্তরের কয়েকটি সনদ নিম্নে প্রদত্ত হল। যেগুলো সহীর খুবই কাছাকাছি।

(١) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده –

(٢) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

(٣) محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن أبي هريرة

(٤) ابن اسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي

কেননা অনেক হাফেযে হাদীসই উপরোক্ত সনদগুলোকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন যে, এগুলো সহীহ-এর সর্বনিম্ন স্তরের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে হাসানের সর্বনিম্ন স্তরের বর্ণনাকারীদের কয়েকজন হলেন:

(١) ابن لهيعة

(٢) عبدالرحمن بن زيد بن أسلم

(٣) ابو بكر بن ابى مريم الحمصى

(٤) فرج بن فضالة

(٥) رشدين

কেননা উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ যয়ীফ হলেও সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় নয়। শাহেদ, মুতাবে' কিংবা অন্যকোন বিষয়ের দ্বারা হাদীসটি গ্রহণীয় হওয়ার প্রত্যয় জন্মালে এ ধরণের দুর্বল ব্যক্তিদের হাদীস গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়। হাসানের মধ্যবর্তী স্তর হল, যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। অনেকেই তাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন, আবার অনেকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। যেমন-حجاج بن ارطاة ، وغيره – حارث بن عبد الله ، عاصم بن ضمرة

পক্ষান্তরে কিছু বর্ণনাকারী এমনও রয়েছেন, যাদের বর্ণনা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় হয় না। যেমন: যে বর্ণনাকারী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, তার বর্ণনা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় নয়। কিংবা যে বর্ণনাকারী ফিসকের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তার বর্ণনাও কোন অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হয় না। কিংবা যদি হাদীসটি শায্ বা মুনকার হয়, তাহলে সেগুলোও কোন অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হয় না।

হাসান হাদীসের উপমা

ক. হাসান লি-যাতিহির উদাহরণ:

ইমাম তিরমিযী كتاب البر والصلة-এর প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে-

حدثنا محمد بن بشار اخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا بهز بن حكيم، حدثني أبي عن جدّي قال قلت يَا رَسُولَ اللّٰه مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ : أُمَّكَ. قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ :ثُمَّ أُمَّكَ. قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمَّكَ. قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ :ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ. – قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم، وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر والثورى وحماد بن سلمة وغير واحد من الائمة –

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান হওয়ার ফয়সালা করেছেন। কেননা এই হাদীসের সূত্রে بهز بن حكيم নামে যে বর্ণনাকারী রয়েছেন, তার ব্যাপারে শো'বা সমালোচনা করেছেন। ফলে হাদীসটি এই বর্ণনাকারীর সমস্যার কারণে সহীহ-এর মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু যদিও শো'বা সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর সমালোচনা যথার্থ ছিল না। কেননা হাদীস বিশারদ অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তাছাড়া হাম্মাদ, সুফয়ান সওরী ও মা'মারের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাথেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বর্ণনাকারী হিসাবে بهز بن حكيم নির্ভরযোগ্য বিধায় হাদীসটি অবশ্যই গ্রহণীয় হবে। তবে যেহেতু তার ব্যাপারে শো'বার ন্যায় একজন গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক সমালোচনা করেছেন, অতএব তা একেবারে প্রথম শ্রেণীর গ্রহণীয় অর্থাৎ সহীহ এর পর্যায়ভুক্ত হবে না। তবে حسن لذاته বলে গণ্য হবে।

খ. হাসান লি-গায়রিহির উদাহরণ:

حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ – قال الترمذى هذا حديث حسن، وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وابى حدرد.

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান হওয়ার মন্তব্য করেছেন। বর্ণনাকারী আসেম ইবনে উবায়দুল্লাহ স্মৃতিদৌর্বল্যের কারণে যয়ীফ, এ কারণে হাদীসটি যয়ীফ বলে গণ্য হত। কিন্তু যেহেতু হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, অতএব তার মুতাবে' পাওয়া যাওয়ার কারণে হাদীসটি যয়ীফের পর্যায় থেকে উন্নীত হয়ে হাসানের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। তবে মর্যাদাগত উত্তরণ যেহেতু অন্য সূত্রের সহায়তায় অর্জিত হয়েছে, অতএব এটি حسن لغيره বলে গণ্য হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

যদি কোন হাদীস সম্পর্কে হাদীস বিশারদদের একদল হাসান হওয়ার মন্তব্য করেন, আর একদল যয়ীফ হওয়ার মন্তব্য করেন, তাহলে হাদীসটি হাসান বলে গণ্য

হবে।[১] আবার কোন রাবী সম্পর্কে যদি একদল নির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করেন, আর একদল দুর্বল বা যয়ীফ হওয়ার মন্তব্য করেন, তাহলে সেই বর্ণনাকারী হাসান পর্যায়ের বলে গণ্য হবে।[২] বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

হাসানের হুকুম

হাসান পর্যায়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়। প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার দিক থেকে এটি সহীর সমপর্যায়ের। যদিও বলিষ্ঠতার প্রশ্নে তা সহীর চেয়ে একটু নিম্নমানের।

হাসান লি-যাতিহি পর্যায়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে কারো কোন দ্বিমত নেই। বরং এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে।

হাসান লি-গায়রিহি পর্যায়ের হাদীস- যা মূলত যয়ীফ- তা যদি শাহেদ কিংবা মুতাবে' পাওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে উন্নীত হয়, তাহলে তা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করা যাবে। তবে যয়ীফ হাদীস যদি মওজু না হয় বা মারাত্মক ধরণের মুনকার না হয় কিংবা হাদীসটি যদি শায্ বা মু'আল্লাল না হয়, তাহলে সেগুলো তারগীব-তারহীব, ফিতান, রিকাক ও ফাযায়েল অধ্যায় সংশ্লিষ্ট হলে গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে আদাব, যুহ্‌দ ও নফল আমলের ক্ষেত্রে এ ধরণের যয়ীফ হাদীসের ভিত্তিতে আমল করা যায়। তবে আকায়েদ ও আহকামাতের ক্ষেত্রে এ ধরণের যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

যয়ীফ হাদীস যদি শায্, মু'আল্লাল বা মারাত্মক ধরণের মুনকার হয় কিংবা যদি হাদীসটি মতরুক বা মওজু' হয়, তাহলে সেগুলো কোন অবস্থাতেই কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হয় না।[৩]

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য هذا حديث حسن صحيح -এর অর্থ

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, যদি কোন বর্ণনাকারী هذا حديث حسن বলে মন্তব্য করেন, তাহলে এর অর্থ হল বর্ণনাকারী হাদীসটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে হাসান হওয়ার গ্যারান্টি আমাদেরকে দিচ্ছেন। কিন্তু যদি তিনি বলেন যে, هذا حديث حسن الاسناد তাহলে এর অর্থ হল বর্ণনাকারী হাদীসটির সনদ হাসান পর্যায়ের হওয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছেন। তবে তিনি মতনের দায়-দায়িত্ব নিচ্ছেন না।

---

[১] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস -পৃ:৪৭।

[২] কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস -পৃ: ৪৭।

[৩] পাণ্ডুলিপি মাও. আব্দুল মালেককৃত, ইষৎ পরিবর্তিত।

কিন্তু ইমাম তিরমিযী রহ. কোন কোন হাদীস বর্ণনার পর মন্তব্য করেছেন هذا حديث حسن صحيح। একথা সকলেরই জানা যে, হাসান বলাই হয় এমন হাদীসকে যার বর্ণনাকারীগণ স্মৃতির প্রখরতা ও নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে সহীহ এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। অতএব একই হাদীস হাসানও হবে আবার সহীহও হবে তা কি করে সম্ভব?

সুতরাং মুহাদ্দিসগণ ইমাম তিরমিযীর এই মন্তব্যের অর্থ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। এই মন্তব্যের অর্থ নির্ধারণ করতে গিয়ে বিভিন্নজন যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা দশের কোটা অতিক্রম করে গেছে। আমরা নিম্নে আল্লামা ইবনে হজরের ব্যাখ্যাটি পেশ করছি; যে ব্যাখ্যাটি আল্লামা সুয়ূতীও গ্রহণ করেছেন। ইবনে হজর বলেছেন যে-

১. যে হাদীসের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী এই মন্তব্য করেছেন, যদি তা একাধিক সনদে বর্ণিত থাকে, তাহলে এই মন্তব্যের অর্থ হবে যে, এক সনদের প্রেক্ষিতে তা হাসান; আর অন্য সনদের প্রেক্ষিতে তা সহীহ।

২. আর যদি হাদীসটি একটি মাত্র সনদে বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে এই মন্তব্যের অর্থ হবে-

ক. এই সনদের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের মতভিন্নতা রয়েছে। একদলের মতে হাদীসটি হাসান, আর একদলের মতে হাদীসটি সহীহ।

খ. অথবা ইমাম তিরমিযী হাদীসটির স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি কোন দিককেই প্রাধান্য দিতে যাননি। বরং মন্তব্য করে দিয়েছেন যে هذا حديث حسن صحيح অর্থাৎ হাদীসটি হয় হাসান, না হয় সহীহ। অবশ্য অনেকেই ইবনে হজরের এই ব্যাখ্যাকে অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অধমের অভিমত

অধম মনে করে যে, যেহেতু হাসানের পরিভাষাটি একটি নতুন পরিভাষা এবং একটি পৃথক স্তর হিসাবে এই পরিভাষাটি ব্যাপক প্রয়োগের সূচনা ইমাম তিরমিযীই করেছেন। অথচ পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ এ ধরণের হাদীসকে সহীহ-এর অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে করতেন; তাই তিনি নতুন পরিভাষার আলোকে হাদীসটি হাসান হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু পুরাতন পরিভাষার আলোকে হাদীসটি যেহেতু সহীহ বলে গণ্য হত, তাই তিনি উভয় পরিভাষার প্রতি ইঙ্গিত করতে এ ধরণের মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্যের অর্থ হল-

هذا حديث حسن باعتبار اصطلاح جديد و صحيح باعتبار اصطلاح قديم –

সম্ভবত তিনি এ ধরণের মন্তব্য حسن لذاته পর্যায়ের হাদীসের ক্ষেত্রেই করেছেন। যেগুলো পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সহীর সর্বনিম্ন স্তর বলে গণ্য হত। অবশ্য বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দাবী রাখে। আশাকরি গবেষকরা বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবেন। তবে কোন কোন গবেষক বলেছেন যে, নতুন পরিভাষা অনুসারে যেসব হাদীস সহীহ বলে সাব্যস্ত হয় এমন হাদীসের উপরও ইমাম তিরমিযী এই মন্তব্য করেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হল, সম্ভবত ঐ হাদীসের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ঐরূপ ছিল।

রাবী مقبول বা গ্রহণযোগ্য একথা বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণ যে সব শব্দ ব্যবহার করেন :

রাবী গ্রহণযোগ্য, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় একথা বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন। এইসব শব্দ ব্যবহারের মাঝ দিয়ে রাবীর গ্রহণযোগ্যতা কোন পর্যায়ের তাও নির্দেশ করে থাকেন। গ্রহণযোগ্য রাবীদেরকে কয়টি স্তরে বিভক্ত করা হবে- এ ব্যাপারে মনীষীদের মাঝে মতভিন্নতা থাকলেও আল্লামা সাখাভী তাদেরকে মোট ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন। আমরা নিম্নে তার উল্লিখিত স্তরসমূহ এবং কোন স্তরের জন্য মুহাদ্দিসগণ কি ধরণের শব্দ উল্লেখ করে থাকেন তা উদ্ধৃত করে দিলাম।

১. **নির্ভরযোগ্যতার সর্বোচ্চ স্তর:** এস্তরের রাবীদের বেলায় সাধারণত: মুহাদ্দিসগণ ইসমে তাফযীলের সীগাহ ব্যবহার করেন। যেমন -

هو أوثق الناس، أضبط الناس، وإليه المنتهى في التثبيت، ولا أعرف له نظيراً في الدنيا

২. **দ্বিতীয় স্তর:** যা প্রথমোক্ত স্তরের চেয়ে সামান্য নিম্ন পর্যায়ের। এ স্তরের রাবীদের জন্য মুহাদ্দিসগণ সাধারণতঃ **فلان لايسئل عنه** বা এধরণের কোন শব্দ ব্যবহার করেন।

৩. **তৃতীয় স্তর:** এ স্তরের রাবীদের বেলায় সাধারণত নির্ভরযোগ্যতার অর্থবোধক শব্দগুলো একাধিক বার উল্লেখ করেন। যেমন- كان ثقة ثقة – أو كان ثبت ثبت কিংবা অনেক সময় নির্ভরযোগ্যতার অর্থজ্ঞাপক একাধিক শব্দ উল্লেখ করেন। যেমন: -

هو ثقة مأمون، ثبت حجةٌ، صاحب حديث عدل ضابط

৪. **চতুর্থ স্তর :** এ স্তরের রাবীদের বেলায় নির্ভরযোগ্যতার অর্থজ্ঞাপক শব্দ একবার করে উল্লেখ করেন। যেমন - هو ثقة، أوثبتٌ، أوكأنه مُصحفٌ، أوإمام، أوحافظ، أو حجة

অবশ্য এর সঙ্গে রাবীকে আদালতের বৈশিষ্ট্যে অবশ্যই বৈশিষ্ট্যবান হতে হবে। কেননা শুধুমাত্র যবতের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলেই হাদীস প্রমাণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয় না।

৫. **পঞ্চম স্তর :** এ স্তরের রাবীদের বেলায় সাধারণত নিম্নোক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন - ليس به بأس، لا بأس به، لا بأس، صدوق، مأمون خيار الخلق

৬. **ষষ্ঠ স্তর:** এটি সর্বনিম্ন স্তর। এ স্তরের জন্য যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো সাধারণত সমালোচনার খুবই কাছাকাছি অর্থ বহন করে। এ স্তরের জন্য সাধারণত নিম্নোক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন -

ليس ببعيد عن الصواب، اويُروى حديثه، اويعتبر به اوشيخ وسط أو روى الناس عنه اوصالح الحديث، أو يكتب حديثه، أو مقارب الحديث، أو صدوق انشاء الله، ارجو ان لا بأس به –

উপরোল্লেখিত ছয়টি স্তরের মাঝে প্রথম চার স্তরের রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা নি:সন্দেহে প্রমাণ পেশ করা যাবে। বরং পঞ্চম স্তরের বর্ণনাকারীদের দ্বারাও প্রমাণ পেশ করা যাবে বলে অনেকেই মনে করেন। তবে ইবনুস সালাহ মনে করেন যে, শেষোক্ত দুই স্তরের রাবীদের হাদীস আহরণ করা গেলেও তাদ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না। তবে যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে তাহলে তা প্রমাণযোগ্য বলে পণ্য হবে।[১]

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য একথা বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণ যেসব শব্দাবলী ব্যবহার করেন :

جيدٌ، مُجَوَّدٌ، قوي، ثابت، محفوظ، معروف، صالح، حسن، مستحسن، صحيح، رجاله ثقات، رجاله موثوقون، رجاله رجال الصحيحين –[২]

---

[১] যফরুল আমানী পৃ: ৭৭-৭৯।

[২] উলূমুল হাদীস পৃ: ১৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

মারদূদ (المردود) :

আভিধানিক অর্থ :

এটি মূলত বাবে نصر (رَدَّ يَرُدُّ) থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। আভিধানিক অর্থ প্রতিহত করা, প্রত্যাখ্যান করা, বর্জন করা। যেহেতু এধরণের হাদীস সাধারণত প্রমাণ গ্রহণের অযোগ্য, তাই এগুলোকে মারদূদ বা বর্জনীয় বলে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

هو الحديث الذِي لم يترجح صدق المخبر به اما بفقد شرط أو اكثر، من شروط المقبول–

যে হাদীসের সনদের মাঝে গ্রহণযোগ্য হওয়ার এক বা একাধিক শর্ত বিদ্যমান না থাকার কারণে বর্ণনাকারীর সত্যবাদী হওয়ার দিকটি প্রাধান্য পায়নি; এরূপ হাদীসকে মারদূদ বলা হয়।[১]

উল্লেখ্য যে, মারদূদ হাদীসের অনেক প্রকার রয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের পৃথক পৃথক নামও রয়েছে। তবে ব্যাপক ভিত্তিতে সবগুলোকেই যয়ীফ বলা হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ হাদীস মাকবূল হওয়ার যেসব শর্ত-শারায়েত রয়েছে তা বিদ্যমান না থাকলেই সে হাদীসকে মারদূদ বলা হয়ে থাকে। হাদীস মাকবূল হওয়ার জন্য মোট শর্ত রয়েছে ছয়টি। যথা:

১. ইত্তিসাল (الإتصال) সূত্রের ধারাবাহিকতা।

২. আদালত (العدالة) রাবীর বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা ।

৩. যবত্ (الضبط) রাবীর প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া।

৪. (عدم الشذوذ) রিওয়ায়াতটি শায্ না হওয়া।

৫. (عدم العلة) তাতে কোন ইল্লত না থাকা।

৬. (وجود الجابر في الخلل الذي يمكن انجباره) : যে দুর্বলতাগুলো দূরিভূত করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে দুর্বলতা দূরীভূত করণের উপায় বিদ্যমান থাকা।

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৬২।

সুতরাং যে অবস্থাগুলো এই বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিপন্থী সেগুলোই মূলত হাদীস মারদূদ হওয়ার কারণ। যেমন :

১. ইত্তিসালের বিপরীত হল ইনকিতা' (انقطاع) বা সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া; তা যতভাবে হতে পারে। যেমন- معلق، معضل، منقطع، مرسل، مدلس، مرسل خفي এসকল প্রকারই এর অন্তর্ভুক্ত এবং সাধারণভাবে হাদীস মারদূদ হওয়ার কারণ। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে; যার আলোচনা যথাস্থানে আসবে।

২. আদালত বা বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী হল মিথ্যা (كذب), মিথ্যার অভিযোগ (تهمة الكذب), পাপাচার (فسق), কুসংস্কার (البدعة), অজ্ঞতা (الراوي جهالة) (অর্থাৎ বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত কি না এব্যাপারে অজ্ঞতা)। এসব কারণ বিদ্যমান থাকলেও হাদীস মারদূদ বলে গণ্য হবে।

৩. যব্ত বা সংরক্ষণ গুণের পরিপন্থী হলো:

ক. فحش الغلط অসতর্কতাবশত ভুল বেশী হওয়া- (مغفلا بحيث يغلب عليه الخطاء)

খ. سوء الحفظ স্মৃতিদুর্বলতা জনিত কারণে ভুল বেশী হওয়া- (سيئ الحفظ بحيث يكثر منه الخطاء)

গ. غفلة عن الاتقان আহরণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গাফ্লত বা অসতর্কতা।

ঘ. الوهم সন্দেহবাদিতায় ভোগা, একই হাদীসে সন্দেহ প্রকাশ করা। কিংবা রাবীর وهم এর কারণে হাদীসে বিভিন্ন ধরণের প্রচ্ছন্ন ত্রুটি সৃষ্টি হওয়া।

ঙ. مخالفة للثقات নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত বর্ণনা। বস্তুতঃ উপরোক্ত ৪টি কারণের যে কোন একটি কারণ নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত বর্ণনার মূল কারণ হতে পারে। তাছাড়া মযীদ ফি মুত্তাসিলিল আসানিদ ইত্যাদি পন্থায়ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত বর্ণনা হতে পারে। ফলে হাদীসটি মুদরাজ, মাকলূব, মুসাহ্হাফ, মুহার্‌রাফ, মুযতারাব হয়ে যেতে পারে।

৪. عدم الشذوذ এর বিপরীত হল বর্ণনাটি শায্ হওয়া অর্থাৎ কোন গ্রহণযোগ্য (مقبول) বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত কোন হাদীস যদি তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের সাথে বৈপরিত্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়; তাহলে এ কারণেও হাদীসটি মারদূদ বলে গণ্য হয়। এর মূল কারণও স্মৃতির দুর্বলতা। তবে তা নিতান্তই সাময়িক, স্থায়ী নয়। স্থায়ী হলে তা سوء حفظ -এর পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়।

৫. غير معلل এর বিপরীত হল معلل হওয়া। অর্থাৎ বর্ণিত হাদীসে কোন প্রচ্ছন্ন ত্রুটি বিদ্যমান থাকলে সে কারণেও হাদীসটি মারদূদ বলে গণ্য হয়। অবশ্য معلل

শব্দটির অন্য একটি ব্যাপক অর্থ রয়েছে। معلل অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করব।

৬. وجودالجابر -এর বিপরীত হল عدم وجودالجابر অর্থাৎ দুর্বলতা যদি এমন ধরণের হয়, যা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে দূরীভুত হয়ে যায়। কিন্তু যদি অন্যকোন সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত না থাকে তাহলে তাও মারদূদ বলে গণ্য হবে।
উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে হাদীস মারদূদ হওয়ার মূল কারণ দাঁড়ায় ১১টি।

١. الانقطاع بجميع انواعه أي المعلق، المعضل، المنقطع، المرسل، المدلس، المرسل الخفي

٢. كون الراوي كذابا يضع الحديث

٣. كون الراوي متهما بالكذب في الحديث أو كون الراوي يكذب في الكلام مع الناس

٤. كون الراوي فاسقا في عمله و سيرته

٥. كون الراوي مبتدعا في الاعتقاد

٦. كون الراوي مجهولا لا يعرف حاله أو عينه

٧. فحش الغلط في الراوي بحيث يغلب عليه الخطاء

٨. سئى الحفظ – بحيث يخطئ كثيرا

٩. غفلة الراوي في التحمل والاداء أو الضبط والصيانة

١٠. وهم الراوي في حديث بعينه أو وجود علة قادحة في الرواية بسبب وهم الراوي

١١. كون الرواية شاذا أو منكرا ما يعرف بمخالفة الثقات- ولها اقسام- المدرج، المقلوب، المزيد في متصل الأسانيد، المضطرب، المحرف، المصحف-

যেসব ক্ষেত্রে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার সম্ভাবনা আছে সেসব ক্ষেত্রে যদি দুর্বলতা কাটানোর কোন পন্থা বিদ্যমান না থাকে তাহলেই উপরোক্ত কারণগুলো হাদীস মারদূদ হওয়ার কারণ বলে গণ্য হবে।
যদিও এ হিসাবে মওজু' বা জাল হাদীসও মারদূদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা মারদূদ হাদীসকে প্রধান দুইভাগে ভাগ করে নেওয়া ভাল মনে করছি। যথা:

১. যয়ীফ (الضعيف)

২. মওজু' (الموضوع)

আশাকরি এই বিভাজন দ্বারা আলোচনা ধারাবাহিকতা পাবে। আমরা আগে হাদীস যয়ীফ হওয়ার অন্যান্য কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করব; অত:পর একটি পৃথক অধ্যায়ে মওজু' হাদীস নিয়ে আলোচনা করব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, যয়ীফ হাদীস মারদূদ বা বর্জনীয় হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তা আর কোনভাবেই প্রমাণযোগ্য হবে না। বরং মারদূদ হওয়ার অর্থ হল উপরোক্ত কারণসমূহ বিদ্যমান থাকলে হাদীসটি প্রাথমিক বিবেচনায় বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। অত:পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যদি হাদীসটির দুর্বলতা দূরীকরণের কোন পন্থা উদ্ঘাটিত হয়- যদ্বারা দুর্বলতা দূরীভুত হওয়ার প্রত্যয় জন্মে, তখন তা আবার প্রমাণযোগ্য বলে গৃহীত হবে। যার বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে আসবে। অবশ্য এই কারণগুলোর কিছু কিছু এমনও রয়েছে যে, সেগুলোর দুর্বলতা কোনভাবেই দূরীভুত করা সম্ভব নয়। যেমন হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়া, কিংবা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, বা ফিসকের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া। সেগুলো কোন সূত্রে পাওয়া গেলে সেগুলো সব সময় বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এসব রিওয়ায়াতের সমর্থনে অন্য কোন রিওয়ায়াত পাওয়া গেলেও এগুলো কখনই গ্রহণযোগ্য রিওয়ায়াতের মর্যাদা পাবে না।

আমাদেরকে আরো জানতে হবে যে, উপরোক্ত কারণগুলোর অনেকগুলো এমন যে, সে সব কারণে হাদীস যয়ীফ হওয়ার ব্যাপারে সকলের ঐক্যমত্য রয়েছে। আর কিছু কারণ এমনও আছে যে, সে সকল কারণে হাদীস যয়ীফ হওয়ার বিষয়ে অনেকের দ্বিমত রয়েছে। যেমন হাদীস মুরসাল হওয়া হানাফীদের নিকট যয়ীফ হওয়ার কারণ বলে গণ্য হয় না। অথচ অন্যদের কাছে তা যয়ীফ হওয়ার কারণ বলে গণ্য হয়।

যয়ীফ (الضعيف)

<u>আভিধানিক অর্থ :</u>

যয়ীফ (ضعيف) শব্দটি কাবীউন (قوي) শব্দের বিপরীত অর্থবোধক। قوي -এর অর্থ হল শক্তিশালী। অতএব ضعيف-এর অর্থ হবে দুর্বল। যদিও দুর্বল বলতে সাধারণত: শারীরিক দুর্বলতাকেই বুঝানো হয়, কিন্তু অন্যান্য দুর্বলতার জন্যও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। যেমন বলা হয় 'যুক্তিটি খুবই দুর্বল'। হাদীস যয়ীফ হওয়ার অর্থও এরূপ। অর্থাৎ সূত্রের বিচারে হাদীসটি বলিষ্ঠ নয়; বরং দুর্বল।

অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বলতা বলতে তার সূত্রগত দুর্বলতাকেই বুঝানো হয়ে থাকে। অন্যথায় রাসূল সা.-এর বক্তব্য কখনই দুর্বল হতে পারে না। তাঁর বক্তব্য সব সময়ই সবল, বলিষ্ঠ ও প্রমাণযোগ্য। কিন্তু যে সূত্রে বক্তব্যটি আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাতে এটি যে রাসূল সা.-এরই বক্তব্য এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। তাই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হচ্ছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : هو الحديث الذي لم يوجد فيه شروط الحسن كلاً أو جزأً.

যে হাদীসে হাসান হওয়ার শর্তাবলী সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে বিদ্যমান নেই তাকে যয়ীফ বলা হয়।[১]

অবশ্য আল্লামা ইবনুস্-সালাহ যয়ীফের সংজ্ঞা নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন-

وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن.

অর্থাৎ যে হাদীসে সহীর শর্তাবলী কিংবা হাসানের শর্তাবলী বিদ্যমান নেই তাকে যয়ীফ বলে।[২]

অনেকেই মনে করেন যে, 'হাসানের শর্তাবলী উপস্থিত নেই' একথা বলাই যথেষ্ট; সহীহ্-এর কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা যেখানে হাসানের শর্তই বিদ্যমান থাকবে না সেখানে সহীহ্-এর শর্ত বিদ্যমান থাকার প্রশ্নই আসে না। এজন্যই আল্লামা দাকীকূল ঈদ তৎকর্তৃক প্রদত্ত্ব সংজ্ঞায় সহীহ্ শব্দটি উল্লেখ করেননি।[৩] আল্লামা বাইকুনীও এমতের প্রবক্তা।

যয়ীফের উদাহরণ :

روى الترمذي عن أحمد حدثنا يزيد حدثنا حجاج عن يحيى عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صــ ليلة فخرجت فاذا هو بالبقيع –

হাদীসটির সনদ মুনকাতে' বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে যয়ীফ। কেননা হাজ্জাজ সরাসরি হাদীসটি ইয়াহইয়া থেকে শ্রবণ করেনি।[৪]

যয়ীফ হাদীসের স্তরভেদ

উল্লেখ্য যে, সহীহ হাদীসের যেমন বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যয়ীফ হাদীসেরও তেমনি বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সনদ মুত্তাসিল না থাকার কারণে যে সকল হাদীস মারদূদ বা যয়ীফ বলে গণ্য হয়, সেগুলোর মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক যয়ীফ হল-

معلق শ্রেণীর হাদীস; (যিনি সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য করেননি, তিনি যদি সনদ উল্লেখ না করেই কোন হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে এধরণের হাদীস এই শ্রেণীর সর্বনিম্ন যয়ীফ বলে গণ্য হবে)।

অতপর معضل শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ যে হাদীসের সনদে পরপর দুই জন বর্ণনাকারীর উল্লেখ নেই)।

---

১ লেখক কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা।

২ তাকরীব আলাত্ তাদরীব - পৃ: ১৪১।

৩ তাদরীবুর-রাবী -পৃ: ১৪১।

৪ তিরমিযী শরীফ

অতপর منقطع শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ যে হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন, তা যেভাবেই হোক না কেন)।

অতপর مدلَس শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ যে হাদীসের সনদে কোন ক্রুটিকে গোপন করা হয়েছে। যেমন যার কাছ থেকে কেউ কোন হাদীস শ্রবণ করেছেন, তার উদ্ধৃতিতে শুনে নাই এমন কোন হাদীসকে এমন শব্দে বর্ণনা করা যাতে মনে হয় যে, বর্ণনাকারী তাথেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন)।

অতপর المرسل الجلي শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ যে হাদীসের সনদে তাবেয়ীর পরবর্তী বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা হয়নি। যেমন কোন তাবেয়ী বললেন যে, "রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন)। অবশ্য হানাফীদের নিকট এটি হাদীস যয়ীফ হওয়ার কারণ বলে গণ্য হয় না।

অতপর المرسل الخفي শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ এমন হাদীস যার বর্ণনাকারী এমন ব্যক্তি থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যার সাথে তার সাক্ষাত ঘটেনি অথচ তিনি তারই সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন)।

আর যে সকল হাদীস সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে নয়; বরং অন্যান্য কারণে অর্থাৎ রাবীর আদালত বা বিশ্বস্ততা কিংবা যব্ত ও সংরক্ষণগুণের দুর্বলতার জন্য যয়ীফ বলে গণ্য হয়েছে, সেগুলোর মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক ধরণের যয়ীফ হল موضوع শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের পক্ষ থেকে হাদীস তৈরী করে প্রতারণার উদ্দেশ্যে রাসূল সা.-এর বক্তব্য বলে চালিয়ে দিয়েছে)।

অতপর متروك শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন বর্ণনাকারী রয়েছে)।

অতপর مدرج শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ কোন হাদীসের সনদে কিংবা মতনে যদি বর্ণনাকারী নিজের কোন বক্তব্য এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট করে দেয় যা রাসূল সা.-এর বক্তব্য বলে অন্যের নিকট প্রতিভাত হওয়ার আশংকা থাকে)।

অতপর مقلوب শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ যে হাদীসের সনদ কিংবা মতনে শব্দকে এদিক সেদিক করে পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে)।

অতপর منكر শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ যে হাদীস কোন যয়ীফ বা দুর্বল বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত অথচ গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে এর বিপরীতার্থক হাদীস বর্ণিত আছে)।

অতপর شاذ শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ যে হাদীস কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত; কিন্তু তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে এর বিপরীতার্থক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে)।

অতপর معلل শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ যে হাদীসে প্রচ্ছন্ন কোন ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে)।

অতপর مضطرب শ্রেণীর হাদীস; (অর্থাৎ যে হাদীস সমপর্যায়ের নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে)।[১]

অনেকেই এই স্তরবিন্যাস নিম্নোক্তভাবে করেছেন-

١. الموضوع ٢. المتروك ٣. المنكر ٤. المعلل ٥. المدرج ٦. المقلوب ٧. المضطرب

وقال الخطابى ١. الموضوع ٢. المقلوب ٣. المجهول

অবশ্য যবত ও আদালত উভয় শ্রেণীর সমন্বয়ে দুর্বলতার স্তরভেদে আল্লামা ইবনে হজর যে স্তরবিন্যাস করেছেন তা নিম্নরূপ:

١. الموضوع – علته الكذب في حديث الرسول صـــ

٢. المتروك – علته قمة الكذب أو الكذب في الكلام مع الناس

٣. المنكر – علته فحش الغلط

٤. المنكر – علته الغفلة عن الاتقان

٥. المنكر – علته فسق الراوي

٦. المعلل – علته وهم الراوي

٧. الشاذ/المنكر – علته مخالفة الثقات (وله اقسام) (١) المدرج (٢) المقلوب (٣) المزيد في متصل الاسانيد (٤) المضطرب (٥) المحرف (٦) المصحف

٨. المجهول – علته جهالة عن الراوي

٩. المردود – علته البدعة

١٠. المردود – علته سوء حفظ الراوي

এই স্তর বিন্যাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ের দুর্বল থেকে পর্যায়ক্রমে সর্বনিম্ন পর্যায়ের দুর্বলের স্তর পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

---

১ আদদুরারুস সামিনাহ (পরিবর্ধনসহ) পৃ: ৫৫ ও মুকাদ্দামায়ে ফাতহুল মুলহিমের তথ্য অবলম্বনে পৃ: ১৫২ (নতুন এডিশান ১৪২৪হি: করাচী।)

২ শরহে নুখবা পৃ: ৫৪-৫৬ দ্রষ্টব্য।

নোট :

অবশ্য মাও. আব্দুল হক দেহলভী রহ. মকলূব, মযীদ ফি মুত্তাসিলিল আসানীদ, মুহাররাফ ও মুসাহ্হাফ এগুলোকে মুয্তারাবের বিভিন্ন প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ তিনি মুখালাফাতুস সিকাতের ইল্লতের কারণে সমস্যাগ্রস্থ হাদীসকে مضطرب নামে অভিহিত করেছেন এবং مصحف – محرف – مزيد في متصل الاسانيد – مقلوب ইত্যাদি শ্রেণীর হাদীসকে مضطرب -এর প্রকার হিসাবে গণ্য করেছেন।[১]

যয়ীফের শ্রেণীবিভাগ

যয়ীফ হাদীস কত প্রকার তা নির্ধারণ করতে গিয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। আল্লামা ইবনুস-সালাহ গ্রহণযোগ্যতার শর্ত বিদ্যমান না থাকার প্রেক্ষিতে যয়ীফকে বহু প্রকারে বিভক্ত করেছেন, আল্লামা ইরাকী শরহে আলফিয়ায় যয়ীফের ৪২ প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা শরফুদ্দীন আল-মানাবী যৌক্তিকভাবে যয়ীফের ১২৯ প্রকার হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন। আর বাস্তবে পাওয়া যেতে পারে এমন ৮১ প্রকার হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও প্রকৃত পক্ষে সবগুলো বাস্তবে বিদ্যমান নেই।[২]

অনেকেই শ্রেণী বিভাজনের বিষয়টিকে এত বিস্তৃত করেছেন যে, তাদের বিভাজন অনুসারে তা ৩৮১ প্রকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার অনেকের হিসাব অনুসারে তা পাঁচশত প্রকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এগুলো শুধু শুধু প্রকার বৃদ্ধিকরণের অহেতুক প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

বস্তুত হাদীস যয়ীফ হওয়ার মূল কারণ দুইটি। যথা:

(১) ضعيف بسبب سقط من الاسناد বা সনদ থেকে বর্ণনাকারী পড়ে যাওয়ার কারণে যয়ীফ। এটি মূলত ছয় প্রকার যথা-

١. المعلق   ٢. المعضل

٣. المنقطع   ٤. المدلس

٥. المرسل (الجلي)   ٦. المرسل الخفي

(২) ضعيف بسبب الطعن في الراوي বা বর্ণনাকারী সমালোচিত ও অভিযুক্ত হওয়ার কারণে যয়ীফ।

---

[১] মুকাদ্দামায়ে মিশকাত- পৃ: ৪ দ্রষ্টব্য

[২] তাদরীব- পৃ: ১৪১।

বর্ণনাকারী সমালোচিত ও অভিযুক্ত হওয়ার কারণে যয়ীফ হাদীস প্রধানত ২ প্রকার। যথা:

১. طعن في العدالة বিশ্বস্ততার দিক থেকে সমালোচিত।

২. طعن في الضبط সংরক্ষণের প্রশ্নে সমালোচিত।

১. طعن في العدالة মোট ৫ ভাগে বিভক্ত। যথা:

১ .الكذب في حديث الرسول صـــ ٢ .تهمة بالكذب ٣ .الفسق

٤ .البدعة ٥ .الجهالة في الراوي انه عادل ام لا

২. طعن في الضبط মোট ৫ প্রকার। যথা:

١ .سوء الحفظ ٢ . فحش الغلط ٣ .الغفلة في الضبط و الاتقان

٤ .كثرة الاوهام ٥ .مخالفة الثقات

অবশ্য এই মৌলিক প্রকারগুলোর কোন কোনটির একাধিক বিভাজন রয়েছে।(১)

যয়ীফের সাধারণ হুকুম

বস্তুতঃ যয়ীফ হাদীসের প্রত্যেক প্রকারের জন্য আলাদা আলাদা বিধান রয়েছে; যথাস্থানে তার আলোচনা আসবে। আমরা এখানে যয়ীফের সাধারণ বিধান সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে একটি আলোচনা পেশ করছি।

অবশ্য যয়ীফ হাদীসের বিধান সম্পর্কে মনীষীগণের বিরাট মতভিন্নতা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে যয়ীফ হাদীস কোন অবস্থাতেই আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইবনুল আরাবী, ইবনে হযম জাহেরী প্রমূখ মনীষী এরূপ মত পোষণ করতেন বলে উল্লেখ করা হয়। আবার অনেকেই মনে করেন যে, আহকাম ও আকায়েদের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। আবার অনেকেই মনে করেন, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোন সহীহ বা হাসান হাদীস না থাকলে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। বিধান সংক্রান্ত আলোচনাকে গুছিয়ে পেশ করার জন্য আমরা একটি নতুন পদ্ধতিতে আলোচনা করছি। আশাকরি এর দ্বারা বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। যয়ীফ হাদীসকে প্রধানত: দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ضعيف يمكن ان ينجبر ضعفه যে যয়ীফের দুর্বলতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২. ضعيف لا يمكن ان ينجبر ضعفه যে যয়ীফের দুর্বলতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

---

(১) তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস-পৃ: ৮৮-৮৯।

১. যে যয়ীফের দুর্বলতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

যে সব যয়ীফ হাদীসের দুর্বলতার কারণ স্মৃতিদৌর্বল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট (যেমন ইরসাল, তাদলীস, সূয়ে হিফজ, ইখতিলাত, ওয়াহাম কিংবা বর্ণনাকারী সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি) সেগুলো সমপর্যায়ের কিংবা তার চেয়ে শক্তিশালী এক বা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে তার দুর্বলতা দূরীভুত হয়ে যায়। কেননা যখন একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয় তখন সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বর্ণনাকারী স্মৃতিদৌর্বল্যের শিকার হলেও বর্ণিত হাদীসটির ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা ছিল না। সুতরাং হাদীসটি তখন হাসান লি-গায়রিহি -এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আর হাসান লি-গায়রিহি পর্যায়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কারো কোন দ্বিমত নেই। বরং বলতে গেলে এ ব্যাপারে মনীষীদের ঐকমত্য রয়েছে।[১]

আল্লামা সুয়ূতী তাদরীবুর রাবীতে উল্লেখ করেছেন-

لا بدع في الاحتجاج بحديث له طريقان– لو انفرد كل منهما لم يكن حجة– كما في المرسل اذ اورد من وجه آخر مسندا أو وافقه مرسل آخر بشرطه– كذا اذا كان ضعفه لارسال أو تدليس أو جهالة رجال، زال بمجيئه من وجه آخر -كان دون الحسن لذاته.

এমন হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে কোন অসুবিধা নেই যা এমন দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার প্রত্যেকটি পৃথকভাবে দলীল হওয়ার যোগ্য নয়। যেমন মুরসাল হাদীস যদি অন্য সূত্রে মুসনাদ রূপে বর্ণিত হয় কিংবা যদি তারই সমমানের অন্য একটি মুরসাল সূত্রেও বর্ণিত হয়; অনুরূপভাবে দুর্বলতার কারণ যদি ইরসাল, তাদলীস কিংবা বর্ণনাকারী সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি হয় তাহলে তা অন্য আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হলে দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে যাবে এবং হাদীসটি তখন হাসান লি-যাতিহি থেকে সামান্য নিম্নমানের (অর্থাৎ হাসান লি-গায়রিহির পর্যায়ভুক্ত) বলে গণ্য হয়।[২]

২. যে যয়ীফের দুর্বলতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই :

যয়ীফ হাদীসের কিছু কিছু এমনও রয়েছে যেগুলোর দুর্বলতা তার সমপর্যায়ের এক বা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলেও দূরীভূত হয় না। যেমন বর্ণনাকারী হাদীসে রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়া, কিংবা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, কিংবা ফাসেক হওয়া কিংবা হাদীসটি শায্ কিংবা মুনকার হওয়া ইত্যাদি।

---

[১] কাওয়াইদ লি উলূমিল হাদীস পৃ: ৭৯-৮০।

[২] তাদরীব- পৃ: ৯১।

এ ধরণের হাদীস সমপর্যায়ের একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলেও তা প্রমাণযোগ্য হয় না। কেননা এগুলোর দুর্বলতা এত মারাত্মক যে, একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়া দ্বারা যে শক্তি অর্জিত হয় তা ঐ দুর্বলতা কাটানোর জন্য যথেষ্ট নয়।[১]

ইবনুস সালাহ্ উল্লেখ করেছেন -

لا يلزم من ورود الحديث من وجوه متعددة ان يكون حسنا – لان الضعيف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات – ومنه ضعيف يزول بالمتابعات –

কোন যয়ীফ হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলেই তা হাসান পর্যায়ে উন্নীত হওয়া অপরিহার্য নয়। কেননা যয়ীফের মাঝেও পার্থক্য রয়েছে। কিছু যয়ীফ এমন রয়েছে যার দুর্বলতা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়া দ্বারা দূরীভূত হয় না। আবার কিছু যয়ীফ এমনও রয়েছে যার দুর্বলতা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়া দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায়।[২]

তবে আল্লামা সুয়ূতী রহ. উল্লেখ করেছেন যে এধরণের দুর্বল হাদীস (যা সমপর্যায়ের একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলেও দুর্বলতা দূরীভূত হয় না) তা যদি সমপর্যায়ের একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়, তাহলে হাদীসটি যে একেবারে মুনকার বা ভিত্তিহীন নয় তা সাব্যস্ত হয়ে যায়।[৩] আল্লামা ইবনে হজরও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৪]

অবশ্য এধরণের দুর্বল হাদীস যদি তার চেয়েও শক্তিশালী কোন সূত্রে বর্ণিত হয় কিংবা যদি তা বহু সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে তার দুর্বলতা হ্রাস পায় এবং হাদীসটি তখন হাসান লি-গায়রিহির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়।[৫]

তবে বাস্তব বিচারে যে দুর্বলতা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়া দ্বারা দূরিভুত হয় না, তা যত সূত্রেই বর্ণিত হোক সেই হাদীসটির দুর্বলতা পূর্ববৎ বহাল থাকাই যুক্তি সঙ্গত।

যে যয়ীফ হাদীসের শাহেদ ও মুতাবে' নেই :

এমন ধরণের যয়ীফ হাদীস যা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে যেত, কিন্তু তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়নি বরং একটিমাত্র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; এমন ধরনের যয়ীফ হাদীসের বিধান এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রকৃত অবস্থা

---

১ তাদরীব- পৃ: ১০৪।
২ ইখতিসারু উলূমিল হাদীস-পৃ: ৪৩।
৩ তাদরীবুর রাবী পৃ: ১০৪।
৪ কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ: ৮১ দ্রষ্টব্য।
৫ কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস-পৃ: ৮১-৮২।

উদ্ঘাটিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ তাকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না। আল্লামা সুয়ূতী তাদরীবুর-রাবীতে এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার সারসংক্ষেপ হল,

ان حكمه التوقف، حتى ينكشف حاله

এর বিধান হল প্রকৃত অবস্থা উদ্ঘাটন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ধরণের হাদীসের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ।

হাদীসের প্রকৃত অবস্থা (অর্থাৎ তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে কি হবে না তা) উদ্ঘাটন বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে। যেমন:

ক. কিয়াসের অনুকূল হওয়ার কারণে কোন মুজতাহিদের নিকট হাদীসটি গ্রহণীয় হতে পারে।

খ. কোন সাহাবী বা তাবেয়ীর বক্তব্যের অনুকূল হওয়ার কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

গ. কোন নস এর প্রতিফলিত অর্থের প্রতি ইঙ্গিতবহ হওয়ার কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

এছাড়াও এধরণের সঙ্গত কোন কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

যে সব কারণ বিদ্যমান থাকলে যয়ীফ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় :

১. যদি হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়। অর্থাৎ যদি হাদীসটির কোন গ্রহণযোগ্য মুতাবে' বা শাহেদ পাওয়া যায়।
২. যদি হাদীসটি দ্বারা কোন মুজতাহিদ প্রমাণ পেশ করে থাকেন।[১]
৩. হাদীসটি যদি কুরআনের কোন আয়াতের ভাবার্থের অনুকূল হয়।[২]
৪. হাদীসটি যদি দ্বীনের স্বীকৃত কোন মূলনীতির অনুকূল হয়।[৩]
৫. হাদীসটি যদি কোন মুহাদ্দিস কর্তৃক বর্ণিত হয় এবং কোন হাফেযে হাদীস সেটিকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন।[৪]
৬. যদি ব্যাপক ভিত্তিতে লোকেরা হাদীসটিকে গ্রহণ করে থাকেন।[৫]
৭. যদি হাদীসটির সমর্থনে এমন কোন ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা দ্বারা

---

১ ইবনে হুমামকৃত আত-তাহরীর

২ তাদরীবুর-রাবী -পৃ: ২৫।

৩ তাকরীবুল মাদারেক আলা-মুয়াত্তা মালেক।

৪ নসবুররায়াহ্- ২য় খন্ড, পৃ: ১৩৮

৫ কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস-পৃ: ৬০

হাদীসটি সহীহ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।[১]

একটিমাত্র সূত্রে বর্ণিত যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোন কারণ উদ্ঘাটিত না হলেও যদি হাদীসটি মারাত্মক ধরণের যয়ীফ না হয়; (যেমনঃ মওজু, মারাত্মক ধরণের মুনকার, মতরুহ, মতরুক, শায্ না হয়,) তাহলে ফাযাইলে আমালের ক্ষেত্রে এধরণের হাদীসের ভিত্তিতে আমল করা যাবে। দুররে মুখতারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, فيعمل به في فضائل الاعمال এ ধরণের হাদীসের ভিত্তিতে ফাযাইলে আমালের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে। তাছাড়া যুহ্দ, রিকাক, তারগীব, তারহীব, আদাব, অতিরিক্ত পর্যায়ের আমল ইত্যাদি ক্ষেত্রেও- যেখানে হালাল হারাম বা অন্যের অধিকারের প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট নেই- সে ধরণের ক্ষেত্রে এধরণের হাদীস গ্রহণীয় হবে।

আল্লামা ইবনে হজর হাইতামী মক্কী শরহে আরবাঈনে উল্লেখ করেছেন যে, যদি হাদীসটি প্রকৃত পক্ষে সহীহ হয়, তাহলে তো তার উপর আমল করা যথার্থই হল। আর যদি সহীহ নাও হয়, তাহলে এদ্বারা কোন বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করা বা হারাম সাব্যস্ত করা কিংবা কারো অধিকার হনন করার মত জঘণ্য কিছু সংঘটিত হল না।[২] তবে যদি হাদীসটি মারাত্মক ধরণের যয়ীফ হয় তাহলে কোন ক্ষেত্রেই তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি তার ভিত্তিতে ফাযাইলে আমালের ক্ষেত্রেও কোন আমল করা বৈধ হবে না।[৩]

মারাত্মক ধরণের যয়ীফ বা (شدة ضعف) বলতে কি বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন উল্লেখ করেছেন-

شدة الضعف هو الذي لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم بالكذب، قاله ابن حجر

মারাত্মক ধরণের যয়ীফ বলতে এমন ধরণের হাদীসকে বুঝানো হয়, যার সূত্রসমূহের কোন একটিও এমন নেই যাতে কোন মিথ্যাবাদী কিংবা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি নেই। এটি আল্লামা ইবনে হজর হাইতামীর (মৃঃ ৯৭৪ হি:) বক্তব্য। তাছাড়া যেসব হাদীস নিতান্ত ভিত্তিহীন (اباطيل و مناكير) সেগুলোও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশ্য মুহাক্কিক কামাল ইবনে হুমাম ফতহুল কাদীরে উল্লেখ করেছেন যে, والضعيف غير الموضوع يعمل به في فضائل الاعمال যয়ীফ যা মওজু বা জাল নয় এমন ধরণের হাদীসের ভিত্তিতে ফাযায়েলে

---

১ তাদরীব

২ কাওয়ায়িদ লি উলূমিল হাদীস-পৃঃ ৯৩।

৩ শরহে নুখবা মাও. আব্দুল মালেক এর পান্ডুলিপি।

আমালের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে।[১]

কোন যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে হাফেয ইবনে হজর তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন। যথা:

১. হাদীসটি মারাত্মক ধরণের যয়ীফ না হতে হবে।
২. হাদীসটির বক্তব্য শরীয়তের কোন মূলনীতির আওতায় পড়তে হবে।
৩. বিষয়টি সুন্নত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যাবে না।[২]

কোন বিষয়ে সহীহ হাদীস বিদ্যমান না থাকলে ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিসগণ যয়ীফ হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতেন :

মুল্লা আলী কারী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে -

ان مذهبهم القوي تقديم الحديث الضعيف على قياس المرء الذي يحتمل التزييف

মুহাদ্দিসগণের বলিষ্ঠ নীতি এই ছিল যে, তারা যয়ীফ হাদীসকে ব্যক্তি বিশেষের কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। কেননা কিয়াস অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।[৩]

আল্লামা সুয়ূতী তাদরীবে উল্লেখ করেছেন যে-

كذالك ابو داؤد.... يخرج الاسناد الضعيف اذا لم يجد في الباب غيره، لانه اقوى عنده من رأي الرجال، هذا ايضا رأي الامام احمد

অনুরূপভাবে ইমাম আবু দাউদ কোন অধ্যায়ে যয়ীফ ছাড়া অন্য কোন হাদীস না পেলে যয়ীফ সনদেই হাদীস সংকলন করতেন। কেননা তার কাছে কারো ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে যয়ীফ হাদীস অধিক নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হত। এটা ইমাম আহমদেরও অভিমত।[৪]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তার ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেছেন যে,

وأصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة ان ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي

ইমাম আবু হানীফার অনুসারীরা এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম আবু হানীফার মতাদর্শ ছিল এই যে, যয়ীফ হাদীস তাঁর নিকট কিয়াস ও ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে উত্তম বলে বিবেচিত হত।[৫]

---

[১] ফতহুল কাদীর, ১ম খন্ড, বাবুল ইমামাহ- পৃ: ২৪৬।

[২] দুররে মুখতার খ: ১ পৃ: ৮৭।

[৩] মেরকাত -খ: ১ - পৃ: ৩

[৪] তাদরীব - পৃ: ৯৮।

[৫] ফাতাওয়া- খ: ১ - পৃ: ৭৭।

যদিও ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিম দাবী করেছেন যে, উপরোক্ত বক্তব্যসমূহে যে যয়ীফের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদ্বারা মূলত হাসান পর্যায়ের হাদীস উদ্দেশ্য। কেননা পূর্বযুগীয় মনীষীদের কাছে হাসান পর্যায়ের হাদীসগুলো যয়ীফেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা তারা হাদীসকে সহীহ ও যয়ীফ এই দুই ভাগেই ভাগ করতেন।

কিন্তু শায়খ মুহাম্মদ 'আওয়ামা মনে করেন যে, উপরোক্ত বক্তব্যসমূহে যয়ীফ দ্বারা মারাত্মক ধরণের যয়ীফ নয় এমন যয়ীফ হাদীসকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা মারাত্মক ধরণের যয়ীফ হাদীস কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি যয়ীফ হাদীসকে মোট ৪ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

১. الضعيف المنجبر الضعف بالمتابعة اوالشاهد বা যে যয়ীফের দুর্বলতা শাহেদ ও মুতাবে' দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায়। এধরণের হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ لين الحديث – وفيه لين ইত্যাদি ধরণের মন্তব্য করে থাকেন।

২. الضعيف المتوسط الضعف বা মধ্যম ধরণের যয়ীফ। এ ধরণের হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ সাধারণত: منكر الحديث، مردود الحديث، ضعيف الحديث ইত্যাদি ধরণের মন্তব্য করে থাকেন।

৩. الضعيف الشديد الضعف মারাত্মক ধরণের যয়ীফ; এমন যয়ীফ যার রাবীদের মাঝে متهم بالكذب অথবা متروك বর্ণনাকারী রয়েছেন।

৪. الموضوع বা জাল হাদীস।

শায়েখ মুহাম্মদ 'আওয়ামা মনে করেন যে, সহীহ হাদীস বিদ্যমান না থাকলে মুহাদ্দিসগণ যে যয়ীফ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন, তাদ্বারা প্রথমোক্ত দুই ধরণের যয়ীফ উদ্দেশ্য। শেষোক্ত দুই ধরণের হাদীস উদ্দেশ্য নয়। কেননা সেগুলো কোন অবস্থাতেই এবং কোন ক্ষেত্রেই প্রমাণ হিসাবে পেশ করার যোগ্য নয়।[১]

তবে এধরণের ক্ষেত্রে তখনই তারা কোন যয়ীফ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত থাকে এবং তারা হাদীসটির একাধিক সূত্র উল্লেখও করে থাকেন। আল্লামা শা'রানী উল্লেখ করেছেন -

وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف اذاكثر طرقه ... فانهم اذا لم يجد حديثا صحيحا أو حسنا يستدل به لقول ذالك الامام أو قول احد من مقلديه ، يصير يروى الحديث الضعيف من كذا كذا طريقا، يكتفي بذالك، ويقول هذه الطريق يقوي بعضها بعضا –

মুহাদ্দিসগণের সকলেই কখনো কখনো যয়ীফ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে

---

[১] কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস পৃ: ১০১ টিকা দ্রষ্টব্য

থাকেন যদি তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়। কেননা যখন তারা কোন ইমামের মতকে কিংবা তার কোন অনুসারীর মতকে প্রমাণপুষ্ট করার জন্য কোন সহীহ বা হাসান হাদীস না পান, তখন তারা কোন যয়ীফ হাদীসকে একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেন; আর এটাকে তারা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন এবং বলতেন যে, এই সূত্রগুলো (স্বয়ং দুর্বল হলেও) পরস্পরকে শক্তিশালী করে তুলে।[১]

কেননা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীসটি হাসান লি-গায়রিহির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অতএব তাদ্বারা দলীল পেশ করা সর্বসম্মত ভাবেই বৈধ হয়ে যায়।

যয়ীফ হাদীস বর্ণনার বিধান

যয়ীফ হাদীস যদি সনদসহ বর্ণনা করা হয়, তাহলে হাদীসটি যয়ীফ একথা উল্লেখ না করেও বর্ণনা করা বৈধ হবে। তবে যদি জানা থাকে তাহলে উল্লেখ করে দেওয়া উত্তম হবে। আর যদি হাদীসটি সনদ বিহীন বর্ণনা করা হয় আর জানা থাকে যে, হাদীসটি যয়ীফ তাহলে তা উল্লেখ করে দেওয়া কর্তব্য। যাতে শ্রোতারা বিভ্রান্ত না হয়। তবে এক্ষেত্রেও সতর্কতার জন্য قال رسول الله صـــ বা 'রাসূল সা. বলেছেন' এরূপ না বলে روى عنه كذا أو بلغنا عنه كذا -রাসূল সা. থেকে এরূপ বর্ণিত আছে, রাসূল সা. থেকে এরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, একটি হাদীসের দ্বারা জানা যায়-এরূপ শব্দে বর্ণনা করা উচিত হবে। কেননা হাদীসটি যয়ীফ জেনেও 'রাসূল সা. বলেছেন' এরূপ দৃঢ়তাবোধক শব্দে বর্ণনা করা সঙ্গত নয়।

উল্লেখ্য যে, সনদবিহীন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি জানা না থাকে যে, হাদীসটি সহীহ কি যয়ীফ তাহলে তখনও তা দৃঢ়তাবোধক শব্দে বর্ণনা করা সঙ্গত হবে না। বরং তখনও روى عنه كذا أو بلغنا عنه كذا ইত্যাদি দুর্বলতাজ্ঞাপক শব্দে তা বর্ণনা করা কর্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যদি কোন হাদীস কোন সনদের বিচারে যয়ীফ বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলেও সে হাদীসের ব্যাপারে চটকরেই এরূপ মন্তব্য করা ঠিক হবে না যে, হাদীসটি যয়ীফ। কেননা অন্য কোন সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণিত থাকতেও পারে। তাই সতর্কতার প্রশ্নে এরূপ মন্তব্য করা বাঞ্ছনীয় হবে যে, هذا حديث ضعيف بهذا الاسناد এই সূত্রে হাদীসটি যয়ীফ।

তবে হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যিনি গভীর পাণ্ডিত্য রাখেন এমন কোন মুহাদ্দিস

[১] কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস পৃ: ৮২।

যদি হাদীসটির ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করে থাকেন যে, এটি বিশুদ্ধ সূত্রে কোথায়ও বর্ণিত নেই, তাহলে সেক্ষেত্রে هذا حديث ضعيف এরূপ মন্তব্য করতে কোন দোষ নেই।

অনেক মুহাদ্দিস যয়ীফ হাদীসের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে সতর্কতা মূলক এরূপ মন্তব্য করতেন যে, هذا حديث ضعيف من قبل اسناده অর্থাৎ সনদের বিচারে হাদীসটি যয়ীফ। কারণ বলাতো যায় না যে, সনদ দুর্বল হলেও বক্তব্যটি বাস্তবে হয়ত রাসূল সা. -এরই বক্তব্য।[১]

ضعيف ও مضعف -এর মাঝে পার্থক্য

যয়ীফ কাকে বলে তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। مضعف এমন হাদীসকে বলা হয় যা যয়ীফ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কারো মতে যয়ীফ, কারো মতে যয়ীফ নয়। এ ধরণের مضعف হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করা যায়।[২]

রাবী ضعيف বা গ্রহণযোগ্য নয় একথা বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণ যেসব শব্দ ব্যবহার করে থাকেন :

রাবী গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না একথা বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণ যেসব শব্দ ব্যবহার করেন তার মাঝ দিয়ে তারা রাবীর অগ্রহণযোগ্যতা কোন পর্যায়ের তার প্রতিও ইঙ্গিত করে থাকেন। যারা গ্রহণযোগ্য নয় এধরণের রাবীদেরকে মোট কয়টি স্তরে বিভক্ত করা হবে এ ব্যাপারে মনীষীদের মতভিন্নতা থাকলেও আল্লামা সাখাভী তাদেরকে ৬টি স্তরে বিভক্ত করে উল্লেখ করেছেন এবং কোন স্তরের জন্য কি ধরণের শব্দ ব্যবহার করা হয় তাও নির্দেশ করেছেন। আমরা নিম্নে তার বিভাজনটি উদ্ধৃত করলাম।

১. প্রথম স্তর : অনির্ভরযোগ্যদের মাঝে যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ের অগ্রহণযোগ্য অর্থাৎ যারা মারাত্মক পর্যায়ের অগ্রহণযোগ্য তাদেরকে এস্তরের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। এদের জন্য মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত শব্দসমূহ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন-

هو أكذب الناس ، وإليه المنتهى في الكذب ، وهو ركن الكذب ، أو منبع الكذب ، أو معدن الكذب–

২. দ্বিতীয় স্তর : যাদের দুর্বলতা প্রথম স্তরের চেয়ে কিছুটা হালকা। এস্তরের রাবীদের বেলায় মুহাদ্দিসগণ সাধারণত নিম্নোক্ত শব্দসমূহ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন-- هو دجّال ، أو كذاب ، أو وضّاع ، يضع الحديث ، أو يكذب في الحديث

---

[১] কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস পৃ: ৯৫ এর ভাবাবলম্বনে।

[২] প্রাগুক্ত পৃ: ....

৩. তৃতীয় স্তর : যাদের দুর্বলতা দ্বিতীয় স্তরের চেয়েও একটু হালকা। এ স্তরের রাবীদের জন্য মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত শব্দসমূহ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন-

فلان يسرق الحديث، فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع، أو فلان ساقط، أو فلان هالك، أو هو ذاهب الحديث، أو متروك الحديث، أو لا يعتبر به، أو لا يعتبر بحديثه، أو ليس بالثقة، أو غير ثقة –

৪. চতুর্থ স্তর : যাদের দুর্বলতা ৩য় স্তরের চেয়েও হালকা। এ ধরণের রাবীদের বেলায় নিম্নোক্ত শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়। যেমন-

فلان رد حديثه، أو مردود الحديث، أو ضعيف جداً، أو واهٍ، أو هم قـــد طرحـــوه، أو مطروح الحديث، أو مطروح، لايكتب حديثه، لاتحل كتابة حديثه، أو لاتحل الرواية عنه، أو ليس بشيئ.

৫. পঞ্চম স্তর: এই স্তরের রাবীদের বেলায় সাধারণত নিম্নোক্ত শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয় **فلان لا يحتج به – أو ضعفوه، أو مضطرب الحديث، أو له ما ينكر، أو له مناكير، أو منكر الحديث، أو ضعيف –**

৬. ষষ্ট স্তর : যাদের দুর্বলতা নিতান্তই হালকা পর্যায়ের। এধরণের রাবীদের বেলায় নিম্নোক্ত শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়।

فيه مقال، أو فيه ادنى مقال، أو ضعفٌ، أو ينكر مرة ويعرف اخرى، أو ليس بذالك، أو ليس بالقوي، أو ليس بالمتقن، أو ليس بحجة، أو غيره اوثق منه، أو فيه شئ، أو فيه جهالة، أو لا ادرى ما هو، أو سيئ الحفظ، أو ليّن الحديث، أو فيه لين، أو تكلموا فيه، سكتوا عنه، أو فيه نظر.

আল্লামা সাখাভী শরহে আলফিয়ায় উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম চার স্তরের কোন রাবীর বর্ণিত কোন হাদীস প্রমাণযোগ্যও নয়, কিংবা সেগুলো শাহেদ ও মুতাবে' হিসাবে পেশ করারও যোগ্য নয়। তবে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর রাবীদের বর্ণিত হাদীস শাহেদ ও মুতাবে' হিসাবে পেশ করার যোগ্য।[১]

মারদূদ হাদীসের জন্য মুহাদ্দিসগণ যেসব শব্দাবলী ব্যবহার করেন :

موضوع ، متروك ، مطروح ، منكر ، معلل ، مردود ، ضعيف ، لا يعتبر به ، ليس بذالك ،

---

[১] যফরুল আমানী - পৃ: ৭৯-৮১ (সংক্ষেপায়িত)

وليس بالقوي ، لا يحتج به ، وليس بحجة ، ومضطرب ، يعد من المناكير

সহীহ কি যয়ীফ এ ব্যাপারে দ্বিমত হলে কি করতে হবে?

যদি কোন হাদীসের পর্যায় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দ্বিমত পাওয়া যায়; যেমন হাদীসটি সম্পর্কে কেউ কেউ সহীহ কিংবা হাসান হওয়ার মন্তব্য করেছেন; আর কেউ কেউ যয়ীফ হওয়ার মন্তব্য করেছেন। তাহলে এধরণের হাদীস হাসান বলে গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে মন্তব্যের ক্ষেত্রেও যদি দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়, যেমন কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে কেউ কেউ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করেছেন; আর কেউ কেউ তার সম্পর্কে যয়ীফ হওয়ার মন্তব্য করেছেন। তাহলে এধরণের বর্ণনাকারী হাসান পর্যায়ের রাবী বলে গণ্য হবে।[১]

জ্ঞাতব্য যে, কোন হাদীসকে সহীহ কিংবা যয়ীফ বলে সাব্যস্ত করা একটি ইজতিহাদী বিষয়। অনুরূপভাবে কোন বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বা যয়ীফ বলে গণ্য করা এটিও একটি ইজতিহাদী বিষয়। আল্লামা যাহাবী তাযকেরাতুল হুফফাযের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন-

ان توثيق الرجال وتضعيفها وتصحيح الاحاديث وتزييفها أمر اجتهادى يحتمل الاختلاف، فلا يلزم من جرح أحد في رجل كونه مجروحا عند الكل –

কোন ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করার বিষয়টি, অনুরূপভাবে কোন হাদীসকে সহীহ ও যয়ীফ সাব্যস্ত করার বিষয়টি একটি ইজতিহাদী বিষয়, যাতে মতপার্থক্য হওয়ার অবকাশ রয়েছে। অতএব কারো ব্যাপারে কোন ব্যক্তির সমালোচনার দ্বারা সেই ব্যক্তি সকলের নিকটই সামালোচিত হবে, এটা অপরিহার্য নয়।[২]

সুতরাং একটি হাদীস কারো নিকট সহীহ বলে গণ্য হলেও অন্যজনের কাছে তা যয়ীফ হওয়া বিচিত্র নয়। উদাহরণ হিসাবে ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসকে পেশ করা যায়-

قال ابن جرير حدثنا اسماعيل بن موسى السدي انبأنا محمد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي رض قال قال رسول الله

---

১ কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস পৃ: ৭২।

২ মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস-সুনান পৃ: ৫২।

صـــ انا دار الحكمة وعليٌّ بابها–

এই হাদীসটির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনে জারীর বলেছেন যে, এই হাদীসটির সনদ আমাদের দৃষ্টিতে সহীহ। তবে হতে পারে অন্যদের বিচারে তা সহীহ নয় অর্থাৎ কারো কাছে তা যয়ীফ বলে গণ্য হতে পারে। আর তা হতে পারে দু'টি কারণে। একটি কারণ এই যে, এই হাদীসটি হযরত আলী রা. থেকে এই একটি মাত্র সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত নেই। দ্বিতীয়ত বর্ণনাকারী 'সালামা ইবনে কুহায়ল' তাদের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তি যার বর্ণিত কোন হাদীস কোন ক্ষেত্রে প্রমাণ হতে পারে না।

অথচ এই হাদীসটি নবী কারীম সা. থেকে আলী রা. ছাড়া অন্যরাও বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীস উল্লিখিত সূত্রে ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন (وفي نسخة غريب) هذا حديث منكر এই হাদীসটি মুনকার।

أوهى الأسانيد (দুর্বলতম সনদ)

সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে أصحُّ الأسانيد বা বিশুদ্ধতম সূত্রের বিষয়ে যেমন মুহাদ্দিসগণের একটি আলোচনা রয়েছে; যয়ীফের ক্ষেত্রেও তেমনি اوهى الاسانيد বা দুর্বলতম সূত্রের বিষয়ে একটি আলোচনা রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ কিছু কিছু সনদের ব্যাপারে اوهى الاسانيد এর মন্তব্য করেছেন। أصحُّ الأسانيد -এর ক্ষেত্রে যেমন একেক সাহাবী বা একেক অঞ্চলের ভিত্তিতে أصحُّ الأسانيد কে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুরূপ اوهى الاسانيد কেও একেক সাহাবী ও একেক অঞ্চলের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন হাকেম বলেছেন যে,

১. হযরত আবু বকর রা. থেকে যেসব বর্ণনা সূত্র রয়েছে তার মাঝে দুর্বলতম সূত্র হল:

صدقة الدقيقى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن ابى بكر رض

২. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে দুর্বলতম সূত্র হল -

السرى بن اسماعيل عن داؤد بن يزيد الاودي عن أبيه عن أبى هريرة رض

৩. হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে দুর্বলতম সূত্র হল-

شريك عن ابى فزارة عن ابى زيد عن ابن مسعود رض

৪. মক্কাবাসীদের থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে দুর্বলতম সূত্র হল-

عبدالله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن ابرهيم بن يزيد الخورى عن عكرمة عن ابن عباس رض

৫. ইয়ামানীদের থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে দুর্বলতম সূত্র হল-

حفص بن عمر العدنى عن الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رض

৬. সিরিয়াবাসীদের থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে দুর্বলতম সূত্র হল- .

محمد بن قيس المصلوب عن عبيد بن زحر ، عن على بن زيد عن القاسم عن أبى امامة رض .

৭. খোরাসানীদের থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহের মাঝে দুর্বলতম সূত্র হল-

عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رض .

যয়ীফ রাবীদের উপর লিখিত গ্রন্থাবলী

১. كتاب الضعفاء ইবনে হিব্বানকৃত।

২. ميزان الاعتدال আল্লামা যাহাবীকৃত।

৩. كتاب المراسيل ইমাম আবু দাউদকৃত।

৪. كتاب العلل দারাকুতনীকৃত।

সনদ থেকে রাবী পড়ে যাওয়ার কারণে যয়ীফ হাদীসের প্রকারভেদ

বস্তুত বর্ণনাসূত্র থেকে বর্ণনাকারী পড়ে যাওয়া বা বিচ্যুত হওয়ার অর্থ হল সূত্রের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হওয়া। সূত্র থেকে বর্ণনাকারীর বিচ্যুতির বিষয়টি বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। যেমন বিচ্যুতির বিষয়টি কেউ ইচ্ছা করেও ঘটাতে পারে, আবার অনিচ্ছাকৃতভাবেও ঘটতে পারে। ইচ্ছা করে বর্ণনাকারীকে ফেলে দেওয়ার পিছনেও বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আবার বিচ্যুতির বিষয়টি সনদের শুরুভাগেও হতে পারে, মধ্যভাগেও হতে পারে, আবার শেষভাগেও হতে পারে। আবার বিচ্যুতির বিষয়টি এমন সুস্পষ্টও হতে পারে যে, যারাই এ বিষয়ের সাথে মোটামোটি সংশ্লিষ্ট তারাই তা ধরতে পারেন। কিংবা বিচ্যুতির বিষয়টি এমন অস্পষ্টও হতে পারে যে, এ বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যরা তা অনুধাবনই করতে পারে না।

বিচ্যুতির বিষয়টি সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট হওয়ার দিক থেকে বিষয়টিকে প্রথমত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. السقط الظاهر **বা সুস্পষ্ট বিচ্যুতি।**

২. السقط الخفي **বা অস্পষ্ট বিচ্যুতি।**

সুস্পষ্ট বিচ্যুতি (السقط الظاهر)

বিচ্যুতির বিষয়টি যদি এত সুস্পষ্ট হয় যে, ইলমে হাদীস সম্পর্কে যাদের সাধারণ জ্ঞান আছে তারাই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন, তাহলে তাকে السقط الظاهر বলা হয়। যেমন বর্ণনাকারী ও তিনি যাথেকে বর্ণনা করছেন তাদের দু'জনের মাঝে যদি দেখা সাক্ষাত বা আদান প্রদান না ঘটে থাকে। কারণ বর্ণনাকারী হয়ত তার সময় কালে জন্মই গ্রহণ করেননি কিংবা দু'জন সমকালীন ব্যক্তি হলেও দু'জনের মাঝে সাক্ষাত ঘটেনি, বা তিনি তাকে হাদীস বর্ণনার লিখিত অনুমতিও প্রদান করেননি কিংবা পাণ্ডুলিপিও তাকে সরবরাহ করেননি। তাহলে এ দু'জনের মাঝে অন্য একজন মধ্যস্ততাকারী ছিলেন একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য সনদের এসব বিষয় অনুধাবনের জন্য রাবীদের জীবন ইতিহাস, তাদের জন্ম তারিখ, মৃত্যু তারিখ, অধ্যয়নকাল, তাদের জ্ঞানাহরণের জন্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য, তাদের শিক্ষক ও ছাত্র সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হয়।

বিচ্যুতির স্থানভেদে سقط ظاهر বা সুস্পষ্ট বিচ্যুতিকে মোটামোটি ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা - ১. معلق ২. معضل ৩. منقطع ৪. مرسل

এই চারভাগে বিভাজন ও নামকরণের প্রেক্ষিত উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা জাযায়েরী রহ. লিখেছেন-

ذالك لان السقوط اما ان يكون من مبادئ السند، أومن آخره بعد التابعي، أومن غير ذلك، فالأوّل معلق، الثاني المرسل، الثالث ان كان الساقط فيه اثنان فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. و إلا فهو المنقطع.

চারভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণ ও নামকরণের প্রেক্ষাপট এই যে, বিচ্যুতি হয়ত সনদের শূরুতে হবে, না হয় শেষে তাবেয়ীর পরে হবে, কিংবা অন্যত্র হবে। শুরুতে হলে তাকে মু'আল্লাক (المعلق) বলা হবে, আর শেষে তাবেয়ীর পরে হলে তাকে মুরসাল (المرسل) বলা হবে। শুরু শেষ বাদে অন্যত্র যে বিচ্যুতি ঘটবে, তা যদি পর পর দু'জন বর্ণনাকারী ধারাবাহিক ভাবে বিচ্যুত হয় তাহলে তাকে মু'দাল (المعضل) বলা হবে। আর যদি একজন বিচ্যুত হয় (তা এক স্থান থেকেই হোক বা একাধিক স্থান থেকে একজন করে বিচ্যুত হোক) তাহলে তাকে মুন্‌কাতে' (المنقطع) বলা হবে।[১]

অস্পষ্ট বিচ্যুতি (السقط الخفي)

কোন হাদীসের সনদ থেকে রাবীর বিচ্যুতির বিষয়টি যদি এত অস্পষ্ট হয় যা এ বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছাড়া সাধারণ জনরা অনুধাবনই করতে পারে না তাহলে তাকে السقط الخفي বা অস্পষ্ট বিচ্যুতি বলা হয়।

অস্পষ্ট বিচ্যুতি সাধারণত দুই প্রকার। যথা :

১. المدلس (মুদাল্লাস) ২. الارسال الخفي (ইরসালে খফী)

আমরা নিম্নে উক্ত ছয় প্রকারের সংজ্ঞা ও হুকুম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

১. মু'আল্লাক (المعلق)

আভিধানিক অর্থ

মু'আল্লাক (معلق) শব্দটি باب تفعيل থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। علّق الشيئ بالشيئ অর্থ একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া, বেঁধে রাখা।

---

[১] মুকাদ্দামায়ে ফতহুল মুলহিম পৃ: ৮৭ (নতুন এডিশন ১৪২৪হি:)।

সুতরাং معلق অর্থ ঝুলন্ত। সনদের শেষপ্রান্ত সম্পর্ক যুক্ত থাকলেও শুরুর দিকে যেহেতু বর্ণনাকারীর উল্লেখ নেই, তাই যেন এটি মূলের সাথে ঝুলে আছে। এ প্রেক্ষিতে এ ধরণের রিওয়ায়াতকে মু'আল্লাক বলা হয়।[১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা : هوالحديث الذي سقط من أول سنده رأو فأكثر

যে হাদীসের সনদের শুরুতে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বিচ্যুত হয়েছে তাকে মু'আল্লাক বলে।[২] এমনকি যদি সম্পূর্ণ সনদও ফেলে দেওয়া হয় তাহলেও তাকে মু'আল্লাক বলা হবে। ইবনে হজর বলেছেন যে-

ومن صور المعلق أن يحذف منه جميع السند- ويقال مثلا قال رسول الله صـــ

পূর্ণ সূত্রটি ফেলে দিয়ে কেবল রাসূল সা. বলেছেন- এই বলে কোন হাদীস বর্ণনা করলে তাও মু'আল্লাক বলে গণ্য হবে।[৩]

و منها أي من صورها أن يحذف منه إلا الصحابي، أو الصحابي والتابعي.

এর একটি রূপ এমনও হতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসটি যে সাহাবী থেকে বর্ণিত তাকে ছাড়া সনদের বাকী অংশ ফেলে দেওয়া হবে কিংবা সাহাবী এবং তাথেকে বর্ণনাকারী তাবেয়ীকে ছাড়া সনদের বাকী অংশ ফেলে দেওয়া হবে।[৪]

সুতরাং মু'আল্লাকের মোট রূপ হবে চারটি :

১. পূর্ণ সনদ ফেলে দিয়ে قال رسول الله صـــ বলে হাদীসটি বর্ণনা করা। যেমন-

اخرج البخاري في باب ما جاء في البول، وقال النبيّ صـــ لصاحب القبر كان لايستنزه عن بول

ইমাম বুখারী বল্লেছেন রাসূল সা. কবরের বাসিন্দা লোকটির সম্পর্কে বলেছিলেন যে, সে পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না।[৫]

২. শুধু সাহাবী ছাড়া বাকী সনদ ফেলে দেওয়া। যেমন-

قال أبو موسى : غطّى النبيّ صـــ ركبتيه حين دخل عثمان.

হযরত আবু মূসা রা. বলেছেন যে, যখন হযরত উসমান রা. প্রবেশ করলেন তখন রাসূল সা. তাঁর হাটু মুবারক ঢেকে ফেললেন।[৬]

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৬৯।
[২] মুকাদ্দামায়ে ফতহুল মুলহিম পৃ: ৮৭।
[৩] মুকাদ্দামায়ে ফতহুল মুলহিম পৃ: ৮৭।
[৪] মুকাদ্দামায়ে ফতহুল মুলহিম পৃ: ৮৭।
[৫] বুখারী।
[৬] বুখারী।

৩. সাহাবী ও তাবেয়ী ছাড়া বাকী সনদ ফেলে দেওয়া হবে। যেমন বলা হবে -

قال عطاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم–

৪. বর্ণনাকারী তার উস্তাদকে ফেলে দিয়ে তার পরবর্তী ব্যক্তি থেকে সনদসহ হাদীসটি বর্ণনা করবেন। যেমন-

اخرج البخاري في باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صـــ يقول إذا أسلم العبـــد فحسن إسلامه يكفرالله عنه كل سيئة كان زلفها –[১]

হাদীসটি ইমাম বুখারী ইমাম মালিক রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ ইমাম বুখারী ইমাম মালিক থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। অতএব ইমাম বুখারী ও ইমাম মালিকের মাঝে একজন বর্ণনাকারী নিশ্চয়ই ছিলেন, যিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ; যার কথা সনদে উল্লেখ করা হয়নি।

বর্ণনাকারী যদি দুর্বলতা জ্ঞাপক শব্দেও এধরণের হাদীস বর্ণনা করেন (যেমন: ذُكِر، رُوِيَ، حُكِيَ ইত্যাদি) তবুও হাদীসটি মু'আল্লাক বলেই গণ্য হবে। আব্দুল হাই লাখনুভী রাহ. উল্লেখ করেছেন যে-

فالحذف اما ان يكون في اول الاسناد وهو معلق سواء كان مذكورا بصـــيغة الجـــزم أو بصيغة التمريض–

রাবীর বিচ্যুতি যদি সনদের শুরুতে ঘটে তাহলে হাদীস মু'আল্লাক বলে গণ্য হবে; তা দৃঢ়তাবোধক শব্দেই বর্ণিত হোক বা দুর্বলতা জ্ঞাপক শব্দেই বর্ণিত হোক।[২]

মু'আল্লাকের হুকুম

মু'আল্লাক হাদীস সাধারণত বর্জনীয় বলে গণ্য হয়। কেননা হাদীস মাকবূল হওয়ার জন্য অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার যে শর্ত রয়েছে তাই তাতে বিদ্যমান নেই। ফলে বর্ণনাকারীদের অবস্থা অজ্ঞাত থাকে।[৩] কিন্তু যদি হাদীসটি অন্য কোন মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত থাকে তখন তাকে মাকবূল বলে গণ্য করা যাবে- যদি সেই সনদটি মাকবূল পর্যায়ের হয়।[৪]

এর ফলাফল প্রকাশ পাবে যখন সূত্রাধিক্যের দ্বারা কোন বিষয়কে প্রাধান্য

---

[১] বুখারী।

[২] যফরুল আমানী পৃ: ২২৫।

[৩] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৭০।

[৪] গ্রন্থকারের অভিমত।

দেওয়ার প্রশ্ন আসে তখন। অর্থাৎ মু'আল্লাক হাদীসটি তখন একটি পৃথক হাদীস হিসাবে গণ্য হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। অন্যথায় অন্য একটি মাকবূল সনদে হাদীসটি বর্ণিত থাকলে বিধান প্রবর্তনের জন্য তাই যথেষ্ট। মু'আল্লাক হাদীসকে মাকবূল গণ্য করার দ্বারা অতিরিক্ত কোন ফায়দা হয় না।[১]

সহীহাইনের মু'আল্লাক হাদীসের বিধান

যেসব গ্রন্থে সহীহ হাদীস বর্ণনা করার প্রত্যয় গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন বুখারী ও মুসলিম- সেসব গ্রন্থে উল্লিখিত মু'আল্লাক হাদীসের হুকুম কি হবে তা বর্ণনা সাপেক্ষ একটি বিষয়। বুখারী ও মুসলিমে যেসব মু'আল্লাক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা যদি গ্রন্থকার নিজেই অন্যত্র মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে তা নি:সন্দেহে সর্ব সম্মতভাবেই সহীহ বলে গণ্য হবে।[২]

তবে যদি গ্রন্থকার অন্যত্র উক্ত হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা না করে থাকেন (অথবা যদি অন্য কেউ উক্ত হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা না করে থাকেন) তাহলে দেখতে হবে যে, গ্রন্থকার কি ধরণের শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যদি দৃঢ়তাবোধক শব্দে যথা: قال، روى، ذكر، حكى ইত্যাদি শব্দে উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে তিনি যাথেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেই ব্যক্তি থেকে গ্রন্থকার পর্যন্ত সহীহ সনদে হাদীসটি পৌঁছেছে বলে ধরা হবে। গ্রন্থকার যাথেকে বর্ণনা করছেন তার পর থেকে সূত্রে যেসব ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকবে তাদের যাচাই-বাছাই করে হাদীসটির পর্যায় নির্ণয় করতে হবে। যদি সেসব ব্যক্তি গ্রন্থকারের শর্তানুরূপ হয় তাহলে হাদীসটি গ্রন্থে উল্লিখিত অন্যান্য হাদীসের সমপর্যায়ের সহীহ বলে গণ্য হবে। অন্যথায় হয়ত তার চেয়ে নিম্নমানের সহীহ, কিংবা হাসান কিংবা যয়ীফ বলে গণ্য হবে।

আর যদি গ্রন্থকার দৃঢ়তাবোধক শব্দে তা উল্লেখ না করে থাকেন। বরং দুর্বলতা জ্ঞাপক শব্দ যথা: قِيلَ، رُوِىَ، ذُكِرَ، حُكِيَ ইত্যাদি ধরণের শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে যাথেকে তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাথেকে সংকলক পর্যন্ত সহীহ সনদে হাদীসটি পৌঁছেছে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না।[৩] ইবনে হজর ফতহুল বারীর মুকাদ্দামায় উল্লেখ করেছেন যে,

ان ما جاء بصيغة التمريض عنه البخاري فيه ما هو صحيح وفيه ما هو حسن لغيره وفيه ما هو ضعيف- إلا أنه على وِفق العمل، وفيه ما هو ضعيف لا عاضد له-

---

১ গ্রন্থকার।

২ যফরুল আমানী পৃ: ১৩৪।

৩ যফরুল আমানী পৃ: ১৩৬-১৩৮ এর ভাবাবলম্বনে।

অর্থাৎ যেসব মু'আল্লাক হাদীস বুখারী দুর্বলতা জ্ঞাপক শব্দে উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোর মাঝে সহীহও রয়েছে, হাসান লি-গায়রিহিও রয়েছে, আবার এমন যয়ীফও রয়েছে যার উপর আমল করা হয়ে থাকে, আবার এমন যয়ীফও রয়েছে যাকে শক্তিশালী করার মত কোন সাপোর্ট নেই।[১]

২. মু'দাল (المعْضَلُ)

আভিধানিক অর্থ :

معضل শব্দটি عَضَلٌ মূলধাতু থেকে باب افعال-এর ইসমে মাফউলের সীগাহ। باب افعال থেকে এর অর্থ হয় কোন বিষয় কঠিন হওয়া, সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, ডাক্তার চিকিৎসা করতে অপারগ হওয়া, কাউকে ক্লান্ত করে ফেলা, চলতে অক্ষম হওয়া, কোন বস্তুর খারাবী মারাত্মক রূপ ধারণ করা। সুতরাং معضل শব্দের অর্থ হবে, মারত্মক ঝটিল বা যার খারাবী মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে, কিংবা যার চিকিৎসা করতে ডাক্তার অপারগ। যে হাদীসের সূত্র থেকে পরপর দুইজন বর্ণনাকারী বিচ্যুত হয়েছে, সেগুলোর দুর্বলতা এত মারাত্মক ধরণের যা নিরসন করতে হাদীস বিশারদগণ অপারগ। এ দৃষ্টিকোন থেকে এধরণের হাদীসকে معضل নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

هو الحديث الذي سقط من إسناده راويان فصاعدا على التوالي

যে হাদীসের সনদ থেকে দুইজন বা তার চেয়ে অধিক বর্ণনাকারী ধারাবাহিকভাবে বিচ্যুত হয়েছে তাকে মু'দাল বলা হয়।[২]

মু'দালের উদাহরণ

عن مالك أنه قال بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمنوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق.

ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে আমার নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, দাস-দাসীদের ন্যায়সঙ্গত আহার্য ও পোষাক লাভের অধিকার রয়েছে। তাদেরকে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, যা করার সাধ্য তাদের নেই।[৩]

---

[১] ফতহুল বারী -খ: ১, পৃ: ১৬।
[২] আদ-দুরারুস সামিনাহ পৃ: ৬৪ ও তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৭৫ শাব্দিক পরিবর্তনসহ।
[৩] মুআত্তা মালিক।

এ হাদীসটি এ কারণে মু'দাল যে, ইমাম মালিক দুইজনের মধ্যস্থতায় হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা থেকে আহরণ করেছেন। যদিও হাদীসটি মুআত্তায় معضل রূপে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে হাদীসটি মুসনাদরূপে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে-

عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رض

সুতরাং মুআত্তায় বর্ণিত হাদীসটিতে পরপর দুইজন বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে তা معضل বলে গণ্য হয়েছে।[১]

অনেক সময় বিচ্যুত বর্ণনাকারীদের স্থলে এমন ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে, যাদের পরস্পরের মাঝে দেখা সাক্ষাত হয়নি বা হাদীসের লেনদেন হয়নি। সুতরাং এই উল্লিখিত ব্যক্তিরা মূলত ভুলক্রমে সূত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। সনদে তাদের উল্লেখ করা না করারই শামিল। যেন বাস্তবে সূত্রে দু'জন রাবীর উল্লেখই করা হয়নি। বস্তুত হাদীসটি তখনও মু'দাল বলেই গণ্য হবে। যেমন ইমাম তিরমিযী একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন:

عن أحمد حدّثنا يزيد حدّثنا حجاج عن يحيى عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله ﷺ ليلة فخرجت فاذا هو بالبقيع الخ

ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসটি মু'দাল। কেননা হাজ্জাজ ইয়াহ্ইয়া থেকে হাদীস শ্রবণ করেনি। অনুরূপভাবে ইয়াহ্ইয়াও উরওয়া থেকে হাদীস শ্রবণ করেনি। অর্থাৎ হাদীসটি ইয়াযীদ যেন দুইজন বর্ণনাকারী উহ্য রেখে উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটি মু'দাল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কোন কোন সময় যেসব হাদীসের অর্থের ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতা পরিলক্ষিত হয়, সেসব হাদীসকেও (معضل) মু'দাল বলা হয়। তার সনদ থেকে কোন রাবী বিচ্যুত না হলেও। আল্লামা ইবনে হজর এরূপই উল্লেখ করেছেন।[২]

মু'দালের হুকুম

মু'দাল হাদীস সাধারণত যয়ীফ ও মারদূদ বলে গণ্য হয়।[৩] তবে যদি অন্যসূত্রে হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয় কিংবা যদি তার কোন শাহেদ ও মুতাবে' থাকে তাহলে তখন তা মাকবূল বলে গণ্য হবে।

---

১ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস।

২ যফরুল আমানী পৃ: ৩৫৬।

৩ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৭৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

যদি সনদের শুরুতে পরপর দুইজন রাবী বিচ্যুত হয় তাহলে সে হাদীসটি মু'দাল বলেও গণ্য হবে,আবার তা মু'আল্লাক বলেও গণ্য হবে। কেননা উভয় সংজ্ঞাই তখন এর উপর প্রযোজ্য হবে।[১]

মু'দাল হাদীস যেসব গ্রন্থে পাওয়া যাবে

১. كتاب السنن সাঈদ ইবনে মনসূরকৃত।
২. ابن ابي الدنيا -এর রচনাবলী।[২]

৩. মুনকাতে' (المنقطع)

আভিধানিক অর্থ :

منقطع শব্দটি قَطَعٌ মূলধাতু থেকে باب انفعال-এর ইসমে ফায়েলের সীগাহ। باب انفعال থেকে এর অর্থ হল বিচ্ছিন্ন হওয়া। সুতরাং মুনকাতে' -এর অর্থ হবে বিচ্ছিন্ন। এটি মূলত اتصال -এর বিপরীতার্থক।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

মুতাকাদ্দেমীনদের অনেকেই মুনকাতে' -এর সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে-

هو الحديث الذي لم يتصل إسناده على أيِّ وجه كان انقطاعه.

যে হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন তা যেভাবেই হোক তাকে মুনকাতে' বলা হয়।[৩] খতীব বাগদাদী ও ইবনে আব্দুল বার এমতেরই প্রবক্তা ছিলেন।

এই সংজ্ঞা অনুসারে মুরসাল, মুআল্লাক ও মু'দাল সবই মুনকাতে' -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। একারণে মুতাআখ্‌খেরীন ভিন্ন সংজ্ঞার দিকে গিয়েছেন। তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

هو الحديث الذي سقط من اسناده راوٍ أو راويان غير متواليين، ولم يكن من المرسل والمعلق والمعضل.

যে হাদীসের সনদ থেকে একজন কিংবা একাধিক বর্ণনাকারী বিচ্যুত হয়েছে তবে তা ধারাবাহিকভাবে পর পর নয়, এবং হাদীসটি যদি মুরসাল, মু'আল্লাক বা মু'দাল না হয় তাহলে তাকে منقطع বলা হয়।[৪]

---

১ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ৭৬ পৃষ্ঠার ভাবাবলম্বনে।
২ তাদরীব পৃ: ১৭৯।
৩ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৭৭।
৪ মুতাআখখেরীনদের প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞার সার অবলম্বনে -গ্রন্থকার।

অবশ্য এটি মু'তাআখ্খেরীনদের অভিমতের আলোকে প্রদত্ত সংজ্ঞা। মুতাকাদ্দেমীনদের অনেকের অভিমতও এরূপই ছিল। অবশ্য আল্লামা নববী উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ববর্তীরা সাধারণত তাবেয়ীর পরবর্তী যুগের কোন ব্যক্তি সরাসরি সাহাবী থেকে কোন রেওয়ায়াত বর্ণনা করলে সে ধরণের রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে منقطع শব্দটি ব্যবহার করতেন।[১]

যেমন তিরমিযী বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি:

عن أبي البختري عن علي قال لما نزلت : ولله على الناس حجُّ البيتِ الخ قالوا يا رسول الله أ في كلّ عام؟ فسكت – الحديث

কেননা আবুল বুখতারী হযরত আলী থেকে সরাসরি হাদীসটি শ্রবণ করেননি। অতএব তা মুনকাতে'।

অবশ্য আল্লামা ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন যে, বর্ণনা সূত্র থেকে একজন রাবী বিচ্যুত হলে হাদীস যেমন মুনকাতে' বলে গণ্য হয়, অনুরূপভাবে যদি সনদের কোথায়ও একজন মুবহাম বা নাম পরিচয়হীন কোন রাবীর উল্লেখ থাকে তাহলেও হাদীসটি মুনকাতে' বলে গণ্য হয়।[২]

মুনকাতে'-এর উদাহরণ

روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حزيفة مرفوعا– ان وليتموها ابا بكر فقويّ آمين –

সুফ্য়ান সওরী আবু ইসহাক থেকে সরাসরি হাদীসটি শ্রবণ করেননি। অতএব এ দুইজনের মধ্যে থেকে একজন বর্ণনাকারী বিচ্যুত হয়েছে।[৩]

মুনকাতে' -এর হুকুম

মুনকাতে' হাদীস সর্ব সম্মতভাবেই যয়ীফ। কেননা বিচ্যুত বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত কি না তা অজ্ঞাত। তবে শাহেদ ও মুতাবে' পাওয়া গেলে তা প্রমাণযোগ্য বলে গণ্য হয়। যেরূপ যয়ীফের সাধারণ বিধানে বর্ণিত হয়েছে।

---

[১] তাদরীব।

[২] ইখতিসারু উলূমিল হাদীস পৃ: ৫৩

[৩] উলূমুল হাদীস, সুবহী সালেহকৃত পৃ: ১৭০-১৭১।

৪. মুরসাল (المرسل)

আভিধানিক অর্থ :

مرسل শব্দটি باب افعال-এর ইসমে মাফউলের সীগাহ। ক্রিয়াধাতু الارسال। শব্দটি تقييد এর বিপরীত অর্থবোধক। تقييد-এর অর্থ হল বন্ধনে আবদ্ধ করা, আটক করা, সীমাবদ্ধ করা। সুতরাং ارسال-এর অর্থ হবে বন্ধন মুক্ত করা, ছেড়ে দেওয়া, বন্ধন শিথিল করা, উন্মুক্ত করে দেওয়া। আরবরা বলে থাকেন ' ناقة مرسلة-এর অর্থ হল ছাড়া উট অর্থাৎ যে উটকে রাখাল বিচরণ করে আহার করার জন্য ছেড়ে দিয়েছে, বেধে রাখেনি। অতএব মুরসালের অর্থ হবে বন্ধনহীন, সীমাবদ্ধতামুক্ত, উন্মুক্ত। যে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীর উল্লেখ করা হয় না সেগুলোকে এজন্য মুরসাল বলে নামকরণ করা হয়েছে যে, রাসূল সা. থেকে হাদীসটি বহনের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সাহাবীর সাথে বিষয়টি সীমাবদ্ধ করে উল্লেখ করা হয়নি। (নিশ্চয়ই কোন সাহাবী তা প্রথম ধারণ করেছেন তবে তা কে, তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি।) যেন বিষয়টিকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।[১]

কিংবা এও বলা যায় যে, ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় হাদীস বর্ণনার যে সীমাবদ্ধতা ছিল, তাবেয়ীর পরবর্তী পর্যায়ে যেন সেই সীমাবদ্ধতা থেকে হাদীসটিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেন সনদ বর্ণনার বিধি-বন্ধনকে শিথিল করে দেওয়া হয়েছে।[২]

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

ড. সুবহী আস-সালেহ মুরসালের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে,

هو الحديث الذي سقط منه الصحابي – كقول نافع قال رسول الله صـــ كذا أو فعــل كذا أو فُعِل بحضرته كذا –

যে হাদীসের সনদ থেকে সাহাবী বিচ্যুত হয়েছেন (তাকে মুরসাল বলে)। যেমন- নাফে' বললেন যে, রাসূল সা. এরূপ বলেছেন বা করেছেন কিংবা তার সম্মুখে এরূপ করা হয়েছে।[৩]

তবে মাহমূদ আত্-তাহহান মুরসালের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইবনে হজরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে- هو الحديث الذي سقط من آخر اسناده مَن بعد التابعي

---

১ উলূমুল হাদীস পৃ: ১৬৮।

২ গ্রন্থকার।

৩ উলূমুল হাদীস পৃ: ১৬৮।

যে হাদীসের সনদের শেষপ্রান্তে তাবেয়ীর পরবর্তী ব্যক্তি বিচ্যুত হয়েছেন তাকে মুরসাল বলা হয়।[১]
পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞার চেয়ে পরবর্তী সংজ্ঞাটি অধিক প্রজ্ঞা প্রসূত। যা পরবর্তী পর্যালোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা তাবেয়ীর পরবর্তী বিচ্যুত ব্যক্তিটি সাহাবী না হয়ে তাবেয়ীও হতে পারেন। অবশ্য খতীব বাগদাদী তার কিফায়াহ নামক গ্রন্থে মুরসালের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছেন-

المرسل ما انقطع إسناده بان يكون في رُواته من لم يسمعه ممَّن فوقه–

মুরসাল বলা হয় এমন হাদীসকে যার সনদ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তার সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছে যিনি তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী -যার উল্লেখ তিনি করেছেন - তাথেকে হাদীসটি সরাসরি শ্রবণ করেননি।[২] (বরং অন্যের মধ্যস্থতায় আহরণ করেছেন)। এ সংজ্ঞা অনুসারে মু'আল্লাক, মু'দাল, মুনকাতে' সবই মুরসালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।
আল্লামা নববী শরহে মুসলিমে উল্লেখ করেছেন, মুরসালের এই সংজ্ঞাটিকে ফিকাহবিদ ও উসূলবিদগণ এবং খতীব বাগদাদীসহ একশ্রেণীর মুহাদ্দিস অবলম্বন করেছেন।[৩] منقطع বা বিচ্ছিন্ন সনদের উপর মুরসাল শব্দটির ব্যবহার আরো যারা করেছেন তাদের মাঝে আবু যুর'আহ, আবু হাতেম, দারাকুতনী ও বায়হাকীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আবু নু'আয়েম মু'আল্লাক হাদীসের উপরও মুরসাল শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।[৪]
বস্তুত এটি ফিকাহবিদদের দেওয়া মুরসালের সংজ্ঞা - যা মুহাদ্দেসীনের সংজ্ঞা থেকে একটু ভিন্নতর। আল্লামা সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন যে–

المحدثون خصّوا إسم المرسل بالأوّل (أي اذا انقطع بعد التابعيّ) دون غـيره والفقهـاء والأصوليُّون عمّموا

মুহাদ্দিসগণ প্রথমোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা যে ধরণের হাদীসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে- (অর্থাৎ তাবেয়ীর পরবর্তী বর্ণনাকারী বিচ্যুত হওয়া) সে ধরণের হাদীসকেই মুরসাল বলে গণ্য করেন। তবে ফিকাহবিদ ও উসূলবিদগণ বিষয়টি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন অর্থাৎ যে কোন ধরণের ইনকিতা'কেই তারা মুরসাল মনে করেন।[৫]

---

১ নুযহাতুন-নযর-পৃঃ ৪৩, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস-পৃঃ ৭১।
২ কিফায়াহ -পৃঃ ৫৪৬।
৩ শরহে নববী -খঃ ১ পৃঃ ৩০।
৪ যফরুল আমানী পৃঃ ৩৪১।
৫ তাদরীব- পৃঃ ১৫৯।

মুহাদ্দিসগণের নিকট মুরসালের যে সংজ্ঞাটি সর্বাধিক গ্রহণীয় ও সুবিধিত তা নিম্নরূপ- المرسل هو مرفوع التابعي صغيراً كان أو كبيراً
কোন তাবেয়ী তিনি বয়স্ক হউন বা কমবয়সী হউন, যদি তিনি কোন হাদীস সরাসরি রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেন তাহলে তাকে মুরসাল বলা হবে।[১]
হাকেম আবু আব্দুল্লাহ ও ইবনে আব্দিল বার'সহ অনেক ফিকাহবিদ ও উসূলবিদ এ সংজ্ঞাটির কথা উল্লেখ করেছেন।[২] এ সংজ্ঞা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাবেয়ী বয়স্ক হোক কিংবা কমবয়সী হোক সকল তাবেয়ীর قال رسول الله বলে বর্ণিত হাদীস মুরসাল বলে গণ্য হবে।
সংজ্ঞায় তাবেয়ীর কথা উল্লেখ করা দ্বারা একথাও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাবেয়ীর পরবর্তী কোন ব্যক্তি (অর্থাৎ কোন তাব্য়ে তাবেয়ী বা তৎপরবর্তী কোন ব্যক্তি যদি قال رسول الله বলে কোন হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে তা মুরসালের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ইরসালে সাহাবী

থেকে যায় কোন সাহাবী যদি অন্য কোন সাহাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করার পর উক্ত সাহাবীকে উল্লেখ না করে সরাসরি قال رسول الله বলে হাদীসটি বর্ণনা করেন, তাহলে তা মুরসাল বলে গণ্য হবে কি না? নির্ভরযোগ্য মতানুসারে এধরণের হাদীসও মুরসাল বলে গণ্য হবে। তবে তা সাধারণত مرسل الصحابي বলেই উল্লেখ করা হয়। এ ধরণের ইরসাল অল্পবয়স্ক সাহাবী- যেমন ইবনে আব্বাস, ইবনুয্ যুবায়র, উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী, মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর প্রমুখ বর্ণিত হাদীসগুলোতেই সাধারণত হয়ে থাকে। অবশ্য বয়স্ক সাহাবীও অন্য আরেকজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করতে পারেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা রা. যখন রাসূল সা. থেকে من اصبح جنبا فلا صوم له এই হাদীসটি বর্ণনা করলেন, আর এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হল, তখন তিনি বললেন أخبرني به فضل بن عباس ফযল ইবনে আব্বাস আমাকে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে।[৩]

তাবয়ে তাবেয়ীনদের ইরসাল

অবশ্য অনেকেই তাব্য়ে তাবেয়ীনদের قال رسول الله বলে বর্ণিত হাদীসকেও মুরসালের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন ইবনুল হাম্বলী কাফউল আসারে উল্লেখ করেছেন যে-

---

১ তামহীদ-খ: ১ পৃ: ২।
২ যফরুল আমানী-পৃ: ৩৪৫।
৩ বুখারী।

والمختار في التفصيل يقبل مرسل الصحابي اجماعا ومرسل أهل القرن الثاني والثالث عندنا (أي الحنفية) وعند مالك مطلقا –

গ্রহণযোগ্য মতটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। সাহাবীদের মুরসাল হাদীস সর্বসম্মতভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত মুরসাল হাদীস আমাদের (অর্থাৎ হানাফীদের) নিকট ও ইমাম মালিক রহ.-এর নিকট সাধারণ ভাবেই গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়।[১]

قرن ثاني দ্বারা তাবেয়ীনদের যুগকে বুঝানো হয়েছে, আর قرن ثالث দ্বারা তাব্য়ে তাবেয়ীনদের যুগকে বুঝানো হয়েছে।[২]

আর এই তিন যুগের মুরসাল গ্রহণীয় হওয়ার পিছনে যুক্তি দেখানো হয় যে, এই তিন যুগ উত্তম হওয়ার ঘোষণা স্বয়ং রাসূল সা. নিম্নের হাদীসে দিয়েছেন -

خير امتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. –البخارى

সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, তারপর তৎপরবর্তী যুগ, তারপর তৎপরবর্তী যুগ।-বুখারী

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী উল্লেখ করেছেন যে,-

واما أهل القرون الثلاثة فمرسلهم مقبول عندنا مطلقًا

এই তিন যুগের অর্থাৎ সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাব্য়ে তাবেয়ীনদের যুগের লোকদের বর্ণিত মুরসাল হাদীস আমাদের নিকট সাধারণভাবেই গ্রহণযোগ্য।[৩]

এথেকে বুঝা যায় যে, তাব্য়ে তাবেয়ীনদের قال رسول الله বলে বর্ণিত হাদীসগুলোও মুরসাল বলে গণ্য হয়।

অবশ্য আব্দুল হাই লাখনোভী রহ. তাব্য়ে তাবেয়ীনদের قال رسول الله বলে বর্ণিত হাদীসকে মুরসাল বলে গণ্য করেননি বরং তিনি এগুলোকে معضل এর অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

আল্লামা সুয়ূতী তাদরীবুর রাবীতে উল্লেখ করেছেন যে -

ان اكثر ما يوصف بالارسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبيّ صـــ

---

[১] কাফউল আসার।

[২] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস-পৃ: ১৩৮ টিকা দ্রষ্টব্য।

[৩] কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস -পৃ: ১৩৯।

[৪] যফরুল আমানী-৩৪৬।

বস্তুতঃ তাবেয়ীনরা সরাসরি রাসূল সা. থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় সেগুলোকেই মুরসাল বলা হয়।[১]

সংক্ষেপ কথা এই যে, যদি মুরসালকে তাবেয়ীনদের বর্ণনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে সংজ্ঞার আলোকে তা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যথা :

১. مرسل الصحابي সাহাবীদের মুরসাল। ২. مرسل التابعي তাবেয়ীনদের মুরসাল।

সাহাবীদের মুরসালকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. সাহাবী কোন সাহাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করত: উক্ত সাহাবীকে উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূল সা. থেকে হাদীসটি বর্ণনা করবেন।

২. সাহাবী কোন তাবেয়ী থেকে হাদীস শ্রবণ করবেন, অতপরঃ উক্ত তাবেয়ী এবং তিনি যে সাহাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এ দুইজনকে উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূল সা. থেকে হাদীসটি বর্ণনা করবেন।

তাবেয়ীনদের মুরসালও দুই ভাগে বিভক্ত হতে পারে। যথা :

১. তাবেয়ী কোন সাহাবী থেকে হাদীস আহরণ করবেন, অতপর সেই সাহাবীকে উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূল সা.-এর দিকে নিসবত় করে তা বর্ণনা করবেন।

২. কিংবা তাবেয়ী অন্য আরেকজন তাবেয়ী থেকে হাদীস আহরণ করবেন, অতপর উক্ত তাবেয়ী এবং তিনি যে সাহাবী থেকে হাদীস আহরণ করেছেন এই দুইজনকে উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূল সা.-এর দিকে নিসবত করে হাদীসটি বর্ণনা করবেন।

মুখদারিম (مخضرم) -দের বর্ণিত হাদীস মুরসাল বলে গণ্য হবে

যে সকল ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূল সা. থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করে ছিলেন, রাসূল সা.-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য তাদের হয়নি, কিন্তু রাসূলের ইন্তিকালের পর তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এদেরকে মুখদারিম বলা হয়। যেমন আবু উসমান নাহদী, কায়স ইবনে আবি হাযেম প্রমুখ। ইমাম মুসলিম এধরণের বিশ জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[২] তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূল সা. থেকে সরাসরি যেসব হাদীস শ্রবণ করেছিলেন সেগুলোও মুরসাল বলে গণ্য হবে।

---

[১] ...দরীব -পৃ: ১৫৯।

[২] ...রাহে নুখবার টিকা দ্রষ্টব্য।

মুরসালের উদাহরণ

قال الإمام مسلم ح حدثني محمد بن رافع حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صـــ نهي عن المزابنة –

ইমাম মুসলিম, মুহাম্মদ ইব্‌নে রাফে'- লাইস - ওকায়ল - ইবনে শিহাব -এর সূত্রে সঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সা. মুযাবানা[১] প্রক্রিয়ার বেচাকেনা থেকে নিষেধ করেছেন।[২]

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (জন্ম: ১৫হি: মৃত্যু: ৯৪ হি:) একজন বয়ষ্ক তাবেয়ী। তিনি সরাসরি নবী কারীম সা. থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সাঈদ ও নবী সা.-এর মাঝে নিশ্চয়ই একজন সাহাবী রয়েছেন। কিংবা একজন তাবেয়ী ও একজন সাহাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং হাদীসটি মুরসাল।[৩]

মুরসালের হুকুম

মুরসালের হুকুম এবং তাদ্বারা প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে মুহাদ্দেসীন, ফুকাহায়ে কিরাম ও উসূলবিদগণের মাঝে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। মুরসাল হাদীস যদিও বিচ্ছিন্ন, কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা অন্যান্য বিচ্ছিন্নতা থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা মুরসাল সনদে বিচ্যুত ব্যক্তিটি সাধারণত সাহাবী হয়ে থাকেন। যেহেতু সাহাবীগণ সকলেই (عدول) বা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত। সুতরাং তাদের বিচ্যুতির ফলে রাবীর পরিচয় হীনতার কারণে সনদে দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার যে আশংকা ছিল, তা আর থাকেনা।[৪] কিন্তু হাদীস প্রমাণযোগ্য হওয়ার জন্য সনদ অবিচ্ছিন্ন থাকার যে শর্ত রয়েছে তা বিদ্যমান নেই। এ কারণে মুরসাল হুজ্জত হবে কি হবে না, এব্যাপারে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্নজন বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টিকে বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১. মুরসালে সাহাবীর হুকুম : মুরসাল যদি মুরসালে সাহাবী হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে জমহুর ফুকাহা মুহাদ্দীসীন একমত। এমনকি যারা মুরসালকে যয়ীফ বলে মনে করেন এবং তা প্রমাণযোগ্য হওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত-শারায়েত আরোপ করেন, তারাও মুরসালে সাহাবীকে

---

[১] **মুযাবানা:** বৃক্ষে বিদ্যমান কাঁচা ফলের সঙ্গে ভূমিতে বিদ্যমান কর্তিত ফলের বিনিময় করাকে মুযাবানা বলা হয়।

[২] মুসলিম -খ: ২ কিতাবুল বুয়ূ'।

[৩] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস-পৃ: ৭১-৭২।

[৪] তাইসীর-পৃ: ৭১।

নি:শর্তভাবে গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য মনে করেন। কেননা সাহাবী যদি একজন সাহাবীকে উল্লেখ নাও করে থাকেন তাহলেও সাহাবী ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে সনদে কোন দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া তাবেয়ীন থেকে সাহাবীদের হাদীস বর্ণনার বিষয়টি খুবই বিরল। যদি কোন তাবেয়ী থেকে তাঁরা কোন হাদীস বর্ণনা করেও থাকেন তাহলে তা তাঁরা উল্লেখ করে দেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাঁরা তাবেয়ী থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা ইসরাঈলী বর্ণনা, কিস্‌সা কাহিনী কিংবা কোন তাবেয়ীর বক্তব্য। তা কোন মরফূ হাদীস নয়।[১] সাহাবীরা তাবেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন এধরণের মরফূ হাদীসের সংখ্যা ৭-৯টি।[২]

২. মুরসালে তাবেয়ীর হুকুম : বস্তুত মুরসালের হুকুমের ক্ষেত্রে যে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তা মূলত মুরসালে তাবেয়ীর ক্ষেত্রে। মুরসালে তাবেয়ী প্রমাণযোগ্য কিনা এব্যাপারে যে মতামতগুলো পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. حجة مطلقا সাধারণভাবেই প্রমাণযোগ্য।

২. لا يحتج به مطلقا সাধারণভাবেই প্রমাণযোগ্য নয়।

৩. يحتج به إن ارسله أهل القرون الثلاثة তিন যুগ অর্থাৎ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাব্‌য়ে তাবেয়ীনদের মুরসাল প্রমাণযোগ্য।

৪. يحتج به إن لم يرو الا عن عدول যদি মুরসিল (যিনি ইরসাল করেন) কেবল মাত্র ন্যায়পরায়ণ ও বিশস্ত ব্যক্তিদের থেকেই ইরসাল করেন বলে জানা যায়, তাহলে এধরণের ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত মুরসাল রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে।

৫. يحتج به إن أرسله سعيد فقط শুধুমাত্র সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব কর্তৃক বর্ণিত মুরসাল দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে।

৬. يحتج به ان اعتضد যদি তার সমর্থনে অন্য রিওয়ায়াত বিদ্যমান থাকে তাহলে প্রমাণ পেশ করা যাবে।

৭. يحتج بمراسيل كبار التابعين বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেয়ীনদের মুরসাল দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে।

৮. يحتج ان لم يكن في الباب سواه সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে অন্যকোন হাদীস না থাকলে তখন মুরসাল রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে।

---

১. তাদরীব ১৬৯ পৃষ্ঠার ভাবাবলম্বনে।

২. ফাতহুল মুলহিম খ:১।

৯. وهو اقوي من المسند মুরসাল মুসনাদের চেয়েও শক্তিশালী।

১০. يحتج به ندبا لا وجوبا কোন বিষয়কে মুস্তাহাব বলে প্রমাণ করার জন্য মুরসালকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে। তবে ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়।[১]

এই মতামতগুলোকে সংক্ষেপে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. মুরসাল হাদীস যয়ীফ এবং বর্জনীয়

এটি মূলত মুহাদ্দেসীন ও বেশ কিছু ফিকাহবিদ ও উসূলবিদের অভিমত। যাদের মাঝে ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইবনুল মাহদী, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। তাঁদের যুক্তি হল হাদীস মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার অন্যতম শর্ত হল সনদ অবিচ্ছিন্ন হওয়া। আর সেটাই মুরসালে বিদ্যমান নেই। তাছাড়া বিচ্যুত ব্যক্তির অবস্থা অজ্ঞাত। আর সেই বিচ্যুত ব্যক্তিটি সাহাবী ছাড়া অন্য কেউ হওয়ার আশংকা রয়েছে। এমতাবস্থায় তা কি করে হুজ্জত হতে পারে?

২. মুরসাল হাদীস মাকবূল এবং প্রমাণযোগ্য

এটি ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ রাহ. -এর মশহুর অভিমত। মুহাদ্দিসগণের একদলও এমতের প্রবক্তা।

আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদী রহ. বলেছেন যে, মুরসালকে মাকবূল হিসাবে গ্রহণের পক্ষে দু'টি দলীল রয়েছে। এর একটি হল ইজমা, অপরটি হল যুক্তি।[২] মুরসালকে যারা হুজ্জত বলে মনে করেন, তাদের একটি অন্যতম যুক্তি হল এই যে, একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী একটি রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আশ্বস্ত ও নিশ্চিত না হয়ে 'রাসূল সা. বলেছেন' একথা বলতে পারেন না।[৩] তাছাড়া হাদীসে মকতূ'- যা মূলত তাবেয়ীনদের মতামত ও ফতওয়া- তা হানাফীগণের নিকট এবং কোন কোন শাফেয়ী, হাম্বলী ইমামের নিকটও হুজ্জত বলে গণ্য হয়। অতএব তারা যদি রাসূল সা.-এর দিকে নিসবত করে কোন কথা বলেন, তাহলে তা হুজ্জত হবে না কেন? ইবনুল কাইয়্যিম উল্লেখ করেছেন যে, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও তৎপরবর্তী কালের মনীষীদের কিতাবাদী নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে দেখা যাবে যে, তারা তাবেয়ীনদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা বিস্তর ক্ষেত্রে প্রমাণ পেশ করেছেন। অতএব তাবেয়ীনদের মুরসাল অবশ্যই হুজ্জত হবে। কেননা এটা সাধারণ যুক্তির দাবী যে, তাদের নিজের কথা হুজ্জত হলে, তারা রাসূল সা. থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাও হুজ্জত হবে।

---

[১] তাদরীব-পৃ: ১৬৫ ও যফরুল আমানী -পৃ: ৩৫২।

[২] কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস পৃ: ৭৬-৮৭ দ্রষ্টব্য।

[৩] তাইসীর পৃ: ৭৩।

আল্লামা কাউসারী মন্তব্য করেছেন যে, من رد المرسل فقد رد شطرالسنة অর্থাৎ যারা মুরসালকে বর্জনীয় বলে মনে করেন বস্তুত তারা সুন্নার এক বিরাট অংশকে বর্জন করেন।(১)

বস্তুতঃ দুইশত হিজরীর পূর্ব পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনদের মাঝে যারা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাদের সকলেই মুরসাল রিওয়ায়াতকে হুজ্জত ও প্রমাণযোগ্য মনে করতেন। এসম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম আবু দাউদ তাঁর الرسالة إلى أهل مكة নামক পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন -

واما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثورى ومالك والاوزاعى حتى جاء الشافعى فتكلم فيه –

মুরসাল রিওয়ায়াতসমূহের দ্বারা অতীতের সকল আলেম উলামাই যেমন- সুফয়ান সাওরী, মালিক, 'আওযায়ী প্রমুখ মনীষীরা প্রমাণ পেশ করতেন। পরে ইমাম শাফেয়ী এসে এব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।(২)

অনুরূপভাবে ইবনে জারীর তাবারী উল্লেখ করেছেন যে-

لم يزل الناس على العمل بالمرسل وقبوله حتى حدث بعد المأتين القول بردّه –

লোকেরা মুরসালকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে আমল করে যাচ্ছিল। পরে দুইশত হিজরীর পর মুরসালকে বর্জন করার মতামত গড়ে উঠেছে।(৩)

ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন, মুরসালকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের অভিমত ছিল, ইমাম গাজালী বলেছেন যে এটা জমহুরের অভিমত।

ইবনে জারীর তাবারী ও ইবনে হাজেব দাবী করেছেন যে, মুরসালকে মাকবূল হিসাবে গ্রহণ করা এবং তাদ্বারা প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে তাবেয়ীনদের ইজমা রয়েছে।(৪)

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী রহ. বলেছেন যে, ইজমার কথা না বলে জমহুর তাবেয়ীনের ঐকমত্য রয়েছে বলা উচিত। কেননা সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, ইবনে সীরিন এবং ইমাম যুহরীর ন্যায় ব্যক্তিরা মুরসালকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন না।(৫)

---

১ তা'লীক আলা শুরুতিল আইম্মাতিল খামসাহ হাযেমীকৃত পৃঃ ৫২।

২ আর-রিসালাহ ইলা আহলে মক্কা পৃঃ ৫।

৩ আহকামুল মারাসিল লিল 'আল্লায়ী- দুরারুস-সামিনার সৌজন্যে।

৪ যফরুল আমানী পৃঃ ৩৫১।

৫ যফরুল আমানী পৃঃ ৩৫১।

বস্তুতঃ হানাফীরাও মুরসালে তাবেয়ীকে একেবারে নিঃশর্তভাবে হুজ্জত মনে করেন না। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী দাবী করেছেন যে, হানাফী মাজহাবের মুহাক্কিক ব্যক্তিরা মুরসাল গ্রহযোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো আরোপ করেন। যথা:

১. যিনি ইরসাল করবেন তাকে তিন যুগের কোন এক যুগের ব্যক্তি হতে হবে, যে তিন যুগ সম্পর্কে কল্যাণের যুগ হওয়ার সাক্ষ্য নবী সা. দিয়ে গেছেন।
২. যিনি ইরসাল করবেন তার নিজেকেও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৩. অন্তত তাকে এমন হতে হবে যে, এব্যাপারে সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করে কেবল মাত্র এমন ব্যক্তি থেকেই তিনি ইরসাল করেন (অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকেই উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন) যিনি বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য। যদি তিনি এই সতর্কতা অবলম্বন না করেন তাহলে তার বর্ণিত মুরসাল রিওয়ায়াত সর্বসম্মতভাবেই বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।[১]

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, যারা মুরসালকে শর্তহীনভাবেই মাক্‌বূল বা গ্রহণযোগ্য মনে করেন তারা অনাকাংখিত শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করেছেন। অনুরূপভাবে যারা বলেন যে, মুরসাল মুসনাদের চেয়েও শক্তিশালী তারাও অনাকাংখিত বাড়াবাড়ি করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করেছেন।[২]

আল্লামা ইবনে হুমামও আত্-তাহরীরে উল্লেখ করেছেন, যারা মুরসালকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন, তারাও কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. মুরসিল বা যিনি ইরসাল করবেন তাকে বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে, যিনি ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন না।
২. হাদীস বর্ণনার বিষয়ে তাকে ইমাম পর্যায়ের ব্যক্তি হতে হবে। বর্ণনাকারী সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন, যা শুনেন তাই বর্ণনা করেন না (বরং যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেন) এমন পর্যায়ের ব্যক্তি হতে হবে।
৩. রাবীদের জরাহ ও তা'দীল বা সমালোচনার যোগ্যতা তার মাঝে এমন পর্যায়ে থাকতে হবে যে, রাবীদের ব্যাপারে সমকালীন প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মতামত তার কাছে অজ্ঞাত থাকবে না। আর যে বর্ণনাকারীকে তিনি উহ্য

---

[১] যফরুল আমানী পৃ: ৩৫১।

[২] যফরুল আমানী পৃ: ৩৫১।

রাখবেন তার সম্পর্কে জারেহীনদের (অর্থাৎ রাবীদের বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য রাখেন এমন ব্যক্তিদের) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি সে সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।

৪. হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে দৃঢ়তাবোধক শব্দে রাসূল সা.-এর দিকে নিসবত করতে হবে। (যেমন: حدث–قال ইত্যাদি শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করতে হবে)।

৩. কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে মুরসাল গ্রহণযোগ্য

ইমাম শাফেয়ী রাহ.-সহ অনেকেই এমতের প্রবক্তা। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকট মুরসাল হুজ্জত বা প্রমাণযোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকতে হবে। যথা:

১. যিনি ইরসাল করবেন তাকে অবশ্যই বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেয়ী হতে হবে। (যদিও ইমাম শাফেয়ী রহ. বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেয়ী হওয়ার শর্ত লাগিয়েছেন, কিন্তু তার অনুসারীরা মনে করেন যে, তাবেয়ী হলেই চলবে, বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। যদি অন্যান্য শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকে)।

২. যিনি ইরসাল করবেন তাকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যিনি সবসময় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকেই হাদীস বর্ণনা করে থাকেন এবং তার রিওয়ায়াতে কোন ধরণের গড়বড় হয় না। আর যদি তিনি কখনো বিচ্যুত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন, তাহলে দেখা যায় যে, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নামই উল্লেখ করেছেন।

৩. যদি কোন হাফেযে হাদীস এই রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেন, তাহলে দেখা যায় যে, হুবহু তারই অনুরূপ বর্ণনা করছেন। (দুই একটি শব্দের ব্যতিক্রম হলেও অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না।)

৪. এই মুরসাল হাদীসটি নিম্নোক্ত পন্থাসমূহের কোন এক পন্থায় সমর্থনপুষ্ট হতে হবে। যথা:

ক. অন্য আরেকটি সূত্রে যদি হাদীসটি বর্ণিত থাকে, সেই সূত্রটি সহীহ, হাসান, যয়ীফ কিংবা মুরসালও হতে পারে। তবে মুরসাল হলে তিনি যাথেকে ইরসাল করেছেন তাথেকে না হতে হবে।

খ. যদি কোন সাহাবীর বক্তব্য এই মুরসাল হাদীসের অনুকূলে বিদ্যমান পাওয়া যায়।

গ. যদি অধিকাংশ আলেম-উলামা এই হাদীসের অনুকূলে ফত্ওয়া প্রদান করে থাকেন।

উপরোক্ত শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকলে মুরসাল হাদীস হুজ্জত বা প্রমাণযোগ্য বলে গণ্য হবে।[১]

---

[১] যফরুল আমানী পৃ: ৩৪৭-৩৪৮।

ইবনে রজব হাম্বলী নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে মুরসালকে হুজ্জত মনে করেন :

১. যদি মুরসাল হাদীসটি অন্য একটি হাদীস দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হয়।

২. যদি অন্য আরেকটি মুরসাল হাদীস দ্বারাও সমর্থনপুষ্ট হয়; তবে তা ভিন্নসূত্রে বর্ণিত হতে হবে। কেননা তাহলে একাধিক উৎসমূল থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে তা প্রমাণিত হবে।

৩. যদি মুরসাল হাদীসটি কোন সাহাবীর বক্তব্যের অনুকূল হয়।

৪. যদি অধিকাংশ আহলে ইলম ও জ্ঞানীজনরা এই হাদীসটিকে গ্রহণ করে থাকেন।[১]

আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ বলেন :

বস্তুতঃ এক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতামত এই যে, কিছু মুরসাল বর্জনীয়। আর কিছু মুরসাল স্বাভাবিকভাবে গ্রহণীয়, আর কিছু মুরসাল মওকূফ। অর্থাৎ হাদীসটি যদি এমন হয় যে, তা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহলে তা বর্জনীয়। আর যিনি ইরসাল করেছেন তিনি যদি এমন ব্যক্তি হন যে, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি থেকে ইরসাল করেন না, তাহলে তৎকর্তৃক বর্ণিত মুরসাল হাদীস গ্রহণীয় বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তিনি যদি এমন ব্যক্তি হন, যিনি নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য নির্বিশেষে সবধরণের ব্যক্তি থেকেই ইরসাল করেন, অর্থাৎ তিনি যাথেকে ইরসাল করেন তার অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না, তাহলে এধরণের ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত মুরসাল হাদীস মওকূফ বলে গণ্য হবে, অর্থাৎ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর আমল স্থগিত বলে গণ্য হবে।[২]

এই আলোচনার সারসংক্ষেপ এই যে, মুরসাল হাদীস হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃত মতামত মূলত দু'টি। যথা :

১. মুরসাল কোন অবস্থাতেই প্রমাণযোগ্য নয়। যেমনঃ মুহাদ্দিসগণের অনেকেই মুরসালকে হুজ্জত মনে করেন না।

২. শর্তসাপেক্ষে মুরসাল প্রমাণযোগ্য। যা মূলত হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীদেরসহ অধিকাংশ ফিকাহবিদদের মতামত।

সে ভিন্ন কথা যে, সকলের শর্ত এক ধরণের নয়। হানাফীগণ কতিপয় শর্তসাপেক্ষে মুরসালকে প্রমাণযোগ্য মনে করেন, শাফেয়ীরা অন্য কতিপয় শর্তসাপেক্ষে মুরসালকে হুজ্জত মনে করেন। হাম্বলীরা অন্য কতিপয়

---

[১] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ: ১৪৩।

[২] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ: ১৪২।

শর্তসাপেক্ষে মুরসালকে হুজ্জত মনে করেন। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শর্তগুলোর মাঝে মৌলিকত্বের বিচারে খুব একটা পার্থক্য নেই।

মুহাদ্দেসীন ও ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মুরসাল হুজ্জত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে যে মতভিন্নতা, গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, তাও মূলত বিপরীতমুখী কোন সিদ্ধান্ত নয়। বরং মুহাদ্দিসগণ সনদের প্রেক্ষিতে বিষয়টি বিচার করেছেন। আর মুরসালের সনদ যেহেতু বিচ্ছিন্ন, তাই তারা তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। আর ফুকাহায়ে কিরাম যেহেতু মূল বক্তব্যের আলোকে বিধান প্রবর্তন করেন, তাই তারা দেখেছেন যে, মুরসালের সনদ বিচ্ছিন্ন হলেও যদি তা রাসূল সা.-এর বক্তব্য হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যয় জন্মায়, তাহলে তাদ্বারা বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে। তাই তারা এমন শর্ত আরোপ করেছেন, যে শর্তগুলো পাওয়া গেলে সনদ বিচ্ছিন্ন হলেও বক্তব্যটি রাসূল সা.-এর বক্তব্য হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যয় জন্মায়। তাই তারা সে সব শর্ত বিদ্যমান থাকার শর্তে মুরসালকে হুজ্জত বা প্রমাণযোগ্য বলে মনে করেছেন।[১] হযরত মাও. নেয়ামতুল্লাহ 'আজমী উস্তাদ দারুল উলূম দেওবন্দ' তিনিও এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন বলে তার শাগরিদগণ উল্লেখ করেছেন।[২]

মুরসাল গ্রহণযোগ্য হলে তা কি মুসনাদের সমমর্যাদা পাবে?

কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস গ্রন্থে আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রহ. উল্লেখ করেছেন যে -

المرسل دون المتصل عندنا، بخلاف ما قال بعضهم، من اسند فقد احالك ، ومن ارسل فقد تكلف لك-

আমাদের কাছে মুরসাল হাদীস মুত্তাসিল হাদীসের চেয়ে নিম্নমানের। অবশ্য অনেকেই এর বিপরীত মতামত পোষণ করেন এবং বলে থাকেন যে, 'যিনি সনদসহ হাদীস বর্ণনা করলেন, তিনি সনদের যাচাই-বাছাইয়ের দায়িত্ব পাঠকের উপর ন্য স্ত করলেন। আর যিনি ইরসাল করে হাদীস বর্ণনা করলেন তিনি সনদ যাচাই-বাছাই করার দায়িত্ব নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিলেন।[৩]

ইবনুল হাম্বলী উল্লেখ করেছেন যে -

ان كانت فيه صفات الصحيح كلها بلا خلاف فهو مقدم على ما هى فيه الخلاف في وجود بعضها أو مع الخلاف في كونه شرطا للصحة بعد الاتفاق على عدمه نحو الاتصال بالنسبة إلى من يصحح مرسل أهل قرون الثلاثة وهم اصحابنا الحنفية –

---

১ ইবনে রজব হাম্বলী, কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ: ১৪৩ এর সৌজন্যে।

২ আদ-দুরারুস সামিনাহ পৃ: ৬১ দ্রষ্টব্য।

৩ কাওয়ায়েদ ফী উলূমুল হাদীস পৃ: ১৪৭।

যদি হাদীসের সনদে সহীর শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে এবং এব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত না থাকে, তাহলে তা ঐসকল হাদীসের তুলনায় অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে যেগুলোর মাঝে সহীর যাবতীয় শর্তাবলী বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কিংবা ঐসব হাদীসের তুলনায়ও অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে যেগুলোতে সহীর কোন একটি শর্ত নিশ্চিতভাবেই বিদ্যমান নেই; তবে ঐ শর্তটি হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য অপরিহার্য কি না, এ বিষয়ে মনীষীদের মতভিন্নতা রয়েছে। যেমন ইত্তিসাল বা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীস মুরসালের তুলনায় অগ্রগণ্য হবে, যারা মুরসালকে সহীহ বলে মনে করেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেও। বস্তুতঃ আমাদের হানাফী মাজহাবের অনুসারীরাই কুরুনে সালাসাহ বা সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীনদের ইরসালকে হাদীস সহীহ্ হওয়ার পথে অন্ত রায় মনে করেন না।[১]

সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুরসাল গ্রহণযোগ্য হলেও মুত্তাসিল হাদীসের সমমর্যাদা লাভ করবে না।

এ থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত কোন হাদীসের সাথে কোন মুরসাল হাদীসের যদি বৈপরীত্য দেখা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হাদীস প্রাধান্য পাবে। তবে যদি মুরসাল হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী কর্তৃক আরোপিত পূর্বোক্ত পন্থাসমূহের কোন এক পন্থায় সমর্থনপুষ্ট হয়, কিংবা কিয়াসের অনুকূল হয়, তাহলে তা মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হাদীসের সমমান লাভ করবে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে।[২]

তাদরীবুর রাবীতে আল্লামা সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন যে, মুরসাল যদি অন্য একটি হাদীস দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হয়, সে হাদীসটির সনদ মুসনাদ হোক কিংবা অন্য আরেকটি এমন মুরসালও হয়- যা পূর্বোক্ত মুরসাল হাদীসটি যাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে তাদের ছাড়া অন্যকোন ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তাহলে তখন মুরসাল হাদীসটি সহীহ বলে পরিগণিত হয়।

এ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই মুরসাল সূত্রটি এবং যা দ্বারা এটি সমর্থনপুষ্ট হয়েছে এই দু'টিই সহীহ বলে গণ্য হবে। সুতরাং যদি একটিমাত্র সূত্রে বর্ণিত কোন সহীহ হাদীসের সাথে এই দু'টি হাদীসের বৈপরীত্য দেখা দেয়, আর এই বৈপরীত্য নিরসনের কোন পন্থা উদ্ভাবিত না হয়, তাহলে তখন মুরসাল ও তার

---

[১] কাফউল আসার পৃ: ৮।

[২] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ: ১৪৮।

সহযোগী হাদীসদ্বয় এক সূত্রে বর্ণিত মুত্তাসিল হাদীসের উপর প্রাধান্য পাবে।[১]

আল্লামা আইনী উল্লেখ করেছেন যে -

ان المرسلين صحيحين إذا عارضا حديثا مسندا كان العمل بالمرسلين أولى –

সহীহ বলে গণ্য দু'টি মুরসাল হাদীসের সাথে যদি একটি মুসনাদ হাদীসের বৈপরীত্য দেখা দেয় তাহলে মুরসাল দু'টির উপর আমল করা উত্তম।[২] কেননা সেটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত।

যেসব তাবেয়ীর মুরসাল সাধারণত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় :

(١) مراسيل الشعبي –
(٢) مراسيل النخعي –
(٣) مراسيل سعيد بن المسيب –
(٤) مراسيل قاضى شريح –
(٥) مراسيل ابن سيرين –
(٦) مراسيل حسن بصرى –
(٧) مراسيل محمد بن المنكدر –
(٨) مراسيل سعيد بن جبير –
(٩) مراسيل مجاهد –
(١٠) مراسيل مالك بن انس – وغيرهم
(৩)

মুরসালের উপর লিখিত গ্রন্থাবলী :

(١) المراسيل لأبي داؤد –

(٢) المراسيل لإبن ابى حاتم –

(٣) جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائى –

৫. মুদাল্লাস (المدَلَّسْ)

আভিধানিক অর্থ :

মুদাল্লাস (مُدَلَّسْ) শব্দটি تدليس ক্রিয়াধাতু বা مصدر থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। এটি মূলত دَلَسٌ মূলধাতু থেকে গঠিত। যার অর্থ অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া। সুতরাং তাদলীস-এর অর্থ হবে অন্ধকারকে ঘনীভূত করা, অন্ধকারে আচ্ছাদিত করা, অন্ধকারাচ্ছন্ন করা, অস্বচ্ছ করা। কোন পণ্যের দোষত্রুটি গোপন করার অর্থেও তাদলীস শব্দটি ব্যবহার হয়। কেননা সে ক্ষেত্রেও পণ্যের

---

১ তাদরীব পৃ: ১২০।

২ উমদাতুল ক্বারী খ:৩ পৃ: ১১৬।

৩ ফতহুল মুলহীম পৃ: ৯৬-৯৮ দ্রষ্টব্য।

দোষত্রুটিকে প্রতারণার অন্ধকারে আচ্ছাদিত করার অর্থ নীহিত আছে। সুতরাং মুদাল্লাস অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ।

যে হাদীসের সনদে রাবীদের এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে তার প্রকৃত অবস্থা অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে, সে ধরণের হাদীসকে মুদাল্লাস নামে নামকরণ করা হয়। যেমন: এমন শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করা হল যে, দেখে মনে হয় হাদীসটি তিনি সরাসরি পূর্বোক্ত ব্যক্তি থেকে শ্রবণ করেছেন; অথচ তিনি তাথেকে সরাসরি তা শ্রবণ করেননি। কিংবা রাবীর সর্বজনবিদিত নাম উল্লেখ না করে এমন নামে উল্লেখ করা হল; যা সকলের নিকট সুবিদিত নয়। কিংবা এমন কোন গুণবাচক শব্দ তার সাথে জুড়ে দেওয়া হল; যেগুণে তিনি পরিচিত নন। এক্ষেত্রে যেন সনদের ত্রুটিকে গোপন করা হল। আর এই ত্রুটি গোপন করার কারণে সনদের প্রকৃত অবস্থা অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেলে। তাই এ ধরণের হাদীসকে মুদাল্লাস বা অস্বচ্ছ হাদীস নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

المدلّس هو الحديث الذي أُخفي في اسناده عيب تحسينا لظاهره –

মুদাল্লাস ঐ হাদীসকে বলা হয় যার সনদকে বাহ্যিকভাবে সুন্দর বলে প্রতিপন্ন করার জন্য সনদের কোন ত্রুটিকে গোপন করা হয়েছে।[১]

আর বাহ্যিকভাবে ত্রুটিহীন বলে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সনদের ত্রুটি গোপন করার এ কাজকে তাদলীস (تدليس) বলা হয়। আর যিনি এহেন কাজ করেন তাকে মুদাল্লিস مُدَلِّس বলা হয়।

মুদাল্লাস হাদীসের উদাহরণ

ما رواه الترمذي عن ابى اسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صـــ
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الاّ غفر له قبل أن يتفرق –

আবু ইসহাক হাদীসটি বারা' ইবনে আযেব থেকে عن শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন। বারা' ইবনে আযেব থেকে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেগুলো যে তিনি সরাসরি হযরত বারা' ইবনে আযেব থেকে শ্রবণ করেছেন তা প্রমাণিত আছে। কিন্তু বক্ষমান হাদীসটি তিনি সরাসরি হযরত বরা' ইবনে আযেব থেকে শ্রবণ করেননি। বরং এই হাদীসটি তিনি নুফায়' (نُفَيْع) ইবনুল হারেস-এর মধ্যস্থতায় শ্রবণ করেছেন- যিনি আবু দাউদ আল-আ'মা নামে খ্যাত। আবু দাউদ আল-আ'মা মূলত মিথ্যার

---

১ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীসে উল্লিখিত তাদলীসের সংজ্ঞার ছায়া অবলম্বনে রচিত। -গ্রন্থকার।

অভিযোগে অভিযুক্ত একজন রাবী, যার হাদীস বর্জনীয়। তিনি যে উপরোক্ত হাদীসের সনদ থেকে আবু দাউদ আল-আ'মাকে ফেলে দিয়েছেন, তা অন্যান্য বর্ণনা সূত্র থেকে প্রতীয়মান হয়।

কেননা আবুদ দুনিয়া এই হাদীসটি নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

عن ابى بكر بن عياش عن ابى اسحاق عن ابى داؤد قال دخلت على البراء بن عازب فاخذت بيده فقال سمعت النبيّ صـــ يقول ما من مسلمين يلتقيان– الخ

এই হাদীসটি আবু দাউদ আল-আ'মার হাদীস নামেই খ্যাত। ইমাম আহমদও মালিক ইবনে মিগওয়ালের সূত্রে আবু দাউদ থেকে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। অতএব আবু ইসহাক সরাসরি বারা' ইবনে আযেব থেকে যখন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তখন তিনি তাতে তাদলীস করেছেন একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।[১]

তাদলীসের প্রকারভেদ

তাদলীসকে প্রধানত: দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. তাদলীসুল ইসনাদ (تدليس الاسناد) বা সনদে অস্বচ্ছতা।

২. তাদলীসুশ শুয়ূখ (تدليس الشيوخ) বা উস্তাদের নামের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা।

ক. তাদলীসুল ইসনাদ বা সনদে অস্বচ্ছতা

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

هو ان يروى الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع عنه – بلفظ موهم انه سمـــع منـــه – كقال فلان أو عن فلان أو نحو ذالك –

অর্থাৎ সনদে তাদলীস বা অস্বচ্ছতা বলতে বুঝায় যে, রাবী এমন ব্যক্তি থেকে হাদীসটি বর্ণনা করবেন যাথেকে তিনি অন্যান্য হাদীস আহরণ করেছেন, তবে এই হাদীসটি তাথেকে শ্রবণ করেন নি। আর তা বর্ণনা করবেন এমন শব্দযুগে যাদ্বারা তিনি তাথেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন এরূপ ধারণা জন্মাতে পারে।[২] যেমন বলবেন যে, عن فلان অমুকের সূত্রে বর্ণিত, বা قال فلان অমুক বলেছেন ইত্যাদি।[৩]

---

[১] তাইসীরু উলূমিল হাদীস পৃ: ৫৪।

[২] শরহে আলফিয়ায়ে ইরাকী খণ্ড: ১ পৃ: ১৮০ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীসের সৌজন্যে।

[৩] কিন্তু এধরণের ক্ষেত্রে যদি حدثنا অথবা سمعت (ইত্যাদি শব্দ যা উক্ত ব্যক্তি থেকে এই হাদীস শ্রবণ করার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝায়) এরূপ শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেন তাহলে তখন তাকে মুদাল্লিস বলা হবে না। বরং তাকে মিথ্যুক ও ফাসেক বলা হবে। আর তার বর্ণিত হাদীস সবসময় বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।-আল-বায়েসুল হাসীস পৃ: ৪৬।

অবশ্য আল্লামা ইবনে কাসীর ইখতিসারু উলূমিল হাদীসে তাদলীসের সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছেন-

هو ان يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه أو عمّن عاصره ولم يلقه –

অর্থাৎ যার সাথে রাবীর দেখা সাক্ষাত হয়েছে তার উদ্ধৃতিতে এমন হাদীস বর্ণনা করা যা তিনি তাথেকে শ্রবণ করেন নি, কিংবা রাবীর সমকালীন কোন ব্যক্তি যার সাথে তার দেখা সাক্ষাত হয়নি, তার উদ্ধৃতিতে কোন হাদীস বর্ণনা করা; তবে তা বর্ণনা করা হবে এমন শব্দযোগে যাদ্বারা রাবী তাথেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন এমন ধারণা জন্মে।[১]

পূর্বোক্ত সংজ্ঞার চেয়ে এই সংজ্ঞাটি একটু ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা এদ্বারা বুঝা যায় যে, রাবী যদি তাথেকে অন্য কোন হাদীস আহরণ নাও করে থাকেন শুধু দেখা সাক্ষাত হয়েছে, কিংবা যদি দেখা সাক্ষাত নাও হয়ে থাকে বরং দু'জন সমকালীন ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলেই ঐ ধরণের শব্দে বর্ণিত হাদীস তাদলীসে ইসনাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে এই সংজ্ঞায় ইরসালে খফীও (ارسال خفي) তাদলীসে ইসনাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

তাদলীসুল ইসনাদ ও ইরসালে খফীর মাঝে পার্থক্য

আবুল হাসান আল-কাত্তান বলেন যে, তাদলীস ও ইরসাল এর মাঝে পার্থক্য এই যে, ইরসালের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী যার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করছেন, তিনি তাথেকে কোন হাদীসই শ্রবণ করেননি। সংশ্লিষ্ট হাদীসটিও নয়, অন্য কোন হাদীসও নয়। কিন্তু তাদলীসের ক্ষেত্রে রাবী যার উদ্ধৃতিতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, এই হাদীসটি ছাড়া অন্য হাদীস তিনি তাথেকে শ্রবণ করেছেন।[২]

বস্তুতঃ তাদলীস ও ইরসালে খফী উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণনাকারী যাথেকে হাদীস শ্রবণ করেন নি তার উদ্ধৃতিতে এমন শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করেন যাদ্বারা তিনি তাথেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এরূপ সংশয় সৃষ্টি হয়। তবে তাদলীসের ক্ষেত্রে রাবী উল্লিখিত ব্যক্তি থেকে এ হাদীসটি ছাড়া অন্য হাদীস শ্রবণ করেছেন। কিন্তু

অনুরূপভাবে তিনি যদি এমন শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করেন যার দ্বারা তিনি যে, তার থেকে হাদীসটি সরাসরি শ্রবণ করেননি তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলেও সেটা তাদলীস বলে গণ্য হবে না। হাদীসটি তখন মুরসাল, মুনকাতে বা মু'দাল ইত্যাদির কোন এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। -যফরুল আমানী পৃ: ৩৭৯।

[১] আল-বায়েসুল হাসীস শরহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীস পৃ: ৪৬।

[২] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৮০, কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ: ৪৮।

ইরসালে খফীর ক্ষেত্রে রাবী উল্লিখিত ব্যক্তি থেকে কোন হাদীসই শ্রবণ করেন নি। তবে তিনি তার সমকালীন ব্যক্তি; বা তার সাথে দেখা সাক্ষাতও হয়েছে।[১]

কেউ কেউ আরো ব্যাপক অর্থবোধক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের মতে -

هو ان يحدّث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ موهم (أي لا يقتضي تصريح السماع) –

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি থেকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করবেন, যা তিনি তাথেকে শ্রবণ করেন নি। তবে তা বর্ণনা করবেন এমন শব্দযোগে যা দ্বারা তিনি তাথেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তিনি তাথেকে শুনেছেন, এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না।[২]

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বলেছেন যে, যদি তাদলীসে ইসনাদের সংজ্ঞাকে এত ব্যাপক করা হয় তাহলে কেউই তাদলীসের অভিযোগ থেকে রক্ষা পাবে না; এমনকি ইমাম মালেকের মত ব্যক্তিরাও না।[৩]

সম্ভবত একারণেই আবুল হাসান আল-কাত্তান ও আবু আমর আল-বায্যার প্রথমোক্ত সংজ্ঞাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাদলীসুল ইসনাদের উদাহরণ

আলী ইবনুল খশরম বলেন, আমরা একবার সুফয়ান ইবনে উয়ায়নার দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি (আলোচনাপ্রসঙ্গে) বললেন, قال الزهري كذا। যুহরী এরূপ বলেছেন। তাকে জিজ্ঞাস করা হল, আপনি কি তাথেকে একথা শ্রবণ করেছেন? তখন তিনি বললেন-

لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري –

না, আমি যুহরী থেকে শুনিনি এবং যিনি যুহরী থেকে শ্রবণ করেছেন তাথেকেও শ্রবণ করিনি। বরং আমাকে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রায্যাক, তিনি মা'মার থেকে, মা'মার যুহরী থেকে শ্রবণ করেছেন।[৪]

---

১ দুরারুস্-সামিনাহ পৃ; ৪৬।

২ তাদরীব পৃ: ১৮৮, ফতহুল মুগীস খ: ১ পৃ: ১৮০।

৩ তাদরীব পৃ: ১৮৮, তামহীদ খ: ১ পৃ: ১৫।

৪ মা'রেফাতু উলূমিল হাদীস পৃ: ১৩০, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীসের সৌজন্যে।

তাদলীসে ইসনাদের আরো কতিপয় প্রক্রিয়া

১. তাদলীসুত্-তাসবিয়াহ (تدليس التسوية)

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو اسقاط الراوي شيخ شيخه أو من هو أعلى منه من بين الثقتين الّتين لقــي أحــدهما الآخر– لكونه ضعيفا أو صغيرا –

রাবী তার উস্তাদের উস্তাদ কিংবা তার পরবর্তী কোন রাবীকে দুর্বল হওয়ার কারণে কিংবা অল্পবয়ষ্ক হওয়ার কারণে এমন দুইজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাঝ থেকে ফেলে দিবেন, যে দু'জনের মাঝে দেখা সাক্ষাত ঘটেছে। [১]

মুতাকাদ্দেমীন এটিকে শুধু تسوية নামেও উল্লেখ করে থাকেন। এটিকে তাদলীসের সর্ব নিকৃষ্ট পন্থা বলে অভিহিত করা হয়। কেননা এতে অস্বচ্ছতা সৃষ্টির সাথে সাথে খিয়ানতও রয়েছে এবং মারাত্মক ধরণের প্রতারণাও রয়েছে। কারণ প্রথমোক্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী যেহেতু তাদলীসের অভিযোগে অভিযুক্ত নয়, আর তিনি যখন আরেকজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করছেন, অতএব হাদীসটিতে কোন ক্রটি থাকতে পারে বলে কারো ধারণাই জন্মাবে না।

ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম এবং বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ এ ধরণের তাদলীসের জন্য সুবিশেষ খ্যাত ছিলেন।[২] আবু মুসহির বাকিয়্যাহ সম্পর্কে একটি চটকদার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন- أحاديث بقيّة ليست بنقيّة فكن منها على تقيّة বাকিয়্যার হাদীস স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন নয়, তাই তাথেকে হাদীস আহরণের ক্ষেত্রে সতর্ক থেকো।[৩]

২. তাদলীসুল 'আত্ফ (تدليس العطف)

و هو ان يقول الراوي حدثني فلان و فلان – ويكون الحال انه سمعه من الأول ولم يسمع من الثاني–

তাদলীসুল-'আত্ফ -এর প্রক্রিয়া হল এই যে, রাবী বলবেন আমাকে হাদীসটি র্বণনা করেছেন অমুক এবং অমুক। অথচ তিনি হাদীসটি প্রথম জন থেকে শ্রবণ করেছেন, দ্বিতীয় জন থেকে শ্রবণ করেন নি।[৪] (অবশ্য দ্বিতীয় জন থেকেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।)

---

১ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীসে প্রদত্ত সংজ্ঞার ছায়া অবলম্বনে রচিত।-গ্রন্থকার

২ তাদরীব।

৩ মীযানুল এ'তেদাল খ: ১ পৃ: ৩৩২ তাইসীরের সৌজন্যে।

৪ তাইসীরু উলূমিল হাদীস পৃ: ৫৭।

৩. তাদলীসুস-সুকূত (تدليس السكوت)

و هو ان يقول الراوي حدثنا أو سمعت، ثم يسكت، فيسرد الحديث من احد شيخ شيوخه، أو من فوقه، الذي لم يسمع منه هذا الحديث.

তাদলীসুস-সুকূত -এর প্রক্রিয়া হল এই যে, রাবী বলবেন আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন... এরপর কিছুক্ষণ চুপ থাকবেন, অতপর তার উস্তাদের উস্তাদদের কোন একজন বা তারও পরবর্তী কোন একজনের নাম উল্লেখ করবেন, অথচ তিনি তাথেকে এই হাদীসটি শ্রবণ করেন নি।[১]

খ. তাদলীসুশ-শুয়ূখ (تدليس الشيوخ) বা উস্তাদের ব্যাপারে অস্পষ্টতা

و هو ان يذكر الراوي شيخه باسم غير معروف، أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف

তাদলীসুশ শুয়ূখের প্রক্রিয়া হল এই যে, রাবী তার শায়খকে এমন নামে উল্লেখ করবেন যা সকলের নিকট সুবিদিত নয়, কিংবা তার ডাক নাম উল্লেখ করবেন, কিংবা তাকে কোন গোত্র, অঞ্চল বা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করে উল্লেখ করবেন, কিংবা এমন কোন বিশেষণ তার সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করবেন, যার ফলে তাকে সহজে চেনা দুষ্কর হয়ে পড়ে।[২]

তাদলীসূশ-শুয়ূখ -এরও বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে। যেমন :

১. তাদলীসুল বিলাদ تدليس البلاد

বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার সময় কোন নির্দিষ্ট নগরের নাম উল্লেখ করবেন অথচ তিনি তাদ্বারা অন্য কিছু বুঝাবেন। (যেমন কেউ বলল حدثني البخاري -এদ্বারা স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় যে, বর্ণনাকারী যাথেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন তিনি বুখারার বাসিন্দা অথবা তিনি ইমাম বুখারী। কিন্তু বর্ণনাকারী এই অর্থে সেটি প্রয়োগ করেননি। বরং বুখারী শব্দটি আভিধানিকভাবে যিনি জ্বরের চিকিৎসা করেন তার জন্যও ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ জ্বরের চিকিৎসককেও বুখারী বলা হয়। বর্ণনাকারী সেই অর্থে বুখারী শব্দটি প্রয়োগ করেছে।

কিংবা কেউ বলল حدثني شيخ مدني। বাহ্যত মনে হয় মদীনার কোন শায়েখ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রাবী মদনী শব্দের আরেক অর্থ 'নগরে বসবাসকারী' গ্রহণ করে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। কিংবা কেউ বলল حدثني بداكا আমাকে ঢাকায় হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে অথচ ঢাকা দ্বারা সিলেটের ঢাকাদক্ষিণ অঞ্চলকে বুঝানো হল ইত্যাদি।

---

[১] ...উসীরু উলূমিল হাদীস পৃ: ৫৭।
[২] ...দরীব পৃ: ১৯১ আংশিক পরিবর্তিত।

২. তাদলীসুত্-তাসবিয়াহ (تدليس التسوية)

শায়খুল ইসলাম তাদলীসুত্-তাসবিয়াহকে তাদলীসুশ্-শুয়ূখের এক প্রকার বলে গণ্য করেছেন।[১]

৩. تدليس الاجازة والمناولة والوجادة باطلاق اخبرنا :

অর্থাৎ ইজাযত, মুনাওয়ালা কিংবা الوجادة -এর প্রক্রিয়ায় হাদীস লাভ করে اخبرنا বলে বর্ণনা করা। এটিও এক ধরণের তাদলীস।

তাদলীসের উদ্দেশ্য

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাবীগণ তাদলীস করে থাকেন। নিম্নে তার কতিপয় উল্লেখ করা হল। যথা:

১. লোকেরা তাঁর সনদকে আলী মনে করবে এই উদ্দেশ্যে অনেক সময় তাদলীস করা হয়।

২. রাবী কোন এক উস্তাদ থেকে বহু হাদীস শ্রবণ করেছেন, কিন্তু যা শ্রবণ করেননি সেক্ষেত্রেও অনেক সময় 'হয়ত শ্রবণ করেছেন' এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েও তাদলীস করে থাকেন।

৩. উস্তাদ যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেও তাদলীস করা হয়।

৪. উস্তাদ দীর্ঘ হায়াত লাভ করার কারণে বর্ণনাকারীর চেয়েও কম বয়সীরা তাথেকে হাদীস আহরণের সুযোগ লাভ করেছেন। ফলে বর্ণনাকারী তার চেয়েও কম বয়সীদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। এই সংকোচ এড়ানোর উদ্দেশ্যেও তাদলীস করা হয়ে থাকে।

৫. উস্তাদ এত অল্পবয়স্ক যে, তিনি বর্ণনাকারীর ছাত্রদের চেয়েও কম বয়সী। ফলে এটি একটি সংকোচের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যা এড়ানোর জন্যও তাদলীস করা হয়।

৬. এক উস্তাদ থেকে বহু হাদীস আহরণ করার ফলে বার বার তার নাম উল্লেখ করা বিরক্তিকর মনে করেও তাদলীস করা হয়। হয়ত তার নাম ফেলে দিয়ে কিংবা তার নামের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেন।[১]

---

[১] তাদ্‌রীব পৃ: ১৯১।

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৮৩ আংশিক পরিবর্তিত।

শেষোক্ত চারটি কারণ তাদলীসে শুয়ূখেরও উদ্দেশ্য। যথাঃ

১. উস্তাদ যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য হলে তার পরিচয়ে অস্পষ্টতা তৈরীর উদ্দেশ্যে তার অখ্যাত নাম, বা ডাক নাম, বা কোন নিসবত বা বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করে তার দুর্বলতাকে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়।

২. উস্তাদের হায়াত দীর্ঘ হওয়ার ফলে তার পরবর্তী কালের ছাত্ররা বর্ণনাকারীর চেয়ে কম বয়সী হওয়া সত্ত্বেও তার সমপর্যায়ে চলে আসার সংকোচ এড়ানোর জন্যও উস্তাদের ব্যাপারে অস্পষ্টতা তৈরী করা হয়।

৩. উস্তাদ বেশী অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে সৃষ্ট সংকোচ এড়ানোর উদ্দেশ্যেও তার নামের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা তৈরী করা হয়।

৪. একই উস্তাদের নাম বারবার উল্লেখ করাজনিত বিরক্তি এড়ানোর জন্যও উস্তাদের নামের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়।

৫. অনেক সময় উস্তাদের সাথে মানসিক দূরত্ব থাকার কারণে তার কাছ থেকে হাদীস তো বর্ণনা করা হয়, কেননা তার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু মানসিক দূরত্বের কারণে তার নাম সরাসরি উল্লেখ করতে একধরণের সংকোচবোধ কাজ করে। সে জন্য তার নামকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে অস্পষ্টতা তৈরী হয়। যেমন ইমাম বুখারী এবং তার শায়খ যুহলীর মাঝে কোন বিষয়ে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার কারণে তিনি যখন তাথেকে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তার নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতেন না। কখনো বলতেন حدثني محمد কিন্তু তার পিতার নাম ইয়াহইয়া হলেও তার পিতার নাম উল্লেখ করতেন না। আবার কখনো বলতেন حدثني محمد بن عبدالله অথচ আব্দুল্লাহ ছিল তার দাদার নাম। আবার কখনো বলতেন حدثني محمد بن خالد অথচ খালেদ ছিলেন তার দাদার বাপ। কিন্তু حدثني محمد بن يحيى কখনই বলতেন না। এর উদ্দেশ্য তার পরিচয় অস্পষ্ট করাই ছিল; অন্য কিছুই নয়। [১]

উল্লেখ্য যে, তাদলীস যে উদ্দেশ্যেই করা হোক এটি একটি নিন্দনীয় কাজ। ইমাম শু'বা বলতেন لأن أزني أحب إلى من أن ادلس আমার নিকট হাদীসে তাদলীস করার চেয়ে যিনা করাটা বরং উত্তম। অবশ্য ইবনুস সালাহ বলেছেন যে, শো'বার এই মন্তব্যে বাড়াবাড়ি রয়েছে। সম্ভবত তিনি কঠোরভাবে সতর্ক করার জন্যই এরূপ মন্তব্য করেছেন। শো'বা আরো বলতেন যে, التدليس أخ الكذب। তাদলীস হল মিথ্যার ভাই।[২] অনুরূপ মন্তব্য ইমাম শাফেয়ী থেকেও বর্ণিত আছে। শো'বা এও বলেছেন যে-

---

১ ফাতহুল মুগীছ সাখাবীকৃত খ: ১ পৃ: ৯১ ও যফরুল আমানী।

২ তাদরীব পৃ: ১৯২।

لأن اخرّ من السماء إلى الارض أحب إلى من أن اقول: زعم فلان ولم أسمع منه

যাথেকে আমি সরাসরি শ্রবণ করিনি তার সম্পর্কে বলব যে, 'তিনি মনে করেন' -এর চেয়ে আকাশ থেকে মাটিতে পড়া আমার নিকট শ্রেয়।

ইবনুল মুবারক বলেছেন- ان الله لا يقبل التدليس আল্লাহ অবশ্যই তাদলীসকে গ্রহণ করেন না।

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বলেছেন- المدلس متشبع بما لم يعط মুদাল্লিস মূলত যা তাকে প্রদান করা হয়নি তাদ্বারা তৃপ্তি অর্জন করতে চায়।

ওয়াকী বলেছেন- الثوب لا يحل تدليسه فكيف الحديث

কাপড় পরিধানের ক্ষেত্রে যেহেতু তাদলীস করা বা অস্বচ্ছতা তৈরী করা (অন্যের কাপড় পরিধান করে নিজেকে বড় করে প্রকাশ করা) বৈধ হয় না, অতএব হাদীসের ক্ষেত্রে তা কি করে বৈধ হবে।

আল্লামা যাহাবী বলেছেন যে- من غشنا فليس منا এই হাদীসে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তাদলীস মূলত তারই অন্তর্ভুক্ত।[১]

তাদলীস কেন এত ঘৃণ্য ?

১. তাদলীসের দ্বারা যাথেকে হাদীস শ্রবণ করা হয়নি, তাথেকে শ্রবণ করা হয়েছে এরূপ সংশয় সৃষ্টি করা হয়।
২. সুস্পষ্টতাকে বর্জন করে অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতার দিকে যাওয়া হয়।
৩. যাথেকে তাদলীস করা হয়েছে তাকে উল্লেখ করা হলে বর্ণিত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে না, একথা জেনেও এরূপ করা হয়। সুতরাং এটি একটি ঘৃণ্য প্রতারণা বৈ কিছু নয়।[২]

তাদলীসের হুকুম

১. তাদলীসুল ইসনাদের হুকুম : সনদে অস্বচ্ছতা তৈরী করা উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপসন্দনীয় একটি কাজ। এ সম্পর্কে শো'বাসহ অন্যান্য মনীষীদের মন্তব্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

হাদীস বিশারদ ও ফিকাহবিদদের একদলের অভিমত এই যে, যদি কারো ব্যাপারে তাদলীস করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে সে (مجروح) বা সমালোচিত ও অভিযুক্ত বলে গণ্য হবে এবং তার বর্ণিত সকল হাদীস বর্জিত বলে গণ্য হবে। এমনকি যদি তার বর্ণিত অন্যান্য হাদীসে শ্রবণের কথা

---

[১] ফতহুল মুগীছ খ: ১ পৃ: ১৮৮ ও যফরুল আমানী পৃ: ৩৯২।

[২] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস।

সুস্পষ্টভাবে উল্লেখও থাকে তবুও সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।[১] তবে এমতটি নির্ভরযোগ্য নয়।

২. তাদলীসুত্-তাসবিয়াহ এর হুকুম : তাদলীসুত্ তাসবীয়াহ (تدليس التسوية) আরো মারাত্মক এবং তাদলীসের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম পদ্ধতি। আল্লামা ইরাকী বলেছে - الله قادح فيمن تعمد فعله যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করবে তার জন্য এটি ত্রুটি বলে গণ্য হবে।[২]

৩. তাদলীসুশ-শুয়ূখ এর হুকুম : (تدليس الشيوخ) এধরণের তাদলীস যিনি করবেন, তার নিয়্যতের আলোকে এর হুকুম নির্ণীত হয়।

যাথেকে তিনি হাদীস আহরণ করেছেন, সে ব্যক্তিটি যদি যয়ীফ হয় আর তিনি যদি এই উদ্দেশ্যে তাদলীস করে থাকেন যে, লোকেরা যেন তার পরিচয় উদ্ঘাটন করতে না পারে, কিংবা লোকেরা যেন এরূপ ধারণা করে যে মধ্যবর্তী লোকটি হয়ত বিশ্বস্ত ছিল; কিংবা তার নামের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা এজন্য তৈরী করেন যে, লোকেরা যাতে মনে করে যে, ইনি ভিন্ন কোন লোক- তাহলে এ কাজটি হারাম হবে। কেননা এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা ও প্রতারণা।

কিন্তু যদি উস্তাদ আহরণকারীর চেয়ে কমবয়সী হওয়ার কারণে, কিংবা উস্তাদের সনদ নাযিল বা তাতে মধ্যস্থতা বেশী হওয়ার কারণে বা একই নাম বারবার উল্লেখ করার বিরক্তি এড়ানোর উদ্দেশ্যে তাদলীস করে থাকেন, তাহলে তা মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কাজ বলে গণ্য হবে।

হাকেম উল্লেখ করেছেন যে-

فان التدليس مطلقا ليس كذبا وانما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل

তাদলীস সাধারণভাবে মিথ্যা নয়। বরং এটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দে সৃষ্ট এক ধরণের সংশয়।[৩]

মুদাল্লিসের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

হাদীসবিশারদ ও ফিকাহবিদদের একদল মনে করেন যে, তাদলীস করার কারণে রাবীর আদালত ও বিশ্বস্ততা বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং তাদলীসের অভিযোগে অভিযুক্ত রাবীর বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় হবে না। এমনকি যদি তারা حدثني বা سمعت শব্দযোগেও বর্ণনা করেন তবুও না।[৪]

---

১ তাদরীব পৃ: ১৯২।

২ তাদরীব পৃ: ১৮৯।

৩ যফরুল আমানী

৪ ফাতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ: ১০৬।

এমতটি যে নির্ভরযোগ্য নয় তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন যে, যারা মুরসালকে হুজ্জত মনে করেন, তারা মুদাল্লাস হাদীসকে সাধারণভাবেই গ্রহণীয় বলে মনে করেন।[১]

খতীব বাগদাদীর এই বক্তব্যের আলোকে বিষয়টির ব্যাখ্যা এই যে :

১. তাদলীসের অভিযোগে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি এমন শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করেন, যাদ্বারা সনদ অবিচ্ছিন্ন এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়; যেমন- তিনি سمعت، حدثنا، اخبرنا এধরণের শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করলেন, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য বলে গণ্য হবে। ফতহুল মুলহিমের মুকাদ্দামায় আল্লামা শাব্বীর আহমদ রহ. উল্লেখ করেছেন-

لان التدليس ليس بكذب حقيقة حتى يجرح به الراوي مطلقا انما هو تحسين الاسـناد– متضمن الخداع– فاذا رواه بلفظ دال على الاتصال زال ذالك الخداع

প্রকৃতপক্ষে তাদলীস মিথ্যা নয়- যার কারণে রাবীকে অভিযুক্ত করা যায়। বরং এটি সনদকে সুন্দর করার একটি প্রয়াস- যাতে প্রতারণা নিহিত আছে। সুতরাং যদি তা এমন শব্দে বর্ণিত হয় যা সনদ অবিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রমাণ বহন করে তাহলে এই প্রতারণা দুরীভুত হয়ে যাবে। [২]

২. তবে তিনি যদি এমন শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করেন, যাদ্বারা তিনি উল্লিখিত ব্যক্তি থেকে হাদীস সরাসরি শ্রবণ করেছেন একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা না যায়, তাহলে এধরণের হাদীসের হুকুম মুরসালের হুকুমের অনুরূপ হবে।[৩]

* আল্লামা ইবনু আব্দিল বার হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, যদি মুদাল্লিস কেবলমাত্র সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকেই তাদলীস করে থাকেন বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে তার তাদলীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে; অন্যথায় নয়।[৪]

* আলী ইবনুল মাদিনী উল্লেখ করেছেন যে, যদি তিনি এমন ব্যক্তি হন যিনি কখনো কদাচ তাদলীস করেন, তাহলে তার عن শব্দযুগে বর্ণিত রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য হবে।[৫]

---

[১] তাদরীব পৃ: ১৯২।

[২] যফরুল আমানী পৃ: ৩৯৪।

[৩] যফরুল আমানী পৃ: ৩৯৪।

[৪] তামহীদ -এর মুকাদ্দামা খ: ১ পৃ: ৮২ ও যফরুল আমানী।

[৫] তামহীদ -এর মুকাদ্দামা খ: ১ পৃ: ১৮ ও যফরুল আমানী।

মুদাল্লেসীনের স্তর (طبقات المدلسين)

উল্লেখ্য যে, সকল মুদাল্লিস এক স্তরের নয়। তাই তাদের সকলের বর্ণিত রিওয়ায়াত সমূহের ব্যাপারে ঢালাওভাবে গ্রহণীয় হওয়ার মতামত দেওয়া যায় না। হাফেয 'আলায়ী মুদাল্লিসদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণিত স্তরসমূহ নিম্নরূপ:

১. প্রথম স্তর : যারা কদাচ কখনো তাদলীস করেন। এদেরকে বরং তাদলীসকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য করা যায় না। যেমনঃ ক. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী, খ. হিশাম ইবনে উরওয়া, গ. মূসা ইবনে উক্‌বাহ।

২. দ্বিতীয় স্তর : যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার তুলনায় তাদলীসের সংখ্যা খুবই কম। হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণ এধরণের ব্যক্তিদের তাদলীসকে গ্রহণীয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। সরাসরি শ্রবণ করেছেন এমন শব্দে হাদীস বর্ণনা না করলেও তাদের বর্ণিত হাদীসকে সহীহ হাদীসের গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত করা হয়েছে।[১] যেমনঃ

১. যুহরী
২. আ'মাশ
৩. ইব্‌রাহীম নাখয়ী
৪. ইসমাঈল ইবনে আবু খালেদ
৫. সুলায়মান আত্-তায়মী
৬. হুমায়দ আত্-তবীল
৭. হাকাম ইবনে উতায়বাহ
৮. ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর
৯. ইবনে জুরায়জ
১০. সুফয়ান সাওরী
১১. ইবনে উয়ায়নাহ
১২. শারীক
১৩. হুশায়ম প্রমুখ।

উপরোল্লিখিত রাবীদের বহু হাদীস সহীহাইনে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অথচ তার অনেক গুলোতেই সরাসরি শ্রবণের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই।

---

[১] হয়ত তারা গুরুত্বপূর্ণ ইমাম হওয়ার কারণে, অথবা তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার তুলনায় তাদলীসের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে, কিংবা তাঁরা একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকেই তাদলীস করতেন সে কারণে।

৩. তৃতীয় স্তর : যারা ব্যাপক ভিত্তিতে তাদলীস করেছেন এবং কেবলমাত্র নির্ভরযোগ্যদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেননি। এমন ধরণের মুদাল্লিসদের বর্ণিত হাদীসে সরাসরি শ্রবণের কথা উল্লেখ না থাকলে একদল মুহাদ্দিস সেগুলোকে স্থগিত বলে গণ্য করেছেন। আর একদল এদের রিওয়ায়াতকেও সাধারণভাবেই গ্রহণ করেছেন। যেমন-

১. হাসান বসরী
২. কাতাদাহ
৩. আবু ইসহাক আস্-সাবিঈ
৪. আবুয্-যুবায়র আল-মক্কী
৫. আবু সুফয়ান ত্বালহা
৬. আব্দুল মালিক ইবনে উমায়র।

৪. চতুর্থ স্তর : যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যয়ীফ ও অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের থেকে তাদলীস করেছেন। এধরণের মুদাল্লিসের ব্যাপারে জমহুর এই অভিমত পোষণ করেন যে, সরাসরি শ্রবণের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে তাদের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য হবে না।[১] যেমন:

১. ইবনে ইসহাক
২. বাকিয়্যাহ
৩. হাজ্জাজ ইবনে আরতাত
৪. জাবের আল-জু'ফী
৫. ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম
৬. সুওয়ায়েদ ইবনে সাঈদ প্রমুখ।

৫. পঞ্চম স্তর: যারা তাদলীস ছাড়াও অন্য কোন কারণে যয়ীফ বলে গণ্য হয়েছেন। এধরণের ব্যক্তিদের হাদীস এমনিতেই বর্জনীয়। এমনকি যদি তারা 'সরাসরি শ্রবণ করেছেন' এমন শব্দযোগেও হাদীস বর্ণনা করেন তবুও। যেমন:

১. আবু জানাব আল-কালবী
২. আবু সাঈদ আল বাক্কাল প্রমুখ।[২]

অনেক সময় তাদলীস মতনেও করা হয়, যাকে পরিভাষায় মুদরাজ (مدرج) বলা হয়। অর্থাৎ নিজের থেকে কোন শব্দ হাদীসের মতনে এমনভাবে প্রবেশ করিয়ে

---

১ হয়ত অধিকহারে তাদলীস করার কারণে, কিংবা যয়ীফ এবং মাজহুল ব্যক্তিদের থেকে ব্যাপকভাবে তাদলীস করার কারণে।

২ যফরুল আমানী পৃ: ৩৯১-৩৯২ থেকে উদ্ধৃত এবং ফতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ: ১০৮ থেকে সংজোযিত।

দেওয়া যে, পাঠক সেটাকে মূল হাদীসের শব্দ বলেই ধারণা করে। ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করাও হারাম।[১]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বুখারী, মুসলিম এবং এধরণের সহীহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে যদি তাদলীসের অভিযোগে অভিযুক্ত কোন রাবীর হাদীস পাওয়া যায়, আর তা যদি এমন শব্দযোগে বর্ণিত হয়, যাদ্বারা সরাসরি শ্রবণের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় তাহলে তা মুত্তাসিল বলেই গণ্য হবে। তবে যদি তা عن শব্দযোগে কিংবা এমন কোন শব্দযোগে বর্ণিত হয়, যাদ্বারা সরাসরি শ্রবণের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় না, সেগুলোর ব্যাপারে আল্লামা ইবনুস সালাহ এবং ইমাম নববীর মত হল যে, যদি সেগুলো তা'লিকাত না হয় তাহলে সেগুলোকেও মুত্তাসিল বলেই গণ্য করতে হবে এবং ধরে নিতে হবে যে, অন্য সূত্রে সরাসরি শ্রবণের বিষয়টি গ্রন্থকারের নিকট প্রমাণিত আছে। না থাকলে তারা এগ্রন্থে ঐ হাদীস সংকলন করতেন না। যদিও আমরা সে সম্পর্কে অবগত নই।

অবশ্য আল্লামা কুত্‌বুদ্দীন হালবী বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন- ان المعنعنات في الصحيحين منــزلته منــزلة السماع

অর্থাৎ সহীহাইনে যে সব রিওয়ায়াত عن শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সরাসরি শ্রবণের মর্যাদা পাবে। এর কারণ হিসাবে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। যথা:

১. অন্য সূত্রে হয়ত সরাসরি শ্রবণের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

২. কিংবা যিনি عن শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করছেন তিনি হয়ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি থেকে তাদলীস করেন না।

৩. কিংবা হয়ত হাদীসটি তিনি عن শব্দযোগে বর্ণনা করলেও তার কোন উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪. কিংবা কোন হাদীস বিশারদ থেকে এরূপ মন্তব্য পাওয়া গেছে যে, যদিও তিনি عن শব্দযোগে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু উল্লিখিত ব্যক্তি থেকে তিনি সরাসরি হাদীসটি শ্রবণ করেছেন।[২]

সারকথা এই যে, বুখারী মুসলিম যেহেতু সহীহ ছাড়া অন্য কোন হাদীস তাদের গ্রন্থে সংকলন করবেন না বলে সংকল্প করেছেন; অতএব কোন মুদাল্লাস হাদীস

---

[১] ফাতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ: ১০৮।

[২] ফাতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ: ১০৫-১০৬।

তারা সংকলন করতে পারেন না। তবে এমন মুদাল্লাস যার তাদলীসের অভিযোগ যেকোনভাবে নিষ্পন্ন হয়ে গেছে, সে ধরণের কোন হাদীস উল্লেখ করা তাদের সংকল্পের পরিপন্থী নয়।[১]

কোন হাদীসে তাদলীস করা হয়েছে কি না তা কিভাবে জানা যাবেঃ

কোন হাদীসে তাদলীস করা হয়েছে কি না তা জানার মাত্র দু'টি পন্থা রয়েছে। যথা:

১. যদি মুদাল্লিস নিজেই তা বলে দেন। যেমন প্রশ্ন করা হলে ইবনে উয়ায়না বলে দিয়েছেন।
২. কিংবা যদি কোন হাদীস বিশারদ পণ্ডিত ব্যক্তি অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা এবিষয়ে অবগত হওয়ার পর তা বলেন।[২]

তাদলীস ও মুদাল্লেসীনের উপর রচিত গ্রন্থাবলী

১. التبيين لأسماء المدلسين -খতীব বাগদাদীকৃত।
২. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس -হাফেয ইবনে হজরকৃত।
৩. أسماء المدلسين -সুয়ূতীকৃত ।
৪. التبين لاسماء المدلسين -বুরহানুদ্দীন ইবনূল হলবীকৃত।
৫. جامع التحصيل في أحكام المراسيل -হাফেয সালাহ উদ্দীন আলায়ীকৃত।
৬. اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمى بالتدليس من الشيوخ -হাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ আল- আনসারীকৃত।
৭. খতীব বাগদাদীর আরো দু'টি গ্রন্থ রয়েছে; যাতে তিনি তাদলীসের প্রকার নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৩]

৬. ইরসালে খফী (الارسال الخفى)

আভিধানিক অর্থ

আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে, ارسال শব্দের আভিধানিক অর্থ বন্ধনমুক্ত করা, বন্ধন শিথিল করা, উন্মুক্ত করে দেওয়া। তাই রাবীদেরকে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতাকে যে হাদীসে অনুসরণ করা হয়নি সেই হাদীসকে

---

১ -গ্রন্থকার
২ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৮৪ ও যফরুল আমানী তাদলীস অধ্যায়।
৩ কিফায়াহ পৃ:৩৫২।

মুরসাল বলা হয়। আর خفي শব্দের অর্থ হল গোপন, লুকায়িত, অস্পষ্ট, অপ্রকাশ্য। সুতরাং যে হাদীসে রাবীর বিচ্যুতির বিষয়টি খুবই অস্পষ্ট সেগুলোকে المرسل الخفي নামে নামকরণ করা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو الحديث الذي يروى عمن عاصره ولم يلقه – أو لقيه ولم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، ك'قال ﷺ أو 'عن ﷺ وغيره –

যে হাদীস এমন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করা হবে, যিনি বর্ণনাকারীর সমসাময়িক ব্যক্তি হলেও তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাত হয়নি কিংবা সাক্ষাত হলেও বর্ণনাকারী তাথেকে কোন হাদীস আহরণ করেননি। তবে তিনি হাদীসটি বর্ণনা করবেন এমন শব্দযোগে যাতে শ্রবণ করার অর্থ গ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন قال বা عن বা এধরণের অন্যকোন শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করবেন।[১]

মুরসালে খফীর উদাহরণ

حديث عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا رحم الله حارس الحرمين –

উমর ইবনে আব্দুল আযীয উকবা ইবনে আমেরের সূত্রে নবী কারীম সা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (তিনি ইরশাদ করেছেন) আল্লাহ তা'আলা হারামাইনের তত্ত্বাবধানকারীর উপর রহম করুন।[২]

আল্লামা মিয্‌যী বলেন, উমর ইবনে আব্দুল আযীয ও উকবা ইবনে আমের একই যুগের ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাঝে দেখা সাক্ষাত হয়নি। সুতরাং উমর ইবনে আব্দুল আযীয ও উকবার মাঝে একজন মধ্যস্থতাকারী বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু যেহেতু দু'জনই সমকালীন ব্যক্তি তাই ঐ বর্ণনাকারীর বিচ্যুতির বিষয়টি অস্পষ্ট। তাই এটি المرسل الخفي বলে গণ্য হবে।

كرواية الاعمش عن أنس بن مالك عن النبيّ صـــ

আলী ইবনুল মাদিনী বলেন, আ'মাশ আনাস রা. থেকে কোন হাদীস আহরণ করেননি। তবে তিনি তাকে খুতবা দিতে ও নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি ইয়াযীদ আর-রুক্কাশী ও আবানের মধ্যস্থতায় হযরত আনাস রা. থেকে হাদীস আহরণ করেছেন।[৩]

---

১ তাইসীরু উলূমিল হাদীস পৃ: ৬০ ঈষৎ পরিবর্তিত।

২ ইবনে মাজাহ

৩ তাইসীরু উলূমিল হাদীস পৃ: ৬০।

ইরসালে খফী চিনার উপায়

ইরসালে খফী চিনার তিনটি উপায় রয়েছে। যথা :

১. হাদীসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ কোন ইমাম যদি বলেন যে, রাবী যাথেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সাথে তার সাক্ষাত ঘটেনি এবং তাথেকে কোন হাদীস তিনি শ্রবণ করেননি।

২. কিংবা রাবী নিজেই যদি বলেন যে, যাথেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সাথে তার সাক্ষাত ঘটেনি এবং তাথেকে কোন হাদীস শ্রবণ করেনি।

৩. যদি এই হাদীসটি অন্যসূত্রে বর্ণিত থাকে, আর সেই সূত্রে বর্ণনাকারী এবং তিনি যাথেকে বর্ণনা করেছেন এই দু'জনের মাঝে যদি অন্য আরেকজন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে। তবে শেষোক্ত ৩ নং পন্থাটির ব্যাপারে অনেকেরই দ্বিমত রয়েছে। কেননা রাবী এবং তিনি যাথেকে বর্ণনা করেছেন এই দুই জনের মধ্যবর্তী ব্যক্তিটি مزيد في متصل السند -এর প্রক্রিয়ায়ও সংযোজিত হতে পারে।[১]

মুরসালে খফীর হুকুম

মুরসালে খফীও য়য়ীফ বলে গণ্য হবে। কেননা এক্ষেত্রেও সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

অনেকেই ইরসালে খফীকে পৃথক একটি প্রকার হিসাবে গণ্য করেন না, তারা একে তাদলীসেরই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। যে কারণে তারা তাদলীসের সংজ্ঞা এত ব্যাপক অর্থে প্রদান করেন, যাতে ইরসালে খফীও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাদলীসের সংজ্ঞা সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা এব্যাপারে আলোকপাত করেছি। আর যারা ইরসালে খফীকে একটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করেন, তারা তাদলীসের সংজ্ঞা সীমিত অর্থে প্রদান করেন। যাতে ইরসালে খফী তাথেকে পৃথক হয়ে যায়।[২] যেহেতু ইরসালে খফীর সাথে অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ একটি বিষয় হল মুহমাল; তাই এখানে আমরা মুহমালের আলোচনা পেশ করলাম।

মুহমাল (مهمل)

আভিধানিক অর্থ

مهمل শব্দটি هَمْلٌ মূলধাতু থেকে باب افعال -এর ইসমে মাফউলের সীগাহ। هَمْلٌ-এর অর্থ হল উটকে রাখাল বিহীন ছেড়ে দেওয়া। باب افعال থেকে এর অর্থ হল

---

১ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ. ৮৬।

২ -গ্রন্থকার

ফেলে রাখা, কাজে না লাগানো, ছেড়ে দেওয়া, অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা, কোন বিষয়ের বিধানকে সুস্পষ্ট না করা ইত্যাদি। সুতরাং মুহমাল শব্দের অর্থ হবে বর্জিত, অব্যবহৃত বা যার বিধান সুস্পষ্ট নয় ইত্যাদি।
যেহেতু, যে সকল হাদীসের রাবীকে সনাক্ত করা যায় না, সেগুলো প্রমাণের জন্য সহজে গ্রহণ করা যায় না, তাই এগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ফেলে রাখতে হয়। যেন এগুলো প্রাথমিক বিবেচনায় অকেজো, অব্যবহৃত এবং তার বিধান সুস্পষ্ট নয়। এজন্যই এধরণের হাদীসকে মুহমাল নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو الحديث الذي روى عن احد اثنين متفقين في الاسم فقط من كنية أو غيرها– أو فيه و في اسم الاب، أو فيهما وفي اسم الجد، أو فيهن و في النسبة معبرا عنه بما فيه الاتفاق – من غير ان يذكر ما يتميز عن الآخر –

মুহমাল বলা হয় এমন হাদীসকে যা এমন দুই ব্যক্তির কোন একজন থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে দু'জনের নাম ও ডাক নামের মাঝে ঐক্য রয়েছে, কিংবা সে দু'জনের নাম ও বাপের নামে অথবা তাদের নাম বাপের নাম ও দাদার নামে, কিংবা তাদের গৌত্রিক পরিচয় ও পেশাগত পরিচয়ে ঐক্য রয়েছে। আর সনদে যখন একজনকে উল্লেখ করা হয় তখন যেক্ষেত্রে দু'জনের ঐক্য রয়েছে সেটুকু পরিচয়ই উল্লেখ করা হয়। একজন থেকে অন্য জনকে পার্থক্য করা যায় এমন কোন দিক বা পরিচয় উল্লেখ করা হয় না।
এ ধরণের ক্ষেত্রে হাদীসের সনদে উল্লিখিত ব্যক্তিটি কে? তা সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয় পড়ে। ফলে রাবীর পরিচয় অজ্ঞাত থাকার কারণে হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার পর্যায়ে চলে যায়। পরে গবেষণার মাধ্যমে রাবীকে সনাক্ত করা গেলে হাদীসটির পর্যায় নির্ণীত হয় এবং তার বিধান সুস্পষ্ট হয়।
অবশ্য পুর্ববর্তীদের অনেকেই معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب শিরোনামে এতদ সংক্রান্ত আলোচনাকে উপস্থাপন করেছেন।

মুহমালের উদাহরণ

যেমন 'হাম্মাদ ইবনে যায়েদ' ও হাম্মাদ ইবনে সালামাহ দু'জন ব্যক্তি। অনেক হাদীসেই পিতার নাম উল্লেখ না করে শুধু 'হাম্মাদ' উল্লেখ করা হয়। ফলে কে এই হাম্মাদ তা সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা উভয়েই সমকালীন ব্যক্তি এবং একই উস্তাদ থেকে উভয়েই বহু হাদীস আহরণ করেছেন। আবার পরবর্তী মুহাদ্দেসীনদের অনেকেই উভয় হাম্মাদ থেকে হাদীস আহরণ করেছেন।
অনুরূপভাবে সুফয়ান সাওরী ও সুফয়ান ইবনে উয়ায়নার ক্ষেত্রেও এরূপ হয়ে থাকে যে, শুধু 'সুফয়ান' উল্লেখ করা হয়। ফলে উল্লিখিত সুফয়ান কোন সুফয়ান তা সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা দু'জনই তাবেয়ী।

অনুরূপভাবে সাহাবী ও তাবেয়ীদের অনেকের নামই আব্দুল্লাহ। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। যদি কোন হাদীসে শুধু আব্দুল্লাহ উল্লেখ করা হয় তাহলে উল্লিখিত ব্যক্তিটি কোন আব্দুল্লাহ তা সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়বে। তবে রাবীদের জীবন ইতিহাস জানা থাকলে, তাদের উস্তাদ সাগরিদদের ব্যাপারে অবগতি থাকলে অনেক ক্ষেত্রে তা সনাক্ত করা সম্ভব হয়। তাছাড়া মুহাদ্দেসীন এব্যাপারে কিছু কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, যেগুলো অনুসরণ করলেও এ ধরণের ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সহজ হয়। যেমনঃ সালামাহ ইবনে সুলায়মান উল্লেখ করেছেন যে, সাধারণত মক্কার কোন বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বললে তার দ্বারা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়রকে বুঝতে হবে, মদিনার কেউ বললে ইবনে ওমরকে বুঝতে হবে, কুফার কেউ বললে ইবনে মাসঊদকে বুঝতে হবে, বসরার কেউ বললে ইবনে আব্বাসকে বুঝতে হবে, খুরাসানের কেউ বললে ইবনুল মুবারককে বুঝতে হবে। খলিলী বলেছেন, মিসরী কেউ বললে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আসকে বুঝতে হবে।[১]

মুহমালের হুকুম

মুহমাল হাদীস প্রাথমিক বিবেচনায় বর্জনীয়। তবে যদি তার ইহমালকে কোন উপায়ে দূরীভূত করা সম্ভব হয় অর্থাৎ রাবীকে সনাক্ত করা যায় তাহলে উক্ত রাবী যয়ীফ না হলে হাদীসটি প্রমাণযোগ্য বলে গণ্য হয়।

ইহমাল দূরীভূত করা যায় দুই পন্থায় :

১. আনুষাঙ্গিক ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা প্রবল ধারণা যার প্রতি জন্মায় তাকে ধরে নিয়ে।

২. কিংবা যিনি হাদীসটি বর্ণনা করছেন, তিনি যদি তাদের দু'জনের মাঝে নির্দিষ্ট একজন থেকেই বর্ণনা করেন- একথা জানা যায়।

আর যদি ইহমাল বা অস্পষ্টতা দূর করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে দু'জনের মাঝে 'দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তাদের দু'জনই যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে হাদীস প্রমাণযোগ্য হবে। আর যদি দু'জনের কেউই নির্ভরযোগ্য না হয়, তাহলে হাদীস প্রমাণযোগ্য হবে না।

আর যদি দু'জনের কারো অবস্থা জানা না যায়, তাহলে ইহমাল বা অস্পষ্টতা মারাত্মক ধরণের বলে গণ্য হবে।[২] এধরণের ক্ষেত্রে বিষয়টি জাহালত ফির রাবীর পর্যায়ে চলে যাবে।

---

[১] কাফউল আসার পৃঃ ১০৪-১০৫, টিকার ভাব অবলম্বনে।

[২] কাফউল আসার পৃঃ ১০৫-১০৬ ও কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস পৃঃ ৪৫।

অষ্টম অধ্যায়

রাবী সমালোচিত ও অভিযুক্ত হওয়ার কারণে যয়ীফ হাদীসের প্রকারভেদ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি যে, রাবী সমালোচিত ও অভিযুক্ত হওয়ার কারণে যয়ীফ হাদীস প্রধানত: দুই প্রকার। যথা:

১. طعن في العدالة বিশ্বস্ততার দিক থেকে সমালোচিত ও অভিযুক্ত।

২. طعن في الضبط সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমালোচিত ও অভিযুক্ত।

বিশ্বস্ততার দিক থেকে সমালোচনা বা طعن في العدالة -এর বিষয়টি প্রধানত : ৫ ভাগে বিভক্ত। যথা :

١. كذب في حديث الرسول. ٢. تهمة بالكذب ٣. الفسق ٤. البدعة ٥. جهالة في الراوي

আমরা পর্যায়ক্রমে এক একটি বিষয়ের উপর আলোচনার প্রয়াস পাব।

১. كذب في حديث الرسول বা হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে মিথ্যা

কোন রাবী থেকে যদি হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে موضوع বা জাল হাদীস বলা হয়। আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে, আলোচনার সুবিধার্থে মারদূদ হাদীসকে আমরা দুইভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। যথা: ضعيف ও موضوع । সুতরাং এখানে আমরা موضوع হাদীস নিয়ে আলোচনা করব না; যদিও হাদীস যয়ীফ হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হল হাদীস মওজু' হওয়া।

হাদীস যয়ীফ হওয়ার অন্যান্য কারণসমূহ নিয়ে আলোচনার শেষে আমরা একটি পৃথক অধ্যায়ে মওজু' হাদীসের উপর বিশদভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

২. تهمة الكذب বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত

তুহমতে কিজবের অর্থ:

যদি কোন রাবীর বর্ণিত হাদীস শরীয়তের সর্বজন বিদিত নীতির পরিপন্থী হয়, আর এই হাদীসটি একমাত্র ঐ রাবী ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে বর্ণিত না পাওয়া যায়: কিংবা যদি রাবী সাধারণ কথাবার্তার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলেন- এ কথা সর্বজন বিদিত হয়, তাহলে এধরণের ব্যক্তিকে متهم بالكذب বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত

বলা হয়। অবশ্য সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলার কারণে অভিযুক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রথমোক্ত বিষয়ের মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার চেয়ে সামান্য হালকা।[১] যে হাদীসের রাবী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক (متروك) হাদীস বলা হয়।

মাত্রূক (المتروك)

আভিধানিক অর্থ

মাতরূক শব্দটি باب نصر থেকে ইসমে মাফঊলের সীগাহ। ترك মূলধাতু থেকে এর অর্থ হল বর্জন করা। আরবরা ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয়ে যাওয়ার পর যে খোলশ পড়ে থাকে তাকে التريكة বলে থাকে। অর্থাৎ বর্জিত খোলশ যা কোন কাজে আসে না। সুতরাং মাতরূক অর্থ বর্জিত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو الحديث الذي ينفرد بروايته من يتهم بالكذب في الحديث – ويدخل فيه من عرف بالكذب في غير الحديث وان لم يظهر كذبه في الحديث–

হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি এককভাবে কোন হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে সেই হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলা হয়। হাদীসে রাসূল ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার ব্যাপারে সর্বজন জ্ঞাত কোন ব্যক্তি যদি এককভাবে কোন হাদীস বর্ণনা করেন (যা অন্য কোন সূত্রে পাওয়া যায় না) তাহলে হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত না হলেও তার হাদীস মাতরূক বা বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।[২] অর্থাৎ যিনি সাধারণ কথা-বার্তায় মিথ্যা বলেন তার এককসূত্রে বর্ণিত হাদীসটি শরীয়তের স্বীকৃত কোন মূলনীতির পরিপন্থী না হলেও তা মাতরূক বলে গণ্য হবে।

মাতরূকের উদাহরণ

حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعى عن جابر عن ابى الطفيل عن على وعمار قالا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر اخر ايام التشريق – وقال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شمر هو متروك الحديث–

নাসায়ী ও দারাকুতনী এ হাদীসের বর্ণনাকারী আমর ইবনে শামির সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, সে মাতরূকুল হাদীস অর্থাৎ তার হাদীস সবসময় বর্জনীয়।

---

[১] কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস পৃ: ৪৩ ও কাফউল আসার পৃ: ১৭।

[২] ফতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ: ১৬৬।

মাতরূকের হুকুম

উসূলবিদ উলামায়ে কিরামের একদলের অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার ব্যাপারে কঠোর, কিন্তু ব্যক্তিগত কথা-বার্তায় মিথ্যা বলার ব্যাপারে শিথিল তার হাদীসও বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।

তবে অন্য আরেক দলের অভিমত এই যে, যিনি হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে মিথ্যা বর্ণনার ব্যাপারে শিথিল বলে খ্যাত কেবলমাত্র তার হাদীসই বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। অন্য ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার ব্যাপারে শিথিল হলেও তার হাদীস বর্জনীয় বলে গণ্য হবে না।

অবশ্য আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী বলেছেন যে, মিথ্যা যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, তাদ্বারা আদালত বাতিল হয় না, তাহলে তার বর্ণিত হাদীস বর্জনীয় না হওয়া উচিৎ। আর যদি মিথ্যা এমন পর্যায়ের হয় যে, তাদ্বারা আদালত বিপন্ন হয়; এমনকি যদি তাদ্বারা শুধু মরুওয়াত বা উন্নত শিষ্টাচারের বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হয় তাহলেও ঐ মিথ্যার কারণে উক্ত রাবীর বর্ণিত হাদীস বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।[১]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

মুহাদ্দেসীনের ব্যবহারে مطروح শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। এদ্বারা কি পৃথক কোন শ্রেণীকে বুঝানো হয়, না মাতরুককে বুঝানোর জন্য তারা মাতরুহ শব্দটি ব্যবহার করেন- এব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে, এটি মাতরুকেরই একটি ভিন্ন নাম মাত্র। তবে অনেকেই এটিকে একটি ভিন্ন প্রকার বলে গণ্য করেন। তাদের মতে যে হাদীসের সনদের মান যয়ীফের চেয়ে নিম্ন কিন্তু মওজু'র চেয়ে একটু উপরের স্তরের সে ধরণের হাদীসকে মাতরুহ (مطروح) বলা হয়।[২]

৩. পাপাচার (الفسق)

আভিধানিক অর্থ

ফিস্‌ক (فسق) শব্দটি باب نصر এর مصدر বা ক্রিয়াধাতু। অর্থ অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, শরীয়তের সীমালঙ্গন করা, অবাধ্যাচরণ করা, নাফরমানী করা, বস্তুতঃ কথায় কিংবা কাজে শরীয়তের সীমালঙ্গন করাকে فسق বলা হয়।

---

[১] ফতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ: ১৬৬।
[২] ফতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ: ১৬৬।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

الفسق هو تجاوز حدود الشرع اتباعا لهوى النفس –

প্রবৃত্তির তাড়নায় শরীয়তের নির্ধারিত সীমা লঙ্গন করাকে ফিসক বা পাপাচার বলা হয়।[১]

বর্ণনাকারী যদি এধরণের পাপাচারে প্রকাশ্যে লিপ্ত হয় বলে জানা যায় তাহলে তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না।

তবে এক্ষেত্রে পাপাচার দ্বারা এমন ধরণের পাপাচারকে বুঝানো হবে যা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত নয়।[২] এবং রাসূল সা.-এর উপর মিথ্যারোপের পর্যায়ের নয়।[৩] কেননা এধরণের পাপাচার হয় কুফর (كفر) বলে আখ্যায়িত হয়, না হয় মিথ্যা (كذب)-এর পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়। কোন রাবীর ব্যাপারে ফিসকের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে মুনকার (منكر) বলা হয়।

* মুনকারের সংজ্ঞা, তার বিধান ও এতদসংশ্লিষ্ট আলোচনা যবতের (ضبط) সাথে সংশ্লিষ্ট (علت طعن) বা সমালোচনার কারণসমূহের আলোচনা শেষে উল্লেখ করা হবে। তথায় দ্রষ্টব্য।

৪. বিদ'আত (البدعة)

আভিধানিক অর্থ

البدعة শব্দটি بَدَعَ – يَبْدَعُ থেকে ইসমে মুশতাক -এর সীগাহ। বাবে فتح থেকে এর অর্থ হয় এমন কিছু সৃষ্টি করা, যার কোন নমুনা পূর্বে বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং بدعة শব্দের অর্থ হবে নবসৃষ্ট, অভিনব। মু'জামুল ওয়াসীতে بدعة শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে ما احدثت في الدين وغيره ধর্মীয় ক্ষেত্রে বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে যা নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে বিদ'আত বলা হয়।[৪]

তবে এক্ষেত্রে বিদ'আতের অর্থ হল রাসূল সা. সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীন থেকে যা সুপ্রমাণিত বা সুবিদিত আছে, তার পরিপন্থী কোন বিষয়ের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়া- অস্বীকৃতির মনোভাব নিয়ে নয়; বরং অগ্রহণযোগ্য কোন দলীলের ভিত্তিতে।

---

১ গ্রন্থকার।

২ শরহে নূখবা পৃ: ৫৫।

৩ কাফউল আসার পৃ: ৭৪।

৪ মু'জামুল ওয়াসীত পৃ: ৪২।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

وهي اعتقاد ما احدث على خلاف ما عرف عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهة –

রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে যা সুবিদিত ও সুপ্রমাণিত আছে তার পরিপন্থী যা কিছু নতুন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে- বিদ্বেষমূলক মনোভাব নিয়ে নয় বরং কোন অগ্রহণযোগ্য দলীলের ভিত্তিতে -তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে বিদ'আত বলা হয়।[১]

যার বিরুদ্ধে বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হবে তার বর্ণিত রিওয়ায়াতকে মারদূদ (المردود) বলা হয়।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী উল্লেখ করেছেন, কোন কোন বিদ'আত কেবলমাত্র আ'মালের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন- কবরে ফুল দেওয়া, মৃতের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা, শবেবরাতে রুটি হালুয়া বিতরণ করা, মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা, তাতে কিয়াম করা ইত্যাদি যেগুলোর কোন শরয়ী ভিত্তি নেই, এ ধরণের বিদ'আতকে বিদ'আতে আমলী বলা হয়।

এধরণের বিষয়কে যদি কেউ দ্বীনি বিষয় বলে বিশ্বাস করে পালন করে, তাহলে তা ফিসক বা পাপাচার বলে গণ্য হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফিসক বা পাপাচারে লিপ্ত কোন ব্যক্তির রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হয় না এবং তৎকর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতকে মুনকার বলা হয়।

আর কিছু বিদ'আতের সম্পর্ক কেবলমাত্র বিশ্বাসের সাথে অর্থাৎ কোন ব্যক্তির এমন ধরণের বিশ্বাস পোষণ করা, যে বিশ্বাস কুরুনে সালাসাহ তথা সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনদের যুগে ছিল না এবং কোন শরয়ী দালায়েলের আলোকেও তা প্রতিষ্ঠিত নয়; যেমন- খারেজী, রাফেযী , মু'তাযিলা, কাদারিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ তথা আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পরিপন্থী বিশ্বাসের অধিকারী সকল ভ্রান্ত ফিরকার বিশ্বাসসমূহ। এধরণের বিদ'আতকে এ'তেকাদী বিদ'আত বলা হয়। এ'তেকাদী বিদ'আত আবার দুইভাবে বিভক্ত। যথা:

১. اعتقاد مكفرة। যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে কাফের বলে গণ্য করা হয় :

অর্থাৎ এমন বিশ্বাস যা দ্বীনের স্বীকৃত কোন বিষয়ের অবিশ্বাসকে অপরিহার্য করে। ফলে তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয়। এধরণের বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির রিওয়ায়াত সর্বসম্মতভাবেই বর্জনীয় বলে গণ্য হয়।

---

[১] শরহে নুখবা পৃ: ৫৬ এবং তৎসংশ্লিষ্ট টিকার ভাব অবলম্বনে।

যেহেতু একদল অন্যদলকে কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে থাকে; তাই কেউ কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করলেই তার রিওয়ায়াত বর্জনীয় বলে গণ্য করা সঙ্গত হবে না। বরং এক্ষেত্রে শরীয়তের মূলনীতি এই যে, কেউ যদি দ্বীনের এমন কোন বিষয়কে অস্বীকার করে, যা মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত এবং সাধারণভাবে তা সর্বজন বিদিত, কিংবা এমন কোন বিষয় দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত ও সর্বজন বিদিত, তাহলে তাকে কাফের বলা হবে। তাই কোন এ'তেকাদী বিদ'আত যদি এমন হয় যা এধরণের কোন স্বীকৃত বিষয়কে অবিশ্বাসের পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যায়, তাহলে এধরণের বিদ'আতে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে কাফের বলে গণ্য করা হবে। আর এমন ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াত সর্বসম্মতভাবেই বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। (কেউ কাউকে কাফের বললেই তার রিওয়ায়াত বর্জনীয় মনে করা যাবে না। বরং কাফের বলে আখ্যায়িত করার বিষয়টি উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে সাব্যস্ত হতে হবে)। [১]

২. اعتقاد مفسقة। যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে ফাসেক বলে গণ্য করা হয় :

অর্থাৎ এমন নবতর বিশ্বাস যা কুফরীর পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছায় না। এধরণের বিশ্বাসে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা যায় না। তবে তাকে ফাসেক বলা হয়। এধরণের বিদ'আতীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে কি না এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি মত রয়েছে। যথাঃ

ক. এ ধরণের বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির রিওয়ায়াত সাধারণভাবেই বর্জনীয় ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এটি মূলত ইমাম মালিক ও তাঁর অনুসারীগণ, কাজী আবুবকর বাকেল্লানী ও তাঁর অনুগামীগণ এবং ইবনে হাজেবসহ পূর্বসূরী আসলাফের এক জমা'আতের অভিমত।

খ. যদি সে তার বিশ্বাসের সমর্থনে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে বৈধ মনে করে, তাহলে তার রিওয়ায়াত সাধারণভাবেই বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।

এটি মূলত ইমাম শাফেয়ী, ইবনু আবি লায়লা, সুফয়ান সওরী, কাজী আবু ইউসুফ, ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম রাযী, ইবনু দাকীকিল ঈদ-সহ অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনে কিরামের অভিমত। অবশ্য এধরণের ব্যক্তি যদি এমন কোন হাদীস বর্ণনা করেন যা তার অনুসৃত বিদ'আতের পরিপন্থী, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

গ. সে যে বিদ'আতে লিপ্ত, যদি অন্যদেরকেও তার প্রতি আহবান করে এবং সে ঐ বিদ'আতের প্রচার-প্রসারে সচেষ্ট থাকে, তাহলে তার রিওয়ায়াত

---

[১] শরহে নুখবা পৃঃ ৭১ ও ফতহুল মুলহিম খঃ ১ পৃঃ ১৭৬।

বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। তবে যদি সে অন্যদেরকে সেই বিদ'আতের প্রতি আহ্বান না করে তাহলে তার রিওয়ায়াত গ্রহণ্যযোগ্য হবে।

আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর ছেলে আব্দুল্লাহ একবার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনি আবু মু'আবিয়া আদ্-দরীর (الضرير) থেকে হাদীস গ্রহণ করেন, অথচ সে একজন মুরজিয়্যাহ, কিন্তু শাবাবাহ্ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন না, আর সে একজন কাদরিয়্যাহ। উত্তরে তিনি বললেন যে, আবু মু'আবিয়াহ্ মুরজিয়্যাহ হলেও সে তার মতাদর্শের প্রতি অন্যদেরকে আহ্বান করে না। আর শাবাবাহ্ কাদরিয়্যাহ মতাদর্শের প্রতি অন্যদেরকে আহ্বান জানায়।

উপরোক্ত মতটি আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী, আল্লামা নববী, ইমাম আহমদ এবং ইবনে হিব্বানসহ অধিকাংশ ফিকাহবিদদের অভিমত। ইবনে হিব্বান উল্লেখ করেছেন যে-

ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف ان الصدوق المتقن اذا فيه بدعة ولم يكـــن يدعوا اليها ان الإحتجاج بأخبارها جائز–

হাদীস বিশারদ ইমামগণের মাঝে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, কোন বর্ণনাকারী যদি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হয়, আর সে যদি কোন বিদ'আতে লিপ্তও থাকে, কিন্তু সেই বিদ'আতের প্রতি অন্যদেরকে আমন্ত্রণ না জানায়, তাহলে তার বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বৈধ হবে।[১]

ঘ. যদি সে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করে যা দ্বারা তার অনুসৃত বিদ'আতটি সমর্থন লাভ করে এবং তার সহযোগিতা হয়, তাহলে তার বর্ণিত সেই হাদীসটি বর্জনীয় বলে গণ্য হবে, অন্যগুলো নয়- যদি সে বিশ্বস্ত ও পরহেজগার হয়। এটি আবু ইসহাক জুয্যানীর অভিমত।

ঙ. বিদ'আতটি যদি হালকা পর্যায়ের হয় তাহলে তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন- মুতাকাদ্দেমীন যাকে تشيع বা শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী বলে অভিহিত করতেন; যেমন- হযরত আলী রা. কে হযরত উসমান রা.-এর উপর প্রাধান্য দেওয়া, রাসূলের পর হযরত আলী রা. কে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে অভিহিত করা ইত্যাদি ধরণের বিশ্বাস। এধরণের বিশ্বাসে বিশ্বাসী বিদ'আতীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে।

কিন্তু মুতাআখখেরীন (تشيع) বা শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী বলে যা বুঝিয়ে থাকেন; যেমন- হযরত আবু বকর ও উমর রা.-এর আনুগত্য থেকে

---

[১] মাসসিকাত খ: ৬, পৃ: ১৪০ ও যফরুল আমানী পৃ: ১৯১ - ১৯২।

বেরিয়ে আসার ঘোষণা দেওয়া, তাঁদেরকে গালিগালাজ করা, কিংবা হযরত আলী রা.-এর প্রতিপক্ষ সকল সাহাবীদেরকে গালিগালাজ করা ইত্যাদি। এধরণের বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না। এটি আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.-এর অভিমত।[১]

যার বিরুদ্ধে এমন বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হবে- যার কারণে তৎকর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হয় না- তার বর্ণিত রিওয়ায়াতকে অনেকেই মারদূদ নামে অভিহিত করেছেন। তবে আমাদের মতে বিদ'আতীর হাদীসকে মুনকার নামে অভিহিত করা যুক্তি সঙ্গত। কেননা বিদ'আতও ফিসকের পর্যায়ভুক্ত। আর ফিসকের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাদীসকে মুনকার বলা হয়ে থাকে।[২] মুনকারের আলোচনা পরে আসছে।

৫. বর্ণনাকারী সম্পর্কে অজ্ঞতা (جهالة في الراوي)

আভিধানিক অর্থ

جهالة শব্দটি الجهل মূলধাতু থেকে উদ্গত باب سمع -এর মাসদার বা ক্রিয়াধাতু। এটি العلم-এর বিপরীত অর্থবোধক। যেহেতু العلم অর্থ জ্ঞাত হওয়া, সুতরাং جهالة এর অর্থ হবে অজ্ঞতা, অজানা, অপরিচিত। جهالة الراوي অর্থ বর্ণনাকারী সম্পর্কে অজ্ঞতা। مجهول : ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার পরিচয় অজ্ঞাত। আবার ঐ রিওয়ায়াতকেও বলা হয় যার কোন রাবীর পরিচয় অজ্ঞাত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو عدم معرفة الراوي سواء كان عينه أو حاله –

১. রাবী সম্পর্কে অজ্ঞতা, তা তার ব্যক্তিসত্ত্বা সম্পর্কেই হোক কিংবা তার অবস্থা অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য কি না সে সম্পর্কেই হোক।[৩]

কোন রাবী জাহালতের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তৎকর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতকে মজহুল বলা হয়।

---

[১] যফরুল আমানী পৃ: ৪৮৯- ৪৯২ এবং ফতহুল মুলহিম ১৭৬-১৭৮ পৃষ্ঠার তথ্য অবলম্বনে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত।

[২] -গ্রন্থকার

[৩] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীসে প্রদত্ত সংজ্ঞার ভাব অবলম্বনে পৃ: ১১৯।

মজহুলের বিধান

মজহুল হাদীসের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে অর্থাৎ রাবী সম্পর্কে অজ্ঞতা বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারে। সে প্রেক্ষিতে মজহুলের বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। নিম্নে মজহুলের প্রকার এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিধান পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল।

বর্ণনাকারী বা রাবী সম্পর্কে অজ্ঞতা সৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ

বিভিন্ন কারণে রাবী সম্পর্কে অজ্ঞতা সৃষ্টি হতে পারে। তম্মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি উল্লেখযোগ্য। যথা :

* **রাবীর পরিচয় একাধিক থাকার কারণে :** অর্থাৎ যদি রাবীর একাধিক নাম থাকে বা একাধিক উপনাম (كنيت) কিংবা একাধিক খেতাবী নাম (لقب) থাকে অথবা যদি তার একাধিক গুণবাচক নাম থাকে অথবা যদি তিনি বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত থাকেন, কিংবা যদি বাবা, দাদা, কিংবা পরদাদা এদের একেক জনের সাথে সম্পর্কিত করে একেক সময় তাকে ডাকা হয়। এতসব পরিচয়ের মাঝে কোন একটি পরিচয়ে তিনি হয়ত অধিক খ্যাত থাকেন। আর যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক সেই খ্যাত নাম বা পরিচিতিটি উল্লেখ না করে অখ্যাত কোন নাম বা পরিচয়ে যদি তাকে উল্লেখ করা হয়, তাহলে পরবর্তীদের কাছে তার পরিচয় অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি পরবর্তীরা তাকে ভিন্ন নামের একজন ভিন্ন ব্যক্তি বলেও মনে করতে পারেন। ফলে এই বর্ণনাকারী সম্পর্কে অজ্ঞতা সৃষ্টি হবে। যেমন- মুহাম্মদ ইবনুস্-সায়েব আল কালবী, অনেকেই তাকে তার দাদার দিকে নিসবত করে 'মুহাম্মদ ইবনে বিশর' বলে উল্লেখ করেছেন, আবার অনেকেই তাকে 'হাম্মাদ ইবনুস-সায়েব' নামে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকেই তার কুনিয়ত বা ডাক নাম উল্লেখ করেছেন আবুন্ নজর, আবু সাঈদ, আবু হিশাম। ফলে মনে হয় যেন এরা একদল লোক, কিন্তু বাস্তবে একই ব্যক্তি।[১] এধরণের বর্ণনাকারীকে সাধারণত মজহুল বলা হয়।

* **তাথেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা নিতান্ত কম হওয়ার কারণে :** অর্থাৎ বর্ণনাকারী এমন যে, তাথেকে এক বা দু'টি মাত্র হাদীস বর্ণিত। যে কারণে তাথেকে বর্ণনাকারীর সংখ্যাও নিতান্ত কম হয়। অনেক সময় মাত্র একজন বর্ণনাকারীই তাথেকে হাদীস বর্ণনা করেন; ফলে তার নাম জানা গেলেও

---

১ শরহে নুখবা পৃ: ৬৯।

পরিচিতি সুস্পষ্ট হয় না। যেমন আবুল উশারা' (عشراء) আদ্-দারেমী একজন তাবেয়ী। তাখেকে কেবলমাত্র হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১] এধরণের ব্যক্তিকে মজহুলুল আইন (مجهول العين) বলা হয়।

*** নাম উল্লেখ না করার কারণে :** সংক্ষেপায়ন বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অনেক সময় বর্ণনাকারী তৎপূর্ববর্তী রাবীর নাম উল্লেখ করেন না। বরং حدثنا شيخ، أو رجل مصري أو رجل ثقة ইত্যাদি ধরণের শব্দ উল্লেখ করে থাকেন। ফলে এ রাবী সম্পর্কে অজ্ঞতা সৃষ্টি হয়। রাবীর নাম পরিচয় উল্লেখ না করে এধরণের শব্দে হাদীস বর্ণনা করলে এধরণের হাদীসকে মুবহাম (مبهم) বলা হয়।

*** একই নাম-পরিচয়ের একাধিক রাবী থাকার কারণে :** একই নাম পরিচয়ের একাধিক রাবী থাকলেও জাহালত বা অজ্ঞতা সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ যদি একই নামের দুইজন রাবী থাকে তাহলে পিতার নাম উল্লেখ করা দ্বারা দ্বন্দ্ব নিরসন হয়। কিন্তু যদি দু'জনের বাপের নামও একই হয় তাহলে দাদার নাম উল্লেখ করা দ্বারা সেই দ্বন্দ্ব নিরসন হতে পারে। কিন্তু যদি দাদার নামও একই হয় তাহলে অজ্ঞতা থেকেই যাবে। অনুরূপভাবে উপনাম, খেতাবী নাম, পেশাগত পরিচয়েও দু'জনের ঐক্য ঘটতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে যতটুকুতে দু'জনের মিল রয়েছে সেই পরিচয়ে যদি রাবীকে উল্লেখ করা হয় তাহলেও জাহালত সৃষ্টি হতে পারে। এধরণের কারণে অজ্ঞতা সৃষ্টি হলে সেই রাবীকে মুহমাল (مهمل) বলা হয়।

উল্লেখ্য রাবী যদি জাহালতের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তাহলে তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে সাধারণভাবে মজহুল বলা হয়। অর্থাৎ মুবহাম, মুহমাল, এগুলোও মৌলিকভাবে মজহুলেরই অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে মজহুলকে চার প্রকারে ভাগ করা যায়। যথা:

১. **মুবহাম :** হয়ত ব্যক্তির নাম উল্লেখই নেই, এধরণের হাদীসকে মুবহাম বলা হয়। এধরণের হাদীস সাধারণত গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা যার ব্যক্তি-সত্ত্বাই অজ্ঞাত তার অবস্থা তো অবশ্যই অজ্ঞাত থাকবে। আর অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না। যিনি তাখেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি যদি তাকে নির্ভরযোগ্য বলেও মন্তব্য করেন (যেমন, তিনি বললেন- حدثنا ثقة) তাহলেও তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবেনা। কেননা বর্ণনাকারীর বিবেচনায় তিনি নির্ভরযোগ্য হলেও অন্যের বিবেচনায় হয়ত নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য নাও হতে

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃঃ ১২০।

পারেন। অথচ এক্ষেত্রে নাম উল্লেখ না থাকার কারণে অন্যের বিবেচনার পথ রুদ্ধ।[১]

তবে যদি তাথেকে যিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি তার নাম কোথাও উল্লেখ করে থাকেন, কিংবা অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত থাকে এবং সেই সূত্রে তার নাম উল্লেখ থাকে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়- যদি গ্রহযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ তার মাঝে বিদ্যমান থাকে।

২. **মুহমাল :** নাম উল্লেখ থাকলেও যদি এ নামের একাধিক বর্ণনাকারী থাকেন এবং তাদের মাঝে সংশ্লিষ্ট হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তিটি কোন্ ব্যক্তি তা সনাক্ত করা না যায়, তাহলে এধরণের হাদীসকে মুহমাল বলা হয়। মুহমাল হাদীস প্রাথমিক বিবেচনায় বর্জনীয়। তবে যদি কোন উপায়ে এই দ্বন্দ্বের নিরসন হয় তাহলে উক্ত রাবী যে স্তরের ব্যক্তি সে হিসাবে হাদীসের স্তর নির্ধারিত হবে। আর যদি দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব না হয় আর দেখা যায় যে একই নামের ঐ দুই জন ব্যক্তিই নির্ভরযোগ্য, তাহলে হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর যদি দুই জনের একজন যয়ীফ হয় কিংবা উভয়েই যয়ীফ হয় তাহলে হাদীস বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। আর যদি দুই জনের কারো অবস্থা জানা না যায় তাহলে দ্বন্দ্ব জটিল প্রকৃতির হবে।[২] এবং সে ক্ষেত্রে হাদীসটিকে স্থগিত বলে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়।

৩. **মজহুলুল আইন :** যদি নাম উল্লেখ থাকে অন্য কোন পরিচয় জানা না যায় এবং একজন মাত্র বর্ণনাকারী তাথেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ তাথেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেনি, তাহলে এধরণের বর্ণনাকারীকে মজহুলুল আইন (বা যার ব্যক্তিসত্তা অজ্ঞাত) বলা হয়।

এধরণের ব্যক্তির বর্ণিত রিওয়ায়াত সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। তবে যদি ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে পাণ্ডিত্য রাখেন এমন কোন ব্যক্তি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে সনাক্ত করেন কিংবা যিনি তাথেকে হাদীস বর্ণনা করছেন তার মাঝে যদি ব্যক্তিপরিচয় নির্ধারণের পাণ্ডিত্য থাকে, আর তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেন, তাহলে তখন তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।[৩] আর যদি সলফকে উক্ত রিওয়ায়াতের উপর আমল করতে দেখা যায়, তাহলে রাবীর জাহালত দূর হয়ে যাবে এবং তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে।[৪] কিংবা যদি তাথেকে যারা হাদীস

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ১২১-১২২ আংশিক বর্ধিত, শরহে নুখবা পৃ: ৬৯-৭০।

[২] কাওয়ায়েদ ফী উলুমিল হাদীস পৃ: ৪৫।

[৩] শরহে নুখবা পৃ: ৭০।

[৪] ফাতহুল মুলহিম পৃ: ১৭৫।

বর্ণনা করেছেন তাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি থাকেন, যিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না, যেমন- ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ, ইবনে মাহদী প্রমুখ তাহলেও সেই রিওয়ায়াতটি গ্রহণযোগ্য হবে।[১]

৪. **মজহুলুল হাল :** ব্যক্তি পরিচয় উল্লেখ থাকলেও তার অবস্থা অজ্ঞাত; অর্থাৎ তাথেকে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি নির্ভরযোগ্য কি না, এই মন্তব্য কেউ করেননি। এধরণের ব্যক্তিকে মজহুলুল হাল (যার অবস্থা অজ্ঞাত) বলা হয়। এধরণের ব্যক্তিকে মসতূর (مستور) নামেও উল্লেখ করা হয়।

মসতূরের বর্ণিত হাদীসের বিধান একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয়। কেননা হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান, ইবনে হিব্বান ও ইমাম আবু হানীফা রহ.-সহ এক জামাতের অভিমত এই যে, কোনরূপ শর্ত শারায়েত ছাড়াই মসতুরের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য অন্য আরেক জামাতের অভিমত এই যে, মসতূরের রিওয়ায়াত বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।

অবশ্য আল্লামা ইবনে হজর উল্লেখ করেছেন যে, গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, মসতূর এবং এধরণের আরো যা আছে (যেমন- মুবহাম, মুহমাল) এধরণের রাবীদের বর্ণিত রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য কিংবা বর্জনীয় হওয়ার মন্তব্য ঢালাওভাবে করা যাবে না। কেননা সেই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিটি নির্ভরযোগ্যও হতে পারেন -এই সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এধরণের ব্যক্তিদের বর্ণিত রিওয়ায়াতকে স্থগিত রাখা হবে, যতক্ষণ না তার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়। ইমামুল হারামাইন এমতের উপরই জোর দিয়েছেন। ইবনুস সালাহ-এর মক্তব্যও অনুরূপ।[২]

আল্লামা সাখাভী ইব্‌নে রুশায়দ-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, যদি তাথেকে অনেক ব্যক্তি হাদীস আহরণ করে থাকেন তাহলে তার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সুধারণা সৃষ্টি হয়।[৩]

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বলেছেন যে, যদি সে ব্যক্তি ইলমী দুনিয়ায় পরিচিত নাও হয়, কিন্তু তাকওয়া ও পরহেজগারীর ব্যাপারে খ্যাত হয়, তাহলেও তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে।[৪] তবে অধমের মতে তখন আর ব্যক্তিটি মসতূরই থাকে না। কেননা যে কোন ভাবেই হোক তার অবস্থা সম্পর্কে অবগতি অর্জন হয়ে যায়।

---

[১] ফতহুল মুলহিম পৃ: ১৭০।

[২] শরহে নুখবা পৃ: ৭১।

[৩] ফতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ: ১৭৭।

[৪] ফতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ: ১৭৭।

অবশ্য আল্লামা ইবনূল হুমাম আত্-তাহরীরে উল্লেখ করেছেন যে,

المجهول الذي هو المستور غير مقبول.

মজহুল -যাকে মসতূর বলা হয় তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়।[১]

তবে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে একটি মত এরূপ বর্ণিত আছে যে,

قبول ما لم يرده السلف.

যদি পূর্বসূরী মনীষীগণ তার রিওয়ায়াত বর্জন না করে থাকেন তাহলে এধরণের মসতূর ব্যক্তির রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে।[২] হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান ও ইবনে হিব্বানও এই মত পোষণ করেন। তবে হানাফীগণের অনেকের অভিমত এই যে, পূর্ব কালের মানুষের পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি বর্তমানের তুলনায় কম ছিল; তাই সেকালের মসতূর রাবীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হলেও বর্তমান যুগের অবস্থা এমন নয়। তাই এ যুগে কোন ব্যক্তি মসতূরুল হাল হলে তাকে অজ্ঞাত পরিচয় বলেই গণ্য করা হবে এবং তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না।

সারকথা এই যে, মজহুলুল আইন বা মজহুলুল হাল অর্থাৎ যাথেকে এক বা দু'টি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে মাত্র, কিন্তু তিনি নির্ভরযোগ্য কি অনির্ভরযোগ্য, উস্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সংশ্রব ছিল কি না, এসব কিছুই জানা যায়নি; যদি সলফ তাথেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি গ্রহণ করে থাকেন কিংবা এ হাদীসের ব্যাপারে তারা কোন মন্তব্য না করে থাকেন, কিংবা যদি তার হাদীস গ্রহণ বর্জনের ব্যাপারে তাদের মাঝে মতভিন্নতা থাকে, কিংবা যদি তাথেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি থাকেন যিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না, তাহলে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এধরণের রিওয়ায়াতকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।[৩]

কেননা তারা রিওয়ায়াতটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতেন না। তাছাড়া যদি তা নির্ভরযোগ্য না হত তাহলে তারা অবশ্যই এ ব্যাপারে নিরব থাকতেন না।

আর যদি সলফ সর্বসম্মতভাবেই হাদীসটি বর্জন করে থাকেন তাহলে তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

তবে যদি সলফের যুগে হাদীসটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে, ফলে তাদের গ্রহণ বর্জন কোনটাই নির্ণীত হয়নি এরূপ হয়, তাহলে এধরণের হাদীসের ভিত্তিতে আমল করা যাবে, তবে তা অপরিহার্য পর্যায়ের বলে গণ্য হবে না।

---

১ তাহরীর লি ইবনে হুমাম, ফতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ:১৭৪।

২ ফতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ:১৭৪।

৩ ফতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ:১৭৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাবীর আদালতের অজ্ঞতা বলতে বাহ্যিক অজ্ঞতাকেই বোঝানো হবে। কেননা বাতেনীভাবে ব্যক্তিটি আদেল বা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ কি না, বা পাপাচার মুক্ত কি না, সেটা কারো জন্য জানা সম্ভব নয়। বস্তুত আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়। কেননা আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানা সম্ভব নয়। যদিও আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে তা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে শর্ত-শারায়েতের প্রয়োজন তার চেয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হালকা, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে কঠিন। যেমন:

১. আদালতে সাক্ষী দেওয়ার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ হওয়ার শর্ত রয়েছে। কিন্তু হাদীস বর্ণনার জন্য কোন ক্ষেত্রেই এ শর্ত নেই।
২. নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কেউ সাক্ষী দিলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। অথচ নিজের স্বার্থের পক্ষে হাদীস পেশ করলে তা গ্রহণ করা হয়।
৩. বিদ'আতীর সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণ করা হয়, সে তৎকর্তৃক উদ্ভাবিত বিদ'আতের প্রতি অন্যদেরকে আহ্বান জানালেও। কিন্তু এরূপ বিদ'আতীর রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হয় না।
৪. যার সাথে কারো শত্রুতা রয়েছে তার বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষ্য দিলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়না; অথচ এধরণের একজন অন্যজন থেকে হাদীস বর্ণনা করলে তা গ্রহণ করা হয়।
৫. পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না, কিন্তু পিতা থেকে পুত্রের রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হয়।[১]

মজহুলের উপর লিখিত গ্রন্থাবলী

১. الموضوع باوهام الجمع والتفريق : রাবীদের একাধিক নাম পরিচয়ের উপর রচিত খতীব বাগদাদীর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
২. الوحدان : যাদের থেকে কেবলমাত্র একজন রাবী হাদীস আহরণ করেছেন, তাদের উপর রচিত ইমাম মুসলিমের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ নামে আরো অনেকেরই গ্রন্থ রয়েছে।
৩. الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة : মুবহাম রাবীদের উপর রচিত খতীবে বাগদাদীর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মুবহাম রাবীদের উপর আরো অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন।
৪. المبهمات المستفاد من مبهمات المتن والإسناد : মতন ও সনদের মুবহামাত সম্পর্কে রচিত আল্লামা ওয়ালী উদ্দীন আল ইরাকীর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

---

[১] যফরুল আমানী -৪৯৫

যব্‌তের সাথে সম্পর্কিত ত্রুটিসমূহ

যব্‌তের সাথে সম্পর্কিত ইল্লতে ত'আন বা রাবীদের সমালোচনার কারণ মোট ৫টি। যথা:

১. স্মৃতি দূর্বলতা জনিত ব্যাপক ভুল (سوء الحفظ)

২. অসতর্কতা জনিত মারাত্মক ভুল (فحش الغلط)

৩. হাদীস আহরণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অসতর্কতা (الغفلة في الضبط والتحمل)

৪. ব্যাপক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব (كثرة الوهم)

৫. নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার পরিপন্থী বর্ণনা (مخالفة الثقات)

- **ক.** মুদরাজ
- **খ.** মাকলূব
- **গ.** মাযীদ ফি মুত্তাসিলিল আসানীদ
- **ঘ.** মুযতারিব
- **ঙ.** মুসাহ্‌হাফ/মুহার্‌রাফ

যদিও মুদরাজ, মাকলূব, মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ, মুযতারিব, মুসাহ্‌হাফ, মুহার্‌রাফ ইত্যাদি বিষয়সমূহ হাদীস মুআল্লাল (معلل) হওয়ার কারণসমূহের কতিপয় উল্লেখযোগ্য কারণ। কিন্তু এসব কারণে হাদীস সিকাহ রাবীদের বর্ণনার পরিপন্থী এবং তাদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে যায়। একারণে ইবনে হজর এগুলোকে مخالفة الثقات এর অধীনে আলোচনা করেছেন। আমরাও মুখস্ত রাখার সুবিধার দিক বিবেচনা করে ইবনে হজরকে অনুসরণ করেছি।

১. স্মৃতিদৌর্বল্য জনিত ব্যাপক ভুল (سوء الحفظ)

স্মর্তব্য যে, ভুল সাধারণত দুই কারণে হয়। যথা:

১. স্মৃতিদৌর্বল্যের কারণে।

২. অসতর্কতার কারণে।

سوء الحفظ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল মন্দ স্মৃতিশক্তি বা দুর্বল স্মৃতিশক্তি। স্মৃতিদুর্বলতা জনিত কারণে যার ভুল বেশী হয় তাকে سيئ الحفظ বা স্মৃতিদুর্বল ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়। ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন যে, এমন ব্যক্তিকে স্মৃতিদুর্বল

বলে আখ্যায়িত করা হবে যার ভুল বেশী হয়। سيئ الحفظ بحيث يكثر منه الخطاء অর্থাৎ এমন স্মৃতিদুর্বল যে, তাথেকে ব্যাপক হারে ভুল হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو حالة في الإنسان ينسى كثيرا ما يحفظ، بحيث يغلب عليه النسيان –

মানুষের এমন এক অবস্থাকে স্মৃতিদৌর্বল্য বলা হয় যে, সে যা স্মৃতিতে ধারণ করে তার অনেক কিছুই সে ভুলে যায় এবং ভুলে যাওয়াটা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে।[১]

তবে হাদীসশাস্ত্রে স্মৃতিদৌর্বল্য বলে কেমন ধরণের স্মৃতিদৌর্বল্যকে বুঝানো হবে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হজর উল্লেখ করেছেন-

المراد به من لم يرجح جانب اصابته على جانب خطائه –

হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় স্মৃতিদুর্বল বলতে এমন ধরণের ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যার সঠিক বর্ণনা ভুল বর্ণনার চেয়ে প্রাধান্য পায় না।[২] অর্থাৎ ভুলের সংখ্যা বেশী কিংবা ভুল ও নির্ভুল দু'টোই সমান সমান। তবে যদি ভুলের পরিমাণ নির্ভুল বর্ণনার চেয়ে কম হয় তাহলে সে ব্যক্তি স্মৃতিদুর্বল বলে বিবেচিত হবে না বরং সে ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য (مقبول) বলে বিবেচিত হবে।[৩]

স্মৃতিদৌর্বল্যের প্রকারভেদ

স্মৃতিদৌর্বল্য সাধারণত দুই ধরণের হয়ে থাকে। যথা:

১. لازم বা স্থায়ী স্মৃতিদৌর্বল্য : অর্থাৎ জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার মাঝে এই স্মৃতিদৌর্বল্য বিদ্যমান ছিল।

যে রাবীর স্থায়ী স্মৃতিদৌর্বল্যের সমস্যা রয়েছে তার বর্ণিত হাদীসকে এক শ্রেণীর মুহাদ্দিস শায্ (شاذ) বলে থাকেন। তাদের কাছে হাদীস শায্ হওয়ার জন্য مخالفة الثقات বা নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণিত রিওয়ায়াতের পরিপন্থী হওয়ার শর্ত নেই।[৪] কেবল রাবী স্মৃতিদুর্বলতার শিকার হলেই তার হাদীস শায্ বলে গণ্য হবে। তবে শায্ (شاذ)-এর নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা হল, যে হাদীস কোন ثقة বা নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত, কিন্তু তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে

---

১ -গ্রন্থকার

২ শরহে নূখবা -পৃ: ৭৩-৭৪ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস- পৃ: ১২৫.।

৩ টিকা শরহে নূখবা পৃ: ৫৬।

৪ টিকা -শরহে নূখবা পৃ: ৪০।

তৎকর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতের পরিপন্থী রিওয়ায়াত বিদ্যমান আছে; এমন ধরণের রিওয়ায়াতকে শায বলা হয়।[১]

বস্তুত বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে মনে হয় যে, উভয় সংজ্ঞার মাঝে বিরাট ধরণের কোন পার্থক্য নেই। কেননা কোন নির্ভরযোগ্য রাবী যখন পূর্বোল্লেখিত পর্যায়ের স্মৃতিদৌর্বল্যের শিকার হবেন তখন তৎকর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণিত রিওয়ায়াতের পরিপন্থী হতেই পারে। তবে পার্থক্য দাড়াবে তখন, যখন স্মৃতিদৌর্বল্যের শিকার কোন রাবী এমন কোন রিওয়ায়াত বর্ণনা করবেন, যা তার চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার পরিপন্থী হবে না। তখন প্রথমোক্ত সংজ্ঞার আলোকে সেটিও শায বলে গণ্য হবে। কিন্তু শাযের নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞার আলোকে এহেন হাদীস শায বলে গণ্য হবে না।[২] শায্ হাদীস সব সময় মারদূদ বলে গণ্য হয়।[৩]

২. **طاري বা পরে সৃষ্ট স্মৃতিদৌর্বল্য :** অর্থাৎ যে স্মৃতিদৌর্বল্য পূর্বে ছিল না, পরে কোন কারণে তা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বার্ধক্য জনিত কারণে সৃষ্ট স্মৃতিদৌর্বল্য, দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার কারণে কিতাবাদী পাঠ করা সম্ভব হয়না বলে সৃষ্ট স্মৃতিদৌর্বল্য; বা যে পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন তা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বা হারিয়ে যাওয়ার কারণে (তা দেখার সুযোগ নেই বিধায় স্মৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, ফলে ভুল হয়। এহেন কারণে) সৃষ্ট স্মৃতিদৌর্বল্য ইত্যাদি।

যিনি এধরণের কারণে স্মৃতিদুর্বলতার শিকার, তাকে (مُخْتَلِط) মুখতালিত বলা হয় এবং তার বর্ণিত হাদীসকে (مُخْتَلَط) মুখতালাত বলা হয়।[৪]

এধরণের স্মৃতিদৌর্বল্যের শিকার কোন ব্যক্তি যেসব রিওয়ায়াত এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে বর্ণনা করেছেন সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে। আর যেসব রিওয়ায়াত স্মৃতিদৌর্বল্য সৃষ্টি হওয়ার পরে করেছেন সেগুলো বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।

কিন্তু যেসব রিওয়ায়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে না যে, সেগুলো এই অবস্থা সৃষ্টির পূর্বে না পরে বর্ণিত, সেগুলোকে স্থগিত বলে গণ্য করা হবে- যতক্ষণ না তা সুস্পষ্ট হয়। অর্থাৎ সেগুলোকে গ্রহণযোগ্যও বলা যাবে না বা বর্জনীয়ও বলা যাবে না।[৫]

---

[১] তুহফাতুত্ দুরার পৃ: ১৬ শরহে নুখবা ৪০।

[২] গ্রন্থকার।

[৩] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস -১২৫।

[৪] শরহে নুখবা- পৃ: ৭৪, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস- পৃ: ১২৫।

[৫] শরহে নুখবা- পৃ: ৭৪।

যেমন হযরত 'আতা রহ. শেষ বয়সে স্মৃতিদৌর্বল্যের শিকার হয়ে ছিলেন। এই সমস্যা দেখা দেওয়ার আগে তাথেকে শো'বা এবং সুফয়ান সাওরী হাদীস আহরণ করে ছিলেন। আর স্মৃতিদৌর্বল্যের পর তাথেকে জারীর (جرير) ইবনে আব্দুল হামীদ হাদীস আহরণ করে ছিলেন। কিন্তু আবু আওয়ানা এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেও তাথেকে হাদীস আহরণ করেছেন এবং পরেও হাদীস আহরণ করেছেন।[১]

অনুরূপভাবে কোন রাবীর মুখতালিত হওয়ার ব্যাপারে যদি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে তার রিওয়ায়াতও স্থগিত বলে গণ্য হবে।[২]

তবে যদি স্মৃতিদৌর্বল্যের শিকার কোন ব্যক্তির বর্ণিত রিওয়ায়াতের সমর্থনে অন্য এমন কোন নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত কোন রিওয়ায়াত পাওয়া যায়, যে তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য কিংবা অন্তত তার সমপর্যায়ের নির্ভরযোগ্য, তাহলে তখন সেই রিওয়ায়াতটি হাসান লিগায়রিহির মর্যাদা পাবে।[৩]

২. অসর্তকতা জনিত মারাত্মক ধরণের ভুল (فحش الغلط)

অসতর্কতা জনিত কারণেও মানুষের ভুল হয়। তবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এধরণের ভুল যদি ব্যাপক ভিত্তিতে হয় তাহলে তাকে فحش الغلط বলা হয়। ব্যাখ্যাকারগণ فحش الغلط এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে- مغفلا بحيث يغلب عليه الخطاء এমন অসতর্ক যে, ভুল তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। فحش الغلط এর অভিযোগে অভিযুক্ত রাবীকে فاحش الغلط বলে আখ্যায়িত করা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو خطأ الراوي في رواية الحديث لعدم تيقظه بحيث يغلب عليه الخطاء

রাবীর অসতর্কতা ও অসচেতনতার কারণে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এত ভুল হওয়া যে, ভুল তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে অর্থাৎ তার ভুলের পরিমাণ নির্ভুল বর্ণনার চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। রাবীর এধরণের সমস্যাকে فحش الغلط বলা হয়। فحش الغلط এর অভিযোগে অভিযুক্ত রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুনকার (منكر) বলা হয়। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন কারণেই হাদীস মুনকার বলে গণ্য হয়। তাই মুনকার হাদীসের বিধান সংক্রান্ত আলোচনা পরে একসাথে منكر শিরোনামের অধীনে করা হবে।

---

[১] টিকা - শরহে নুখবা।

[২] শরহে নুখবা - পৃ: ৭৪।

[৩] শরহে নুখবা - পৃ: ৭৪।

৩. হাদীস আহরণ, ধারণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অসতর্কতা

(الغفلة في التحمل والضبط والصيانة)

গাফলত (غفلة) শব্দের অর্থ হল অসতর্কতা, উদাসীনতা, অমনোযোগিতা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

غفلة الراوي في تحمل الحديث و ضبطه وصيانته، حفظاً أو كتابةً

হাদীস আহরণ, তা অন্তরে ধারণ বা স্মৃতিতে সংরক্ষণ অথবা পাণ্ডুলিপিতে ধারণ ও তা সংরক্ষণের ব্যাপারে অমনোযাগী হওয়া বা যত্নবান না হওয়াকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গাফলত (غفلة في التحمل) বলে।

এটি হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীনতার পরিচায়ক। কোন রাবীর মাঝে এ ধরণের অবস্থা পরিলক্ষিত হলে সে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রেও বিশ্বস্ততা হারায়। কারণ সে যেহেতু সে ধারণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে যত্নবান ছিল না, তাই সে যা র্বণনা করবে তা নির্ভুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

কোন রাবী غفلة في التحمل এর অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসকেও মুনকার منكر বলা হয়। মুনকারের বিধান সংক্রান্ত আলোচনা পরে মুনকার অধ্যায়ে আসবে।

৪. ব্যাপক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব (كثرة الاوهام)

যবতের সাথে সংশ্লিষ্ট রাবী সমালোচিত হওয়ার কারণ সমূহের চতুর্থ প্রকার হল কাছরতে আওহাম বা ব্যাপক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। কোন রাবী যদি স্মৃতিদুর্বলতা জনিত কারণে ব্যাপক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হয়, আর সে কারণে তার ভুল হয় এবং তা যদি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, প্রায়ই তাথেকে এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেতে এবং ভুল হতে দেখা যায়, তাহলে তাকে كثيرالاوهام বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসকেও যয়ীফ বলে গণ্য করা হয়। কেননা তিনি কোথায় কি উলট-পালট করেছেন বা আদৌ কোন উলট-পালট করেছেন কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

কাছরতে আওহাম বা ব্যাপক দ্বিধাদ্বন্দ্বের অভিযোগে অভিযুক্ত কোন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে معلل বলা হয়।

মুআল্লাল (المعلل)

মু'আল্লাল (المعلل) শব্দটি باب افعال থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। যদিও باب افعال থেকে اسم مفعول এর সীগাহ নিয়মানুসারে مُعَلٌّ হওয়ার কথা এবং مُعَلٌّ

হওয়াটাই ব্যাকরণের বিধিসম্মত ও বিশুদ্ধতম ব্যবহারও বটে। কিন্তু হাদীস বিশারদগণ ব্যাকরণের সর্বজন বিদিত নিয়মের ব্যতিক্রম করে শব্দটিকে مَعْلُلٌ উচ্চারণ করে থাকেন বলে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। আবার অনেক মুহাদ্দিস শব্দটিকে معلول উচ্চারণ করেছেন, আর এটি আরবী ভাষা অভিধানের আলোকে নিতান্ত দুর্লভ ও বর্জিত ব্যবহার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অধমের কাছে মনে হয় যে, যারা معلل বা معلول উচ্চারণ করেছেন তারাও যথার্থ ব্যবহারই করেছেন। কেননা শব্দটি علّ – يعلّ باب سمع থেকে যদি ধরা হয় তাহলে তার ইসমে মাফউল معلول হওয়াই বিধিসম্মত। আর বাবে سمع থেকে শব্দটির অর্থ হল অসুস্থ হওয়া ও ত্রুটিযুক্ত হওয়া। যেমন আরবরা বলে থাকেন عل فلان أي مرض অর্থাৎ অমূক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অতএব معلول -এর অর্থ হবে অসুস্থ ও ত্রুটিপূর্ণ। সে ভিন্ন কথা যে, তারা লোকটি অসুস্থ একথা বুঝানোর জন্য هو معلول এ শব্দটি সাধারণত: ব্যবহার করেন না। বরং তারা এক্ষেত্রে বলে থাকেন هو ذو علة أو هو عليل। অভিধানে যেখানে معلول শব্দটির ব্যবহার দুর্লভ বলা হয়েছে, এদ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, সে অসুস্থ -এই অর্থ বুঝানোর জন্য এই শব্দটির ব্যবহার দুর্লভ। আর যদি শব্দটিকে باب تفعيل থেকে গণ্য করা হয়; তাহলে তার ইসমে মাফউল معلل হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। باب تفعيل থেকে শব্দটির অর্থ হয় কোন বিষয়ের ত্রুটি উল্লেখ করা, ত্রুটি উদ্ঘাটন করা। যেমন আরবরা বলে থাকেন علل فلان الشئ সে বস্তুটির ত্রুটি উদ্ঘাটন করেছে বা ত্রুটি বর্ণনা করেছে। সুতরাং معلل শব্দের অর্থ হবে যারার মাঝে কোন ত্রুটি উদ্ঘাটন করা হয়েছে বা যার মাঝে কোন ত্রুটির উল্লেখ করা হয়েছে।

আর বাবে افعال থেকে শব্দটির অর্থ হয়, ত্রুটিপূর্ণ বলে গণ্য করা। যেমন আরবরা বলে থাকেন اعل الشئ أي جعله ذا علة অর্থাৎ সে বস্তুটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে গণ্য করেছে। তাই معلّ -এর অর্থ হবে, যে বস্তুকে ত্রুটিপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়েছে।[১]

সুতরাং মুহাদ্দিসগণ বাবে তাফয়ীল থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ হিসাবে معلل উচ্চারণ করেছেন কিংবা বাবে سمع থেকে معلول উচ্চারণ করেছেন এটাই স্বাভাবিক। কেননা باب تفعيل ও باب سمع থেকে এর যে অর্থ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সে প্রেক্ষিতে ব্যকরণের বিধি অনুসারেই معلل ও معلول উচ্চারণ করা অর্থের দিকে থেকে কিছুতেই অসঙ্গত নয় এবং বিধি বহির্ভূতও নয়। তাই

---

১ আল-মু'জামুল ওয়াসীত -পৃ: ৬২৩।

নিয়মের ব্যতিক্রম করে তারা معل উচ্চারণ করেছেন এরূপ বলা সংজ্ঞত নয়। অনুরূপভাবে معلول উচ্চারণ করাকে বর্জিত ব্যবহার বলাও যথার্থ নয়।[১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা

وهو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة في الصحة مع ان الظاهر السلامة منها

কোন হাদীস বাহ্যিকভাবে ক্রটিমুক্ত মনে হলেও যদি তাতে প্রচ্ছন্ন কোন সুক্ষ্ম জটিলতা পরিলক্ষিত হয় যার কারণে হাদীসটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে সে হাদীসকে মু'আল্লাল বলা হয়।[২]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সংজ্ঞায় ব্যবহৃত علة শব্দটি দ্বারা এমন অন্তর্নিহীত বা প্রচ্ছন্ন কারণকে বুঝানো হয়েছে যার ফলে হাদীসটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, একটি হাদীস মু'আল্লাল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। যথা:

১. কারণটি অন্তর্নিহীত ও প্রচ্ছন্ন হতে হবে।

২. এবং কারণটি এমন হতে হবে -যা হাদীসটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে।

অতএব যদি এদু'টি বিষয়ের কোন একটি অনুপস্থিত থাকে; যেমন যদি কারণটি সুস্পষ্ট হয় কিংবা যদি কারণটি এমন হয়, যা হাদীসটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা সৃষ্টি করে না, তাহলে তখন হাদীসটিকে পারিভাষিকভাবে মু'আল্লাল বলা হবে না।

অবশ্য অনেক সময় হাদীসের যে কোন ধরণের জটিলতাকেই علة বলা হয়; তা সুস্পষ্ট হোক কিংবা অস্পষ্ট হোক; কিংবা জটিলতাটি হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি করুক বা না করুক। যেমন অন্য বিশ্বস্ত রাবী যে হাদীস মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করা। মূলত এ ধরণের ইরসালের কারণে হাদীসটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়ে না, তবুও এটিকে علة বলা হয়।

জ্ঞাতব্য যে, হাদীসের অন্তর্নিহীত জটিলতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিষয়টি ইলমে হাদীসের অতি জটিল ও সুক্ষ্ম একটি বিষয়। কেননা যিনি এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে যাবেন, তাকে কোথায় কোথায় অন্তর্নিহীত জটিলতা আছে তা

---

১ গ্রন্থকার।

২ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস (কিঞ্চিত পরিবর্তিত) পৃঃ ৯৯ দ্রষ্টব্য।

খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। আর এটি কোন সাধারণ জ্ঞানীজনের কাজ নয় বরং হাদীস ও ইলমে হাদীস সম্পর্কে যার অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, হাদীসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে যার পর্যাপ্ত জানা শুনা আছে, যার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল, এবং যিনি প্রখর মেধা ও প্রজ্ঞার মালিক; কেবল এ ধরণের লোকেরাই অন্তর্নিহীত জটিলতা সম্পর্কে অবগতি অর্জন করতে পারেন এবং তা বুঝতে পারেন ।

একারণেই এ জ্ঞান-সমুদ্রে খুব বেশী ব্যক্তি অবগাহন করতে পারেননি। সারা পৃথিবীতে মাত্র অল্প কয়জন ব্যক্তি এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন:

১. ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন - মৃত্যু: ২৩৩ হি:
২. আলী ইবনুল মাদিনী - মৃত্যু: ২৩৪ হি:
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল - মৃত্যু: ২৪১ হি:
৪. ইমাম বুখারী - মৃত্যু: ২৫৬ হি:
৫. ইয়াকূব ইবনে শায়বা - মৃত্যু: ২৬২ হি:
৬. আবু যূর'আহ - মৃত্যু: ২৬৪ হি:
৭. আবু হাতেম রাযী - মৃত্যু: ২৭৫হি:
৮. ইমাম তিরমিযী - মৃত্যু: ২৭৫ হি:
৯. ইমাম নাসাঈ -মৃত্যু: ৩০৩ হি:
১০. ইমাম দারাকুতনী - মৃত্যু: ৩৮৫ হি: প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

বাহ্যিকভাবে সহীর যাবতীয় শর্ত যাতে বিদ্যমান থাকে সে ধরণের হাদীসেই এ ধরণের علة নিহিত থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়। কেননা যে হাদীস যয়ীফ, তাতে علة গুলো সুস্পষ্ট থাকে এবং যেহেতু সেই সুস্পষ্ট ইল্লতের কারণেই হাদীসটি প্রত্যাখ্যাত হয়; অতএব সেখানে অন্তর্নিহীত কারণ খুঁজার প্রয়োজন হয় না। এ ধরণের সুক্ষ্ম কারণগুলো খুঁজে বের করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়। যথা:

১. কোন হাদীস যদি মাত্র একজন বর্ণনাকারীই বর্ণনা করেন তাহলে সেক্ষেত্রে এরূপ সূক্ষ্ম কারণ বিদ্যমান থাকতে পারে।
২. কোন রাবীর বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা যদি অন্যান্য (নির্ভরযোগ্য) রাবীদের থেকে পাওয়া যায়, তাহলে সেক্ষেত্রেও এধরণের কোন সূক্ষ্ম কারণ বিদ্যমান থাকার অবকাশ থাকে।
৩. কোন রাবী স্মৃতিদৌর্বল্য বা (سوء حفظ) -এর অভিযোগে অভিযুক্ত হলে কিংবা ব্যাপক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা (وهم)-এর অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এধরণের প্রচ্ছন্ন ত্রুটি পাওয়া যেতে পারে।

এ তিনটিসহ আরো কিছু সূক্ষ্ম ইঙ্গিতাবলী বিদ্যমান থাকে, যা এ বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন। যেমন রাবীর স্মৃতি-বিভ্রাটের কারণে সৃষ্ট কতিপয় জটিলতা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, যে হাদীসটি মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন তাতে হয়ত ইরসালের তথ্য উদ্ঘাটন হবে, কিংবা যে হাদীস মরফূ'রূপে বর্ণনা করা হয়েছে তা হয়ত প্রকৃত পক্ষে মওকূফ ছিল, কিংবা এক হাদীসকে অন্য হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে, কিংবা একজন সবল বর্ণনাকারীর স্থলে একজন দুর্বল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা হয়েছে।

একই বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীসের সনদগুলোকে একত্রিত করলে এবং সেগুলোর মাঝে কি ধরণের পার্থক্য আছে তা সুক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এবং রাবীদের বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ও স্মৃতিশক্তির বিচার-বিশ্লেষণ করলে এ ধরণের প্রচ্ছন্ন জটিলতাগুলো বোধগম্য হতে পারে।

এধরণের প্রচ্ছন্ন জটিলতাগুলো সাধারণত সনদেই বেশী থাকে। কিন্তু কখনো কখনো এ ধরণের প্রচ্ছন্ন জটিলতা মতনেও থাকে। তবে তা খুবই কম। যেমনঃ নামাযে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ সংক্রান্ত হাদীসটির মতনে এরূপ প্রচ্ছন্ন জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। হাদীসটি ইমাম মুসলিম নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন-

روى مسلمْ رح من رواية الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعى عن قتادة انه كتب اليه يخبره عن انس بن مالك انه حدثه قال صليت خلف النبيّ صـــ وابى بكر وعثمـــان فكـــانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين – ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قرائة ولا في اخرها –

আওযায়ী কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কাতাদাহ হযরত আনাস ইবনে মালিকের উদ্ধৃতিতে হাদীসটি তার কাছে লিখে পাঠিয়েছেন। হযরত আনাস বলেছেন যে, আমি নবী করীম সা., হযরত আবু বকর রা. ও উসমান রা.-এর পিছনে নামায আদায় করেছি। তারা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে (কিরাআত) শুরু করতেন। কিন্তু কিরাআতের শুরুতে বা শেষে 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' উল্লেখ করতেন না।

এই হাদীসটি হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। হযরত আনাস থেকে হাদীসটি কাতাদাহ, সাবেত আল-বুনানী, ইসহাক ইবনে আব্দিল্লাহ, হুমায়দ আত্-তবীলসহ আরো অনেকেই বর্ণনা করেছেন।

পরবর্তী স্তরে ইমাম আওযায়ী হাদীসটি কাতাদাহ ও ইসহাক ইবনে আব্দিল্লাহ-এর মধ্যস্থতায় হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর শো'বা শুধুমাত্র কাতাদার মধ্যস্থতায় হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও

সুফয়ান ইবনে উয়ায়না হাদীসটি হুমায়দ আত্-তবীলের সূত্রে হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের পরবর্তী স্তরে যারা হাদীসটি আওযায়ী, শো'বা, ইমাম মালিক এবং সুফয়ান ইবনে উয়ায়না থেকে বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণনায় বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হাদীসের প্রথম বাক্যটি বর্ণনার ক্ষেত্রে মোট চার ধরণের বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা:

(١) صليت خلف رسول الله صـــ.وابى بكر وعثمان–

(٢) صليت خلف رسول الله صـــ وابى بكر وعمر–

(٣) صليت خلف رسول الله صـــ و ابى بكر وعمر و عثمان –

(٤) صليت وراء ابى بكر وعمر وعثمان –

সকল বাক্যের বর্ণনাকারীগণই নির্ভরযোগ্য সুতরাং হাদীসের এবাক্যটিতে ইযতিরাব রয়েছে- যা জাহেরী ইল্লত। কিন্তু বাক্যটিতে একটি অর্ন্তনিহীত সূক্ষ্ম ত্রুটিও রয়েছে। আর তা এইযে, যে সব সূত্রে রাসূল সা.-এর কথা উল্লেখ আছে সেগুলো মারফূ' বলে গণ্য হবে। কিন্তু যেসব সূত্রে রাসুল সা.-এর কথা উল্লেখ নেই সেগুলো মওকূফ বলে গণ্য হবে। সুতরাং বাস্তবে হয়ত হাদীসটি মারফূ' ছিল, সেটিকে মওকূফ করে বর্ণনা করা হয়েছে; না হয় হাদীসটি বাস্তবে মওকূফ ছিল, সেটিকে মারফূ'রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যাই করা হয়ে থাকুক এটি এমন একটি সুক্ষ্ম ত্রুটি যে কারণে হাদীসটি মা'লুল বলে সাব্যস্ত হবে।

হাদীসটির পরবর্তী অংশও বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তারা যেসব শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেগুলোকে সমন্বিত করলেও মোট আট ধরণের বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা:

(١) فكانوا يستفتحون القراءة بـــ الحمد لله رب العلمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم

(٢) فلم يكونوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم

(٣) ولم اسمع احدا يقول / أو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

(٤) ولم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

(٥) فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم

(٦) فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

(٧) فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهربه بالحمد لله رب العلمين

(٨) فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم –

যে সূত্রের মাধ্যমে বক্তব্যগুলো পাওয়া গেছে তার সবগুলোই নির্ভরযোগ্য। কোনটিকেই কোনটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না। সুতরাং এ বাক্যেও ইয্‌তিরাব রয়েছে -যা মূলত বাহ্যিক ত্রুটি।

কিন্তু এতে সূক্ষ্ম ত্রুটিও বিদ্যমান রয়েছে। কেননা হুমায়দ থেকে হাদীসটি যত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তার কোন কোনটিতে حميد عن انس উল্লেখ রয়েছে; আর কোন কোনটিতে হুমায়দ ও আনাসের মাঝে হয় কাতাদাহ না হয় সাবেত আল-বুনানী রয়েছে। অতএব যখন حميد عن انس উল্লেখ করা হয়েছে তখন হাদীসটির সনদ মুনকাতে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

অতএব এক্ষেত্রেও বাস্তবে হয়ত হাদীসটি মুনকাতে ছিল, তাকে কোন কোন সূত্রে মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে; না হয় হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন ছিল, তাকে মুনকাতে' বা বিচ্ছিন্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যাই হোক এটি একটি প্রচ্ছন্ন ত্রুটি; যে কারণে হাদীসটি মু'আল্লাল হয়ে গেছে।

আবার কোন কোন সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাতাদাহ হাদীসটি আওযায়ীকে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। কাতাদাহ আজীবন অন্ধ ছিলেন। সুতরাং তাদ্বারা লিখা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি হয়ত কারো দ্বারা লিখিয়ে ছিলেন- যে ব্যক্তিটি মজহুল বা অজ্ঞাত। এ কারণেও হাদীসটি মু'আল্লাল হয়ে গেছে। আর যেসব সূত্রে হুমায়দ ও আনাসের মাঝে কাতাদাহ বা সাবেত আল-বুনানীর উল্লেখ আছে সেগুলো সূত্র হিসাবে সহীহ হলেও বর্ণিত হাদীসটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। কেননা হাদীসটি যে হুবহু শব্দে বর্ণনা করা হয়নি তা পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট। সুতরাং হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে অর্থের রেয়ায়েত করে। অতএব হাদীসে উল্লিখিত বক্তব্যের মূলভাষ্যটি কি, তা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ। কেননা হতে পারে যে, এবর্ণনার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা বিসমিল্লাহ নামাযের কিরাআতের পূর্বে পড়তেনই না, যেরূপ ইমাম মালিক রাহ. মনে করেছেন। কিংবা এর অর্থ এরূপও হতে পাবে যে, তারা বিসমিল্লাহ পড়তেন, তবে কিরাআতের ন্যায় জুরে পড়তেন না। যেরূপ ইমাম আবু হানিফা মনে করেছেন। কিংবা ইমাম পড়তেন মুক্তাদীরা পড়তেন না কিংবা মুক্তাদীরা পড়তেন ইমাম পড়তেন না- এরূপ অর্থ করারও সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য অন্য কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার প্রবক্তা হয়েছেন; যার সবগুলো যয়ীফ বলে হাদীস বিশারদগণ মন্তব্য করেছেন। কিংবা হাদীসটিতে বিসমিল্লাহ পড়া না পড়ার বিষয়ে আদৌ আলোকপাত করা হয়নি। বরং নামাযের কিরাআতের শুরু কোন সূরা দিয়ে হত তাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল। বিসমিল্লাহ পড়া হবে কি হবে না, জুরে পড়া হবে না আস্তে পড়া হবে, এর কোন কিছুই বর্ণনা করা এ হাদীসের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যে রাবী যেরূপ অর্থ বুঝেছেন হয়ত সেই নিরিখে তিনি বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদে আহমদ, ইবনে খুযায়মা ও দ্বারাকুতনী বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আনাস রা. হাদীসটি দ্বারা বিসমিল্লাহ সংক্রান্ত বিষয়ের দিকে আলোকপাত করতে চাননি।

আবু মাসলামা কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ:

عن ابى مسلمة قال سئلت انس بن مالك – كان رسول الله صـــ يستفتح بـــ الحمد لله أو بسم الله الرحمن الرحيم فقال انك سئلتنى عن شئ ما احفظه – وما سئلنى احد قبلك –

আবু মাসলামা বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞাস করে ছিলাম যে, নবী সা. নামাযের কিরাআত কি আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু করতেন, না বিসমিল্লাহ দিয়ে ? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি আমাকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছ যে ব্যাপারে আমার কিছু জানানেই। তাছাড়া ইতিপূর্বে আমাকে এবিষয়ে কেউ জিজ্ঞাসাও করেনি।

যেহেতু আনাস রা. বিসমিল্লাহ পাঠের বিধান সম্পর্কে কিছু জানেন না বলে উল্লেখ করছেন, অতএব তার বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীস থেকে বিসমিল্লাহ পাঠের বিধান খুঁজতে যাওয়া বোধ হয় সঙ্গত হবে না।

এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কারণ যেটি রয়েছে তা হল এই যে, পূর্বের যে রিওয়ায়াতগুলোতে বিসমিল্লাহ পাঠের বিবরণ রয়েছে, এ প্রেক্ষিতে সেগুলোর সাথে আবু মাসলামা বর্ণিত এই বিবরণটির স্ববিরোধিতা রয়েছে। অতএব একারণেও হাদীসটি মু'আল্লাল হতে পারে।[১]

ইল্লতের শ্রেণী বিভাজন

হাকেম আবু আব্দুল্লাহ علوم الحديث গ্রন্থে দশ প্রকার ইল্লত (علت)–এর কথা আলোচনা করেছেন। যথা:

১. সনদটি বাহ্যত সহীহ মনে হলেও বাস্তবে হয়ত তাতে এমন কোন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি তার পূর্ববর্তী রাবী থেকে হাদীস সরাসরি শ্রবণ করেছেন, তা কোনভাবেই সাব্যস্ত হয় না। যেমন:

روى موسى بن عقبة عن سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ صـــ قال من جلس مجلسا كثر لغطه فقال قبل ان يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انـــت استغفرك واتوب اليك– الا غفر له ما كان في مجلسه ذالك –

---

১ যফরুল আমানী পৃ: ৩৬৬-৩৭৩ -এর তথ্যাবলম্বনে।

এই হাদীসটি একারণে মু'আল্লাল যে, বর্ণনাকারী সুহায়ল থেকে মূসা ইবনে উকবার সরাসরি শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত নেই। ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন যে- لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل
মূসা ইবনে উকবা সুহায়ল থেকে হাদীস আহরণ করেছেন, একথা কেউ উল্লেখ করে না।

২. কোন একটি সূত্রে কোন হাদীস হয়ত মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে, যা বাহ্যত বোধগম্য হয় না। কিন্তু হাদীসটি হয়ত একই সূত্রে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে বর্ণিত আছে, যেখানে তারা মধ্যবর্তী বিচ্যুত রাবীকে উল্লেখ করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । সেটি দেখে পূর্বের সূত্র থেকে যে একজন রাবী বিচ্যুত হয়েছে তা বোধগম্য হয়। যেমন-

روى قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن ابي قلابة عن انس قال قال رسول الله صـــ أرحم امتي أبوبكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمـــان، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل – وان لكل امة أمينـــا وان أمين هٰذه الأمة أبو عبيدة –

বাহ্যত সহীহ মনে হলেও এহাদীসটিও মু'আল্লাল। কেননা বাস্তবে খালেদ আল-হায্যা আবু কিলাবাহ থেকে অন্য আরেক জনের মধ্যস্থতায় এটি শ্রবণ করেছেন। এর প্রমাণ এই যে, হাদীসে উল্লিখিত আবু উবায়দাহ সংক্রান্ত বক্তব্যটুকু খালেদ আবু কিলাবাহ থেকে কারো মধ্যস্থতা ছাড়াও বর্ণনা করেছেন এবং অন্য আরেকজনের মধ্যস্থতায়ও বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনাটি সহীহাইনে উদ্ধৃত হয়েছে। এদ্বারা বুঝা যায় যে, খালেদ যখন সরাসরি আবু কিলাবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তখন মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সূত্রটিতে খালেদ ও আবু কিলাবাহ -এর মাঝে একজন মধ্যস্থতাকারী ছিলেন- যার উল্লেখ এই সূত্রে করা হয়নি কিন্তু সহীহাইনে করা হয়েছে।

৩. কোন হাদীস বাস্তবে হয়ত এক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়ে থাকে, কিন্তু কোন এক সূত্রে তা হয়ত অন্য আরেক সাহাবীর থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা বাস্তবে সঠিক নয়। যেমন-

حديث موسى بن عقبة عن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صـــــ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مأة مرة –

হাকেম বলেন যে, এ হাদীসটির সনদ এমন যে, যে কোন মুহাদ্দিস দেখেই মনে করবে যে, এতে সহীহ-এর শর্ত বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু মদীনাবাসীরা যখন কুফাবাসীদের থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করে তখন তাতে পদস্খলন ঘটেই। পরে

তিনি তার নিজস্ব সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, হাদীসটি আবু বুরদাহ তার বাবা থেকে নয় বরং (اغرّ المزني) আগাররুল মুযানী থেকে আহরণ করেছেন। হাকেমের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ-

روى الحاكم باسناده عن حماد بن زيد عن ثابت البنانى قال سمعت ابا بردة عن الاغر المزني قال قال رسول الله صـ انه ليغان على قلبى فاستغفر الله في اليوم مأة مرة –

যেহেতু উভয় সূত্রই আবু বুরদাহ থেকে বর্ণিত। অতএব সহজেই বুঝা যায় যে, পরবর্তী কেউ اغر المزنى -এর স্থলে ভুল বশত: عن أبيه উল্লেখ করেছেন- যা বাস্তবে সঠিক নয়। সে কারণেই ইমাম মুসলিম عن أبيه এর সূত্রে হাদীসটি সংকলন করেননি। অথচ عن اغر المزنى এর সূত্রে হাদীসটি সংকলন করেছেন।

৪. কোন হাদীস বাস্তবে হয়ত কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত ছিল। কিন্তু কোন সূত্রে হয়ত তা কোন তাবেয়ী থেকে বর্ণিতরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বর্ণনা করা হয়েছে এমন শব্দে যাদ্বারা তিনি সরাসরি রাসূল সা. থেকে শ্রবণ করেছেন- এরূপ বুঝা যায়। ফলে বাহ্যিকভাবে হাদীসটিকে মুত্তাসিল মনে হয়। যেমন-

حديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه انه سمع رسول الله صـ يقرأ في المغرب بالطور

হাকেম উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটিতে তিন ধরণের ক্রটি রয়েছে। যথা-

ক. সনদে উল্লেখ করা হয়েছে عثمان بن سليمان কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নামটি হবে عثمان بن ابى سليمان

খ. সনদে উল্লেখ করা হয়েছে عثمان عن أبيه অথচ বাস্তবে উসমান হাদীসটি نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه এভাবে বর্ণনা করেছেন।

গ. হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে عثمان عن أبيه انه سمع النبيّ صـ যাদ্বারা বুঝা যায় যে, উসমানের বাবা আবু সুলায়মান সরাসরি নবী সা. থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন। বাস্তবে উসমানের বাবা আবু সুলায়মান সরাসরি নবী সা. থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করেননি এবং নবী সা.-এর সঙ্গে তার সাক্ষাতও ঘটেনি। মূলত হাদীসটি সরাসরি শ্রবণ করেছেন নাফে' এর বাবা জুবায়র ইবনে মুতঈম।

৫. কোন হাদীস মু'আন'আনরূপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সনদের মাঝ থেকে কোন একজন রাবী বিচ্যুত হয়েছেন- যা অন্য সূত্র থেকে বোধগম্য হয়। যেমন-

حديث يونس عن ابن شهاب عن على بن الحسين عن رجال من الانصار انهم كانو مع رسول الله صـ ذات ليلة فرمى بنجم فاستنار – الحديث

হাকেম বলেছেন ইউনূস অনেক উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটি বর্ণনার করতে সংক্ষেপায়নের আশ্রয় নিয়েছেন। বস্তুত হাদীসের সূত্রটি ছিল নিম্নরূপ-

عن على بن الحسين عن ابن عباس عن رجال من الانصار -

কেননা এই হাদীসটি উক্ত সূত্রে ইবনে উয়ায়না, শু'বা, সালেহ, আওযায়ী প্রমুখ যখন উল্লেখ করেছে তখন তারা ইবনে আব্বাসের নাম উল্লেখ করেছেন।

৬. কোন একটি হাদীস কোন একজন ব্যক্তি থেকে মুত্তাসিল সনদেও বর্ণিত আছে আবার মুনকাতে' বা বিচ্ছিন্ন সনদেও বর্ণিত আছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন সূত্রের বর্ণনাটিই সঠিক। যেমন-

حديث على بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله مالك أفصحنا - الحديث

এই হাদীসটি নিম্নোক্ত মুনকাতে' বা বিচ্ছিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে-

عن على بن خشرم حدثنا على بن الحسين بن واقد بلغنى عن عمر قال قلت يا رسول الله صـ الخ

হাকেম উল্লেখ করেছেন যে, আলী ইবনে খাশরাম যে সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটিই সঠিক।

৭. কোন হাদীসের এক সূত্রে হয়ত একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য সূত্রে সেই স্থানে ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে অস্পষ্টরূপে 'জনৈক ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে জনৈক ব্যক্তি বলে যে সূত্রটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটিই সঠিক। যেমন-

حديث ابى شهاب عن سفيان الثورى عن حجاج بن فرافصة عن يحى بن كثير عن ابى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صـ المؤمن غر كريم - والفاجر خب لئيم -

হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে কাসীর থেকে নিম্নোক্ত সূত্রেও উল্লেখ আছে-

عن محمد بن كثير حدثنا سفيان الثورى عن حجاج عن رجل عن ابى سلمة عن أبى هريرة

লক্ষণীয় যে পূর্বের সূত্রে যেখানে يحيى بن كثير -এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, পরের সূত্রে সেখানে عن رجل উল্লেখ করা হয়েছে।

হাকেম উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনে কাসীর থেকে বর্ণিত সূত্রটিই অর্থাৎ যে সূত্রে عن رجل উল্লেখ করা হয়েছে সেটিই সঠিক।

অবশ্য অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, হাকেমের এই উদাহরণটি যথার্থ নয়। কেননা আবু শিহাব থেকে পূর্বে যে সূত্রটি বর্ণিত হয়েছে, তার একাধিক মুতাবে রয়েছে।

৮. কোন একজন বর্ণনাকারী তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী- যার সাথে তার দেখা সাক্ষাত হয়েছে এবং তাথেকে তিনি কতিপয় হাদীস আহরণও করেছেন। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট হাদীস তিনি তাথেকে শ্রবণ করেননি। অথচ সে হাদীসটিকে তিনি ভুলক্রমে তারই উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন। যেমন-

حديث يحى بن كثير عن انس ان النبيّ صــ كان اذا افطر عند أهل بيت – قال افطــر عندكم الصائمون – واكل طعامكم الابرار – وصلت عليكم الملائكة –

হাকেম বলেন যে, হযরত আনাস রা. থেকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর হাদীস আহরণ করেছেন তা বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত আছে। কিন্তু এই হাদীসটি তিনি হযরত আনাস থেকে শ্রবণ করেননি। পরে তিনি অন্য সূত্র এনে প্রমাণ করেছেন যে, এই হাদীসের সূত্রে ইয়াহইয়া ও আনাসের মাঝে حُدِّثْتُ একটি শব্দ বর্ধিত ছিল। অর্থাৎ সূত্রটি ছিল নিম্নরূপ- **عن يحيى بن كثير قال حدثت عن انس بن مالك**

৯. কোন একটি হাদীস কোন একটি নির্ধারিত সূত্রে বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি সর্বজন বিদিত। এমতাবস্থায় যদি কোন বর্ণনাকারী ভিন্ন আরেকটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। কেননা সর্বজন বিদিত সূত্রের ব্যতিক্রম ভিন্ন কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করার কারণে বর্ণনাকারী অন্যদের দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন বলে গণ্য হয়। এটি এক ধরণের ত্রুটি, যে কারণে হাদীস মু'আল্লাল হয়ে যায়। যেমন-

حديث منذر بن عبد الله الحزامى عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صــ كان اذا افتتح الصلواة قال سبحانك اللهم – الخ

এই হাদীসটি সাধারণত নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে -

روى الحاكم باسناده عن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن عبد الله بن ابى رافع عن على بن ابى طالب –

হাকেম বলেছেন যে, এ হাদীসটিতে যথার্থই ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে। কেননা মুনযির ইবনে আব্দিল্লাহ হাদীসটি অন্যান্যদের ব্যতিক্রম একটি ভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

১০. কোন হাদীস এক সূত্রে মারফূ'রূপে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু অন্যসূত্রে তা মওকূফরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন -

حديث ابى فروة يزيد بن محمد حدثنا ابى عن أبيه عن الاعمش عن ابى سفيان عن جابر قال قال رسول الله صــ من ضحك في الصلواة – يعيد الصلواة ولا يعيد الوضوء –

হাদীসটি অন্যসূত্রে হযরত জাবের রা.-এর বক্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

روى الحاكم باسناده عن وكيع عن الاعمش عن ابى سفيان قال سئل جابر عن الرجل يضحك في الصلواة فقال من ضحك في صلواة يعيد الصلواة ولا يعيد الوضوء –

এই দশ ধরণের ইল্লত (علت) বা ক্রুটির কথা উল্লেখ করার পর হাকেম উল্লেখ করেছেন যে, এই দশ প্রকারের বাইরেও মু'আল্লাল হাদীসের আরো অনেক প্রকার রয়েছে। আমি সেগুলোর উল্লেখ করছিনা। বস্তুতঃ এখানে কতিপয় মু'আল্লাল হাদীসের উপমা পেশ করাই উদ্দেশ্য ছিল- যাতে এ বিষয়ে দক্ষজনরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন।[১]

মু'আল্লাল-এর ভিন্ন ব্যবহার :

মু'আল্লাল শব্দটির পারিভাষিক ব্যবহার ছাড়াও এর একটি ব্যাপক ভিত্তিক ব্যবহার রয়েছে। অর্থাৎ علة শব্দটি হাদীসের সনদ বা মতনের যেকোন ধরণের ক্রুটি বুঝানোর জন্যই ব্যবহার করা হয়। এমনকি দুর্বলতার যেকোন কারণ বিদ্যমান থাকলেই তা সুস্পষ্ট হোক বা অস্পষ্ট হোক- হাদীসটিকে মু'আল্লাল বলা হয়। যেমন- غفلت، تهمة،كذب، كذب، سوء حفظ ইত্যাদি বিষয় যেগুলো হাদীস যয়ীফ হওয়ার সুস্পষ্ট ও বাহ্যিক কারণ, সেগুলো বিদ্যমান থাকলেও মুহাদ্দিসগণ هذا حديث معلول বলে থাকেন। এদ্বারা অবশ্যই পারিভাষিক معلل বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না। কেননা পারিভাষিক معلل বলা হয় এমন ধরণের ক্রুটিযুক্ত হাদীসকে যে ক্রুটিগুলো সুক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট।

আবার এমন ক্রুটিযুক্ত হাদীসকেও معلول বলা হয়, যা হাদীসটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় না। যেমন কোন হাদীস যদি নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত থাকে, এমতবস্থায় তাকে যদি মুরাসলরূপে বর্ণনা করা হয়। কেননা এদ্বারা হাদীসটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু এধরণের ক্রুটিকেও মা'লুল বলে আখ্যায়িত করা হয়।

একারণেই আল্লামা আবু ই... খলিলী বলেছেন যে- من اقسام الصحيح ما هو صحيح معلول

অর্থাৎ সহীহ-এর এক প্রকার এমনও রয়েছে যে, তা সহীহ হলেও ক্রুটিযুক্ত। ইবনুস সালাহ উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম তিরমিযী নসখ বা রহিত হওয়াকেও علة হিসাবে গণ্য করেছেন। তবে আল্লামা ইরাকী বলেছেন যে, ইমাম তিরমিযীর এই বক্তব্যের দ্বারা যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, মানসূখ হাদীসের উপর আমল করা

---

[১] আল-বায়েসুল হাসীস পৃ: ৫৭-৬০ তে উদ্ধৃত টিকা থেকে সংক্ষেপিত।

ত্রুটিপূর্ণ, তাহলে তার বক্তব্য যথার্থ। কিন্তু যদি তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই হয় যে, মানসূখ হওয়া হাদীসটি সহীহ হওয়ার পথে অন্তরায় -তাহলে তার বক্তব্য যথার্থ নয়। কেননা সহীহ হাদীসের গ্রন্থগুলোতে এধরণের বহু মানসূখ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। এমনকি ইমাম তিরমিযী নিজেও এমন ধরণের মানসূখ হাদীস তার কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। উদাহরণ হিসাবে তিরমিযী শরীফের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত নিম্নের হাদীসটি পেশ করা যায়। যে হাদীসটির ভাষ্য হল - انما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ

সনদে জটিলতা পাওয়া গেলে তাদ্বারা মতনটি সমস্যাগ্রস্থ হবে কিনা?

সনদের জটিলতা অনেক ক্ষেত্রে মতনকেও প্রভাবিত করে। যেমন কোন হাদীস মুরসাল ছিল, তাকে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করা হলে তখন সনদের এই জটিলতা মতনেও প্রভাব ফেলে। আবার অনেক সময় সনদের এধরণের সূক্ষ্ম জটিলতা মতনের উপর মোটেই কোন প্রভাব ফেলে না। যেমন -

حديث يعلى بن عبيد عن سفيان الثورى عن عمروبن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار–

এই হাদীসের বর্ণনাকীর ইয়া'লা যিনি সুফয়ান থেকে, (সুফয়ান আমর ইবনে দ্বীনার থেকে) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি এ ব্যাপারে দ্বিধার শিকার হয়ে ভুল করেছেন। কেননা সুফয়ান সাওরী যাথেকে হাদীসটি আহরণ করেছেন সেই ব্যক্তিটি মূলত আমর ইবনে দ্বীনার না হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে দ্বীনার হবে।

এক্ষেত্রে সনদের জটিলতার কারণে মূল হাদীসটি প্রভাবিত হয়নি। কারণ আমর ইবনে দ্বীনার ও আব্দুল্লাহ ইবনে দ্বীনার দু'জনই বিশ্বস্ত রাবী। যদিও সনদে এক নামের স্থলে অন্য নাম ব্যবহৃত হয়েছে। এই কারণে হাদীসটি মু'আল্লাল হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মতন এ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। কেননা দু'জনই সমান বিশস্ত।

মু'আল্লাল এর উপর লিখিত গ্রন্থাবলী :

১. কিতাবুল মু'আল্লাল - আলী ইবনুল মাদিনীকৃত।
২. ইলালুল হাদীস - ইবনু আবি হাতেমকৃত।
৩. আল-ইলাল ওয়া মা'রেফাতুর রিজাল - আহমদ ইবনে হাম্বলকৃত।
৪. আল-ইলালুল কাবীর - ইমাম তিরমিযীকৃত।
৫. আল-ইলাল -দারাকুতনীকৃত।
৬. আল-ইলালুস সগীর - ইমাম তিরমিযীকৃত।
৭. আয্-যাহরুল মাতলূল ফিল খবরিল মা'লুল - ইবনে হজরকৃত
৮. আল-আরাইকিল মাসনূআহ ফিল আহাদীসিয্ যয়ীফা ওয়াল মাওজু'আহ –মুহাম্মদ আমীন শিবরাবীকৃত।

৫. নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণিত রিওয়ায়াতের পরিপন্থী বর্ণনা

(مخالفة الثقات)

مخالفة الثقات মুখালাফাতুস সীকাত এর অর্থ হল নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরুদ্ধাচরণ করা। যখন কোন বর্ণনাকারী এমন কোন হাদীস বর্ণনা করেন, যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকেও বর্ণিত আছে। কিন্তু এই রাবী যে সনদে বা যে শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা যদি তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে যেন এই রাবী তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরুদ্ধাচরণ করলেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে সামঞ্জস্যহীন এরূপ একক বর্ণনাকে মুখালাফাতুস সীকাত (مخالفة الثقات) বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : – هو أن يروى الراوي رواية مخالفة لما يرويه الثقات

কোন রাবী যদি এমন কোন হাদীস বর্ণনা করেন, যা সনদ কিংবা মতনের প্রেক্ষিতে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণিত এতদসংক্রান্ত বর্ণনার পরিপন্থী, তাহলে একে মুখালাফাতুস সীকাত বলা হয়।(১)

মুখালাফাতুস্ সীকাতের উদাহরণ

নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার পরিপন্থী হওয়ার বিষয়টি যেমন মতনে হতে পারে তেমনি সনদের ক্ষেত্রেও হতে পারে।

ক. সনদের ক্ষেত্রে মুখালাফাতুস সীকাতের উদাহরণ

روى الترمذى من طريق ابن عيينه عن عمروبن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجلا توفي على عهد رسول الله ولم يدع وارثا الا مولى هو اعتقه .... الحديث

উপরোক্ত হাদীসের সনদটি ইবনে জুরায়েজসহ আরো অনেকেই ইবনে উয়ায়নার ন্যায় মুত্তাসিল রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ ইবনে যায়েদ উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত সূত্রে উল্লেখ করেছেন- عن عمروبن دينار عن عوسجة ان رجلا توفي ... الحديث

অর্থাৎ তিনি ইবনে আব্বাসকে উল্লেখ না করে হাদীসটি মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। ফলে এটি সনদের দিক থেকে شاذ বলে গণ্য হয়েছে।

খ. মতনের ক্ষেত্রে মুখালাফাতুস্ সীকাতের উদাহরণ-

روى ابوداؤد عن عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابى صالح عن أبي هريرة مرفوعا اذا صلى احدكم ركعتى الفجر فليضطجع عن يمينه –

---

১ গ্রন্থকার

উপরোক্ত হাদীসটি আব্দুল ওয়াহেদ অন্যান্য সীকাহ রাবীদের বিপরীত বর্ণনা করেছেন। কেননা অন্যান্যরা হাদীসটি নিম্নোক্তশব্দে বর্ণনা করেছেন-

روى النسائ من طريق سهل بن ابى صالح عن أبيه عن أبي هريرة كان النبيّ صـــ يضطجع بعد ركعتي الفجر على شقه الأيمن ثم يجلس -

এ হাদীসটি উল্লিখিত শব্দে অনেকেই বর্ণনা করেছেন। অথচ আব্দুল ওয়াহেদের বর্ণনা এর বিপরীত। কেননা আব্দুল ওয়াহেদের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, ফজরের পর শুয়ে যাওয়ার জন্য রাসূল সা. উপদেশ দিয়েছেন। আর অন্যদের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, ফজরের পর ডান পার্শের উপর ক্ষণিকের জন্য শুয়ে যাওয়া রাসুল সা.-এর অভ্যাস ছিল।

বায়হাকী মন্তব্য করেছেন-

خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فان الناس انما رووه من فعل النبيّ لا من قوله

আব্দুল ওয়াহেদ এক্ষেত্রে বহু সংখ্যক বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। কেননা অন্যান্যরা নবী সা.-এর অভ্যাস এরূপ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এটি তাঁর নির্দেশরূপে বর্ণনা করেননি। আ'মাশের ছাত্রদের মাঝে আব্দুল ওয়াহেদই এই ব্যতিক্রমটি করেছেন।

বস্তুতঃ যিনি নির্ভরযোগ্য রাবীদের পরিপন্থী রিওয়ায়াত বর্ণনা করবেন তিনি নিজে হয়ত সিকাহ (ثقة) বা নির্ভরযোগ্য হবেন অথবা তিনি যয়ীফ (ضعيف) বর্ণনাকারী হবেন।

১. যদি তিনি নিজে সীকাহ বা নির্ভরযোগ্য হন, তাহলে তিনি যাদের বিপরীত বর্ণনা করছেন তাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে তা মোট চার প্রকার হতে পারে। যথা :

(١) الراوي ثقة ـــ مخالفه اوثق واضبط منه

(٢) الراوي ثقة ـــ مخالفه متساوى له في الثقة

(٣) الراوي ثقة ـــ مخالفه ادنى منه في الثقة

(٤) الراوي ثقة و مخالفه ضعيف

* তিনি নিজে নির্ভরযোগ্য কিন্তু তার বিপরীত বর্ণনাকারী তার চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য সেক্ষেত্রে তার বর্ণিত হাদীসকে শায (شاذ) বলা হবে এবং তার বিপরীত বর্ণনাকারীর হাদীসকে মাহফূজ (محفوظ) বলা হবে। বিপরীত বর্ণনাকারী ১জন হলেও। [১]

---

১ যফরুল আমানী-পৃ: ৩৫৭ দ্রষ্টব্য। যদিও মুহাদ্দিসগণ শব্দটি الثقات উল্লেখ করেছেন যাদ্বারা মনে হয়যে, বিপরীত বর্ণনাকারীর সংখ্যা একাধিক হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি এমন নয়। বরং যদি বিপরীত বর্ণনাকারী একজনও হয় তাহলেও সেক্ষেত্রে মুখালাফাতুস সীকাত করা হয়েছে বলেই গণ্য হবে।-যফরুল আমানী পৃ: ৩৫৬।

* তিনি নিজে নির্ভরযোগ্য কিন্তু তার বিপরীত বর্ণনাকারী তারই সমমানের নির্ভরযোগ্য। এক্ষেত্রে বিপরীত বর্ণনাটি যদি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে সেটিকেই অধিক নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হবে। অতএব এক্ষেত্রেও রাবীর বর্ণিত রিওয়ায়াতটি শায্ (شاذ) বলে গণ্য হবে এবং তার বিপরীত বর্ণনাটি মাহফূজ বলে গণ্য হবে।

আল্লামা মুহাম্মদ আমীন মিসবাহুদ্-দূজার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে,

إذا انفرد الثقة بالحديث ــ فان انفراده مقبول غير مردود ــ اما اذا خالف الثقة الثقات أو من هو اوثق منه ــ فان حديث هذا الثقة هو الحديث الشاذ – وهو حديث مردود غير مقبول و مقابله هو الحديث المحفوظ –

যদি কোন নির্ভরযোগ্য রাবী এককভাবে কোন হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে তার এককভাবে বর্ণিত হাদীস মাকবূল বলে গণ্য হয়। তবে তার একক বর্ণনাটি যদি একাধিক সিকাহ (ثقه) রাবীর বর্ণনার পরিপন্থী হয় কিংবা যদি তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য কোন রাবীর বর্ণনার পরিপন্থী হয় তাহলে উক্ত র্নিভরযোগ্য রাবীর একক বর্ণনাটি شاذ নামে আখ্যায়িত হবে এবং তা বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। আর তার বিপরীত র্বণনাটি محفوظ নামে আখ্যায়িত হবে। [১]

কিন্তু যদি সেটিও এক সূত্রে বর্ণিত হয় অর্থাৎ দু'টি বর্ণনাই যদি নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নে সমান হয়, তাহলে এটি مختلف الحديث বা পরস্পর বিরোধী হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এবং মুখতালিফুল হাদীসের যে বিধান পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেভিত্তিতে তার ফয়সালা হবে। [২]

* তিনি নিজে নির্ভরযোগ্য; কিন্তু তার বিপরীত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হলেও তার চেয়ে নিম্নমানের। তাহলে এক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে, তার বিপরীত বর্ণনাকারীই তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অতএব সেই বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি তখন (شاذ) বলে গণ্য হবে। আর তার হাদীসটি তখন (محفوظ) বলে গণ্য হবে।

* তিনি নিজে নির্ভরযোগ্য কিন্তু তার বিপরীত বর্ণনাকারী যয়ীফ। তাহলে তার বর্ণিত হাদীসটি (معروف) বলে গণ্য হবে। আর বিপরীত বর্ণনাকারীর হাদীসটি মুনকার (منكر) বলে গণ্য হবে।

২. আর যদি রাবী নিজে যয়ীফ হয় এবং তিনি যাদের বিপরীত বর্ণনা করছেন তারা যদি সীকাহ বা নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে রাবীর বর্ণিত হাদীসটিকে منكر বলা

---

১ তাদরীব ১২৯।

২ যফরুল আমানী পৃ: ৩৬০।

হবে। আর তার বিপরীত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসটিকে معروف বলা হবে।[১]

অবশ্য যদি কোন যয়ীফ রাবী একক সূত্রে কোন হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার কোন শাহেদ মুতাবে' বিদ্যমান না থাকে তাহলে সেই হাদীসটি সিকাহ রাবীদের বর্ণনার বিপরীত না হলেও তাকে মুনকার منكر নামে অভিহিত করা হয়।[২]

ইবনে হজর উল্লেখ করেছেন যে-

ان الشاذ والمنكر يعتبر فيهما المخالفة ويفترقان في كون الراوي مجروحا وغير مجروح، فان خالف الثقة من هو اوثق منه فهو الشاذ، المردود، وان وقعت المخالفة مع كونه في نفسه ضعيفا بحيث يبلغ درجة رواة الضعيف فهو المنكر، ويقابله المعروف

অর্থাৎ শায্ ও মুনকার উভয় ক্ষেত্রেই সীকাহ রাবীদের বিপরীত হওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান থাকে। তবে বর্ণনাকারী যয়ীফ হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া ও না হওয়ার দিক থেকে দু'টির মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়। যদি নির্ভরযোগ্য কোন রাবী তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য কোন রাবীর বর্ণনার পরিপন্থী কোন রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন তাহলে তৎকর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতটিকে شاذ বলা হয় এবং তা বর্জনীয় বলে গণ্য হয়। কিন্তু তিনি নিজে যয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও যদি সীকাহ রাবীর বর্ণনার পরিপন্থী কোন রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন, তাহলে তৎকর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতটিকে মুনকার منكر বলা হবে এবং তার বিপরীতে সীকাহ রাবী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতটিকে معروف বলা হবে।[৩]

উল্লেখ্য যে যদি কোন সীকাহ রাবী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতের বিপরীত বর্ণনা একদল যয়ীফ রাবী থেকেও পাওয়া যায় তাহলেও সীকাহ রাবী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে। যয়ীফ রাবীরা একদল হলেও তাদের বর্ণিত রিওয়ায়াতের কারণে সীকাহ রাবী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলবে না।[৪]

এই আলোচনা দ্বারা একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাবী যদি مخالفة الثقات-এর অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তাহলে সীকাহ রাবীদের বিপরীতে তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহ হয় شاذ হবে, না হয় মুনকার منكر হবে। একারণেই আমরা

---

[১] যফরুল আমানী পৃ: ৩৬০ ও ৩৬২।

[২] যফরুল আমানী পৃ: ৩৬২।

[৩] যফরুল আমানী - পৃ: ৩৬২।

[৪] যফরুল আমানী - ৩৫৭।

মুখালিফাতুস্- সীকাতের অভিযোগে অভিযুক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের নাম উল্লেখ করেতে شاذ/منكر এরূপ উল্লেখ করেছি।

মুখালাফাতুস-সীকাত বিভিন্ন পন্থায় হতে পারে। সে প্রেক্ষিতে একে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়[১] যথা:

(১) مدرج (٢) مقلوب (٣) مزيد في متصل الأسانيد (٤) مضطرب (٥) مصحف/محرف

নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের পরিচিতি ও সংজ্ঞা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

অতপর মুনকার ও মা'রুফ এবং শায্ ও মাহফূয সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৫-ক মুদরাজ (المدرج)

মুদরাজ (مدرج) শব্দটি باب إفعال থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। বাবে ইফ'আল থেকে এর অর্থ হয় প্রক্ষেপ অনুপ্রবেশ করানো, মিলিয়ে ঝুলিয়ে ফেলা, গুলিয়ে ফেলা। আরবরা বলে থাকেন ادرجت الشيئ في الشيئ অর্থাৎ আমি এক বস্তুকে অন্য বস্তুর মাঝে ঢুকিয়ে দিয়েছি। সুতরাং মুদরাজ শব্দের অর্থ হবে প্রক্ষেপিত, অনুপ্রবিষ্ট, মিশ্রিত, তালগোল পাকানো। যেসব হাদীসের সনদে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে কিংবা সনদে অথবা মতনে রাবী নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছে সে ধরণের হাদীসকে মুদরাজ নামে নামকরণ করা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو الحديث الذي غيّر سياق اسناده أو ادخل في متنه ما ليس منه بغير فصل –

যে হাদীসের সনদের আঙ্গিককে পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে কিংবা তার মতন বা মূল বক্তব্যে এমন কোন বিষয়কে অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যা তার অন্ত র্ভুক্ত নয়, অথচ কোন পার্থক্য সূচীত করা হয়নি; এমন ধরণের হাদীসকে মুদরাজ বলা হয়।[২]

সনদের আঙ্গিক পরিবর্তন করে ফেলার অর্থ এক হাদীসের সনদকে অন্য হাদীসের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া, দুই বা তিন সূত্রে পাওয়া হাদীসকে এক সূত্রে

---

[১] অবশ্য এধরণের ওয়াহাম ও গলতের কারণে মা'লূল হাদীসের অনেক প্রকার রয়েছে। ইলালের গ্রন্থ সমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আবার মুযতারাবকে একটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আমরা এক্ষেত্রে ইবনে হজরের অনুসারনেই বিষয়টিকে বিন্যাস করেছি: যাতে শরহে নুখবার সাথে সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে।

[২] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ১০৩।

বর্ণনা করা, কিংবা দুই বা তিন সূত্রে পাওয়া কোন হাদীসকে এক সূত্রে বর্ণনা করতে গিয়ে অন্য সূত্রের রাবীকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা, কিংবা সনদ বর্ণনা করার মূহুর্তে কোন বিষয়ে উস্তাদ হয়ত কোন মন্তব্য করেছিলেন, সেটিকেই হাদীস মনে করে সেই সনদে উস্তাদের মন্তব্যকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা ইত্যাদি।

মুদরাজ প্রধানত দুই প্রকার। যথা:

১. মুদরাজ ফিল মতন (مدرج في المتن) বা মতনে অনুপ্রবিষ্ট

২. মুদরাজ ফিস্ সনদ (مدرج في السند) বা সনদে অনুপ্রবিষ্ট

মুদরাজুল মতন (مدرج المتن) এর সংজ্ঞা

و هو ان يدخل في حديث رسول الله صـــ شئ من كلام بعض الرواة –

যে হাদীসে রাসূল সা.-এর বক্তব্যের মাঝে কোন রাবীর কোন কথাকে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়েছে তাকে মুদরাজুল মতন (مدرج المتن) বলা হয়।

স্থান ভেদে মুদরাজুল মতনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. হাদীসের শুরুতে অনুপ্রবিষ্ট।

২..মধ্যভাগে অনুপ্রবিষ্ট।

৩. শেষে অনুপ্রবিষ্ট।

১. শুরুতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার উদাহরণ

ما رواه الخطيب عن ابي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال – قال رسول الله صـــ اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار

এই হাদীসটির প্রথমাংশ অর্থাৎ اسبغوا الوضوء এই বাক্যটি মুদরাজ। এটি বস্তুত আবু হুরায়রা রা.-এর বক্তব্য। আবু কুতন ও শাবাবার ভুলের কারণে এই অংশটুকু হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বস্তুত এ হাদীস ইমাম বুখারী আদাম-এর সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন-

عن أبي هريرة قال اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار–

খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন যে, আদাম যে শব্দে হাদীস বর্ণনা করেছেন: সেই শব্দে বহু সংখ্যক ব্যক্তি হাদীসটি বর্ণনা করেছে।[১] অতএব পরিস্কার হয়ে যায় যে, আবু কুতন ও শাবাবাহ এ দু'জনের সন্দেহের কারণে এই কাণ্ডটি ঘটেছে।

---

[১] তাদরীবুর রাবী।

২. মধ্যভাগে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার উদাহরণ

ما رواه الدارقطنى عن عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صـــ يقول من مس ذكره ـــ وانثييه أو رفغيه فليتوضأ–

বস্তুতঃ انثييه اورفغيه এই অংশটুকু ছিল 'অরওয়ার মন্তব্য। কিন্তু আব্দুল হামীদ হিশাম থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে এই অংশটুকু মূল হাদীসের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। কেননা হিশাম থেকে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা যখন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তখন তারা এই অংশটুকু উল্লেখ করেননি। বরং আইয়ূবের সূত্রে যখন হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তখন এটিযে 'অরওয়ার মন্তব্য তা তিনি সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনাটি নিম্নরূপ-

عن ايوب ...... قال رسول الله من مس ذكره فليتوضأ وقال كان عروة يقول اذا مس رفغيه أو انثييه أو ذكره فليتوضأ –

সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আব্দুল হামীদ 'অরওয়ার এই মন্তব্যকে হাদীসের অংশ মনে করে তিনি তা মূল হাদীসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। ফলেই এজটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

অনেক সময় দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা করার জন্য রাবীগণ শব্দ অনুপ্রবিষ্ট করে থাকেন। যেমন ইমাম বুখারী হযরত আয়শা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস নিম্নোক্ত শব্দে উদ্ধৃত করেছেন-

كان النبيّ صـــ يتحنث في غار حراء – وهو التعبد – الليالى ذوات العدد – الخ

উক্ত হাদীসে و هو التعبد الخ এই অংশটুকু মূলত يتحنث শব্দের ব্যাখ্যা যা ইমাম যুহরীর পক্ষ থেকে সংযোজিত।

৩. হাদীসের শেষাংশে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার উদাহরণ

ما رواه البخارى عن أبى هريرة رض مرفوعا للعبد المملوك اجران– والذِي نفسى بيده لو لا الجهاد والحج وبرّ امى لاحببت ان اموت وانا مملوك –

এই হাদীসে والذِي نفسى بيده থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটুকু রাসূল সা.-এর বক্তব্য না হওয়ার বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। কারণ রাসূল সা. কখনই গোলাম হওয়ার বাসনা পোষণ করতে পারেন না। কেননা তিনি হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ট মানুষ। তাছাড়া তাঁর মা যেহেতু তাঁর শিশুকালেই ইন্তিকাল করে গেছেন; তাই মাতৃসেবাকে গোলাম হওয়ার কামনা না করার কারণ হিসাবে উল্লেখ করার কোন অর্থই হয় না। তাই এটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাদীসের এই অংশটুকু পরবর্তী কোন রাবী তার মানসিক কামনার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। যা পরে কোন বর্ণনাকারী হাদীসের অংশ মনে করে বর্ণনা করেছেন।

মুদরাজুল ইসনাদ (مدرج الإسناد) -এর সংজ্ঞা:

و هو الحديث الذي غير سياق اسناده –

যে হাদীসের সনদের আঙ্গিককে পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে তাকে মুদরাজুল ইসনাদ বলা হয়।[১] মুদরাজুল ইসনাদের বিষয়টিও তিন চার পন্থায় হতে পারে। যথা:

১নং পন্থা : যেমন কোন একজন রাবী একটি হাদীস বিভিন্ন সূত্রে শ্রবণ করেছেন। কিন্তু তাথেকে বর্ণনাকারীদের কেউ সব সূত্রগুলোকে একত্রিত করে হাদীসটি বর্ণনা করলেন, কিন্তু প্রত্যেক সূত্রে বর্ণনাকারীদের তালিকায় যে ভিন্নতা রয়েছে তা তিনি উল্লেখ করলেন না। যেমন-

ইমাম তিরমিযী বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত:

روى الترمذى من طريق ابن مهدى عن الثورى عن واصل الاحدب ومنصور والأعمش عن ابى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب اعظم –

উপরোক্ত হাদীসটি মূলত ওয়াসেল, মনসূর, ও 'আমাশ এই তিনজের সূত্রে সুফয়ান সওরী আহরণ করেছেন। তবে মনসূর ও আ'মাশ দু'জনেই আবু ওয়ায়েল থেকে আমর ইবনে শুরাহবীলের মধ্যস্থতায় ইবনে মাসউদ থেকে আহরণ করেছেন। কিন্তু ওয়াসেল আবু ওয়ায়েলের সূত্রে সরাসরি ইবনে মাসউদ থেকে আহরণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি আমর ইবনে শুরাহবীল এর মধ্যস্থতায় আহরণ করেননি। কিন্তু পরবর্তী বর্ণনাকারী ওয়াসেল, মনসুর 'আমাশ এই তিনজনের সূত্রেই আবু ওয়ায়েল থেকে আমর ইবনে শুরাহ্বীলের মধ্যস্থতায় ইবনে মাসউদ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওয়াসেলের সূত্রে যে আমর ইবনে শুরাহ্বীল নেই সে কথা সুস্পষ্ট করেননি। অতএব ওয়াসেলের সূত্রকে মনসূর ও 'আমাশের সূত্রের মাঝে মুদরাজ বা অনুপ্রবিষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

২নং পন্থা : যেমন কোন একজন রাবী একটি হাদীস এক সূত্রে আহরণ করেছে, আর অন্য একটি হাদীস অন্য আরেক সূত্রে আহরণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কোন রাবী পূর্বোক্ত রাবীর কোন একটি সূত্রকে উল্লেখ করলেন এবং সেই সূত্র-সংশ্লিষ্ট হাদীসটি উল্লেখ করার পর অন্য সূত্রে আহরিত হাদীসটিকে কিংবা তার অংশ বিশেষকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করলেন। কিন্তু সেটি যে ভিন্ন সূত্রে আহরিত তা তিনি উল্লেখ করলেন না। যেমন : মু'আত্তায় সংকলিত নিম্নের হাদীসটি-

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ১০৩।

روى سعيد بن ابى مريم عن مالك عن الزهرى عن انس قال قال رسول الله صـــ : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا –

উপরোক্ত হাদীসে ولا تنافسوا শব্দটি উপরোল্লিখিত সনদে বর্ণিত হাদীসের অংশ নয়। বরং এই অংশটুকু ইমাম মালিক আবুয্ যিনাদ থেকে আ'রাজের মধ্যস্থতায় আবু হুরায়রা থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার অংশ বিশেষ। কিন্তু সাঈদ ইবনে আবি মারয়াম যুহরীর মধ্যস্থতায় হযরত আনাস থেকে বর্ণিত হাদীসের সঙ্গে এই শব্দটি অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। এ অংশটুকু যে অনুপ্রবিষ্ট তা বুঝা গেছে এভাবে যে, মুআত্তার বর্ণনাকারীগণ দু'টি হাদীসই পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন।

* যদি কোন রাবী তার উস্তাদ থেকে একটি হাদীস সরাসরি আহরণ করে থাকেন আর অন্য একটি হাদীস অন্য কারো মধ্যস্থতায় ঐ উস্তাদ থেকেই আহরণ করে থাকেন কিন্তু বর্ণনার সময় ঐ মধ্যস্থিত ব্যক্তিকে উল্লেখ না করে উভয় হাদীসকে একত্রিত করে সরাসরি ঐ উস্তাদের সনদে উল্লেখ করেন, তাহলে সেটিকে আল্লামা ইবনুল হাম্বলী মুদরাজুল ইসনাদের একটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ এটিকে একটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে উল্লেখ না করে উপরোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে ফেলাই শ্রেয়। কেননা এ দু'টি মূলত একই বিষয়।

৩নং পন্থা : যেমন উস্তাদ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে সনদ উল্লেখ করলেন। অতপর: হাদীস বর্ণনার আগেই হয়ত কোন কারণে তিনি কোন মন্তব্য করলেন। কিন্তু ছাত্রদের কেউ হয়ত সেই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য না করে উস্তাদের সেই মন্ত ব্যকেই হাদীস মনে করে বসলেন। পরবর্তীতে সেটিকে হাদীস হিসাবে ঐ উস্ত াদের সূত্রে বর্ণনা করলেন। যেমন ইমাম ইবনে মাজাহ কর্তৃক সংকলিত নিম্নের হাদীসটি-

روى ابن ماجه عن اسماعيل عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن ابى سفيان عن جابر قال قال رسول الله صـــ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار –

বস্তুতঃ বর্ণনাকারী শরীক যখন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন সাবেত ইবনে মূসা তার দরবারে প্রবেশ করেন। সাবেত ছিলেন একজন আবেদ ও যাহেদ ব্যক্তি। যিনি রাতে বেশী নামায আদায় করতেন। আবার তার চেহারাও ছিল খুব প্রৌজ্জ্বল। তাই তাকে দেখে শরীক من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار এই মন্তব্যটুকু করেন। কিন্তু সাবেত সেটিকে হাদীস মনে করে পরবর্তীতে শরীকের সুত্রে তা হাদীস হিসাবে বর্ণনা করতেন। ইবনে হিব্বান বলেন যে, বস্তুতঃ শরীক ঐ সূত্রে তখন যে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ-

عن الأعمش عن ابى سفيان عن جابر .... قال قال رسول الله صـــ يقعد الشيطان على قافية رأس احدكم-

কিন্তু হাদীসটির সনদ বর্ণনার পর সাবেতের আগমনকে কেন্দ্র করে শরীক যে মন্তব্য করেন, সেটিকে হাদীস মনে করে উক্ত সনদে বর্ণনা করার ফলে এটি মুদরাজ বলে গণ্য হয়েছে। অবশ্য ইবনুস সালাহ এটিকে অনিচ্ছাকৃত জাল হাদীস তৈরীর শ্রেণীভূক্ত করে উল্লেখ করেছেন।[১]

মুদরাজের হুকুম :

যদি হাদীসের ব্যাখ্যা হিসাবে কোন কিছু অনুপ্রবিষ্ট করা হয় তাহলে তা শিথিলযোগ্য। একারণেই যুহরীসহ অনেকের কাছ থেকে ঐ ধরণের ইদ্‌রাজের ঘটনা ঘটেছে। তবুও ব্যাখ্যা হিসাবে কোন কিছু অনুপ্রবিষ্ট করলেও রাবীর তা উল্লেখ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় শ্রোতারা ভুল বুঝতে পারেন। আর যদি এ ধরণের অনুপ্রবেশ ভুলক্রমে ঘটে তাহলে ভুল ক্ষমাযোগ্য। তবে এধরণের ভুল বেশী হলে একারণে রাবী স্মৃতিদৌর্বল্য জনিত অভিযোগে অভিযুক্ত বলে গণ্য হবেন। তবে ইচ্ছা করে এরূপ করা সর্বসম্মতভাবেই হারাম। কেননা এতে প্রতারণা রয়েছে। আল্লামা সাম'আনী বলেছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে হাদীসে কোন কিছু অনুপ্রবিষ্ট করবে তার আদালত ও বিশ্বস্থতা বাতিল হয়ে যাবে।

যেসব কারণে ইদরাজ করা হয়ে থাকে :

১. কোন শরয়ী বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে উস্তাদের দেওয়া বক্তব্যকে হাদীসের অংশ মনে করে।
২. হাদীস বর্ণনা শেষ করার আগেই কোন একটি শরয়ী বিধান যা উক্ত হাদীসের আলোকে উদ্ঘাটিত হতে পারে- তা বর্ণনার উদ্দেশ্যে উস্তাদের দেওয়া বক্তব্যকে হাদীসের অংশ মনে করে।
৩. হাদীসের কঠিন শব্দের অর্থ কিংবা জটিল বাক্যের ভাব বর্ণনার উদ্দেশ্যে উস্তাদের দেওয়া বক্তব্যকে হাদীসের অংশ মনে করে।
৪. যেহেতু উস্তাদ থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে, তাই উস্তাদের রেফারেন্সে কোন এক সনদে হাদীসটি বর্ণনা করা যথেষ্ট মনে করে।

হাদীসে ইদরাজ ঘটেছে কিনা তা চেনার উপায়

১. রাবী নিজেই যদি বর্ণনা করেন যে, তিনি ঐ অংশটুকু অনুপ্রবিষ্ট করেছেন।
২. অন্য সূত্রে হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হওয়ার কারণে জানা যাবে যে, ঐ অংশটুকু মুদরাজ বা অনুপ্রবিষ্ট।

---

[১] বায়েসুল হাদীস টিকা ৬২-৬৫ পৃষ্ঠার ভাবালম্বনে (সংক্ষেপিত)।

৩. যদি হাদীসবিশারদ কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ অংশটুকু অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার মন্তব্য করেন।
৪. যদি বিষয়টি এমন হয় যা রাসূল সা. বলতে পারেন না, তাহলেও বুঝা যাবে যে সেটি অনুপ্রবিষ্ট।
৫. নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত বর্ণনা দ্বারাও কোন কিছু অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে কি না তা বুঝা যায়।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা সুয়ূতী তাদরীবুর রাবীতে আল্লামা ইবনুল জাওযীর একটি চমৎকার মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন -

اذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول – فاعلم انه موضوع.

যদি তুমি দেখ যে, কোন হাদীস বিবেক বিরুদ্ধ কিংবা কুরআন সুন্নার সম্পূর্ণ বিপরীত, কিংবা তা দ্বীনের স্বীকৃত মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তাহলে ধরে নিও যে, সেটা জাল বা ভিত্তিহীন।[১] ●

এসম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাবলী:

১. الفصل للوصل المدرج في النقل খতীব বাগদাদীকৃত।
২. تقريب المنهج بترتيب المدرج ইবনে হজরকৃত। এটি মূলত খতীবে বাগদাদীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ও পরিবর্ধিত একটি গন্থ।

৫-খ. মাকলূব (مقلوب) :

মাকলূব (مقلوب) শব্দটি باب نصر থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। আভিধানিক অর্থ পাল্টে যাওয়া, পরিবর্তন হওয়া। মানুষের কলবকে এজন্য কলব নামে নামকরণ করা হয়েছে যে, তাও এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় বার বার পাল্টে যায়। সুতরাং مقلوب এর অর্থ হবে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তীত, রূপান্তরিত। যে হাদীসের সনদ কিংবা মতনে শব্দকে অগ্র-পশ্চাত করা হয়েছে সেগুলোকে এ জন্য মাকলূব নামে নামকরণ করা হয়েছে যে, সেগুলোও এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত ও পরিবর্তীত হয়ে গেছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو الحديث الذي وقع في متنه أو سنده تغيير بابدال لفظ بلفظ، أو جملة باخر، أو بتقديم المتأخر وتاخير المتقدم، أو بتبديل سند للمتن الآخر –

---

[১] আল-বায়েসুল হাসীস টিকা- পৃষ্ঠা- ৭৬

যে হাদীসের সনদ কিংবা মতনে পরিবর্তন ঘটেছে, হয়ত এক শব্দকে অন্য শব্দ দ্বারা বা এক বাক্যকে অন্য বাক্য দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলার মাধ্যমে, কিংবা অগ্রপশ্চাত করণের মাধ্যমে, কিংবা এক হাদীসের সনদকে অন্য হাদীসের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে; এ ধরণের হাদীসকে মাকলূব (مقلوب) হাদীস বলা হয়।[১]

অনেক সময় পরিবর্তন যে ঘটেছে তা হাদীসের অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা করলেই বুঝা যায়। যেমন ইমাম তিরমিযী বর্ণিত একটি হাদীসে আছে-

اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه –

যখন তোমাদের কেউ সিজদা করে তখন যেন উটের মত হামাগুড়ি না দেয়। সুতরাং সে যেন দুই হাতকে দুই হাটুর পূর্বে মাটিতে রাখে।

উট হামাগুড়ি দেওয়ার সময় প্রথমে দুই হাত অর্থাৎ সামনের দুই পা মাটিতে বিছিয়ে দেয়, পরে পিছনের দুই পা ভেঙ্গে মাটিতে শুয়ে যায়। যেহেতু হাদীসের প্রথম অংশে উটের হামাগুড়ি দেওয়ার ন্যায় সিজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে সুতরাং পরবর্তী অংশে যে বিবরণ পেশ করা হয়েছে যে, প্রথমে দুই হাত মাটিতে রাখবে অতপর দুই হাটু মাটিতে রাখবে -তা পূর্বের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।

বরং যদি বর্ণনাটি এমন হত যে, (وليضع ركبتيه قبل يديه) "দুই হাটু দুই হাতের পূর্বে মাটিতে রাখবে" তাহলে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। তাই পরিস্কার বুঝা যায় যে, এ ক্ষেত্রে বাক্যটি-وليضع ركبتيه قبل يديه না হয়ে وليضع يديه قبل ركبتيه ছিল। সম্ভবত কোন বর্ণনাকারী ركبتيه এর স্থলে يديه এবং يديه -এর স্থলে ركبتيه উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ শব্দ উলট পালট করে ফেলেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম যাদুল মা'আদে উল্লেখ করেছেন যে-

فكان الاصل وليضع ركبتيه قبل يديه كما اخرج ابن ابي شيبه– فقدم احد رواته ذكر اليدين على الركبتين–

মূল বক্তব্যটি "দুই হাতের পূর্বে যেন দুই হাটু মাটিতে রাখে" এরূপ ছিল। যেমন ইবনু আবি শায়বার বর্ণনায় সেরূপই আছে। কোন রাবী হয়ত يدين শব্দটিকে ركبتين এর স্থলে উল্লেখ করে উলট পালট করে ফেলেছে।[২]

আবার অনেক সময় পরিবর্তনের বিষয়টি হাদীসের মতন থেকে বুঝা যায় না বরং তা বুঝা যায় সীকাতের মুখালাফাতের দ্বারা অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবীদের

---

১ যফরুল আমানী পৃ: ৪০৯ ইষৎ পরিবর্ধিত।

২ যাদুল মা'আদ খ: ১: পৃ: ২২৬-২২৭ যফরুল আমানী -পৃ: ৪১১।

বিপরীত বর্ণনা করা দ্বারা কিংবা বাস্তবতার পরিপন্থী হওয়া দ্বারা অথবা বর্ণিত অপরাপর বিষয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার দ্বারা।

মাকলূবের প্রকার :

মাকলূব প্রধানত: দুই প্রকার। যথা:

১. (مقلوب المتن) যে হাদীসের মতনে পরিবর্তন ঘটেছে।

২. (مقلوب السند) যে হাদীসের সনদে পরিবর্তন ঘটেছে।

মতনে পরিবর্তন ঘটার অর্থ হল বর্ণনাকারীদের কেউ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মতনের কোন শব্দকে স্থানান্তর করে ফেলবে। অর্থাৎ একস্থানের শব্দকে অন্য স্থানে বসিয়ে বর্ণনা করবে।

মাকলূবুল মতন এর উদাহরণ

حديث ابن عمر – ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله صـــ يقضي حاجته مستدبر القبلة و مستقبل الشام

ইবনে উমর রা. বলেন যে, আমি হাফসার ঘরের উপর আরোহণ করলাম, তখন রাসূল সা. কে দেখলাম, তিনি কিবলাকে পিছনে রেখে এবং শিরিয়ার দিকে মুখ করে ইস্তিঞ্জা করছেন।[১] কিন্তু ইবনে হিব্বান এই রিওয়ায়াতটি নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন - مستقبل القبلة ومستدبر الشام ....

অর্থাৎ কিবলার দিকে মুখ করে এবং শিরিয়াকে পশ্চাতে রেখে ইস্তিঞ্জা করছেন।[২] কোন রাবী হয়ত এটিকে শব্দ স্থানান্তর করে উল্লেখ করেছেন।[৩]

উল্লেখ্য যে, মতনের এধরণের পরিবর্তন অনেক সময় অর্থের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে অর্থাৎ এধরণের পরিবর্তন দ্বারা বিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন পূর্বোক্ত তিরমিযীর রিওয়ায়াতটি وليضع يديه قبل ركبتيه।

কেননা এই রিওয়ায়াতের উপর ভিত্তি করে ইমাম মালেক, আওযায়ী ও ইমাম আহমদ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সিজদার সময় প্রথম দুই হাত মাটিতে রাখা ও পরে দুই হাটু মাটিতে রাখা মুস্তাহাব। অথচ মূল হাদীস অর্থাৎ وليضع ركبتيه قبل يديه -এর উপর ভিত্তি করে হানাফীরা এর বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

---

[১] বুখারী

[২] ইবনে হিব্বান - খ: ২ পৃ: ৪৯৬।

[৩] যফরুল আমানী পৃ: ৪১৪।

আবার অনেক সময় এধরণের পরিবর্তন দ্বারা মূল ভাবের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। যেমন বুখারী বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর রিওয়ায়াতে আছে-

ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه –

কিন্তু মুসলিমের রিওয়ায়াতে আছে لا تعلم يمينه ما تنفق شماله সম্ভবত মুসলিম যাদের থেকে হাদীসটি সংকলন করেছেন তাদের কারো কাছ থেকে এই পরিবর্তনটি ঘটেছে।

কিন্তু এই পরিবর্তনের দ্বারা অর্থের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। যদিও ডান হাত দ্বারা দান করাই মানুষের অভ্যাস।

অনেকেই এক হাদীসের মতনকে অন্য হাদীসের সনদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়াকেও মাকলূবুল মতনের এক প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম বুখারীকে পরীক্ষা করার জন্য বাগদাদে করা হয়েছিল। তবে অধমের কাছে মনে হয় যে, এটি মাকলূবুল ইসনাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়াই শ্রেয়। আব্দুল হাই লাখনভী রহ. এধরণের পরিবর্তনকে মাকলূবুল ইসনাদ এর অন্তর্ভুক্ত করেই উল্লেখ করেছেন।

মাকলূবুল ইসনাদ :

কোন হাদীসের সনদে উদল-বদল হলে তাকে মাকলূবুল ইসনাদ বলে। সনদে পরিবর্তন বিভিন্নভাবে হতে পারে। রাবীর নিজের নাম ও তার পিতার নাম উদল-বদল করে উল্লেখ করার কারণে, কিংবা এক রাবীকে অন্য রাবী দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলার কারণে কিংবা এক সনদকে অন্য মতনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়ার কারণে।

মাকলূবুল ইসনাদের প্রকার :

মাকলূবুল ইসনাদ তিন পন্থায় ঘটতে পারে। যথা:

১. রাবীর নিজের নাম ও তার পিতার নামের মাঝে উদল-বদলের মাধ্যমে। যেমন কোন একটি হাদীসের একজন রাবীর নাম كعب بن مرة ছিল; কিন্তু কোন বর্ণনাকারী হয়ত তাকে উল্লেখ করতে গিয়ে বললেন مرة بن كعب। কিংবা রাবীর নাম ছিল حماد بن عمرو কিন্তু উল্লেখ করা হল عمرو بن حماد ইত্যাদি।

২. অভিনবত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক রাবীর স্থলে অন্য রাবীর নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে। অর্থাৎ হাদীসটি হয়ত সালেমের সূত্রে বর্ণিত ছিল। কিন্তু রাবী

সালেম-এর স্থলে نافع এর নাম উল্লেখ করে হাদীসটি বর্ণনা করলেন। যেমন ইমাম মুসলিম বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি -

روى إمامنا مسلم عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صـــ اذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدئواهم بالسلام –

কিন্তু এই হাদীসটি হাম্মাদ ইবনে আমর নুসায়বী যখন বর্ণনা করেন তখন নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেন روى حماد النصيبى عن الأعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة.

অর্থাৎ তিনি سهل সহলের স্থলে আ'মাশের নাম উল্লেখ করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সাধারণত সমপর্যায়ের রাবী বা তার চেয়েও উপরের স্তরের কোন রাবীকে উল্লেখ করে অন্যদেরকে তাক লাগানো বা আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়।

এ ধরণের এক রাবীর স্থলে অন্য রাবীর নাম অনেক সময় ইচ্ছা করেও উল্লেখ করা হয়। আবার অনেক সময় অনিচ্ছায় এবং ভুল বুঝার কারণেও হয়ে থাকে। যেমন ইমাম মুসলিম বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি -

روى مسلم عن يحى بن ابى كثير عن عبد الله بن ابى قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صـــ اذا اقيمت الصلوة فلا تقوموا حتى ترونى–

কিন্তু জারীর ইবনে হাযেম যখন হাদীসটি বর্ণনা করেন তখন নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেন-

روى جرير بن حازم عن ثابت البنانى ــــ عن انس رض قال قال رسول الله صـــ اذا اقيمت الصلوة ....الخ

বস্তুতঃ জারীর সাবেত আল-বুনানীর দরবারে উপস্থিত ছিলেন এ সময় হাজ্জাজ ইবনে আবি উসমান এই হাদীসটি يحى بن كثير-এর পূর্বোল্লিখিত সূত্রে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু জারীর এটিকে সাবেত আল-বুনানীর হাদীস মনে করে তার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করতেন। ফলে এই পরিবর্তনটি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে।[১]

৩. সনদে পরিবর্তনের একটি পন্থা এও যে, এক হাদীসের সনদকে অন্য হাদীসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। যেমন নিম্নের হাদীসটি মূলত ছিল -

عن سهل بن ابى صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صـــ اذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام –

---

১ যফরুল আমানী

অন্য একটি হাদীস যা মূলত ছিল -

عن يحى بن ابى كثير عن عبد الله بن ابى قتادة عن أبيه – قال قال رسول الله صـــ اذا اقيمت الصلوة فلا تقوموا حتى تروني –

এখন যদি পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে পরের হাদীসটি উল্লেখ করা হয় এবং এভাবে বলা হয় -

عن سهل بن ابى صالح عن أبيه عن أبي هريرة – قال قال رسول الله صـــ اذا اقيمت الصلوة فلا تقوموا حتى تروني –

আর পরের সনদে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করা হয় এবং বলা হয়-

عن يحى بن ابى كثير عن عبد الله بن ابى قتادة عن أبيه – قال قال رسول الله صـــ اذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام –

তাহলে এটিও মাকলূবুল ইসনাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইমাম বুখারী বাগদাদে আসলে তাকে পরীক্ষা করার জন্য ১০০ হাদীসের সনদকে এভাবে উলট পালট করে তার সামনে পেশ করা হয়েছিল।

মাকলূবের হুকুম

মাকলূব হাদীস সাধারণত: যয়ীফ এবং বর্জনীয় বলে গণ্য হয়। যদি কারো স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে এহেন পরিবর্তন করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে।(১) তবে মজলিস ভঙ্গ করার আগে সঠিক হাদীসটি বর্ণনা করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।(২) কেননা এই পরীক্ষা সম্পর্কে বেখবর কোন ব্যক্তি মজলিসে থাকলে সে বিভ্রান্ত হতে পারে।

যদি ভুলক্রমে অনিচ্ছা সত্ত্বে এরূপ হয়ে যায়, তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য।(৩) তবে এধরণের ঘটনা বার বার ঘটলে তা রাবীর স্মৃতিদৌর্বল্যের প্রমাণ বহন করে। সে তখন যয়ীফ বলে গণ্য হবে।(৪) কিন্তু যদি কেও নবী সা.-এর শব্দ বিন্যাসে ত্রুটি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এধরণের পরিবর্তন করে, তাহলে তা হাদীস জাল (وضع) করার বিধানের আওতায় পড়বে। বিশেষ করে সেই পরিবর্তনের দ্বারা যদি অর্থ বদলে যায়, তখন তা অবশ্যই হাদীস জাল করার বিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।(৫)

---

১ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ১০৯।

২ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ১০৯।

৩ যফরুল আমানী - ৪১৫।

৪ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস -১০৯।

৫ যফরুল আমানী পৃ: ৪১৫।

যদি কেউ অভিনবত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও এরূপ পরিবর্তন করে তাহলেও (তা বৈধ্য হবে না) সে ব্যক্তি হাদীস জালকারীর পর্যায়ভূক্ত বলে গণ্য হবে।[১]

মাকলূবের উপর রচিত গ্রন্থাবলী:

১. جلاء القلوب في معرفة المقلوب ইবনে হজরকৃত।

২. دافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والالقاب খতীব বাগদাদীকৃত।

৫-গ. মযীদ ফি মুত্তাসিলিল আসানিদ (مزيد في متصل الأسانيد)

মযীদ (المزيد) শব্দটি الزيادة মাসদার বা ক্রিয়াধাতু থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। الزيادة শব্দের অর্থ অতিরিক্ত করা, বর্ধিত করা। সুতরাং মযীদ (مزيد)-এর অর্থ হবে বর্ধিত বা পরিবর্ধিত। আর মুত্তাসিল (متصل) অর্থ অবিচ্ছিন্ন। আর اسانيد শব্দটি সনদের বহুবচন। সুতরাং مزيد في متصل الأسانيد অর্থ হল, যে সূত্র অবিচ্ছিন্ন তাতে কোনকিছু বর্ধিত করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

هو الحديث الذي زيد في اثناء إسناده راوٍ مع كون الظاهر الإتصال-

বাহ্যত যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন রয়েছে তাতে কোন রাবীকে বর্ধিত করা।[২] সাধারণত: وهم বা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রাবীদের থেকে এধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। তবে সন্দেহে নিপতিত না হয়েও রাবীগণ অনেক সময় এধরণের পরিবর্ধন বাস্তব ভিত্তিতেও করে থাকেন।

যেমন যায়েদ ও রাশেদ একটি খবর সাঈদের মধ্যস্থতায় আহমদ থেকে শ্রবণ করেছেন। কিন্তু যায়েদ পরে সরাসরি আহমদ থেকেও খবরটি শ্রবন করেছেন। কিন্তু রাশেদ এই খবরটি সরাসরি শ্রবন করেননি। এমতাবস্থায় যায়েদ যদি অন্যের কাছে খবরটি পরিবেশন করতে গিয়ে বলেন حدثنا سعيد عن احمد তাহেল তিনি বাস্তবের বিপরীত কিছু বললেন না। কেননা তিনি সাঈদের মধ্যস্থতায় আহমদ থেকে খবরটি বাস্তবেই শ্রবণ করেছেন। আবার যদি তিনি বলেন যে, حدثنا احمد তাহলেও তিনি বাস্তবের বিপরীত কিছু বললেন না। কেননা তিনি আহমদ থেকে সরাসরিও খবরিটি শ্রবণ করেছেন। তাছাড়া তিনি حدثنا احمد বলে

---

১ যফরুল আমানী পৃ: ৪১৫।

২ তাইসীর মুসতালাহিল হাদীস এবং কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীসে প্রদত্ত সংজ্ঞার ভাবালম্বনে। -গ্রন্থকার।

আহমদ থেকে যে খবরটি সরাসরি শ্রবণ করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখও করেছেন। অতএব উভয় সূত্রেই খবরটি মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর যে ক্ষেত্রে তিনি সাঈদের মধ্যস্থতার কথা উল্লেখ করেছেন, সে ক্ষেত্রে সাঈদের পরিবর্ধন সন্দেহ বশত: হয়নি। অতএব এ পরিবর্ধন হাদীস যয়ীফ হওয়ার কারণ হতে পারে না।

কিন্তু রাশেদ যদি খবরটি অন্যের নিকট পরিবেশন করতে গিয়ে বলেন حدثنا سعيد عن احمد তাহলে তো তিনি বাস্তবের অনুরূপই বর্ণনা করলেন। কেননা তিনি বাস্তবেই সাঈদের মধ্যস্থতায় আহমদ থেকে খবরটি শ্রবণ করেছেন। কিন্তু তিনি যদি সাঈদের কথা উল্লেখ না করে সরাসরি আহমদের উদ্ধৃতিতে عن احمد বলে খবরটি অন্যের কাছে পরিবেশন করেন, তাহলে বাস্তবে তা মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত বলে গণ্য হবে না। কেননা তিনি সরাসরি তা আহমদ থেকে শ্রবণ করেননি। বরং তার এই বর্ণনাটি হয়ত منقطع, না হয় مدلس, না হয় ارسال خفي।এই তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কেননা রাশেদ যে খবরটি আহমদ থেকে সরাসরি শ্রবণ করেনি তা আমাদের জানা আছে।

কিন্তু যায়েদ ও রাশেদ সরাসরি আহমদ থেকে খবরটি শ্রবণ করেছেন কি না, তা যদি আমাদের জানা না থাকে, তারাও যদি সুস্পষ্ট শব্দে সরাসরি শ্রবণের কথা উল্লেখ না করেন, বরং عن احمد (আহমদ থেকে বর্ণিত) বা قال احمد (আহমদ বলেছেন) এরূপ শব্দে খবরটি পরিবেশন করেন, আর আহমদ থেকে তাদের সরাসরি শ্রবণের ক্ষেত্রে যদি বাহ্যিক কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে, আহমদ থেকে খবরটি তারা সরাসরি শ্রবণ করেছেন। অর্থাৎ عن احمد বলে যায়েদ বা রাশেদ যে খবরটি পরিবেশন করেছেন তা মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত।

কিন্তু যদি বারান্তরে তারা حدثنا سعيد عن احمد -এই সূত্রে খবরটি পরিবেশন করেন তাহলে তখন আমাদেরকে মনে করতে হবে যে, মুত্তাসিল সনদের মাঝে সাঈদের নাম পরিবর্ধন করা হয়েছে।

কিংবা ধরা যাক যে, যায়েদ ও রাশেদ একটি খবর সরাসরি আহমদ থেকে শ্রবণ করেছেন। পরে যায়েদ সাঈদের মধ্যস্থতায়ও আহমদ থেকে খবরটি শুনেছেন। কিন্তু রাশেদ এই খবরটি সাঈদের মধ্যস্থতায় আহমদ থেকে শ্রবণ করেননি। অন্য আরেকটি খবর হয়ত তিনি সাঈদের মধ্যস্থতায় আহমদ থেকে শ্রবণ করেছেন- যা তিনি حدثنا سعيد عن احمد এই সূত্রে বর্ণনাও করেন।

ধরা যাক যে, রাশেদ থেকে পূর্বোক্ত খবরটি দু'জন ব্যক্তি শ্রবণ করার পর অন্যের

কাছে তা পরিবেশন করতে গিয়ে একজন বলছেন যে حدثنا راشد قال حدثنا احمد আর অন্যজন খবরটি পরিবেশন করতে গিয়ে বলছেন حدثنا راشد عن سعيد عن احمد। আর যদি আমরা জানতে পারি যে, এই দুইজন খবর পরিবেশনকারী একই সঙ্গে রাশেদ থেকে খবর শ্রবণ করে ছিলেন। পরে রাশেদের সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তির আর কোন দিন দেখা-সাক্ষাতও হয়নি। তাহলে ধরে নিতে হবে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি রাশেদ ও আহমদের মাঝে সাঈদের নাম সন্দেহের বশবর্তী হয়ে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। কেননা রাশেদ সাঈদের মধ্যস্থতায় এখবরটি আহমদ থেকে শ্রবনই করেন নি। বরং তিনি আহমদ থেকে সরাসরি শ্রবণ করেছেন। তিনি হয়ত একারণে এরূপ করেছেন যে حدثنا راشد قال حدثنا سعيد عن أحمد এই সূত্রে রাশেদ আহমদ থেকে অন্য আর একটি খবর পরিবেশন করে থাকেন, তাই ঐ বর্ণনাকারী সন্দেহের শিকার হয়েছেন এবং সেই ভিত্তিতে এখানেও سعيد -এর নাম জুড়ে দিয়ে সূত্রটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সন্দেহে নিপতিত হয়ে সূত্রে যে পরিবর্ধন তিনি করলেন এটি হাদীস যয়ীফ হওয়ার কারণ বটে। কেননা এটি রাবীর স্মৃতিদৌর্বল্যের কারণে ঘটা বিষয়।

কিন্তু যিনি সাঈদকে বর্ধিত করে সূত্র উল্লেখ করছেন, তিনি যদি ঐ ব্যক্তির তোলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকেন-যিনি বর্ধিত করছেন না; তাহলে কিন্তু ধরে নিতে হবে যে, যিনি সবল বর্ণনাকারী এবং অধিক নির্ভরযোগ্য তার বর্ণনাই সঠিক। আর যিনি দুর্বল বর্ণনাকারী তিনি হয়ত ভুল করে মধ্যবর্তী বর্ণনাকারীকে ফেলে দিয়েছেন। ফলে হাদীস বিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য যিনি বর্ধিত করেননি তিনি যদি সরাসরি শ্রবণের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করেন, তাহলে এরূপ ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে যে, তিনি মধ্যবর্তী বর্ণনাকারীকে ফেলে দিয়েছেন। সুতরাং যিনি বর্ধিত করেছেন তার বর্ণনাই সঠিক। কিন্তু যদি তিনি সুস্পষ্ট শব্দে সরাসরি শ্রবণের কথা উল্লেখ করেন, তাহলে আর এরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ থাকেনা।

এই আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন হাদীসের মুত্তাসিল সনদের মাঝে কোন রাবীকে পরিবর্ধিত করা হলেই তা হাদীস যয়ীফ হওয়ার কারণ হয়না। বরং এরূপ পরিবর্ধন কেবল তখনই হাদীস যয়ীফ হওয়ার কারণ হয় যখন তাতে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া যায়। যথা:

১. যিনি কোন রাবীকে বর্ধিত করছেন তিনি যদি ঐ ব্যক্তির চেয়ে সীকাহ না হন যিনি বর্ধিত করছেন না -তাহলে তার পরিবর্ধন যয়ীফ হওয়ার কারণ হবে।

২. যিনি বর্ধিত করেননি তার বর্ণনায় ঐ দুইজনের (যে দু'জনের মাঝে আরেকজনকে বর্ধিত করা হয়েছে) একজন থেকে অন্যজন সরাসরি শ্রবণ করেছেন এ কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. এমন কোন ইশারা ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকতে হবে যা দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী وهم বা সন্দেহের শিকার হয়েছেন।

উল্লিখিত তিনটি শর্ত পাওয়া না গেলে কিংবা তিনের কোন একটি শর্ত পাওয়া না গেলে মুত্তাসিল সনদের উপর কোন রাবীর পরিবর্ধন হাদীসটি যয়ীফ বলে গণ্য হওয়ার কারণ হবে না। বরং زيادة الثقة مقبولة -এই নিয়মের আওতায় পড়ে তা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে।[১]

উদাহরণ:

ما روى عن عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت ابا ادريس يقول سمعت واثلة بن الاسقع يقول سمعت ابا ادريس يقول سمعت ابا مرثد الغنوى يقول سمعت رسول الله صـــ يقول لا تجلسو على القبور ولا تصلوا اليها –

এই হাদীসের সূত্রে ইবনুল মুবারকের পর যে সুফয়ানের উল্লেখ রয়েছে তা পরিবর্ধিত। কেননা এক জামাত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এই হাদীসটি ইবনুল মুবারকের সূত্রে সরাসরি আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা সুফয়ানকে উল্লেখ করেননি। তাদের অনেকেই حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا عبد الرحمن এরূপ শব্দে সূত্রটি উল্লেখ করেছেন। যা দ্বারা ইবনুল মুবারক যে সরাসরি আব্দুর রহমান থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন তা স্পষ্টভাবে ব্যাক্ত হয়েছে। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পরবর্তী যে বর্ণনাকারী ইবনুল মুবারক ও আব্দুর রহমানের মাঝে সুফয়ানের নাম সংযুক্ত করে সনদ উল্লেখ করেছেন তিনি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এই কাণ্ডটি করেছেন। সুতরাং সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবেই এই সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়নি।

অনুরূপভাবে এই সূত্রে বুছর ইবনে উবায়দিল্লাহ ও ওয়াছেলাহ ইবনুল আসকা' -এর মাঝে আবু ইদ্‌রীসের উল্লেখও পরিবর্ধিত। এই পরিবর্ধনটি ইবনুল মুবারকের পক্ষ থেকে সন্দেহ বশত ঘটেছে বলে মনে করা হয়। কেননা আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে ইবনুল মুবারক ছাড়াও এক জামাত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউই বুছর ও ওয়াছেলার মাঝে আবু ইদ্‌রীসের উল্লেখ করেননি।

আবু হাতেম রাযী উল্লেখ করেছেন যে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, ইবনুল মুবারকের সন্দেহের কারণে এই অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কেননা বুছর বহু হাদীস আবু

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ১১১ এবং মুকাদ্দামায়ে ইবনুস-সালাহ ও মাহাসিনুল ইসতিলাহ ৪৮০-৪৮১ পৃষ্ঠার ভাবাবলম্বনে।

ইদ্‌রীসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাই ইবনুল মুবারক সন্দেহে নিপতিত হয়েছেন যে, এ হাদীসটিও হয়ত আবু ইদ্‌রীসের সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। ফলে তিনি এই ভুলটি করেছেন। অথচ বুছর এহাদীসটি সরাসরি ওয়াছেলাহ থেকে শ্রবণ করেছেন।[১] এ কারণেই মুসলিম এবং তিরমিযী ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যকোন গ্রন্থেই আবু ইদ্‌রীসকে যে সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সূত্রে হাদীসটি সংকলন করা হয়নি।[২]

হুকুম :

যদি কোন সূত্রে কোন রাবীকে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বর্ধিত করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সে হাদীসটি যয়ীফ ও মারদূদ বলে গণ্য হবে।

এসম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ :

تمييز المزيد في متصل الأسانيد খতীব বাগদাদীকৃত। যদিও এ কিতাবে পরিবেশিত সকল তথ্য যথার্থ নয়।[৩]

৫-ঘ. মুজতারিব (المضطرب)

مضطرب শব্দটি باب افتعال এর ইসমে ফায়েলের সীগাহ। الاضطراب ক্রিয়াধাতু বা মাসদার থেকে এটি উদ্গত। যার অর্থ কোন বিষয় এলোমেলো হওয়া, শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়া, নিয়ম-নীতি বিপন্ন হওয়া। اضطراب الموج অর্থ এক তরঙ্গের উপর আরেক তরঙ্গ ক্রমাগত আছড়িয়ে পড়া। সুতরাং مضطرب অর্থ সংঘাত সৃষ্টিকারী বা সাংঘর্ষিক। তবে শব্দটি مضطَرب অর্থাৎ ইসমে মাফউলের সীগাহ হিসাবেও ব্যবহার হয়ে থাকে।[৪] তখন এর অর্থ হবে সংঘাতময় হাদীস। একই মর্মের হাদীস যখন বিভিন্ন পন্থায় বর্ণিত হয়, তখন যেন বর্ণনার একটি পন্থা অন্য পন্থার সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে। এ হিসাবে এধরণের হাদীসকে مضطرِب সংঘাত সৃষ্টিকারী বা সাংঘর্ষিক হাদীস কিংবা مضطرَب সংঘাতময় হাদীস বলে নামকরণ করা হয়েছে।

---

১ মুকাদ্দামায়ে ইবনুস-সালাহ ও মাহাসিনুল ইসতিলাহ পৃ: ৪৮০

২ মাহাসিনুল ইসতিলাহ আলা হামেশে মুকাদ্দামায়ে ইবনুস-সালাহ পৃ: ৪৮১।

৩ মুকাদ্দামায়ে ইবনুস-সালাহ পৃ:২৮০।

৪ আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী বলেছেন- (هو بكسر الراء المهملة وقيل بفتحها) যফরুল আমানী পৃ: ৩৯৮

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو الحديث الذي يروى على اوجه مختلفة – ولم تترجح إحدى الأوجه على الأخر (سواء كان الإختلاف من راوٍ واحد أو من اكثر– ويمكن ان يكون الإختلاف في السند فقط أو في المتن فقط – أو في كليهما) –

যে হাদীস একাধিক পন্থায় বর্ণিত; পন্থাগুলোর কোন একটিকে অন্যগুলোর উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়নি, তাকে মুযতারিব বলা হয়। বিভিন্ন পন্থায় বর্ণনার বিষয়টি একজন বর্ণনাকারী থেকেও হতে পারে কিংবা একাধিক বর্ণনাকারী থেকেও হতে পারে। আর বর্ণনার ভিন্নতার বিষয়টি সনদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, মতনের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, আবার সনদ মতন উভয় ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।[১]

অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন হাদীস যদি বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেন -যা অর্থের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বৈপরীত্য সৃষ্টি করে এবং সাংঘর্ষিক হয় এবং কোনভাবেই সেগুলোর মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়; কিংবা একই ব্যক্তি থেকে হাদীসটি বিভিন্নজন বর্ণনা করতে গিয়ে সেই ব্যক্তির পরবর্তী সূত্রে একেক জন একেকভাবে সূত্রটি উল্লেখ করেন, যা সমন্বয় করা সম্ভব নয়; কিংবা সনদ মতন উভয় ক্ষেত্রেই যদি এই বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়; আবার বিপরীত মূখী বর্ণনাগুলোর মাঝে কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়াও সম্ভব না হয়, কেননা সবগুলোই সমমানের সূত্রে বর্ণিত তাহলে এধরণের সাংঘর্ষিক হাদীসকে মুয্তারি বলা হয়।

মুযতারিবের প্রকার :

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুযতারিব প্রধানত: তিন প্রকার। যথা:

১. সনদে ইযতিরাব (مضطرب السند)

২. মতনে ইযতিরাব (مضطرب المتن)

৩. সনদ মতন উভয় ক্ষেত্রে ইযতিরাব (مضطرب السند والمتن)

অবশ্য অনেকেই অর্থের ক্ষেত্রে ইযতিরাব (مضطرب المعنى) নামে একটি পৃথক প্রকারের কথাও উল্লেখ করেছেন।

সনদে ইযতিরাবের উদাহরণ:

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি সনদে ইযতিরাবের একটি উদাহরণ:

---

[১] তাদরীবুর রাবী পৃ: ২২৭ এবং যফরুল আমানী পৃ: ৩৯৮ -এ প্রদত্ত সংজ্ঞার সার অবলম্বনে রচিত। -গ্রন্থকার

عن أبي هريرة رض قال قال رسول الله صـــ اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد شيئا فلينصب عصا – فان لم يكن معه عصى فليخطط بين يديه خطا ثم لا يضره ما مرّ امامه – ابن حبان في صحيحه –

আল্লামা ইরাকী আলফিয়ায় উল্লেখ করেছেন যে, এই হাদীসের সনদে ইযতিরাব রয়েছে।[১] আল্লামা সাখাভী শরহে আল্‌ফিয়ায় এহাদীসের সনদের ইযতিরাবের উল্লেখ করতে গিয়ে (মদারে সনদ) ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া থেকে প্রায় দশ ধরণের সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। যথা-

(١) عن اسماعيل بن اميه عن ابي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة –

(٢) عن اسماعيل بن امية عن ابي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة –

(٣) عن اسماعيل بن امية عن ابي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن ابي هريرة

(٤) عن اسماعيل بن امية عن ابي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عزرة عن أبي هريرة –

(٥) عن اسماعيل بن امية عن بن محمد بن عمرو بن خزم عن أبيه عن جده عن ابي هريرة-

(٦) عن اسماعيل بن امية عن محمد بن عمرو بن حريث عن ابي سلمة عن أبي هريرة

(٧) عن اسماعيل بن امية عن حريث بن عمار عن أبي هريرة

(٨) عن اسماعيل بن امية عن ابي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان عن أبي هريرة

(٩) عن اسماعيل بن امية عن ابي عمرو بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة

(١٠) وقيل غير ذالك –

সনদের এই ইযতিরাবের কারণেই ইমাম নববীসহ বহু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ এই হাদীসটিকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে সম্মত হননি। দারাকুতনী মন্তব্য করেছেন যে لايثبت অর্থাৎ এটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নেই। ইমাম তাহাভী মন্তব্য করেছেন لا يحتجّ بمثله এধরণের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।[১]

মতনে ইযতিরাবের উদাহরণ :

তিরমিযী বর্ণিত ফাতেমা বিনতে কায়সের হাদীসটি এর একটি উদাহরণ্–

---

১ আলফিয়ায়ে ইরাকী খ: ১ পৃ: ২৪১।

১ ফাহ্‌রুল আমানী পৃ: ৪০৬-৪০৭ দ্রষ্টব্য ও তাদরীবুর রাবী পৃ: ২২৮ ২২৯ দ্রষ্টব্য।

روى الترمذي من رواية شريك عن أبي حمزة، وهو ميمون الاعور، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان في المال لحقا سوى الزكوة

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের সম্পদে যাকাত ছাড়াও আরো হক্ব রয়েছে। কিন্তু ইমাম ইবনে মাজাহ উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন-

...... انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكواة

অর্থাৎ মানুষের সম্পদে যাকাত ছাড়া অন্য কোন হক্ব নেই।

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের সম্পদে যাকাত ছাড়া অন্য কোন হক্ব নেই।

অবশ্য অনেকেই হাদীস দুটোর মাঝে সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেছেন, আবার অনেকেই একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন।

সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রে ইযতিরাবের উদাহরণ : বস্তুত তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত قلتين -এর হাদীসটি এর একটি উদাহরণ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ নিম্নোক্ত সূত্রে উল্লেখ করেছেন-

اخرج ابو داؤد عن محمد بن العلاء عن ابى اسامة حماد بن اسامة عن وليد (بن كثير) عن محمد بن جعفر بن ابي الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه سئل النبيّ صـــ عن الماء و ما ينوبه من الدواب والسباع قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

আবু উসামা থেকে হাদীসটি বহু ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তাদের মাঝে একদল ওয়ালীদ ইবনে কাসীর (وليد بن كثير) -এর পরবর্তী রাবীর নাম মুহাম্মদ ইবনে জা'ফার -এর স্থলে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফর বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন আবু মাসঊদ আর-রাযী ও উসমান ইবনে আবিশায়বার বর্ণনায় এরূপ উল্লেখ রয়েছে।

আবার মুহাম্মদ ইবনে জা'ফরের উস্তাদের নাম পূর্বোক্ত সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর উল্লেখ থাকলেও বায়হাকীর এক রিওয়ায়াতে তা উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর উল্লেখ রয়েছে।

আবার এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী যখন উদ্ধৃত করেছেন তখন হান্নাদের সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক কার কাছ থেকে হাদীসটি আহরণ করেছেন, সে ক্ষেত্রেও ইযতিরাব রয়েছে। বায়হাকী যখন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তখন নিম্নোক্ত সূত্রে উল্লেখ করেছেন-

..... عن حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ان رسول الله صـــ سئل عن الماء يكون في الفلاة وترده السباع والكلاب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث –

কিন্তু দারাকুতনী তা নিম্নোক্ত সনদে উল্লেখ করেছেন -

.... عن ابن عباس عن ابن اسحاق عن الزهرى عن عبيدالله بن عبد الله بن عمر عن أبى هريرة انه سئل رسول الله صـــ عن القليب تلقى فيه الجيف وتشرب منه الكلاب والدواب – قال ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذالك لم ينجسه شئ –

কিন্তু আব্দুল ওয়াহহাবের সূত্রে যখন বর্ণিত হয়েছে তখন সূত্রটি ছিল নিম্নরূপ-

... عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن اسحاق عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم –

আবার মুগীরা ইবনে সাকলাব যখন বর্ণনা করেছেন তখন সূত্রটি নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে – عن مغيرة بن سقلاب عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر

আবার ইমাম ইবনে মাজাহ নিম্নোক্ত সূত্রে উল্লেখ করেছেন -

عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة عن ابن اسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابى ان رسول الله صـــ قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس –

আবার দারাকুতনী হাদীসটিকে ইবনে উমরের উপর মওকুফ করেও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এহাদীসের সূত্রে কি ধরণের ইযতিরাব রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

আর মতনে ইযতিরাবের কয়েকটি পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও কোন কোন রিওয়ায়াতে قلتين او ثلاثا কোন কোন রিওয়ায়াতে أربعين قلة কোন কোন রিওয়ায়াতে أربعين غربا কোন কোন রিওয়ায়াতে اربعين دلوا ইত্যাদির শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং মতনে যে ইযতিরাব রয়েছে তাও সহজেই বোধগম্য।

তাছাড়া অনেকেই বলেছেন যে, এহাদীসের ব্যবহৃত قلة শব্দের অর্থেও ইযতিরাব রয়েছে কেননা قلة শব্দের অর্থ পাহাড়ের চূড়া, মাটির পাত্র, মটকা ইত্যাদি হয়ে থাকে। তাই হাদীসে কোন অর্থে তা প্রয়োগ হয়েছে তা নির্ধারণ করা দুরূহ। আবার মটকার অর্থ ধরলেও কোন দেশীয় মটকা বুঝানো হয়েছে, তা কত বড় ইত্যাদি নির্ধারণ করাও দুরূহ।

ইযতিরাবের হুকুম

যদি সমন্বয় সাধন বা তারজীহের মাধ্যমে হাদীসটির উপর আমল করা সম্ভব হয়, তাহলে ইয্‌তিরাব দূরীভূত হয়ে যায়। যে রিওয়ায়াতটিকে তারজীহ বা প্রাধান্য দেওয়া হবে, সেটি মাকবূল বলে গণ্য হবে। আর যেটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে, সেটি মাতরুক বলে গণ্য হবে।এবং তা শায বা মুনকার নামে আখ্যায়িত হবে।[১] তবে যে হাদীসে প্রকৃতই ইযতিরাব পাওয়া যাবে তা যয়ীফ এবং বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। কেননা এধরণের ইযতিরাব রাবীর সংরক্ষণ গুণের দুর্বলতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।[১]

তবে আল্লামা ইবনে হজর উল্লেখ করেছেন যে, ইযতিরাব অনেক সময় সহীহ হাদীসেও বিদ্যমান থাকতে পারে। যেমন কোন একজন ব্যক্তির নাম, পিতার নাম, দাদার নাম ও বংশ পরিচয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইয্‌তিরাব থাকলেও যদি ব্যক্তিটি নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য হবে। তার নাম বা পিতার নামের মাঝে ইয্‌তিরাবের কারণে কোন সমস্যা হবে না। সহীহাইনে এধরণের ইয্‌তিরাব বিশিষ্ট বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।[২]

ইয্‌তিরাবের উপর লিখিত গ্রন্থাবলীঃ

১. আল-ইলাল - দারাকুত্‌নীকৃত
২. আল মুকতারিব ফী বায়ানিল মুযতারিব- ইবনে হজরকৃত।

৫-ঙ. মুসাহ্‌হাফ (المصحف)

মুসাহ্‌হাফ (المصحف) শব্দটি বাবে تفعيل -এর ক্রিয়াধাতু বা মাসদার থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। তাসহীফ এর আভিধানিক অর্থ হল কোন শব্দকে ভুলপড়া কিংবা ভুল লিখা, এক অক্ষরকে অন্য অক্ষর মনে করে পাঠ করা বা লিখা। যেমন ‘কবর’ কে ‘করব’ পাঠ করা কিংবা ‘কলম’কে ‘কমল’ পাঠ করা বা লিখা। সুতরাং মুসাহ্‌হাফ -এর অর্থ হবে ভুল পঠিত বা ভুল লিখিত। আরবরা الصحفي বলে এমন ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকেন যিনি পাঠ করতে গিয়ে এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ উচ্চারণ জনিত ভুল বেশী করে থাকেন।

হাদীসের পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে কিংবা লিপিবদ্ধ করতে অথবা উস্তাদ থেকে শ্রবণ করার সময় ছাত্রদের অবস্থানগত দূরত্ব বেশী থাকার কারণে বা শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের

---

[১] তাদরীব পৃঃ ২২৮।
[১] যফরুল আমানী পৃঃ ৩৯৮ ও তাদরীবুর রাবী পৃঃ ২২৮ ।
[২] তাদরীব পৃঃ ২৩১।

দুর্বলতার কারণে মুহাদ্দিসগণের এধরণের ভুল অনেক সময় হয়ে থাকে। যে হাদীসে এধরণের ভুল উদঘাটিত হয় সে হাদীসকে (مصحف) মুসাহ্হাফ হাদীস নামে নামকরণ করা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات سواء كان بتقديم حرف أو تاخيره-
أو تبديل نقطة حرف إلى حرف – أو بتغيير حركة بحركة –

হাদীসের কোন শব্দকে নির্ভরযোগ্য রাবীরা যেভাবে বর্ণনা করে থাকেন- অক্ষর, নুকতা বা হরকত পরিবর্তন করে সেই শব্দটিকে ভিন্ন আদলে বর্ণনা করাকে তাসহীফ বলা হয়।

অবশ্য আল্লামা ইবনে হজর এধরণের ভুলকে দুইভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করেছেন। যথা:

১. مصحّف **মুসাহ্হাফ** : শব্দের অবকাঠামো অপরিবর্তিত থেকে যদি মাত্র নূকতা বা হরকতের এদিক সেদিক হওয়ার কারণে শব্দটি পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তাকে مصحف বলা হয়।

যেমন : مراجم এর স্থলে مزاحم পড়া হল أُبَيّ এর স্থলে أَبِي পড়া হল। কিংবা عَوْسَجَة কে غوسجة পড়া হল।

২. محرف **মুহাররাফ** : শব্দে বিদ্যমান অক্ষরগুলো অগ্র-পশ্চাৎ করার কারণে যদি শব্দের অবকাঠামো বদলে যায় তাহলে তাকে محرف বলা হয়। যেমন جعفر এর স্থলে جفعر পড়া হল; অথবা যদি দু'টি শব্দের লিখার আকৃতিটি কাছাকাছি হওয়ার কারণে একটি শব্দকে অন্যশব্দ মনে করে লিখা বা পড়া হল। যেমন ستاً -এর স্থলে شيئاً বলা হল অথবা عاصم الأحوال এর স্থলে واصل الأحداب পড়া হল।

তাসহীফ বা তাহরীফ কেন হয়?

বিভিন্ন কারণেই তাসহীফ ও তাহরীফ হতে পারে। তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলো প্রধান। যথা:

১. পাণ্ডুলিপি দেখে পড়ার সময় পাণ্ডুলিপির অক্ষর কিংবা নুকতা অস্পষ্ট হওয়ার কারণে এধরণের ভুল হতে পারে। আবার অনেক সময় চোখে ধাঁ ধাঁ লাগার কারণেও এমন ভুল হতে পারে। পাণ্ডুলিপি দেখে লিখার সময় এক শব্দকে অন্যশব্দ মনে করে ভূল লিখা হতে পারে।

২. লিখার সময় দ্রুত কলম চালাতে গিয়েও অনেক সময় হরকত নূকতা এদিক

সেদিক হয়ে যায় কিংবা এক নুকতার স্থলে দুই নুকস্তা বা দুই নুকতার স্থলে এক নুকতা লিখা হয়ে যায়। আবার দ্রুত লিখার সময় অনেক ক্ষেত্রে আগের অক্ষর পরে, পরের অক্ষর আগে লিখা হয়ে যায়। আবার এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর লিখা হয়ে যায়।

৩. শ্রবনের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার কারণেও এধরণের ভুল হতে পারে। হয়ত ছাত্র উস্তাদ থেকে একটু দূরে অবস্থানরত হওয়ার কারণে উস্তাদ একরূপ বলেছেন কিন্তু ছাত্র অন্যরূপ শ্রবন করেছে। কিংবা ছাত্রের শ্রবণ ইন্দ্রিয় দুর্বল হওয়ার কারণে এক শব্দকে অন্যরূপ শুনেছে। এহেন কারণেও এধরণের ভুল হতে পারে।

এজন্য হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর উস্তাদের পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

তাসহীফ ও তাহরীফের প্রকারভেদ

স্থান ভেদে তাসহীফ ও তাহরীফকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. তাসহীফ ফিল ইসনাদ (تصحيف في الأسناد)

২. তাসহীফ ফিল মতন (تصحيف في المتن)

অনেকেই তাসহীফ ফিল মা'না (تصحيف في المعنى) নামে আরও একটি প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণ

তাসহীফ ফিল ইসনাদ-এর উদাহরণ : যেমন শো'বা বর্ণিত এক হাদীসের সূত্রে রাবীর নাম ছিল : شعبة عن العوّام بن مراجم কিন্তু ইবনে মাঈন এটিকে তাসহীফ করে عن العوّام بن مزاحم উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ এক হাদীসের সনদে রাবীর নাম ছিল عتبة بن الندّر কিন্তু ইবনে জারীর তাবারী তাতে তাসহীফ করে উল্লেখ করেছেন عتبة بن النذر রূপে।[১]

তাসহীফ ফিল মতনের উদাহরণ : হযরত জাবের থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে -

عن جابر رمى اُبَىّ يوم الاحزاب على اكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم

কিন্তু গুনদার এটিকে তাসহীফ করে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছেন-

قال رمى أبي يوم الاحزاب –

---

[১] তাদরীব পৃ: ৪৬৪

শব্দটি যে, أُبَيٌّ হবে তার প্রমাণ এই যে, হযরত জাবেরের পিতা আহযাবের যুদ্ধের পূর্বেই ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন।[১] সুতরাং ঐ তীর নিক্ষেপকারী হযরত জাবেরের পিতা হতে পারেন না।

অনুরূপভাবে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত বর্ণিত হাদীসে আছে যে,-

ان النبيّ صـــ احتجر في المسجد يصلى فيها –

অর্থাৎ নবী সা. মসজিদে একটি ছোট হুজরা বানিয়ে ছিলেন, যাতে নামায আদায় করতেন। কিন্তু ইবনে লাহি'আহ যখন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তখন তাতে তাসহীফ করে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন-– احتجم النبيّ صـــ في المسجد অর্থাৎ নবী সা. মসজিদে সিঙ্গা লাগিয়ে ছিলেন।[২]

অনুরূপভাবে এক হাদীসে আছে- من صام رمضان واتبعه ستا من شوال ..... الخ

কিন্তু সুওলী (الصّولى) তাতে তাসহীফ করে নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করেছেন -

من صام رمضان واتبعه شيأ من شوال –

অনুরূপভাবে হযরত আবু যর বর্ণিত এক হাদীসে আছে- وتعين صانعا এবং তুমি শিল্পী ও কারিগরকে সহযোগিতা করবে।

কিন্তু হিশাম ইবনে উরওয়া তাতে তাসহীফ করে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছেন- – تعين ضايعا অর্থাৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে সহযোগিতা করবে।

অনুরূপভাবে হযরত মু'আবিয়া বর্ণিত এক হাদীসে আছে-

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب

যারা খুতবায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাদের প্রতি নবী সা. লা'নাত করেছেন। কিন্তু ওয়াকী' তাতে তাসহীফ করে নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন - لعن رسول الله الذين يشققون الحطب অর্থাৎ যারা লাকড়ী ফাড়ে তাদের প্রতি রাসূল সা. অভিসম্পাত করেছেন। এ শুনে জনৈক দোকানী বলল, এটা কি করে সম্ভব, অথচ লাকড়ী ফাড়ার প্রয়োজন তো রয়েছে।[৩]

অনেক সময় হাদীসে উল্লিখিত শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে বর্ণনাকারী তা না বুঝে ভিন্ন কোন অর্থ বুঝে থাকেন। এটিকে অর্থের তাসহীফ (تصحيف في المعنى) বলা হয়। যেমন এক হাদীসে আছে صلى رسول الله صـــ إلى العنـــزة অর্থাৎ রাসূল সা. লাঠির দিকে মুখকরে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু হযরত আবু

---

১. শরহে নুখবা পৃ: ৬৬।
২. তাদরীব পৃ: ৪৬৪
৩. তাদরীব পৃ: ৪৬৪-৪৬৫।

মূসা- যার প্রকৃত নাম ছিল মুহাম্মদ ইবনূল মুসান্না, যিনি আনাযাহ (العنـــزة) গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি এই হাদীসের অর্থ অনুধাবনে জটিলতায় নিপতিত হয়েছেন। তিনি মনে করেছেন যে, নবী সা. আনাযাহ গোত্রের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। তাই তিনি বলতেন - نحن قوم لنا شرف نحن من العنـــزة صلى الينا رسول الله صـــ

তার চেয়েও চমকপ্রদ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন হাকেম। عنـــزةً (بسكون النون) এর অর্থ হল বকরী। জনৈক বেদূঈন হাদীসটির এরূপ অর্থই বুঝেছেন যে, নবী সা. বকরীর দিকে ফিরে নামায পড়েছেন।[১] অনুরূপভাবে এক হাদীসে আছে -

نهي رسول الله صـــ عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلواة –

রাসূল সা. জুমার দিন নামাযের পূর্বে (মসজিদে) হালকাবন্দী হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি التحليق শব্দের অর্থ করেছেন মাথা মুণ্ডানো। তাই তিনি ৪০ বৎসর পর্যন্ত জুমার নামাযের পূর্বে মাথা মুণ্ডাননি। তিনি বলতেন-

ما حلقت راسى قبل الصلواة منذ اربعين سنة –

চল্লিশ বৎসর ধরে আমি নামাযের পূর্বে মাথা মুণ্ডাইনি।[২]

মুনকার (المنكر)

মুনকার (المنكر) শব্দটি باب افعال থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। বাবে ইফ'আল থেকে انكر ينكر অর্থ অপসন্দ করা, অশোভন মনে করা। সুতরাং المنكر অর্থ হবে অপসন্দনীয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি যে, নিম্নোক্ত কারণে হাদীস মুনকার বলে গণ্য হয়। যথা:

১. ফিসক
২. বিদআহ
৩. ফুহশে গলত
৪. গাফলত
৫. মুখালাফাতুস্-সীকাত (কোন কোন ক্ষেত্রে)। কেননা মুখালাফাতুস-সীকাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে কোন কোন ক্ষেত্রে শায্ (الشاذ) বলা হয়।

---

[১] তাদরীব পৃ: ৪৬৫।

[২] তাদরীব পৃ: ৪৬৫।

মুনকারের সংজ্ঞা

هو الحديث الذي رواه من فحش غلطه، أو كثر غفلته، أو ظهر فسقه، أو رواه ضعيف مخالفا للثقات –

যে হাদীস এমন ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত, যার অসতর্কতা জনিত ভুল ব্যাপক ভিত্তিতে হয়ে থাকে বা হাদীস আহরণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যার ব্যাপারে অসতর্কতার অভিযোগ রয়েছে, কিংবা যার পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়ে গেছে কিংবা কোন যয়ীফ রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন অথচ তা নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার বিপরীত; তাহলে এ ধরণের হাদীসকে মুনকার বলা হবে।

যদি তিনি নিজে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হন, আর তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের বিপরীত বর্ণনা করে থাকেন তাহলে তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে الشاذ বলা হবে। আর তিনি নিজে যয়ীফ হলে তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে মুনকার বলা হবে।

মুনকারের যে সংজ্ঞা উপরে প্রদান করা হয়েছে তাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন যয়ীফ রাবী যদি সীকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত এককভাবে কোন হাদীস বর্ণনা করেন আর তার কোন মুতাবে' ও শাহেদ বিদ্যমান না থাকে তাহলে তা মুনকার বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে কোন যয়ীফ রাবী যদি এককভাবে এমন কোন রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন যাতে অন্য কারো সাথে কোন বৈপরীত্য নেই বটে, কিন্তু রাবীর দুর্বলতা দূরীভূত করার কোন উপায়ও বিদ্যমান নেই, তাহলে সেটিও মুনকার বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ মুনকার দু'ই ধরণের হয়ে থাকে। যথা:

(١)المنفرد المخالف لما رواه الثقات –

(٢) هو الرواية الذي ليس في رواته من الثقة والإتقان ما يتحمل معه تفرده –

মুনকারের উদাহরণ

روى ابن ابي حاتم من طريق حبيّب بن خبيب الزيات عن ابى اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبيّ صـــ قال: من اقام الصلواة وآتى الزكوة و حج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة –

আবু হাতেম বলেছেন যে,

هو منكر لأنّ غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا –

এই হাদীসটি মুনকার। কেননা আবু ইসহাক থেকে অন্যান্য যেসব নির্ভরযোগ্য রাবীরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তারা এটিকে ইবনে আব্বাসের বক্তব্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[১]

*** আরেকটি উদাহরণ:**

روى النسائي عن ابي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن عائشة مرفوعا: كلوا البلح بالتمر فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان –

ইমাম নাসায়ী রহ. মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসটি মুনকার। কেননা একমাত্র আবু যুকায়রই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এমন ব্যক্তি নন যার একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

মুনকার শব্দ ব্যবহারে মুতাকাদ্দেমীন ও মুতাআখখেরীনদের মাঝে পার্থক্য :

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুতাকাদ্দেমীন একটি রিওয়ায়াত কেবল মাত্র একজন ব্যক্তি থেকে পাওয়া গেলে (এবং তার কোন মুতাবে' ও শাহেদ বিদ্যমান না থাকলে) তাকেই মুনকার বলতেন। কিন্তু এতে বেশ কিছু জটিলতা ছিল। যেমন انما الأعمال بالنيات -এর ন্যায় হাদীসও মুনকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ত। কেননা সেটিও চার স্তর পর্যন্ত কেবল মাত্র একজন করে ব্যক্তি থেকেই নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত।

অন্য যেসব সূত্রে হাদীসটি পাওয়া যায়, তার কোনটিই নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ ইমাম বুখারীসহ অনেক সহীহ হাদীসের গ্রন্থপ্রণেতাই এ হাদীসটিকে তাদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তাই মুতাআখখেরীন খানিকটা পরিবর্তন করে মুনকারের সংজ্ঞায় দিয়েছেন। যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

একারণেই মুতাকাদ্দেমীন যদি কোন হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, هذا حديث منكر আর মুতাআখ্খেরীনের কেউ যদি কোন হাদীস সম্পর্কে هذا حديث منكر বলে মন্তব্য করেন, তাহলে এই দুই মন্তব্যর মাঝে পার্থক্য হয়ে যাবে। কেননা মুতাকাদ্দেমীন একটি হাদীস কেবল একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত থাকলে তাকেই মুনকার মনে করতেন। তবে বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হলে তাকে 'সহীহ গরীব' বলে আখ্যায়িত করতেন। আর যয়ীফ রাবীর একক বর্ণনা নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার বিপরীত হলে তাকেতো তারা অবশ্যই মুনকার বলতেন। অথচ মুতাআখখেরীন কোন যয়ীফ রাবী সীকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীত বর্ণনা

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৯৭।

করলে কিংবা দুর্বল ও যয়ীফ রাবী কর্তৃক এককভাবে কোন হাদীস বর্ণিত হলে এবং তার কোন মুতাবে' ও শাহেদ না থাকলে তাকে মুনকার মনে করেন।

ইবনুস সালাহ উল্লেখ করেছেন যে, একক বর্ণনার উপর মারদূদ, মুনকার ও শায্ শব্দের ব্যবহার হাদীস বিশারদদের (অর্থাৎ মুতাকাদ্দেমীনদের) অনেকের বক্তব্যেই পাওয়া যায়। যেমন- ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, বারদেজী প্রমুখ মনীষী একক বর্ণনার উপর : هذا حديث مردود أو هذا حديث منكر أو هذا حديث شاذ –

ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতেন। যাহাবী মিযানুল এ'তেদালে মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বহু হাদীস সম্পর্কেও এরূপ মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্যের দ্বারা তিনি 'একক সূত্রে বর্ণিত' এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। আর একথা সুস্পষ্ট যে এককভাবে বর্ণিত হওয়া দ্বারা হাদীসটি যয়ীফ হওয়া অপরিহার্য নয়। হাদীসটি বাতিল হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসেনা।[১]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মুহাদ্দিসগণ অনেক সময় হাদীসের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে هذا انكر ما رواه فلان এরূপ শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এদ্বারা 'উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহের মাঝে এটি সবচেয়ে নিম্ন মানের' একথা বুঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এদ্বারা হাদীসটি দুর্বল বা যয়ীফ এটা বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না। যেমন ইবনু 'আদী উল্লেখ করেছেন যে-

انكر ما روى بريد بن عبدالله – اذا اراد الله بامة خيرا قبض نبيها قبلها – و قال هذا طريق حسن رواته ثقة وقد ادخله قوم في صحاحهم –

বুরায়দ ইবনে আব্দুল্লাহ যত হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মাঝে সবচেয়ে (انكر) বা নিম্ন মানের হাদীস হল এটি যে, "আল্লাহ তা'আলা যখন কোন উম্মতের কল্যাণ করতে ইচ্ছা করেন তখন তাদের নবীকে তাদের আগে উঠিয়ে নেন।" তিনি মন্তব্য করেছেন যে "এহাদীসের সূত্র হাসান পর্যায়ের এবং তার রাবীরা নির্ভরযোগ্য, অনেকেই হাদীসটিকে সহীহ হাদীসের গ্রন্থে সংকলণ করেছেন।" এমনকি হাদীসটি মুসলিম শরীফেও সংকলিত হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে انكر বলে হাদীসটি যয়ীফ একথা বুঝানো যে উদ্দেশ্য নয় তা একেবারেই সুস্পষ্ট।

حديث منكر ও الحديث منكر এর মাঝে পার্থক্য:

حديث منكر বলে সাধারণত: ঐ অর্থই বুঝানো হয় যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ উল্লেখ করেছেন যে, কখনো

---

[১] আর-রাফউ ওয়াত-তাকমীল পৃ: ১৯৯-২০২।

কখনো মুহাদ্দিসগণ মওযূ‘ হাদীসের ক্ষেত্রেও هذا حديث منكر বলে থাকেন। এদ্বারা ‘হাদীসটির অর্থ মুনকার বা শরীয়ত কর্তৃক সমর্থিত নয় এবং নির্ভরযোগ্য সনদে তা বর্ণিত নেই’ একথা বুঝানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।[১] তবে মুনকারুল হাদীস (منكرالحديث) শব্দটি অনেক সময় এমন ব্যক্তির উপরও প্রয়োগ করা হয়, যিনি একটি মাত্র মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার অনেক সময় এমন ব্যক্তির জন্যও ব্যবহার করা হয় যিনি যয়ীফ রাবীর উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। অথচ তিনি নিজে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। এদ্বারা রাবী যয়ীফ হওয়া প্রমাণিত হয় না।

আল্লামা সাখাভী উল্লেখ করেছেন যে -

وقد يطلق ذالك على الثقة اذا روى المناكير عن الضعفاء –

কখনো কখনো মুনকার শব্দটি এমন নির্ভরযোগ্য রাবীর উপরও প্রয়োগ করা হয় যিনি যয়ীফ রাবীর উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করে থাকেন।

আল্লামা ইরাকী উল্লেখ করেছেন যে -

كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا –

অনেক সময় রাবীকে মুনকার বলে অভিহিত করা হয় একারণে যে, তিনি মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু আল্লামা সাখাভী এও উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু দাকীকিল ঈদ বলেছেন যে, কোন রাবী সম্পর্কে যদি এরূপ মন্তব্য করা হয় যে, روى المناكير বা يروى المناكير তাহলে এ দ্বারা তার বর্ণিত হাদীস বর্জন করার প্রয়োজন নেই; যতক্ষণ না তার বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের মাঝে এমন ব্যাপক ভিত্তিতে মুনকার পাওয়া যায়, যে কারণে তাকে منكر الحديث বলা যায়; এরূপ পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তার রিওয়ায়াত বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। কেননা ‘মুনকারুল হাদীস’ মূলত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এমন হয়ে যায় যে, সে সব সময় মুনকার হাদীস বর্ণনা করে থাকে, তাহলে তার হাদীস বর্জনীয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু يروى المناكر দ্বারা তিনি স্থায়ীভাবে এমন করেন, তা বুঝা যায় না। বরং কখনো কদাচ তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন এরূপ বুঝা যায়।

ইমাম বুখারী বলেছেন- كل من قلتُ فيه منكرَ الحديث، لا تحل الرواية عنه

আমি যার ব্যাপারে ‘মুনকারুল হাদীস’ -এই মন্তব্য করেছি, তাথেকে হাদীস গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

---

[১] তা‘লীক আলা-আর-রফউ ওয়াত্ তাকমীল -পৃ: ২১১

যেহেতু মুনকার শব্দটির এ ধরণের বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে, তাই আসমাউর রিজালের কিতাবাদী অধ্যয়নের সময় মুনকার শব্দ দেখে বিভ্রান্ত না হওয়া উচিত। বরং শব্দটি কে ব্যবহার করেছেন, তিনি কোন যুগের লোক, মন্তব্যটির ধরণ কি ইত্যাদি বিষয় পরীক্ষ নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। কেবল মুনকার শব্দ দেখেই হাদীসটি যয়ীফ বলে সিদ্ধান্ত করে ফেলা উচিত নয়।

মুনকারের স্তর

মুনকার মূলত মারাত্মক ধরণের যয়ীফ। কেননা মুনকারের বর্ণনাকারীগণ হয়ত অসতর্কতা জনিত ব্যাপক ভাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন, কিংবা আহরণের ক্ষেত্রে অসতর্কতা, অথবা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অভিযুগে অভিযুক্ত হবেন; না হয় নিজে দুর্বল বর্ণনাকারী হয়েও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিপরীত বর্ণনা করার অভিযুগে অভিযুক্ত হবেন। আর এগুলো মারাত্মক ধরণের দুর্বলতার পরিচায়ক। তাই মওজু' ও মতরুক- এর পরেই হবে মুনকার হাদীসের স্তর। অর্থাৎ মুনকার হাদীসকে যয়ীফ হাদীসের তৃতীয় স্তর বলে গণ্য করা হবে।[১] জ্ঞাতব্য যে, মুনকারের বিপরীতার্থক পারিভাষিক শব্দ হল মা'রুফ (المعروف)।

মা'রুফ (المعروف)

মা'রুফ (المعروف) শব্দের অর্থ পরিচিত, পরিজ্ঞাত, ন্যায়সঙ্গত, সর্বজন বিদিত ইত্যাদি। যেসব হদীস মুনকারের বিপরীত সেগুলোকে এজন্য معروف নামে নামকরণ করা হয় যে, এগুলো হাদীস হওয়ার বিষয়টি যেন সর্বজন বিদিত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو الحديث الذي رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف –

দুর্বল রাবীর বর্ণনার বিপরীত নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে মা'রুফ বলা হয়। অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত বর্ণনা কোন যয়ীফ রাবী থেকে পাওয়া গেলে তাকে মুনকার বলা হয়। আর সেই মুনকারের বিপরীত সবল ব্যক্তির বর্ণনাকে معروفবলা হয়।

উদাহরণ : আবু ইসহাক থেকে যে হাদীসটি পূর্বে মুনকারের উদাহরণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, সেই হাদীসটি যখন নির্ভরযোগ্য রাবী কৃর্তক ইবনে আব্বাসের বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হয় যখন সেটি মা'রুফের উদাহরণ হয়।

কেননা সেই হাদীসটি সম্পর্কে আবু হাতেম মন্তব্য করেছেন যে-

---

[১] তাইসীর পৃ: ৯৮।

هو منكر لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا ، و هو المعروف –

এটি মুনকার, কেননা আবু ইসহাক থেকে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীরা এটিকে ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন। মূলত সেটিই মারুফ।[১]

শায্ (الشاذ)

শায (الشاذ) শব্দটি باب نصر থেকে ইসমে ফায়েলের সীগাহ। বাবে نصر থেকে এর অর্থ হয় একাকী হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া। সুতরাং الشاذ -এর অর্থ হবে বিচ্ছিন্ন, একাকী। যেসব হাদীস নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার বিপরীত সেগুলো যেন মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, এ হিসাবে সেগুলোকে الشاذ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو الحديث الذي رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه –

যে হাদীস কোন মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হবে এবং তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য কোন রাবীর বর্ণনার বিপরীত বলে প্রতিপন্ন হবে, তাকে শায বলা হবে।[২]

উল্লেখ্য যে, তার বিপরীত বর্ণনাকারী একজন হয়েও তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য হোক বা বিপরীত বর্ণনাকারী একাধিক হওয়ার কারণে সংখ্যাধিক্যের ফলে তার চেয়ে উত্তম বলে প্রতিপন্ন হোক উভয় অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির একক বর্ণনাটি শায্ বলে গণ্য হবে।[৩]

অবশ্য পূর্ববর্তীদের অনেকেই হাদীস শায্ হওয়ার জন্য হাদীসটির অন্য হাদীসের সঙ্গে বৈপরীত্য থাকার শর্ত আরোপ করতেন না। বরং কোন হাদীস একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত হলেই তাকে শায্ বলে আখ্যায়িত করতেন। যেমন আবু ইয়া'লা খলিলী শাযের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে-

ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان منه عن غير ثقة فمتروك و ما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به –

যে হাদীসের একটি মাত্র সূত্র রয়েছে, তা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকেই হোক বা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকেই হোক, তাকে শায্ বলা হবে। তবে যদি তা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে হয়, তাহলে তা বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। আর যদি

---

[১] তাইসীরু মুসাতালাহিল হাদীস পৃ: ৯৮।

[২] তাদরীব পৃ: ১৯৭ ও শরহে নূখবা পৃ: ৩৮।

[৩] তাদরীব পৃ: ১৯৬ ও যফরুল আমানী পৃ: ৩৫৬-৩৫৭।

তা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে হয়, তাহলে সে হাদীসটির উপর আমল স্থগিত রাখা হবে, তাদ্বারা কোন বিষয়ে প্রমাণ পেশ করা যাবে না।[১]

হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এরই কাছাকাছি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ

الشاذ هو ما انفرد به ثقة وليس له اصل بمتابع لذلك الثقة -

কোন নির্ভরযোগ্য রাবী এককভাবে যদি কোন হাদীস বর্ণনা করেন, আর সেই নির্ভরযোগ্য রাবীকে সমর্থন করে এমন কোন সহযোগী রিওয়ায়াত যদি বিদ্যমান না থাকে, তাহলে তাকে শায্ বলা হয়।[২]

শায্ -এর এই সংজ্ঞানুসারে فرد مطلق অর্থাৎ যে হাদীস একটি মাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত এবং অন্য কোন বর্ণনার সাথে বৈপরীত্য নেই, সেগুলোও শায্-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

সুতরাং যদি শাযের এই সংজ্ঞাকে বহাল রাখা হয়, আর হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য শায্ না হওয়ার শর্তারোপ করা হয়- যেরূপ সহীর সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে انما الاعمال بالنيات -এর ন্যায় হাদীসগুলোও -যেগুলো একক সূত্রে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাফেযে হাদীসদের থেকে বর্ণিত- সেগুলোও সহীহ্-এর পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যাবে। অর্থাৎ সেগুলোও সীহহ বলে গণ্য হবে না। কিংবা বলতে হবে যে, শায্ হাদীসের কতিপয় সহীহ বলেও গণ্য হয়। অথচ এটি সর্বজন বিদিত সিদ্ধান্তের বিপরীত। কেননা উসূলবিদগণ একথা স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, শায্ হাদীস যয়ীফের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

বরং এক্ষেত্রে যথার্থ বক্তব্য হল যা ইমাম নববী তাকরীবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে-

فان كان بتفرده مخالفا (لمن هو) احفظ منه أو اضبط كان شاذا مردودا - وان لم يخالف الراوي (غيره) فان كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا - وان لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا - وان بعد كان شاذا منكرا مردودا-

অর্থাৎ যেসব হাদীস একটি মাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত, যদি তা উক্ত বর্ণনাকারীর চেয়েও কোন নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ হয় তাহলে তা শায্ বলে গণ্য হবে এবং তা বর্জনীয় হবে। কিন্তু যদি তা অন্য কোন বর্ণনার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ না হয়, তাহলে দেখতে হবে যে হাদীসটির বর্ণনাকারীরা কোন পর্যায়ের। যদি তার বর্ণনাকারীরা সহীহ-এর মান সম্পন্ন হয়

---

[১] তাদরীব পৃ: ১৯৫ ও যফরুল আমানী পৃ: ৩৫৭।

[২] তাদরীব পৃ: ১৯৫ ও যফরুল আমানী পৃ: ৩৫৮।

[৩] যফরুল আমানী পৃ: ৩৫৭।

অর্থাৎ যদি তারা বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ন, ও পূর্ণ সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তি হয় তাহলে তাদের একক সূত্রে বর্ণিত হাদীস সহীহ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি তাদের সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য দুর্বল হয়, তবে গ্রহণযোগ্যতার স্তর থেকে এ কবারে বাদ পড়ার মত দুর্বল নয়; তাহলে হাদীসটি হাসান বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি তারা নির্ভরযোগ্যতার স্তর থেকে বাদ পড়ে যায়- এমন ব্যক্তি হয়, তাহলে হাদীসটি শায্ মুনকার ও বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।[১]

এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, শায্ দু'ভাবে হতে পারে। যথা:

১. কোন গ্রহণযোগ্য রাবী যদি তার চেয়েও কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিপরীত বর্ণনা করেন।
২. এমন ব্যক্তির একক সূত্রে বর্ণিত হাদীস যিনি বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে এমন পর্যায়ের নয়- যার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।[২]

কিন্তু এই বক্তব্যের দ্বারা শায্ ও মুনকারের মাঝে তেমন কোন পার্থক্য থাকে না। বাস্তবে পূর্বসূরীরা শায্ ও মুনকারের মাঝে খুব একটা পার্থক্য করতেন বলে মনে হয় না। বরং এধরণের জটিলতা দেখলে তারা مردود، منكر، شاذ ইত্যাদি যে কোন একটি মন্তব্য করতেন। সম্ভবত পরবর্তীতে شاذ و منكر -এর পৃথক পরিভাষা গড়ে উঠেছে।

ইবনুস সালাহ -এর বক্তব্য থেকে এরূপ বুঝা যায় যে, শায্ ও মুনকার তার কাছেও সমার্থক ছিল।[৩]

সারকথা এই যে, একক সূত্রে যে হাদীস বর্ণিত হবে, তার বর্ণনাকারী হয়ত অনির্ভরযোগ্য হবেন, না হয় নির্ভরযোগ্য হবেন।

যদি অনির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তার সাথে অন্য হাদীসের বৈপরীত্য থাক বা না থাক; আর বৈপরীত্য থাকলে যার সাথে বৈপরীত্য হচ্ছে তিনি নির্ভরযোগ্য হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় হাদীসটি মুনকার বলে গণ্য হবে। তবে যার সাথে বৈপরীত্য হচ্ছে তিনি যদি নির্ভরযোগ্য হন, তাহলে সেই ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে মা'রুফ বলা হবে। আর যদি বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে হয়ত তার সাথে অন্য হাদীসের বৈপরীত্য থাকবে কিংবা থাকবে না; যদি বৈপরীত্য থাকে তাহলে তার তিন অবস্থা। যথা:

১. **বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য** : যার সাথে বৈপরীত্য হচ্ছে তিনি তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য। তাহলে হাদীসটি شاذ বলে গণ্য হবে এবং তার চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীসটিকে محفوظ বলা হবে।

---

[১] তাকরী আলাত্-তাদরীব পৃ: ১৯৬-১৯৭ ও যফরুল আমানী-পৃ: ৩৬১।

[২] তাকরীব আলাত্-তাদরীব পৃ: ১৯৭ ও যফরুল আমানী পৃ: ৩৬১।

[৩] যফরুল আমানী পৃ: ৩৬২।

২. **বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্যঃ** যার সাথে বৈপরীত্য হচ্ছে তিনি তার সমমানের। তাহলে হাদীসটি مختلف الحديث এর পর্যায়ে পড়বে।

৩. **বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য :** যার সাথে বৈপরীত্য হচ্ছে তিনি নির্ভরযোগ্য হলেও উক্ত বর্ণনাকারীর চেয়ে নিম্নমানের। তাহলে বর্ণনাকারীর হাদীসটি محفوظ বলে গণ্য হবে আর তার চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তির হাদীসটি شاذ বলে গণ্য হবে।

আর যদি তার সাথে কারো বৈপরীত্য না থাকে, তাহলে বর্ণনাকারীর সূত্রের অন্যান্য রাবীগণ যদি সহীহ-এর পর্যায়ের ব্যক্তি হয়, তাহলে হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য হবে। আর যদি হাসান পর্যায়ের হয় তাহলে হাদীসটি হাসান হবে। আর যদি যয়ীফ পর্যায়ের হয় তাহলে তা মুনকার বলে গণ্য হবে।

শায্ -এর উদাহরণ

উল্লেখ্য যে, যে বৈপরীত্যের কারণে হাদীস শায্ বলে গণ্য হয়, তা সনদেও পাওয়া যেতে পারে এবং মতনেও পাওয়া যেতে পারে।

ক. সনদে বৈপরীত্যের কারণে শায্-এর উদাহরণ

روى الترمذى من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجلا توفي على عهد رسول الله صـــ ولم يدع وارثا الا مولا هو اعتقه –

ইবনে উয়ায়নার অনুরূপ সূত্রে হাদীসটি ইবনে জুরায়যসহ অনেকেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বিপরীতে হাম্মাদ যখন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তখন তিনি নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন -

عن عمرو بن دينار عن عوسجة ان رجلا توفي على عهد رسول الله صـــ

অর্থাৎ হাম্মাদ সূত্র উল্লেখ করতে গিয়ে পূর্বোক্ত সূত্রের সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। কেননা পূর্বের সূত্রে ইবনে আব্বাসের উল্লেখ থাকলেও তিনি ইবনে আব্বাসকে উল্লেখ করেননি। তাই হাম্মাদ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হওয়া সত্যেও তার বর্ণনাটি شاذ বলে গণ্য হয়েছে।[১]

খ. মতনে বৈপরীত্যের কারণে শায্-এর উদাহরণ

روى ابو داؤد من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن ابى صالح عن أبي هريرة مرفوعا اذا صلى احدكم الفجر فليضطجع على يمينه –

অথচ এক জামাত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হাদীসটিকে নবী সা.-এর ব্যক্তিগত আমল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ নবী সা. ফজরের পর ডান পা.শের উপর সামান্য ক্ষণের জন্য শুয়ে যেতেন।

---

১ তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃ: ১১৮ দ্রষ্টব্য।

সুতরাং আব্দুল ওয়াহেদ ব্যক্তি হিসাবে নির্ভরযোগ্য হলেও তার এই বর্ণনায় তিনি একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন -যারা সকলেই আ'মাশের ছাত্র ছিলেন এবং তাদের কেউই আব্দুল ওয়াহেদের শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। সুতরাং তার এই রিওয়ায়াতটি শায্ বলে গণ্য হবে।

শাযের হুকুম

শায্ হাদীস যয়ীফ এবং আপাত: গ্রহণীয় না হলেও তাকে একেবারে বর্জনীয় বলে গণ্য করা যায় না। কেননা তার সূত্রটি মূলত গ্রহণযোগ্য। যদিও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত হওয়ার কারণে তার উপর সাময়িকভাবে আমল করা যাচ্ছে না।। তবে আপাদত: সমন্বয় করা সম্ভব না হলেও কেউ হয়ত সমন্বয় সাধনের কোন পন্থা উদ্ভাবন করতেও পারেন। তাছাড়া এমন বিষয়েও তা দলীল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, যে বিষয়ে এহাদীসের সাথে অন্য কোন রিওয়ায়াতের বৈপরীত্য নেই।[১]

মাহ্ফূয (المحفوظ)

আভিধানিক অর্থ

মাহফূয (محفوظ) শব্দটি (باب سمع) থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। আভিধানিক অর্থ হিফাযত করা, সংরক্ষণ করা। সুতরাং মাহফূজের অর্থ হবে সংরক্ষিত। যেহেতু এধরণের হাদীসে কোনরূপ দুর্বলতা নেই তাই যেন এগুলো দুর্বলতা থেকে সংরক্ষিত। এহিসাবেই এগুলোকে মাহফূয নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو الحديث الذي رواه أوثق مخالفا لرواية الثقة –

অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনার বিপরীত অধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনাকে محفوظ বলা হয়।

উদাহরণ

روى النسائي من طريق سهل بن ابى صالح عن أبيه عن أبي هريرة رض قال كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد ركعتي الفجر على شقّه الايمن ثم يجلس –

আব্দুল ওয়াহেদের বর্ণনার বিপরীত এক জামাত নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ আব্দুল ওয়াহেদও একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। সুতরাং আব্দুল

---

১ গ্রন্থকার।

ওয়াহেদের বর্ণিত রিওয়ায়াতটি শায্। আর এই রিওয়ায়াতটি محفوظ মাহফূয বলে গণ্য হবে।[১]

শাহেদ ও মুতাবে' (شاهد و متابع)

যয়ীফ হাদীসের আলোচনায় বার বার এসেছে যে, যয়ীফ হাদীসের কোন মুতাবে' বা শাহেদ পাওয়া গেলে তা হাসান লি গায়রিহীর মর্যাদা লাভ করে এবং হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, শাহেদ ও মুতাবে' বলতে কি বুঝানো হয়ে থাকে? তাই যয়ীফ সম্পর্কিত আলোচনার শেষে আমরা এ'দুটি শব্দের পারিভাষিক তাৎপর্য উল্লেখ করছি।

মুতাবে' (المتابع)

মুতাবে' শব্দটি باب مفاعلة-এর ইসমে ফায়েলের সীগাহ। আভিধানিক অর্থ অন্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা, একজন আরেক জনের আনুকূল্য প্রদান করা, একজন অন্যজনের অনুগামী হওয়া। সুতরাং متابع শব্দের অর্থ হবে আনুকূল্য প্রদানকারী। একটি হাদীস যখন অন্য আরেকটি হাদীসের সমার্থক হয় কিংবা সমশব্দে বর্নিত হয় তখন সেই হাদীসটি যেন অন্য হাদীসটিকে শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে আনুকূল্য প্রদান করে কিংবা তার অনুগমন করে। এ হিসাবে এধরণের হাদীসকে মুতাবে' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو الحديث الذي يشارك حديثا منفردا في اللفظ والمعنى اوفي المعنى فقط – مع الاتحاد في الصحابي الذي روى عنه الحديث –

যে হাদীস এককসূত্রে বর্ণিত কোন হাদীসের সাথে শব্দ ও অর্থের দিক থেকে কিংবা শুধুমাত্র অর্থের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, আর উভয় হাদীস যদি একই সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়, তাহলে তাকে ঐ এককসূত্রে বর্ণিত হাদীসের মুতাবে' বলা হয়।

উদাহরণ

روى الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه – فان غم عليكم فاكملوا عدة ثلاثين– كتاب الام

১. গ্রন্থকার।

মনে করা হয় যে, ইমাম শাফেয়ী এককসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য কারো কাছ থেকে তা বর্ণিত নেই। কেননা ইমাম মালিক থেকে অন্য যারাই বর্ণনা করেছেন তারা فإن غمَ عليكم فاقدروا له এরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু অনুসন্ধানের পর দেখা গেল যে, ইমাম বুখারী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা আল-কা'নাবী থেকে ইমাম মালিকের পূর্বোক্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসের হুবহু শব্দে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ বুখারীর উদ্ধৃত হাদীসেও فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين রয়েছে। অতএব বুখারীর বর্ণনাটি ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনার জন্য متابع বলে গণ্য হবে। কেননা উভয় হাদীস ইবনে ওমর রা. থেকেই বর্ণিত।

* এক হাদীসের সঙ্গে আরেক হাদীসের এরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাওয়াকে মুতাবা'আত (متابعة) বলা হয়।

মুতাবা'আত সাধারণত: দুই প্রকার। যথা:

১. متابعة تامة পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আত অর্থাৎ সনদের শুরু থেকেই একজন আরেক জনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করবেন অর্থাৎ উভয়েই একই উস্তাদ থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করবেন। ইমাম বুখারী বর্ণিত পূর্বোক্ত উদাহরণটি متابعة تامة -এর উদাহরণ হতে পারে।

২. متابعة قاصرة বা আংশিক মুতাবা'আত: অর্থাৎ সনদের কোন এক পর্যায় থেকে একজন আরেক জনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করবেন। যেমন-

روى ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر – وفيه فان غم عليكم فكملوا ثلاثين –

ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত হাদীসের সাথে এ হাদীসটির অর্থের দিক থেকে সামঞ্জস্য রয়েছে এবং পূর্বোক্ত হাদীস এবং এটি যেহেতু একই সাহাবী থেকে বর্ণিত, অতএব এটি ইমাম শাফেয়ীর হাদীসের আরেকটি মুতাবে'। কিন্তু কেবলমাত্র সর্বশেষ বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে উভয়ের সূত্রে সামঞ্জস্য রয়েছে। সনদের পরবর্তী অংশ ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে; তাই এটি متابعة قاصرة বলে গণ্য হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

এক হাদীসের সঙ্গে অন্য হাদীসের এরূপ সামঞ্জস্য খোঁজাকে اعتبار বলা হয়।

শাহেদ (الشاهد)

শাহেদ (الشاهد) শব্দটি باب سمع-এর ক্রিয়াধাতু বা মাসদার الشهادة শব্দ থেকে উদ্গত। الشهادة-এর অর্থ সাক্ষ্য প্রদান করা। অতএব الشاهد -এর অর্থ হবে সাক্ষ্যদানকারী বা সাক্ষী। একটি হাদীসের আনুকূল্যে যখন আরেকটি হাদীস

বর্ণিত হয়, তখন যেন পরবর্তী হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসটি শক্তিশালী হওয়ার সাক্ষ্যপ্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে এধরণের হাদীসকে শাহেদ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو الحديث الذي يشارك حديثا منفردا في اللفظ والمعنى – اوفي المعنى فقط مع الاختلاف في الصحابي الذي روى عنه الحديث–

যদি একটি হাদীস এককসূত্রে বর্ণিত অন্যকোন হাদীসের সাথে শব্দ ও অর্থের দিক থেকে কিংবা শুধুমাত্র অর্থের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, আর এদু'টি হাদীস যদি ভিন্ন ভিন্ন দুই'জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয় তাহলে তাকে শাহেদ (الشاهد) বলা হয়।

সংজ্ঞা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, শাহেদ ও মুতাবে' মূলত একই বস্তু। শুধুমাত্র সাহাবী এক হওয়া ও না হওয়ার দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। যদি একই সাহাবী থেকে উভয় হাদীস বর্ণিত হয় তাহলে তাকে মুতাবে' বলা হবে। আর যদি হাদীস দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দু'জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয় তাহলে তাকে শাহেদ বলা হবে।

উদাহরণ

روى النسائي بسنده عن محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبيّ صـــ قال ...... فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين –

এই হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তবে তা ইবনে উমর থেকে নয় বরং ইবনে আব্বাস রা. থেকে। সুতরাং এহাদীসটি ইমাম শাফেয়ী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শাহেদ বলে গণ্য হবে। এক হাদীসের সঙ্গে অন্য হাদীসের এরূপ সামঞ্জস্য খোঁজাকে ইসতিশহাদ استشهاد বলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কেউ কেউ মুতাবে' ও শাহেদের সংজ্ঞা ভিন্নভাবে দিয়েছেন। তাদের মতে- যদি দুই হাদীসের সামঞ্জস্য শাব্দিক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তাহলে এক সাহাবী থেকে বর্ণিত হোক বা দুই সাহাবী থেকে বর্ণিত হোক উভয় অবস্থায় তাকে মুতাবে' (المتابع) বলা হবে।

আর যদি সামঞ্জস্য শুধুমাত্র অর্থের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তাহলে এক সাহাবী থেকে বর্ণিত হোক কিংবা দুই সাহাবী থেকে বর্ণিত হোক উভয় অবস্থায় তাকে শাহেদ (الشاهد) বলা হবে।

অবশ্য একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এদু'টি শব্দের একটিকে অপরটির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবেই ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ শাহেদকে যেমন অনেক ক্ষেত্রে মুতাবে' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে মুতাবে'কেও অনেক ক্ষেত্রে শাহেব শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়।

কোন شاذ হাদীসের যদি মুতাবে' বা শাহেদ পাওয়া যায়, তাহলে তার شاذ হওয়ার অভিযোগ রহিত হয়ে যায়। মুতাবে' বা শাহেদ রিওয়ায়াতটি যদি এমন বর্ণনাকারী থেকেও পাওয়া যায়, যার একক বর্ণনা গ্রহণীয় হয় না বরং তাকে যয়ীফ বলে গণ্য করা হয়- এমন ধরণের ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতও মুতাবে ও শাহেদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[১]

শাহেদ ও মুতাবে'-এর হুকুম :

কোন যয়ীফ হাদীসের মুতাবে' বা শাহেদ পাওয়া গেলে তা গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য বলে গণ্য হয় এবং হাদীসটি তখন হাসান লিগায়রিহির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সব যয়ীফ হাদীসই মুতাবে' ও শাহেদ পাওয়া যাওয়ার কারণে প্রমাণযোগ্য হয় না বরং যেসব হাদীস যয়ীফ হওয়ার কারণ হল রাবীর স্মৃতিদৌর্বল্য সে সব হাদীসের মুতাবে' ও শাহেদ পাওয়া গেলে তা প্রমাণযোগ্য বলে গণ্য হয়। যেমনঃ কোন হাদীস যয়ীফ হওয়ার কারণ যদি সূয়ে হিফজ, ইখতিলাত, তাদলীস, ইরসাল ইত্যাদি হয় তাহলে সেগুলোর শাহেদ ও মুতাবে' পাওয়া গেলে তা প্রমাণযোগ্য হবে। কিন্তু হাদীস যয়ীফ হওয়ার কারণ যদি হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া, মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, বিদ'আতী হওয়া ইত্যাদি হয় তাহলে সেগুলোর মুতাবে' ও শাহেদ পাওয়া গেলেও তা প্রমাণযোগ্য হবে না।[২]

নির্ভরযোগ্য রাবীদের পরিবর্ধন গ্রহণযোগ্য কি না?

(زيادة الثقات مقبولة ام لا)

আভিধানিক অর্থ

যিয়াদাতুন (الزيادة) শব্দটি বাবে سمع এর মাস্‌দার, যার অর্থ হল পরিবর্ধন করা, বাড়ানো, প্রবৃদ্ধি করা। আর ثقة শব্দের অর্থ হল নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। সুতরাং زيادة الثقات এর অর্থ হবে নির্ভরযোগ্য রাবীদের পরিবর্ধন।

---

[১] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ: ১২৪।

[২] মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস সুনান-এর ভাবালম্বনে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

و هى ما تفرد به الثقة عن غيره من الثقات في رواية الحديث من لفظ زائد – أو جملة زائدة في السند والمتن –

নির্ভরযোগ্য রাবীরা যা বর্ণনা করেননি এমন কোন শব্দ বা বাক্য সনদ কিংবা মতনে যদি কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এককভাবে পরিবর্ধিত করে বর্ণনা করেন তাহলে তাকে যিয়াদাতুস্ সিকাত বলা হয়। [১]

বস্তুতঃ হাদীস নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে দেখা যায় যে, কোন একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আরেকজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরয়োগ্য রাবী সেই হাদীসটি আরো পরিবর্ধিতরূপে উল্লেখ করেছেন। এই পরিবর্ধনের বিষয়টি যেমন মতনে হতে পারে, তদ্রুপ তা সনদেও হতে পারে।

মতনে পরিবর্ধনের অর্থ হল যে, বর্ণনাকারী কোন শব্দ বা বাক্য পরিবর্ধিত আকারে হাদীসটি বর্ণনা করবেন। যেমন, একজন বর্ণনা করলেন : **دخل رسول الله صـــ في المسجد** রাসূল সা. মসজিদে প্রবেশ করেছেন।

অন্য আরেকজন বর্ণনা করলেন : **دخل رسول الله صـــ في المسجد فصلّى ركعتين**। রাসূল সা. মসজিদে প্রবেশ করেছেন এবং দুই রাকা'আত নামায আদায় করেছেন।

আর সনদে পরিবর্ধনের অর্থ হল একজন হয়ত হাদীসটিকে মওকূফ বা মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আর অন্যজন হয়ত সেই সনদেই হাদীসটিকে মারফূ' বা মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করছেন। সুতরাং মারফূ' বা মুত্তাসিলরূপে বর্ণনাকারী যেন পূর্বের বর্ণনাকারীর তুলনায় সনদকে বর্ধিত করে পেশ করেছেন। কিংবা তিনি হাদীসটিকে মারফূ' বা মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করে হাদীসটির মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আবার এধরণের পরিবর্ধণের বিষয়টি অনেক সময় একই ব্যক্তি থেকেও ঘটতে পারে। যেমন এক সময় তিনি হাদীসটি পরিবর্ধন ব্যতিত উল্লেখ করলেন; কিন্তু আরেক সময় হয়ত তিনি পরিবর্ধিতরূপে হাদীসটি উল্লেখ করলেন; কিংবা এক সময় হয়ত তিনি হাদীসটি মুরসাল সনদে উল্লেখ করলেন। আবার অন্য সময় হয়ত তিনি হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করলেন।[২]

---

[১] ইরশাদ তুলাবিল হাকায়েক -পৃ: ৯৮ টিকা দ্রষ্টব্য

[২] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ: ১১৮ -এর ভাব অবলম্বনে।

সনদে পরিবর্ধনের বিধান

বস্তুতঃ এই পরিবর্ধন যদি সনদের ক্ষেত্রে হয় তাহলে বিষয়টি مزيد في متصل الأسانيد এর পর্যায়ে পড়ে- যার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করে এসেছি। এধরণের পরিবর্ধনের বিধানের কথাও তথায় আলোচিত হয়েছে যে, যদি পরিবর্ধনটি বাস্তবের ভিত্তিতে হয়, তাহলে দু'টি বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর যদি তা বাস্তবের ভিত্তিতে হয়েছে কি না কোনভাবেই তা নিরূপণ করা না যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যিনি অধিক নির্ভরযোগ্য তার বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর অধিক নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতেও হতে পারে।

আল্লামা ইবনে হজর শরহে নূখবায় উল্লেখ করেছেন যে -'যদি সহীহ ও হাসান পর্যায়ের রাবীর পরিবর্ধন অন্যকোন অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি না করে' তাহলে তা সাধারণভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সেটি তখন একটি পৃথক হাদীস বলে গণ্য করা হবে -যা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী বর্ণনা করেছেন। আর যদি তা কোন নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, তাহলে পরস্পর বিরোধী দুই বর্ণনার মাঝে প্রাধান্য দেওয়ার পন্থায় কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেটি প্রাধান্য পাবে সেটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, আর যেটি প্রাধান্য পাবে না সেটি বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।[১]

এক্ষেত্রে আরো যে সব মতামত রয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. নির্ভরযোগ্য রাবীদের পরিবর্ধন সাধারণভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে। এটি অধিকাংশ ফুকাহা, মুহাদ্দেসীন ও উসূলবিদদের অভিমত। অর্থাৎ যিনি হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে কিংবা মারফূ'রূপে বর্ণনা করবেন তার বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এর মূল বর্ণনাকারী সংখ্যায় কম হইক বা বেশী হোক, স্মৃতিশক্তি প্রবল হোক বা কিছু কম হোক।[২]

২. পরিবর্ধন বর্জিত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যিনি মুরসাল বা মওকূফরূপে বর্ণনা করবেন তার বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে; এটি অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের অভিমত।[৩] ইমাম আবু হানীফার উল্লেখযোগ্য অনুসারীদের অভিমতও এরূপ বলে উল্লেখ করা হয়।[৪]

---

[১] শরহে নূখবা - পৃঃ ৩৭।

[২] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস - পৃঃ ১১৯।

[৩] তাইসীরু মুসাতালাহিল হাদীস - পৃঃ ১৪০

[৪] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস - পৃঃ ১২৩।

৩. যারা সংখ্যায় বেশী হবে অর্থাৎ দু'টি হাদীসের মাঝে যেটি অধিকসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হবে সেটিকেই গ্রহণ করা হবে। এটি কতিপয় মুহাদ্দিসের অভিমত।[১]

৪. যে হাদীসের বর্ণনাকারী অধিক নির্ভরযোগ্য ও অধিক স্মৃতিধর হবেন তার বর্ণনা গ্রহণ করা হবে। এটি আর কতিপয় মুহাদ্দিসের অভিমত।

সনদে পরিবর্ধনের উদাহরণ

যেমন لا نكاح الا بولي "অভিভাবক ছাড়া কোন বিয়ে হয় না"

এই হাদীসটি ইউনূস, ইসরাঈল এবং কায়েস ইবনুর রবী' আবু ইসহাকের সূত্রে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সুফয়ান সাওরী ও শো'বা আবু ইসহাক থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

মতনে পরিবর্ধনের বিধান

আর এই পরিবর্ধন যদি মতনে হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না এব্যাপারে বেশ কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যথা:

১. পরিবর্ধন যদি মতনে হয় তাহলে এক শ্রেণীর মুহাদ্দিস তা সাধারণভাবেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

২. এক শ্রেণীর মুহাদ্দিস তা সাধারণভাবেই বর্জনীয় বলে মনে করেন।

৩. এক শ্রেণীর মুহাদ্দিস মনে করেন যে, যদি পরিবর্ধনের বিষয়টি একই রাবী থেকে হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু যদি পরিবর্ধন ভিন্ন রাবী থেকে হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

৪. ইবনুস্ সালাহ মনে করেন যে, যদি পরিবর্ধনটি অন্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ না হয় কিংবা পরিবর্ধনকারীর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য কোন রাবীর বর্ণনার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ না হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সেটি তখন একজন বিশ্বস্ত রাবীকর্তৃক বর্ণিত একটি পৃথক হাদীসের মর্যাদায় পরিগণিত হবে।

   কিন্তু যদি বৈপরীত্যপূর্ণ হয় তাহলে তা বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। কেননা সেটি তখন শায্ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি তাতে আংশিক বৈপরীত্য পাওয়া যায়; যেমন পরিবর্ধনের ফলে কোন মুতলাক (مطلق) বা সাধারণ

---

[১] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস - পৃ: ১৪০

বিধান মুকাইয়্যাদ (مقيد) বা শর্তসাপেক্ষ বিধানে পরিণত হয়ে যায়, কিংবা একটি 'আম (عام) বা ব্যাপক বিধান খাস (خاص) বা সীমিত বিধানে পরিণত হয়ে যায়; তাহলে এধরণের পরিবর্ধনের হুকুম সম্পর্কে ইবনুস সালাহ নীরবতা অবলম্বন করলেও ইমাম নববীর মতে তা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে।[১]

৫. তবে এক্ষেত্রে আল্লামা ইবনুস সা'আতী হানাফী রহ. এর নিকট গ্রহণযোগ্য অভিমত এই যে, যদি কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এমন কোন অংশ পরিবর্ধিত আকারে বর্ণনা করেন; যা অন্য কারো বর্ণনার সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে না; আর এই দু'জন বর্ণনাকারী যদি একই উস্তাদ থেকে হাদীসটি শ্রবণ করে থাকেন, কিন্তু শ্রবণের মজলিশ যদি ভিন্ন হয়, অর্থাৎ একই উস্তাদ থেকে একজন এক মজলিশে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন, অন্যজন অন্য মজলিশে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন, তাহলে এ ক্ষেত্রে পরিবর্ধন সর্বসম্মত ভাবেই গ্রহণীয় বলে গণ্য হবে।

কিন্তু যদি দু'জনের শ্রবণের মজলিশ একই হয়, আর যারা পরিবর্ধনবিহীন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তারা যদি সংখ্যায় এত বেশী হয় যে, তাদের সকলের এই বর্ধিত অংশটি সম্পর্কে গাফেল থাকার বিষয়টি কল্পনা করা যায় না, তাহলে এই পরিবর্ধনটি গ্রহণীয় বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি তারা সংখ্যায় এত বেশী না হয় তাহলে জমহুরের অভিমত এই যে, এরূপ পরিবর্ধন গ্রহণীয় বলে গণ্য হবে। তবে ইমাম আহমদসহ কতিপয় মুহাদ্দিস এধরণের পরিবর্ধনকে গ্রহণীয় বলে মনে করেন না। আর যদি এক মজলিশে শুনেছেন, না দুই মজলিশে, তা জানা সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরণের ক্ষেত্রে পরিবর্ধনটি গ্রহণীয় বলে গণ্য করাই শ্রেয়।

কিন্তু যদি পরিবর্ধনের ফলে অন্যদের বর্ণনার সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় তাহলে সেটি পরস্পর বিরোধী হাদীসের বিধানের আওতায় চলে যাবে এবং প্রাধান্য দেওয়ার কোন এক পন্থায় একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং সেটিই গ্রহণযোগ্য হবে।

এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, হানাফীগণ যে পরিবর্ধনের দ্বারা বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় না, সে ক্ষেত্রেও শর্তহীনভাবে পরিবর্ধিত রিওয়ায়াতকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না।[২]

---

[১] তাইসীর পৃ: ১৩৮।

[২] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ: ১২৩-১২৪।

মতনে পরিবর্ধনের উদাহরণ

১. যে পরিবর্ধনের দ্বারা কারো সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় না। যেমনঃ

روى مسلم من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن ابى رزين وابى صالح عن أبي هريرة قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرار، فليرقه .

কিন্তু আলী ইবনে মুসহির ছাড়া আ'মাশের ছাত্রদের মাঝে কেউই فليرقه শব্দটি বর্ধিত করেননি। যেহেতু আলী ইবনে মুসহির একজন নির্ভরযোগ্য রাবী, তাই তার এই পরিবর্ধনকে (একটি পৃথক হাদীসের মর্যাদায়) গ্রহণীয় বলে গণ্য করা হবে।

২. যে পরিবর্ধনের দ্বারা বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। যেমন :

اخرج الترمذى من طريق موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، قال : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام اكل وشرب –

উকবা ইবনে আমের থেকে যারাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের মাঝে মূসা ইবনে আলী ছাড়া অন্য কেউই يوم عرفة শব্দটি বর্ধিত করেননি। সুতরাং এটি মূসা ইবনে আলীর পরিবর্ধন। কিন্তু এই পরিবর্ধনকে গ্রহণ করা হলে আরাফার দিনও পানাহারের দিনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। অথচ আরাফার দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব।

দশম অধ্যায়

মওযু‘ (الموضوع)

মওযু‘ (الموضوع) শব্দটি মূলত باب فتح এর মাসদার বা ক্রিয়া ধাতু- আল-ওয়াযউ (الوضع) থেকে গঠিত ইসমে মাফউলের সীগাহ। الوضع শব্দটি অভিধানে বহু অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন; কোন বস্তুকে কোন স্থানে রাখা, স্থাপন করা, কারো মর্যাদাকে খাঁট করা, বাচ্চা ধারণ করা, বাচ্চা প্রসব করা, নির্ধারণ করা, ক্ষমা করে দেওয়া, দায়িত্ব মুক্ত করে দেওয়া, বর্জন করা, নতূন করে কোন জিনিস বানানো, মিথ্যা উপাখ্যান তৈরী করা ইত্যাদি।

তবে হাদীস শাস্ত্রে যা রাসূল সা. বলেননি এমন কথাকে রাসূল সা.-এর বক্তব্য বলে চালিয়ে দেওয়াকে ওয়াযা‘ বলা হয়। কেননা এ ক্ষেত্রেও যেন হাদীসটিকে নতূন করে বানানো হল, বা রাসূল সা.-এর ব্যপারে মিথ্যা উপাখ্যান তৈরী করা হল। সুতরাং মওযু‘-এর অর্থ হল এমন কথা যা রাসূল সা.-এর বক্তব্য নয়, অথচ তাকে রাসূল সা.-এর বক্তব্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم –

নতূন করে বানানো মনগড়া যে বক্তব্যকে রাসূল সা.-এর হাদীস বলে মিথ্যা-মিথ্যি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে মওযু‘ বলা হয়।[১]

আল্লামা মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান এরই কাছাকাছি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে তার সংজ্ঞাটি আরো সুস্পষ্ট। তিনি বলেন-

هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

যে মিথ্যা মনগড়া উপাখ্যান নিজেথেকে তৈরী করে রাসূল সা.-এর বক্তব্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে মওযূ‘ বলে।[২] আল্লামা সাখাভী উল্লেখ করেছেন যে, বস্তুতঃ মওযূ‘ হাদীস যে প্রকৃত পক্ষে হাদীস নয় বরং মানুষের মনগড়া কথা,

---

[১] আল-ওয়াযউ ওয়াল ওয়ায্যাঊন, ড. আবু বকরকৃত পৃ: ১০।

[২] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৮৯।

তা বুঝানোর জন্যই সংজ্ঞায় المكذوب، المصنوع، المختلق এই তিনটি সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র বিষয়টির গুরুত্ব বর্ধনের জন্যই সংজ্ঞায় তিনটি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। তা নাহলে সংজ্ঞায় এর যে কোন একটি শব্দ ব্যবহার করাই যথেষ্ট ছিল।[১]

অবশ্য অনেক সময় এধরণের মিথ্যা মনগড়া উপাখ্যানকে কেউ অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছাকৃতভাবেও রাসূল সা.-এর বক্তব্য বলে পরিবেশন করতে পারে। এরূপ অনিচ্ছাকৃতভাবে রাসূল সা.-এর বক্তব্য নয়, এমন কথাকে রাসূল সা. -এর বক্তব্য বলে পরিবেশন করলে সেটিও মওযু' বা জাল হাদীস বলে গণ্য হবে। অবশ্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তার দেওয়া এক সংজ্ঞায় قصداً বা 'ইচ্ছাকৃতভাবে' শব্দটি উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তিনি তাঁর দ্বিতীয় মতে একথা সুস্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে, অনিচ্ছাকৃতভাবেও যদি কেউ কোন কথা, কাজ বা অনুমোদনকে রাসূল সা. এর নামে চালিয়ে দেয়, যা মূলত রাসূল সা.-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; তাহলে তাও মওযূ' বলে গণ্য হবে।[২]

উল্লেখ্য যে যদি কোন রাবী রাসূল সা.-এর উপর এরূপ মিথ্যারোপের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তাহলে তৎকর্তৃক বর্ণিত সকল হাদীসকেই মওযূ' বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।[৩]

বস্তুতঃ যয়ীফ হাদীসের সর্বনিম্ন স্তর হল মওযূ' হাদীস। বরং কতিপয় মুহাদ্দিস মওযূ'কে যয়ীফ হাদীসের শ্রেণীভূক্ত করতেই সম্মত নয়। তারা বরং মওযূ'কে যয়ীফের অর্ন্তভুক্ত না করে এটিকে একটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করেন।[৪]

কখন থেকে মিথ্যা বা জাল হাদীস তৈরী শুরু হয়?

কখন থেকে জাল হাদীস তৈরীর সূচনা হয় এব্যাপারে গবেষক ও মুহাদ্দিসগণের মোট ৫টি মতামত রয়েছে। আমরা নিম্নে তা উল্লেখ করে দিলাম-

১. অধ্যাপক আহমদ আমীন ও শিয়া মাতাবলম্বী হাশেম মা'রূফ আল- হুসাইন মনে করেন যে, রাসূল সা.-এর যুগেই মওযূ' বা জাল হাদীস তৈরীর সূত্রপাত হয়। তারা তাদের মতের পক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দ, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রা. থেকে বর্ণিত একটি ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে থাকেন। ঘটনাটি বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে

---

[১] ফতহুল মুগীস সাখাভীকৃত পৃ: ১৫৩।
[২] জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীনকৃত।
[৩] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৮৯।
[৪] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৮৯।

সামান্য পার্থক্যসহ বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দ-এর সূত্রে বর্ণিত ঘটনাটি এরূপ যে, জনৈক ব্যক্তি মদীনার পার্শবর্তী এক গোত্রে এসে বলল যে, রাসূল সা. আমাকে তোমাদের মাঝে অমূক অমূক বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত রায় অনুসারে ফয়সালা করার অনুমতি দিয়েছেন। বস্তুতঃ লোকটি জাহেলিয়্যাতের যুগে সেই গোত্রের জনৈকা মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। পরে সে এই মিথ্যা অনুমতির কথা বলে উক্ত রমনীর নিকট গমন করে। গোত্রের লোকেরা ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য রাসূল সা.-এর নিকট লোক প্রেরণ করে। এ ঘটনা শুনে রাসূল সা. বললেন- 'আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে'। অতপরঃ রাসূল সা. জনৈক ব্যক্তিকে এই নির্দেশ দিয়ে সেখানে পাঠালেন যে, যদি লোকটিকে জীবিত পাও তাহলে তাকে হত্যা করবে, তবে আমার মনে হয় তাকে জীবিত পাবে না। আর যদি তাকে মৃত অবস্থায় পাও তাহলে তার লাশ আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। ঐ ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় পেল। সাপে ধ্বংশন করার ফলে সে মারা গিয়েছে। সুতরাং তার লাশকে সে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই রাসূল সা. বলেছিলেন- من كذب عليَّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار

যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।[১]

এই ঘটনাটি বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হলেও কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে ঘটনাটি প্রমাণিত নেই। বরং আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ এতদসংক্রান্ত সকল রিওয়ায়াতকে মারাত্মক ধরণের মুনকার বলে অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।[২] যে কারণে এর উপর ভিত্তি করে মিথ্যা বা জাল হাদীস তৈরীর বিষয়টি রাসূল সা. এর যুগেই শুরু হয়েছিল- এরূপ দাবী করা সঙ্গত নয়। সম্ভবত শিয়ারা সাহাবীদের বিশ্বস্ততা ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যেই এরূপ মতামত দাঁড় করিয়েছে। তাই এ মতটি মুহাদ্দিসগণের নিকট মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২. ডক্টর আকরাম যিয়া আল উমারীর মতে হযরত উসমান রা. এর শাসনামলের শেষভাগে ইবনে উদায়স রা. নামে জনৈক ব্যক্তি থেকে জাল হাদীস তৈরীর প্রথম সূচনা হয়।

তিনি তার মতের পক্ষে আবু সাওর আল ফাহমী কর্তৃক বর্ণিত একটি রিওয়ায়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে থাকেন। রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপঃ

---

[১] মুশকিলুল আসার ১ম খণ্ড।

[২] লমহাত পৃঃ ৫৬-৬৫।

আবু সওর আল ফাহমী বলেন, আমি উসমান রা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইবনে উদায়সকে মিম্বারে নববীতে বসে বলতে শুনেছি; তিনি বলছিলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ আমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী কারীম সা. কে বলতে শুনেছেন যে, আবীদাহ তার স্বামীর ব্যাপারে যতটুকু বিভ্রান্ত হয়েছিল উসমান তার চেয়েও বিভ্রান্তিতে পড়বে। বর্ণনাকারী আবু সাওর বলেন, এ ঘটনাটি আমি হযরত উসমানকে অবহিত করলে তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম ইবনে উদায়স মিথ্যা বলেছে, সে ইবনে মাসঊদ থেকে এই রিওয়ায়াত শ্রবণ করেনি। আর ইবনে মাসঊদও নবী কারীম সা. থেকে তা শ্রবণ করেননি।"[১]

ড. আকরাম যিয়া ওমারী মনে করেন যে, সম্ভবত ইবনে উদায়সই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি জাল হাদীস তৈরী করেন।

বস্তুতঃ এ রিওয়ায়াতটি মুওযূ' বা জাল। আল্লামা ইবনূল জাওযী الموضوعات নামক গ্রন্থে এটিকে সন্নিবেশিত করেছেন। সম্ভবত হযরত উসমান রা. কে ঘায়েল করার জন্যই কেউ এ হাদীসটি তৈরী করেছেন। যদিও ইবনূল, জাওযী হাদীসটি জাল করার অভিযোগে সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে উদায়সকেই অভিযুক্ত করেছেন, কিন্তু একজন সাহাবীকে এহেন অভিযোগে অভিযুক্ত করা মোটেই সঙ্গত নয়। তদুপরি হযরত আব্দুর রহমান ইবনে উদায়স কেবল একজন সাহাবী ছিলেন তাই নয়, বরং যারা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন এবং বায়'আতে রিদওয়ানের সময় রাসূল সা. এর হাতে হাত রেখে যারা শপথ গ্রহণ করেছিলেন- তিনি ছিলেন তাদের একজন। যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে তাঁর সন্তুষ্টির সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেছেন:- لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

অবশ্যই আল্লাহ (সেই সব) মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন যখন তারা বৃক্ষের তলে আপনার কাছে শপথ গ্রহণ করছিল।[২]

সুতরাং ইবনে উদায়সের উপর এরূপ একটি অভিযোগ উত্থাপন করা কিছুতেই সঙ্গত নয়।[৩] যদিও তিনি মিশর থেকে আগত হযরত উসমান রা. কে অবরোধকারী দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

---

১ বুহুস ফি তারীখিস-সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড পৃ: ৫, ড. আকরাম জিয়া আল-উমারীকৃত।

২ সূরা: ৪৮ আল ফাতাহ: ১৮.

৩ আল-ওয়াযউ ফিল হাদীস, ড. উমর ইবনে হাসান ফালাতাকৃত পৃ: ১৮৯ -১৯০।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এই বর্ণনাটি ইবনে উদায়সের নিজের বক্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং এটি রাসূল সা. এর বক্তব্য নয়। অথচ এটি মরফূ' হাদীস হিসাবে ইবনে লাহি'আহ থেকে কেবলমাত্র নিম্নোক্ত সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে-

عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو بن ابي ثور الفهمي انه قال : قدمت على عثمان فصعد ابن عديس المنبر وقال : ألا ان عبد الله بن مسعود حدثني انه سمع رسول الله صـــ يقول : الا ان عثمان اضل من عبيدة على بعلها. فاخبرت عثمان فقال كذب والله ابن عديس ما سمعها من ابن مسعود ولا سمعها ابن مسعود من رسول الله صـــ قط-

এ প্রেক্ষিতেই ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে জাল বলেছেন। কেননা ইবনে উদায়সের বক্তব্যকে রাসূল সা. এর বক্তব্য বলে পরিবেশন করার কারণে হাদীসটি মওজু' বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর এ কাজটি সম্ভবত ইবনে লাহি'আ দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। কেননা তিনি যয়ীফ ও মুদাল্লিস রাবী হিসাবে খ্যাত। কোন মওকূফ রিওয়ায়াতকে মরফূ' করে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণনা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও হয়ত তাই হয়েছে এবং সে কারণেই হাদীসটি মওযূ'র অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সুতরাং হাদীসটির প্রকৃত জালকারী ইবনে লাহি'আহ। অতএব এ এরূপ একটি মিথ্যা হাদীসের উপর ভিত্তি করে হাদীস জাল করণের কাজ হযরত উসমান রা. এর খিলাফতের শেষকালে শুরু হয়েছে বলে ড. আকরাম যিয়া যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ বক্তব্য নয়।

বস্তুতঃ কোন সাহাবী হাদীস জাল করেছেন এরূপ কোন বর্ণনা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নেই। হাদীস জাল করণের সূচনা মূলত হয়েছে হযরত উসমান রা. কে শহীদ করার পর মুসলিম বিশ্বে যে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন মতবাদ ও ফিরকার উদ্ভব হয়, জঙ্গে সিফফীন ও জঙ্গে জামালের মাঝ দিয়ে উম্মায় যে দ্বিধা- বিভক্তির সূচনা হয়, এর ফলে যে বিভিন্ন দল উপদলের সৃষ্টি হয়- এসব দল উপদলের মাধ্যমে। তারা আপন আপন মতাদর্শকে হাদীসের দ্বারা প্রমাণপুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাদীস জাল করতে প্রবৃত্ত হয়।

৩. আল্লামা আবুল ফাত্তাহ আবুগুদ্দাহ, আবু শাহবা, মুস্তফা আস-সিবাঈ, খতীব আল-আজাজ প্রমূখ মনীষীর অভিমত এই যে, হাদীস জালকরণের এ কাজটির সূচনা ৪০ হিজরীর দিকে হয় এবং হিজরী প্রথম শতকের মাঝেই তা ব্যাপক ভিত্তিতে ছড়িয়ে পড়ে।

৪. ড. মুহাম্মদ আবুয্-যাহু ও ড. নূরউদ্দীন আত্তারের মতে ৪১ হিজরীতে এই ফিত্‌নার সূচনা হয় অর্থাৎ হযরত আলী রা.-এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটে ৪০ হিজরীর রমযান মাসের ১৭ তারিখে; এর পরপরই হাদীস জাল করণের ফিত্‌নার

সূত্রপাত হয়। বস্তুতঃ এ মতের প্রবক্তারাও হযরত উসমানের শাহাদতের পর যে ফিত্নার সূত্রপাত হয়, তার পরিণতিতে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ ও উম্মতের মাঝে যে দ্বিধা-বিভক্তির সূচনা হয় এটিকেই হাদীস জাল করণের এই অপতৎপরতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

৫. ড. উমর ইবনে হাসান ফালাতা মনে করেন যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশের কোন এক সময়ে হাদীস জাল করণের এ ফিতনার সূচনা হয়। তিনিও মূলত হযরত উসমানকে কেন্দ্র করে সাবায়ী গোষ্ঠী কর্তৃক যে ফিতনার সূচনা হয়েছিল তারই ধারাবহিকতায় ঘটা পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ- যথা, খলীফাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা, মারওয়ান ইবনে হাকাম কর্তৃক হযরত উসমান রা. এর স্বাক্ষর জাল করে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্নজনকে চিঠিপত্র প্রদান, জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনের ঘটনা, খলীফাদ্বয়ের মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে উম্মাহর দ্বিধা-বিভক্তি, শিয়া-সুন্নী খারেজী-রাফেজী ইত্যাদি দল-উপদলের উদ্ভব, সাহাবীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা এবং আপন আপন মতাদর্শকে কুরআন সুন্নার প্রমাণপুষ্ট করার প্রবণতা থেকেই মূলত কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা ও হাদীস জালকরণের এই জঘণ্য প্রবণতার সূচনা হয়।

ড. উমর ফালতা বলেন, মওযূ' হাদীসের সূচনাকাল নির্ধারণের ব্যপারে ইঙ্গিতবহ ঘটনা সংশ্লিষ্ট ইসলামী ইতিহাসের গ্রন্থাবলী আমি অত্যন্ত গুরুত্বসহ বিস্তারিতভাবে অধ্যয়নের চেষ্টা করেছি। বহু অনুসন্ধানের পরও নবী কারীম সা.-এর তিরোধানের পর থেকে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়ংশের পূর্বের এমন একটি নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াতও পাইনি, যাদ্বারা হাদীস জাল করণের সূত্রপাত হিজরী প্রথম শতকের শেষ তৃতীয়াংশের পূর্বে হয়েছিল- এর পক্ষে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়।[১]

তিনি তার মতের পক্ষে অর্থাৎ হাদীস জাল করণের সূচনা হিজরী প্রথম শতকের শেষ তৃতীয়াংশের পরে হয়েছে এর পক্ষে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত সমূহের দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

ক. খতীবে বাগদাদী আবু আনাস আল- হারানীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, মুখতার (ইবনে আবু উবায়দ ইবনে মাসউদ) আস-সাকাফী জনৈক মুহাদ্দিসের নিকট এ মর্মে আবদেন জানান যে, আপনি নবী কারীম সা. থেকে আমার জন্য এ মর্মে একটি হাদীস তৈরী করে দিন যে, 'আমি পরবর্তীতে খলীফা হব'। এর বিনিময়ে আপনাকে ইন'আম স্বরূপ দশ হাজার দিরহাম, একটি উন্নত বাহন, একটি মর্যাদা সূচক পোষাক ও

---

[১] আল-ওয়াযউ ফিল হাদীস, ড. উমর ইবনে হাসান ফালাতাকৃত পৃ: ২১২।

একজন গোলাম দেওয়া হবে। এ কথা শুনে মুহাদ্দিস বললেন নবী সা. থেকে কোন হাদীস বানিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আপনি চাইলে কোন সাহাবীর নামে হাদীস বানিয়ে দিতে পারি। তাতে ইন'আমের পরিমাণ আরো কম হলেও আমার কোন আপত্তি থাকবে না। তখন মুখতার বললেন- নবী কারীম সা. এর নামে বানিয়ে দিতে পারলে বিষয়টি বলিষ্ঠ হত। মুহাদ্দিস বললেন, এর শাস্তিও খুব মারাত্মক।[১]

খ. ইমাম বুখারী তারীখে সগীরে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে রাব'আ আল-খুযায়ী বলেন যে, মুখতাররের কিছু লোক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় 'উযায়ব' নামক জলাধারের নিকটে অবস্থান করত। সেখান দিয়ে কোন লোক গমন করলে তারা তাকে অবরোধ করে রাখত- যতক্ষণ না তারা লোকটি সম্পর্কে মুখতারকে অবহিত করত (এবং তাকে মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে মুখতারের অনুমতি লাভ করত)। রাবী বলেন একবার আমাকে মুখতারের সাথে দেখা করতে বলা হল। পরে আমি যখন কূফায় আসলাম তখন তারা আমাকে নিয়ে মুখতারের নিকট গেল। মুখতার বলল, হে শায়খ ! আপনি নবী সা. কে পেয়েছেন এবং কখনো তার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেননি। সুতরাং আমার এ বিষয়টি (অর্থাৎ খলীফা হওয়ার বিষয়টি) শক্তিশালী করার জন্য রাসূলের নামে একটি মিথ্যা হাদীস তৈরী করে দিন। এর বিনিময়ে আপনাকে সাত শত দিনার দেওয়া হবে। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে উক্ত মুহাদ্দিস বললেন, রাসূল সা. এর নামে মিথ্যা হাদীস তৈরীর ভয়াবহ পরিণাম হল জাহান্নাম। আমার দ্বারা একাজ সম্ভব নয়।[২]

উল্লেখ্য যে, মুখতার উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে ৬৭ হিজরীতে নিহত হয়।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতসমূহের ভিত্তিতে উমর ফালাতা মনে করেন যে, মিথ্যা হাদীস তৈরী করার প্রবণতা হিজরী প্রথম শতকের শেষ তৃতীয়াংশের এসময়ে কিংবা এর কিছু পরে শুরু হয় কিন্তু এর পূর্বে নয়।

কিন্তু এই রিওয়ায়াতগুলো দ্বারাও ঠিক কখন থেকে জাল হাদীস তৈরীর প্রবণতার সূচনা হয় তা সুস্পষ্ট নয়। কেননা রিওয়ায়াতগুলোর কোনটির দ্বারাই মুখতারের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কেউ মিথ্যা হাদীস রচনা করে দিয়েছিলেন- একথার উল্লেখ নেই। বরং তার প্রস্তাবকে সবাই প্রত্যাখ্যান করেছেন একথাই সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সার কথা এই যে, দিনক্ষণ নির্ধারিত করে কখন থেকে জাল হাদীস তৈরীর প্রবণতা শুরু হয়েছে তা বলা মুশকিল। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর

---

[১] আল-মওযু'আত ইবনুল জাওযীকৃত পৃ: ৩৯

[২] তারীখুস-সাগীর ইমাম বুখারীকৃত পৃ: ৭৫।

প্রেক্ষিতে হাদীস জাল করণের প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছে। ধর্মীয় বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার অনুসারীদের দ্বারাই এ কাজের সূচনা হয়েছে। পরবর্তীতে কতিপয় ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম ব্যক্তিও ইসলামের সুমহান আদর্শকে কালিমালিপ্ত করার সুক্ষ্ম কৌশল হিসাবেও হাদীস জাল করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

কি উদ্দেশ্যে জাল হাদীস তৈরী করা হয় :

ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্ত থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যেই হাদীস জাল করা হয়। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো প্রধান:

১. রাজনৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট ধর্মীয় ফিরকাসমূহ আপনাপন মতাদর্শের সমর্থনে জাল হাদীস তৈরী করে।

ক. সাবায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক হাদীস জালকরণ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সাবায়ীদের ষড়যন্ত্রের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি ও হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মায় যে দ্বিধা-বিভক্তির সৃষ্টি হয়, এ থেকে জন্ম নেয় বিভিন্ন ধর্মীয় ফিরকা। এই ফিরকাগুলোর মাঝে সাবায়ী ফিরকাই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

সম্ভবত সাবায়ী ফিরকার লোকেরাই সর্বপ্রথম হাদীস জালকরণের এ তৎপরতা শুরু করে। ড. আবু শাহবার মতে ইবনুস সাবা[১] আপন মতাদর্শের সমর্থনে চল্লিশ হিজরী সনে একটি জাল হাদীস রচনা করেছিল। যে হাদীসটি সে বসরা, কূফা ও মিশরসহ বিভিন্ন নগরে প্রচার করে বেড়িয়েছে। হাদীসটি আল্লামা জোয্কানী তৎকর্তৃক রচিত 'আল আবাতিল' গ্রন্থে নিম্নোক্ত সনদসহ উল্লেখ করেছেন –

عن محمد بن حميد الرازي ثنا ابن مجاهد ثنا ابن اسحاق عن شريك بن عبد الله عن أبى ربيعة الأيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي وصيّ و وصيي عليّ –

বস্তুতঃ এই সনদের প্রতি লক্ষ্য করলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাদীসটি জালকারী ইবনুস সাবা নয়। কেননা সনদের কোথায়ও তার নাম উল্লেখ নেই। তাই অনেক গবেষক মনে করেন যে, সম্ভবত এটি ইবনূস সাবার নিজের বক্তব্য ছিল। পরে সাবায়ীদের কেউ মরফূ' সনদ যুক্ত করে এটিকে রাসূল সা. এর বক্তব্য বলে চালিয়ে দিয়েছে।

---

[১] বস্তুত: বাক্যটি 'ইবনুস-সাবার অনুসারীরা' হবে। কেননা ঐতিহাসিক সূত্রে প্রমাণিত যে, ইবনুস-সাবা ৩৭ হিজরী সনে নিহত হয়। - গ্রন্থকার

কিংবা এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, মূলত হাদীসটি ইবনুস সাবাই জাল করেছিল। তবে ইবনুস সাবার প্রতি উম্মার বৃহত্তর জনগোষ্ঠির যে ক্ষোভ ছিল, তাতে সূত্রে তাকে উল্লেখ করা হলে হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতা পাবেনা মনে করে পরবর্তী কোন সাবায়ী এভাবে সনদ তৈরী করেছেন যাতে ইবনূস সাবার উল্লেখ করা হয়নি।

খ. শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক হাদীস জালকরণ

যেসব দল বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হাদীস জাল করণের অভিযোগ রয়েছে তাদের মাঝে শিয়া সম্প্রদায় হল অন্যতম। বস্তুত সাবায়ী ফিতনার পথ বেয়েই শিয়াদের অভ্যূদয়। তবে হযরত মু'আবিয়া রা. এর শাসনকালে (৬৬১-৬৮০ খৃ:) তারা 'শীয়ানে আলী' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ইরাক ছিল তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র। অনেকেই মনে করেন যে, সর্ব প্রথম শিয়ারাই জাল হাদীস রচনার দু:সাহস দেখিয়েছে। তারা তাদের ইমামগণ ও শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাদের ফযীলতের বর্ণনা সমৃদ্ধ বহু জাল হাদীস রচনা করেছে। তাছাড়া ইমামতের ধারণায় বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তারা এর সমর্থনেও বেশ কিছু হাদীস জাল করে। হযরত আলী রা. সম্পর্কে অতি বাড়াবাড়ি মূলক বিশ্বাসের কারণে তারা হযরত আলী রা. সম্পর্কেও বহু জাল হাদীস তৈরী করে। তাদের বিশ্বাসকে হাদীসের দলীল সমৃদ্ধ করত: জনগনকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্য তারা এহেন জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে। এরা যে শুধু নিজেদের মতাদর্শের সমর্থনে হাদীস জাল করেছে তাই নয় বরং তারা মুষ্টিমেয় কয়জন সাহাবী (যার সর্বোচ্চ সংখ্যা ১৫ জন) ছাড়া বাকী সব সাহাবীকে দুর্নীতিপরায়ণ বলে আখ্যায়িত করেছে। কেননা তাদের বিশ্বাসানুসারে ঐসব সাহাবীরা হযরত আলী রা. এর খলীফা হওয়ার নির্দেশ ও ওসীয়ত সম্বলিত রাসূল সা. এর হাদীস সমূহকে গোপন করেছেন; ফলে তারা বিশ্বস্ততা হারিয়েছেন। তারা আরো মনে করত যে, রাসূল সা. এর ইন্তিকালের পর যারা হযরত আলীকে খলীফা নিয়োগ করেননি তারা সকলেই রাসূল সা. এর ওসীয়ত লঙ্গন করেছেন এবং ইমামে হক্কের বিরোধিতা করেছেন। ফলে তারা সকলেই নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলেছেন। অতএব তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি যেসব সাহাবীদের ব্যাপারে শিয়ারা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল, তাদের ফযীলত ও প্রসংশায় রাসূল সা. থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোকে তারা মিথ্যা ও জাল বলে আখ্যায়িত করেছে।

বলতে গেলে সহীহ হাদীসকে জাল বলে আখ্যায়িত করণ এবং হাদীস জাল করণে শিয়াদের দৌরাত্মই সবচেয়ে বেশী। এ কারণে ইমাম মালেক রহ.

বলতেন যে, 'তাদের নিকট হাদীস বর্ণনাও করো না এবং তাদের থেকে হাদীস আহরণও করো না। কেননা তারা মিথ্যা বলে'।[১]

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলতেন- ما رأيت في أهل الأهواء قوماً اشهد بالزور من الرافضية - আমি প্রবৃত্তির পুজারীদের মাঝে রাফেযী শিয়াদের চেয়ে মিথ্যা রচনায় অধিক পটু কোন সম্প্রদায়কে দেখিনি।[২]

তাদের মিথ্যাচার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম যুহরী বলেন-

يخرج الحديث من عندنا شبراً فيرجع الينا من العراق ذراعاً –

আমাদের কাছ থেকে কোন হাদীস এক বিঘত পরিমাণ (অবয়ব নিয়ে) বেরিয়ে যেত। অতপরঃ তা ইরাক থেকে আবার আমাদের নিকট ফিরে আসত একহাত (পরিমাণ দীর্ঘ) হয়ে। কাজী শুরায়হ বলতেন :

أحمل عن كلّ من لقيتُ الا الرافضة فانهم يضعون الحديث ويتخذون دينا

যেকোন মুহাদ্দিসের সঙ্গে দেখা হত, তাথেকেই আমি হাদীস আহরণ করতাম। তবে রাফেজীদের থেকে নয়। কেননা তারা মিথ্যা হাদীস রচনা করে এবং এটাকে দ্বীনি কাজ মনে করে।[৩]

বস্তুতঃ শিয়ারা বহু হাদীস জাল করেছে। তন্মধ্যে 'গদীরে খুম' এর হাদীসটি অন্যতম। কেননা এটি- 'হযরত আলী রা. খিলাফতের প্রকৃত হক্বদার ছিলেন'- তাদের এহনে বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। সংক্ষেপে হাদীসটির বৃত্তান্ত এরূপ যে, বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূল সা. 'গদীরে খুম' নামক স্থানে সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সে সময় তিনি হযরত আলী রা. এর হাত ধরে সমবেত সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন -

هذا وصيي وأخي والخليفة من بعدي فاستمعوا له وأطيعوا.

এ হল আমার ওয়াসী, আমার ভাই এবং আমার পরবর্তী খলীফা। সুতরাং তোমরা তার নির্দেশ মেনে চলো এবং তার আনুগত্য করো।[৪]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত মনে করেন যে, এটি শিয়াদের তৈরী করা মিথ্যা ও জাল হাদীস। কেননা এরূপ বিশাল জনসমাবেশে এরূপ একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা হয়ে থাকলে সাহাবাদের তা চেপে যাওয়ার কোন কারণ নেই।

---

[১] আল-মুনতাকা আল্লামা যাহাবীকৃত পৃঃ ২১।
[২] আলকিফায়াহ খতীব বাগদাদীকৃত পৃঃ ২০২।
[৩] আল-ওয়াযউ ফিল হাদীস উমর ফালাতাকৃত পৃঃ ২৪৬।
[৪] আসসুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা পৃঃ ৭৯-৮০।

তাদের বানানো আরো কতিপয় হাদীস আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম -

(١) من اراد ان ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى ابراهيم في حكمه وإلى موسى في هيبته إلى عيسى في عبادته ، فلينظر إلى علي – [١]

(٢) حبّ علي حسنة لا يضرّ معها سيئة وبغضه سيئة لاينفع معها حسنة – [٢]

(٣) اذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه – [٣]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর মূর্খ লোকেরা এদের মুকাবেলায় যেসব জাল হাদীস তৈরী করেছে তার নমূনা নিম্নরূপ -

ما في الجنة شجرة الا مكتوب على كل ورقة منها لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بكر صديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين –

হযরত মু'আবিয়ার পক্ষের লোকেরা যেসব জাল হাদীস তৈরী করেছে তার নমূনা নিম্নরূপ - الأمناء عندالله ثلاثة، أنا و جبريل و معاوية [٤]

বস্তুতঃ শিয়ারা তাদের জাল হাদীসের সমন্বয়ে বেশ কয়েকটি হাদীসের গ্রন্থও প্রনয়ণ করেছে। সেগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল:

১. আল-কাফী : আবু জা'ফর মুহা: ইবনে ইয়াকূব কুলাইনী (মৃত্যু: ৩২৮/৩২৯ হি:) কৃত। ৩ খণ্ড
২. কিতাবুত্ তাহযীব: মুহাম্মদ ইবনে হাসান তাইমীকৃত। ২ খণ্ড।
৩. কিতাবু মান লা ইয়াহ্‌যুরুহুল ফকীহ: মুহাম্মদ ইবনে আলীকৃত।
৪. কিতাবুল ইসতিবসার (এটি কিতাবুত্ তাহযীবের সারসংক্ষেপ) : মুহাম্মদ ইবনে হাসান তূসীকৃত।
৫. ওসাইলুশ্ শীয়া : মুহাম্মদ ইবনে হাসান আমিলীকৃত।
৬. বাহরুল আনওয়ার : মুহাম্মদ আল-বাকের প্রণীত।

গ. খারেজীদের হাদীস জালকরণ :

জাল হাদীস তৈরীতে খারেজীদের কোন ভূমিকা ছিল কিনা এ নিয়ে গবেষকদের মতভিন্নতা রয়েছে। একদল গবেষক মনে করেন, অন্যান্য বাতিল ফিরকার ন্যায় খারেজীরাও জাল হাদীস রচনা করেছে। তারা এর পক্ষে নিম্নের হাদীসটি পেশ করেন

اذا اتاكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فانا قلتُه –

---

[১] আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা পৃ: ৭৯-৮০।
[২] আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা পৃ: ৮০।
[৩] আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা পৃ: ৮০।
[৪] আল্‌ফাওয়ায়েদুল মাজমু'আহ শাওকানীকৃত পৃ: ৩৪২।

যদি তোমাদের কাছে কোন হাদীস আসে তাহলে তাকে আল্লাহর কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখো। যদি তা আল্লাহর কিতাবের অনুকূল হয় তাহলে মনে করো তা আমি বলেছি।

এ হাদীসটি খারেজীরা তৈরী করেছে বলে মনে করা হয়। তাছাড়া তারা যে জাল হাদীস তৈরী করেছে, এ ব্যাপারে তাদের স্বীকারোক্তিও রয়েছে। যেমন- ইবনে লাহি'আহ বলেন যে, আমি খারেজীদের জনৈক শায়খকে বলতে শুনেছি যে -

ان هذا الأحاديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم فانا كنا اذا هوينا امرا صيرناه حديثا

এই হাদীসগুলো হল দ্বীনের ভিত্তি। কাজেই তোমরা কার কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ তা ভাল করে দেখে নিও। কেননা এক সময় এমন ছিল যে, আমরা যখন কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হতাম তখন তার সমর্থনে একটি হাদীস বানিয়ে ফেলতাম।[১]

অবশ্য ড. মুস্তফা আস-সিবাই ও ড. আজাজ আল-খতীবসহ অনেনেই মনে করেন যে, জাল হাদীস রচনায় খারেজীদের কোন ভূমিকা ছিল- নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমাণের আলোকে তা কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না। বিশেষত তারা যেহেতু মিথ্যা বলা দ্বারা ব্যক্তি দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায়- এ বিশ্বাস পোষণ করত; অতএব তাদের দ্বারা জাল হাদীস তৈরী করার বিষয়টি বলতে গেলে অসম্ভব। কেননা এরূপ করলে তাদের বিশ্বাসানুসারেই তারা দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে। ইমাম আবু দাউদ খারেজীদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন - ليس في أهل الاهواء أصحّ حديث من الخوارج

ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর মাঝে খারেজীদের চেয়ে সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী কোন দল নেই। ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন -

ليس في أهل الاهواء أصدق ولا أعدل من الخوارج –

প্রবৃত্তির অনুসারী দলগুলোর মাঝে খারেজীদের চেয়ে অধিক সত্যবাদী ও ন্যায়-নিষ্ঠ কোন দল নেই।

এতদসত্তেও খারেজীরা যে বিদ'আতে লিপ্ত চরমপন্থী একটি ইসলামী ফিরকা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘ. যিন্দীকদের হাদীস জালকরণ

ইসলামের ছদ্মাবরণে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে যিন্দীক বলা হয়- যারা কুরআন সুন্নার মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে লিপ্ত হয়। এ সম্প্রদায়ও ইসলামের সুমহান

---

[১] আসসুন্নাতু কাবলাততাদবীন মুহাম্মদ আজাজ আল-খাতীবকৃত পৃ: ২০৪।

আদর্শকে কলোষিত করার মানসে জাল হাদীস রচনার প্রবৃত্ত হয়। এদের রচিত কতিপয় জাল হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত করা হল -

(১) ان الله لما اراد ان يخلق نفسه خلق الخيل واجراها فعرقت فخلق نفسه منها –

আল্লাহ যখন নিজেকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি ঘোড়াকে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে দৌড়ালেন। ফলে ঘোড়াটি ঘর্মাক্ত হল, অতপর সেই ঘাম থেকে তিনি নিজেকে সৃষ্টি করলেন।[১]

(২)ينـــزل ربنا عشية عرفة على جمل اورق يصافح الركبان ويعانق المشاة –

আরাফার দিন সন্ধ্যায় আমাদের প্রতিপালক একটি উজ্জল উটের উপর আঁরোহীরূপে অবতরণ করেন। তিনি আরোহীদের সঙ্গে মুসাফা করেন, আর পদচারীদের সঙ্গে মুআনাকা করেন।[২]

(৩) النظر إلى وجه الجميل عبادة

সুন্দর চেহারার প্রতি তাকানো ইবাদত।[৩]

আল্লামা উকায়লী হাম্মাদ ইবনে যায়দের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, যিন্দীকরা রাসূল সা. থেকে ১৪ হাজার জাল হাদীস রচনা করেছিল।

যিন্দীকদের মাঝে উল্লেখযোগ্য জাল হাদীস রচনাকারী ছিলেন -

১. আব্দুল করীম আল-আওজা'। তার নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে সে চার হাজার জাল হাদীস রচনা করেছিল।
২. বয়ান ইবনে সাম'আন আন্-নাহদী ।
৩. মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল-মাসলূব। সে বলত, যদি কোন উত্তম কথা হয় তাহলে তার জন্য একটা সনদ রচনা করে দিতে কোন দোষ নেই।

ঙ. কাররামিয়্যাহদের জাল হাদীস

কাররামিয়্যাহরা মূলত শীয়াদেরই একটি উপদল। তারাও তাদের ইমামের ফযীলত বর্ণনায় হাদীস জাল করেছে। তাদের রচিত একটি হাদীস -

يجئ في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن كرام، يحيي السنة والجماعة ، هجرته من خراسان إلى بيت المقدس كهجرتي من مكة إلى المدينة –

কাররামিয়্যাহরা তাদের ইমামের ফযীলত বর্ণনায় فضائل محمد بن كرام নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিল।[৪]

---

১ আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা পৃ:৮৪।

২ আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা পৃ:৮৪।

৩ আল্ মাসনু' ফি মা'রিফাতি আহাদীসিল মওযূ' মুল্লা 'আলী কারী কৃত পৃ: ১৩২।

৪ আল-লাআলিউল মাসনু'আঁহ ফি আহাদীসিল মাওযু'আহ সুয়ূতীকৃত খণ্ড ১ পৃ: ৪৫৮।

চ. মুরজিয়াদের জাল হাদীস

মুরজিয়ারা মূলত তাসদীকে বাতেনী বা আন্তরিক বিশ্বাসকেই ঈমান মনে করে। আমলকে তারা কোনভাবেই ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করে না। অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস বিদ্যমান থাকলে পাপাচারের দ্বারা ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না এবং পূণ্যকর্ম দ্বারা ঈমানের কোনরূপ পরিবর্ধণ সাধিত হয় না। তারা তাদের এহেন বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাল হাদীস রচনা করে। তাদের রচিত একটি হাদীস হল-

قدم وفد ثقيف على رسول الله صـــ فقالوا جئناك نسئلك عن الإيمان أيزيد أو ينقص فقال الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي، وزيادته كفر ونقصانه كفر –

বনূ সকীফের একটি প্রতিনিধিদল রাসূল সা.-এর নিকট আসল এবং তারা বলল, আমরা আপনার নিকট একথা জিজ্ঞাস করার জন্য এসেছি যে, ঈমান বাড়ে কমে কি না? উত্তরে তিনি বললেন, ঈমান অন্তরে সুদৃঢ় পাহাড়ের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তার বর্ধিত হওয়ার বিশ্বাসও কুফরী এবং তা কমার বিশ্বাসও কুফরী।[১]

যারা আমলকে ঈমানের অংশ মনে করেন তারা এর পাল্টা হাদীস তৈরী করে। তাদের বানানো একটি হাদীস - الإيمان قول وعمل يزيد وينقص

ঈমান মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম- যা বৃদ্ধি পায় এবং কমে যায়।[২]

হাকেম বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে কাসেম তায়কানী (الطايكاني) ছিলেন মুরজিয়াদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। সে তাদের মতাদর্শের পক্ষে জাল হাদীস রচনা করত।[৩]

ছ. কাদরিয়্যাহদের জাল হাদীস :

কাদরিয়্যাহরা মূলত তাকদীরে অবিশ্বাসী এক সম্প্রদায়। তারা মনে করত যদি তাকদীরে বিশ্বাস করা হয় তাহলে পাপ-পূণ্য সকল কাজের জন্য তাকদীরই দায়ী হবে। তাহলে সকল পাপের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর উপর বর্তাবে। তাই আল্লাহকে এই পাপের দায় থেকে মুক্ত রাখার জন্য বলতে হবে যে, তাকদীর বলতে কিছু নেই। বরং মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ম শক্তি প্রয়োগ করেই সবকিছু করে

---

[১] আল-মাওযূ'আত ইবনুল জাওযীকৃত পৃ: ১৩১।

[২] আল-ওয়াযউ ফিল হাদীস -উমর ফারতা কৃত পৃ: ২৫৬।

[৩] তাদরীব ২৪৮।

থাকে এবং তার সকল কাজের জন্য সে নিজেই দায়ী। তারা তাদের মতবাদের সমর্থনে জাল হাদীস তৈরী করে। তাদের তৈরী করা জাল হাদীসের একটি হল -

اذا كان يوم القيامة جمع الله الاولين والآخرين في صعيد واحد – فالسعيد من وجد لقدمه موضعاً فينادى مناد تحت العرش الا من برأ ربّه من ذنبه فليدخل الجنة –

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে এক সমভূমিতে সমবেত করবেন । যে সেখানে কদম রাখার সুযোগ পাবে সে সৌভাগ্যবান বলে গণ্য হবে। তখন আরশের নিচ থেকে একজন ঘোষণাকারী এমর্মে ঘোষণা করবে যে, যারা তাদের প্রতিপালককে তার পাপের দায় থেকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করুক।[১]

জ. জাবরিয়্যাহদের জাল হাদীস :

জাবরিয়্যাদের জাল হাদীস লেখক খুঁজে পাননি।

জাবারিয়্যাহ ও কদরিয়্যাহ সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষীয়রাও জাল হাদীস তৈরী করে

তাদের তৈরী একটি জাল হাদীস হল -

صنفان من أمتي لاتنالهما شفاعتي، المرجية والقدرية. قيل يا رسول الله من القدرية؟ قال قوم يقولون لا قدر، قيل: فمن المرجية؟ قال: قوم يكونون في آخر الزمان اذا سئلوا عن الإيمان يقولون مؤمن إنشاء الله [২]

ঝ. মু'তাযিলাদের জাল হাদীস :

মু'তাযিলারা খলকে কুরআনের বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। এ প্রশ্নে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সাথে তাদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। তারা তাদের এই বিশ্বাসের সমর্থনে জাল হাদীস তৈরী করে। তাদের তৈরী জাল হাদীসের নমূনা-القرآن كلام الله مخلوق। আল-কুরআন হল আল্লাহর কালাম যা সৃষ্ট।

তাদের প্রতিপক্ষীয়রাও জাল হাদীস তৈরী করে

তাদের তৈরী জাল হাদীসের নমূনা নিম্নরূপ - من قال القرآن مخلوق فقد كفر যে বলে যে, কুরআন সৃষ্ট সে কাফের।[৩]

---

[১] আল-মওযূ'আত ইবনুল জাওযী কৃত; পৃ: ২৭২।
[২] আল-ওয়াযউ ফিল হাদীস উমর ফালাতাহকৃত পৃ: ২৫৭
[৩] আল মাওযূ'আত ইবনুল যাওজীকৃত পৃ: ২৭২।

كل من في السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن وسيجيء أقوام من أمتي يقولون القرآن مخلوق فمن قال ذلك فقد كفر بالله العظيم –

আসমান যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার সবই সৃষ্ট- আল্লাহ ও কুরআন ছাড়া। অদূর বভিষ্যতে এমন কিছু সম্প্রদায় আসবে, যারা বলবে যে, কুরআন সৃষ্ট; যারা এ কথা বলবে তারা মহান আল্লাহর প্রতি কুফরী করবে।[১]

ঞ. মাজহাবের অনুসারীদের রচিত জাল হাদীস :

হানাফী মাজাহাবের গোড়াপন্থীরা তাদের ইমামের প্রশংসায় জাল হাদীস তৈরী করেছে। যেমন -

يكون في أمتي رجل يقال له النعمان ابن ثابت يكنى ابو حنيفة يحى الله على يديه ديني وسنتي

আমার উম্মতের মাঝে এমন একজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে যাকে নু'মান ইবনে সাবেত নামে ডাকা হবে। তার কুনিয়্যাত বা উপনাম হবে আবু হানিফা। মহান আল্লাহ তা'আলা তার হাতে আমার দ্বীন ও সুন্নতকে জীবন্ত করবেন।[২]

অনরূপভাবে শাফেয়ীও মালেকী মাজহারের গোড়া পন্থীরাও জাল হাদীস রচনা করেছেন। যেমন- ইমাম শাফেয়ীর উস্তাদ ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ আসলামী এবং আসবাগ ইবনে জালীল মালেকী জাল হাদীস রচনা করতেন।
ইমাম শাফেয়ী রহ. এর ঘোর বিরোধী মূর্খজনেরাও তার বিরুদ্ধে জাল হাদীস রচনা করে। যেমন - يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أضرّ على أمتي من إبليس

আমার উম্মতের মাঝে জনৈক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে যাকে মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস বলে ডাকা হবে। সে আমার উম্মতের জন্য ইবলিসের চেয়েও ক্ষতিকর হবে।[৩]
অনেকেই নিজেদের ফেকহী মতামতের পক্ষে এবং অন্যদের মতের বিপরীতে জাল হাদীস তৈরী করে। যেমন- من رفع يديه في الصلوة فلا صلاة له যে ব্যক্তি তার দুই হাত নামাযের ভিতর উত্তোলন করবে তার নামায হবে না।[৪]

অনেকেই নিজের দেওয়া ফত্ওয়ার সমর্থনেও হাদীস জাল করতেন। বলা হয় যে, হাফেজ আবুল খাত্তাব ইবনে দেহইয়া এরূপ করতেন। তিনি মাগরীবের নামাযে

---

১ আস্সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা পৃ: ৮৭।

২ আল মাওযূ'আত ইবনুল যাওজীকৃত খণ্ড ২ পৃ: ৪৯।

৩ আল মাওযূ'আত ইবনুল যাওজীকৃত খণ্ড ২ পৃ: ৪৮।

৪ আস্সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা পৃ: ৮৭৩।

কসর করা বৈধ হওয়ার ফতওয়া দিয়েছিলেন এবং এর পক্ষে একটি জাল হাদীস তৈরী করেছিলেন।[১] তবে অনেকেই মনে করেন যে, আবুল খাত্তাবের প্রতি হাদীস জাল করার এ অভিযোগ সত্য নয়। অনুরূপভাবে আসবাগ ইবনে কালীল মালেকীও নিজের মতামতের পক্ষে জাল হাদীস রচনা করতেন।

২. সাম্প্রদায়িক গোড়ামীর কারণেও জাল হাদীস তৈরী করা হয়েছে

যেমন পারস্য সম্প্রদায় যখন আরবদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে তখন তারা নিম্নের জাল হাদীসটি রচনা করেন-

إن الله اذا غضب أنزل الوحي بالعربيّة واذا رضي أنزل الوحي بالفارسية

আল্লাহ যখন রাগান্বিত হয় তখন আরবী ভাষার ওয়াহী অবতীর্ণ করেন। আর যখন সন্তুষ্ট থাকেন তখন ফারসী ভাষায় ওয়াহী অবতীর্ণ করেন।[২]

আরবরা পারস্যদের মুকাবেলায় নিম্নের জাল হাদীসটি রচনা করে -

أبغض الكلام عند الله تعالى الفارسية وكلام أهل الجنة العربية –

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে জঘন্য ভাষা হল ফারসী। আর জান্নাতীদের ভাষা হল আরবী।[৩]

বিভিন্ন অঞ্চলের ফযীলত বর্ণনায়ও জাল হাদীস রচিত হয়েছে। যেমন-

جنان هذه الدنيا دمشق من الشام ومرو من الخرسان وصنعاء اليمن وجنة هذه الجنان صنعاء

এই দুনিয়ার শ্রেষ্টতম বাগিচা হল শিরিয়ার দামেশক, খোরাসানের মরও, ইয়ামানের সান'আ। তবে এই বাগচাগুলোর অন্যতম বাগিচা হল সান'আ।

يأتي على الناس زمان تكون أفضل الرباط رباط جدّه

লোকদের উপর একটা সময় এমন আসবে, যখন জিদ্দার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই হবে সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।[৪]

৩. কিস্‌সা ও কাহিনীকার এবং স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন ওয়ায়েযরাও সুনাম-সুখ্যাতি বৃদ্ধির মানসে বহু হাদীস জাল করেছেন :

কিস্‌সা কাহিনী শোনিয়ে জনগণকে মোহিত করার প্রথা তৎকালে অনেকটা আমাদের দেশের বাউল গানের আসরের মত ছিল। প্রাচীন আরবদের

---

[১] তাদরীব - পৃ: ২৪৯।
[২] আল মাওযূ'আত ইবনুল জাওযীকৃত খণ্ড ১ পৃ: ১১১।
[৩] আল মাওযূ'আত ইবনুল জাওযীকৃত খণ্ড ১ পৃ: ১১১।
[৪] আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমু'আহ পৃ: ৪২৮।

কিসসাখানীর আসরের যে জাহেলী প্রথা ছিল, যাতে প্রাচীন কালের যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী বিবৃত হত। ইসলাম পরবর্তী যুগে সেটাই খানিকটা আঙ্গিক পরিবর্তন করে নতূনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরিবর্তীত এই কিস্সা কাহিনীর আসরে ইসলামের যুদ্ধাভিযান, বিজয় গাথা ও ধর্মীয় তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাষায় অভিনব ভঙ্গিতে করা হত। একজন কথক বা কাহিনীকার মরমী ভাষায়, চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে রসালো করে ঐসব কিস্সা কাহিনী বর্ণনা করতেন। বর্ণনার প্রঞ্জলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তারা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কুরআন হাদীসও উদ্ধৃত করতেন। হাদীসের বর্ণনাকে আরো প্রাণবন্ত, হৃদয়গ্রাহী করার জন্য তারা আগে পাছে নিজেথেকে কিছু শব্দ ও বাক্য সংযোজন করে সেগুলোকে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে পরিবেশন করতেন। ফলে হাদীসের শব্দ ও বাক্যের সঙ্গে তাদের সংযোজিত শব্দ ও বাক্য অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যেত। আবার বর্ণনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য অনুকুল কোন হাদীস না পেলে তারা নিজেথেকে বানিয়ে জাল হাদীসও বর্ণনা করতেন।

বস্তুতঃ রাসূল সা.-এর যুগে কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এধরণের কিস্সা কাহিনীর তেমন কোন রেওয়াজ ছিল না। ড. মুহাম্মদ আজাজ আল-খতীব উল্লেখ করেছেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শেষের দিকে এরূপ কিস্সা কাহিনীর আশরের সুত্রপাত হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে মসজিদে মসজিদে এধরণের কিস্সা কাহিনীর আশর অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১]

অনুরূপভাবে স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ওয়ায়েযগণও তাদের বক্তব্যকে চিত্তাকর্ষক অভিনব ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এবং সমাজের মানুষের কাছ থেকে সুখ্যাতি কুড়ানোর জন্য হাদীসের শব্দ ও বাক্যগুলোকে রূপ রস লাগিয়ে চটকদার করে পেশ করতেন। এমনটি ওয়াযকে আকর্ষণীয় করার জন্য তারা জেনে শুনে মুনকার ও মওজু' হাদীস পরিবেশন করে বাজিমাত করার চেষ্টা করতেন। অনেক সময় হাদীস নয় এমন বক্তব্যকে হাদীস বলে বর্ণনা করে শ্রোতাদেরকে তাক লাগিয়ে দিতেন। এতে তাদের ওয়াযের বাজার ভাল হত এবং সমাজে তাদের চাহিদা বেড়ে যেত; ফলে তাদের আয় উপার্জনও বাড়ত। এমনকি অশিক্ষিত লোকেরা এদেরকেই বড় আলেম বলে মনে করত। এ ধরণের কাহিনীকার ও স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন ওয়ায়েযদের প্রতি সমাজের মানুষ কতটা আস্থা পোষণ করত এবং সমাজের মানুষের দৃষ্টিতে তারা কতটা সম্মানী ও আস্থাভাজন বলে গণ্য হত নিম্নের ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

---

[১] আল-ওয়াযউ ফিল হাদীস, আজাজ আল- খতীবকৃত পৃ: ২১০।

মুল্লা 'আলী কারী রহ. আল-মওযু'আতে উল্লেখ করেছেন যে, কূফার মসজিদে এধরণের একজন ওয়ায়েয ছিলেন, যারা নাম ছিল যার'আ। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর আম্মা একবার ইমাম সাহেবের নিকট একটি মাস'আলা জিজ্ঞেস করলে তিনি যে সামাধান পেশ করেন, তাতে তাঁর আম্মা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি বললেন- যার'আর ফায়সালা ছাড়া অন্য কারো ফায়সালা আমি গ্রহণযোগ্য মনে করব না। অগত্যা ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর মাকে নিয়ে যার'আর নিকট গেলেন এবং ঘটনা বললেন যে, মা আপনার ফায়সালা ছাড়া অন্য কারো ফায়সালা মানতে চাচ্ছেন না। এ শুনে যার'আ বললেন এ বিষয়ে তো আপনি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। পরে তিনি যে ফায়সালা দিয়েছিলেন তা যার'আকে শুনালে তিনি বললেন আপনি যা বলেছেন সেটাই সঠিক। তখন তার আম্মা পরিতৃপ্ত হন এবং সেখান থেকে ফিরে আসেন।[১]

কাহিনীকার ও ওয়ায়েজদের হাদীস জালকরণের একটি চাক্ষুষ প্রমাণ

ইবনূল জাওযী রহ. জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ তায়ালেসীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একবার আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ও ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বাগদাদের 'রসাফা' মসজিদে নামাযান্তে বসা ছিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক তথাকথিত ওয়ায়েয তাদের সামনেই ওয়ায শুরু করল। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি নিম্নের সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন -

حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال –

হাদীসটি ছিল এই যে, যখন মানুষ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা এর প্রত্যেকটি শব্দ থেকে একটি করে পাখী সৃষ্টি করেন; যার ঠোঁট স্বর্ণের আর পালকসমূহ মুক্তার।

এরপর ঐ ওয়ায়েয প্রায় ২০ পৃষ্ঠা পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করলেন। এতে ইমামদ্বয় অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে থাকলেন। অবশেষে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন রহ. আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি তার কাছে এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. বললেন আল্লাহর কসম এটি এই মাত্র আমি শুনলাম। এর আগে এরূপ হাদীস কখনই শুনিনি। ওয়ায শেষ হলে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ হাদীস কে আপনার নিকট বর্ণনা করেছে? সে বলল, কেন? ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন ও আহমদ ইবনে হাম্বল। তখন ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন

---

[১] আল মওযূ'আত মুল্লা আলী কারীকৃত পৃ: ২১।

বললেন, আমি হলাম ইয়াহ্ইয়া আর ইনি হলেন আহমদ ইবনে হাম্বল। আমরাতো রাসূল সা.-এর এরূপ কোন হাদীস শুনিনি।

একথা শুনে উক্ত-কাহিনীকার বলল, লোকমুখে শুনে আসছিলাম যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন একজন নির্বোধ। আজ তার সত্যতা প্রমাণিত হল। ইয়াহ্ইয়া জিজ্ঞাস করলেন তা কিভাবে? তখন কাহিনীকার বলল, তোমাদের কথায় মনে হচ্ছে যে, তোমরা ছাড়া দুনিয়াতে আর কোন ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন ও আহমদ ইবনে হাম্বল নেই। আমি ১৭ জন ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন ও আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে এ হাদীস আহরণ করেছি। এ বলে লোকটি তাদেরকে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ করতে করতে চলে গেল।[১]

এধরণের কিস্সা কাহিনী বর্ণনা করে অর্থ উপার্জনকারীদের মাঝে আবু সাঈদ মাদায়েনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২]

৪. অনেক মুহাদ্দিস তার সন্তান-সন্ততি ও নিকটাত্মীয়দের অবৈধ হস্ত –ক্ষেপের কারণে জাল হাদীস বর্ণনার জটিলতায় ফেসে গেছেন:

অনেক সময় কোন মুহাদ্দিসের পাণ্ডুলিপিতে তার সন্তান কিংবা নিকটাত্মীয় কেউ তার অগোচরে কোন জাল হাদীস সংযোজন করে রেখেছে। পরে তিনি অজ্ঞাতসারে সেই হাদীস অন্যের নিকট বর্ণনা করেছেন। এধরণের ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রবী'আহ এবং হাম্মাদ ইবনে সালামাহ-এর জীবনে ঘটেছে। ইবনে আবুল আওজা' তার এক পালক পুত্রকে নিয়ে এধরণের সমস্যায় ভুগেছেন; সে প্রায়ই তার পাণ্ডুলিপিতে এধরণের ঘটনা ঘটাতো। অনুরূপভাবে মা'মারের এক ভাতিজা রাফেযী মতাবলম্বী ছিল। সে মা'মারের পাণ্ডুলিপিতে নিম্নের হাদীসটি সংযোজন করে রেখেছিল -

عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن بن عباس رض قال نظر النبيّ صـــ إلى عليٍّ فقال انت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة ومن أحبّك فقد أحبّني، حبيبي حبيب الله وعدوُّك عدوِّي، وعدوُّى عدوّ الله والويل لمن أبغضك بعدك –

এ হাদীসটি পরে মা'মার থেকে আব্দুর রায্যাক রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনে মাঈন বলেছেন, বস্তুত এ হাদীসটি মওযূ' ও বাতিল।[৩]

---

[১] আল-মওযূ'আত ইবনুল জাওযীকৃত পৃ: ৪৬।

[২] তাদরীবুর রাবী।

[৩] প্রাগুক্ত পৃ: ১৪৮-২৪৯।

৫. অনেকেই ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের জন্য কিংবা অর্থ-কড়ি উপার্জনের জন্য জাল হাদীস তৈরী করেছেন :

ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের জন্য যারা জাল হাদীস রচনা করেছেন তাদের মাঝে মুহাম্মদ ইবনে হাজ্জাজ লাখমীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার 'আল-হারীসা' নামে এক ধরণের খাদ্যের ব্যবসা ছিল। তাই হারীসার ফযীলত বর্ণনা করে তিনি নবী সা.এর নামে নিম্নের জাল হাদীসটি তৈরী করে ছিলেন- أطعمني جبريل الهريسة لأشدّ ظهري لقيام الليل জিবরাইল আমাকে হারীসা আহার করিয়ে ছিল যাতে আমি রাত জেগে নামায পড়ার জন্য শক্তি অর্জন করতে পারি।[১]

অনুরূপভাবে চাল, ডাল, বেগুন, আনার, আঙ্গুর ইত্যাদির ফযীলত সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত আছে তার অধিকাংশই মওযূ'।[২]

অনুরূপভাবে বিভিন্ন পেশার ফযীলত সম্পর্কে বহু জাল হাদীস রচিত হয়েছে।[৩] অনেক সময় কাউকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যেও হাদীস জাল করা হয়েছে। যেমন- সাইফ ইবনে উমর উল্লেখ করেছেন যে, এক সময় আমি সা'আদ ইবনে যরীফের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তার এক ছেলে মক্তব হতে কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? ছেলে বলল আমার শিক্ষক মেরেছেন। তখন তিনি বললেন, আমি ঐ শিক্ষককে অবশ্যই লাঞ্ছিত করব। কেননা ইকরিমা রহ. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম সা. ইরশাদ করেছেন-

معلّمو صبيانكم شراركم، اقلّهم رحمة ليتيم، وأغلظهم على المسكين.

তোমাদের শিশুদের শিক্ষকরা তোমাদের মাঝে সবচেয়ে দুষ্ট শ্রেণীর লোক। ইয়াতীমদের প্রতি তারা খুব কম দয়াপ্রবণ হয়ে থাকে আর মিসকীনদের প্রতি অতি দুর্ব্যবহারকারী হয়ে থাকে।[৪]

এছাড়াও সাঈদ ইবনে তরীফ, মুহাম্মদ ইবনে উক্কাশা, মা'মুন আল-মুহরী এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।[৫]

---

[১] আল-মাওযূ'আত ইবনু ল জাওযীকৃত খণ্ড ৩ পৃ: ১৬-১৭।

[২] তাদরীব - পৃ: ২৫২।

[৩] আল-ওয়াযউ ফিল হাদীস পৃ: ২৮০।

[৪] আজাজ আল-খতীবকৃত পৃ:২১৭-২১৮।

[৫] তাদরীব পৃ: ২৪৯

৬. অনেকেই মুহাদ্দিস হিসাবে সুখ্যাতি কুড়ানোর জন্য হাদীসের সনদ উলট-পালট করে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। ফলে হাদীসটি মওযূ' বলে সাব্যস্ত হয়েছে :

সাধারণত দুর্লভ হাদীস বর্ণনা করার মাঝে এক ধরণের কৃতিত্ব আছে নি:সন্দেহে। কিন্তু অনেকেই এত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হতেন না, যাতে দুর্লভ হাদীস বর্ণনা করা যায়। কিন্তু তাদের অনেকেই এক হাদীসের সনদকে অন্য হাদীসের সঙ্গে লগিয়ে দিয়ে কিংবা সনদে রদ-বদল করে অভিনবত্ব ও দুর্লভ্যতা সৃষ্টির অপতৎপরতায় লিপ্ত হতেন। ফলে হাদীসটি জাল বলে গণ্য হত।

ইবনে আবি হাইয়্যাহ, হাম্মাদ নুসায়বী, বাহলুল ইবনে উবায়দুল্লাহ, আসরাম ইবনে হাওশাব এ ধরণের কর্মকাণ্ডের জন্য খ্যাত ছিলেন।[১]

৭. সম্রাটের কথা বা কর্মের অনুকূলে হাদীস বর্ণনা করে তাদের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেও জাল হাদীস তৈরী করা হয়েছে :

সম্রাটদের নৈকট্য লাভ ও তাদের মনোতুষ্টির জন্যও অনেকে জাল হাদীস তৈরী করেছেন। যেমনঃ গিয়াস ইবনে ইব্রাহীম, মুকাতিল, আবুল বুখতরী প্রমূখ।

খলীফা আল-মাহদী একদিন কবুতর উড়িয়ে খেলা করছিলেন। এ সময় গিয়াস ইবনে ইব্রাহীম উপস্থিত হয়ে তাকে এ অবস্থায় দেখে তার মনোরঞ্জনের জন্য নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেন -

قال رسول الله صـــ لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر أو جناح -

রাসূল সা. বলেছেন তীরান্দাজী, অশ্বচালনা, উটের দৌড় ও পাখী উড়ানো ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নেই।

বস্তুতঃ বাদশাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি মূল হাদীসটির সাথে "أو جناح" শব্দটি বর্ধিত করেছেন। এ দ্বারা তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, কবুতর নিয়ে খেলা করার বৈধতা রাসূল সা. থেকে প্রমাণিত আছে।[২]

অনুরূপভাবে বাদশাহ হারুন আর রশীদকে কবুতর উড়াতে দেখে তাকে খুশী করার জন্য আবুল বুখতরী নিম্নের জাল হাদীসটি রচনা করে শুনিয়ে ছিলেন-

---

[১] তাদরীব পৃ: ২৪৯

[২] আল মওযূ'আত মুল্লা আলী কারীকৃত পৃ: ২৫৬-২৫৭।

ان النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام –

নবী সা. কবুতর উঠাতেন।[১]

মুকাতিল ইবনে সুলায়মানও বাদশা মাহদীকে হাদীস জাল করে দিতে চেয়েছিলেন। তবে মাহদী তা প্রত্যাক্ষান করেন।[২]

৮. অনেক যাহেদ আবেদ ব্যক্তি মানুষকে দ্বীনের প্রতি অনুরক্ত করার মানসে এবং সাওয়ারের প্রত্যাশায় হাদীস জাল করেছেন :

স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন অনেক আবেদ ও যাহেদ ব্যক্তি মানুষকে দ্বীনের প্রতি আগ্রহী ও অনুরক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে জাল হাদীস তৈরী করেছেন। তারা মনে করতেন যে, একাজের দ্বারা তারা দ্বীনের কল্যাণ সাধন করছেন এবং এদ্বারা তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে সাওয়ারের অধিকারী হবেন। তাছাড়া অনেক সময় এইসব আবেদ যাহেদ ব্যক্তিরা সাফদিল হওয়ার কারণে অন্যের কাছ থেকে যা শুনতেন তাই বিশ্বাস করতেন এবং অন্যের কাছে তা বর্ণনা করতেন। এগুলোর সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন মনে করতেন না। এভাবেও ঐসব আল্লাহ ওয়ালাদের মাধ্যমে বহু জাল হাদীসের প্রসার ঘটে। একারণেই ইয়াহইয়া আল-কাত্তান বলতেন- ما رأيت الكذب في احد اكثر منه فيمن ينسب إلى الخير

যাদেরকে ধর্মভীরু বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাদের মাঝে মিথ্যা হাদীস বর্ণনার বিষয়টি যত বেশী লক্ষ্য করেছি তত বেশী অন্য কারো মাঝে লক্ষ্য করিনি।[৩]

তাদের মাধ্যমে জাল হাদীসের বিস্তার বেশী ঘটার কারণ এই যে, লোকেরা তাদের দীনদারীর উপর আশ্বস্ত থাকার কারণে তাদের বর্ণিত হাদীস সমূহ নির্দিধায় গ্রহণ করত। এ ধরণের আবেদদের রচিত কতিপয় জাল হাদীসের নমূনা :

১. হাকেম আবু আব্দুল্লাহ তার সনদে ইবনে আম্মার আল মারওয়াযী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, একবার নূহ ইবনে আবি মারয়ামকে (যিনি ইকরামার ছাত্র ছিলেন) জিজ্ঞাস করা হল যে, আপনি عكرمة عن ابن عباس এই সূত্রে প্রতি সূরার ফযীলত সংক্রান্ত যেসব হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, সেগুলো কোথায় পেলেন? ইকরিমার ছাত্রদের মাঝে অন্য কেউতো সেগুলো বর্ণনা করেন না। তখন তিনি বললেন যে, আমি দেখলাম,

---

১ আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা পৃঃ ৮৯।

২ তাদরীব পৃঃ ২৪৮ দ্রষ্টব্য।

৩ তাদরীব পৃঃ ২৪৫।

লোকেরা কুরআন রেখে আবু হানীফার ফিকাহ ও ইবনে ইসহাকের মাগাযী অধ্যয়নে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাই আমি সাওয়াবের প্রত্যাশায় এসব হাদীস নিজে থেকে রচনা করেছি।[১] অবশ্য অনেকেই নূহ ইবনে আবি মারয়ামের প্রতি জাল হাদীস রচনার অভিযোগ যথার্থ বলে মনে করেন না। তারা উদ্বৃত হাদীসটিকে মুনকার বলে অভিহিত করেছেন।[২]

২. ইবনে হিব্বান তার 'আয্-যু'আফা' গ্রন্থে ইবনে মাহদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি মাইসারা ইবনে আব্দে রাব্বিহীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এসব হাদীস কোথা থেকে নিয়ে আসলেন যে, যে ব্যাক্তি এই সূরা তিলাওয়াত করবে, সে এই পাবে। তিনি বললেন, লোকদেরকে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি অনুপ্রাণিত করার জন্য এগুলো আমি নিজে থেকে রচনা করেছি।[৩] অথচ তিনি এত বড় আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন যে, তার মৃত্যুতে গোটা বাগদাদের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আবু দাউদ নাখয়ী রাতভর তাহাজ্জুদ পড়তেন, আর দিনভর রোযা রাখতেন। অথচ তিনি হাদীস বানাতেন। ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন যে, আবু বিশ্‌র আহ্‌মদ ইবনে মুহাম্মদ ছিলেন তার যুগের সুন্নতের অনুসারীদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু তিনিও হাদীস বানাতেন।

ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াহাব ইবনে হাফস ছিলেন একজন নেককার ব্যক্তি; দীর্ঘ ২০ বৎসর তিনি কোন লোকের সাথে কথা বলেননি। অথচ তিনিও হাদীস বানাতেন।[৪]

আল্লামা যাহাবী উল্লেখ করেছেন, গোলাম খলীল ছিলেন একজন সংসারত্যাগী আবেদ। সকল কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। তিনিও যিকিরের ফযীলত ও বিভিন্ন প্রকার অযীফার ফযীলত সম্পর্কে বহু জাল হাদীস রচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, সাধারণ মানুষের মনকে নরম করার জন্য আমি এসব মিথ্যা হাদীস তৈরী করেছি।[৫]

এ সকল প্রজ্ঞাহীন আবেদদেরকে যখন বলা হয় যে, রাসূল সা. তো মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করার ব্যপারে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (হাদীসটি অন্য সূত্রে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে -

---

[১] তাদরীব পৃ: ২৪৬।
[২] যফরুল আমানী পৃ: ৫৭৩-৫৮০ দ্রষ্টব্য।
[৩] তাদরীব পৃ: ২৪৬।
[৪] তাদরীব পৃ: ২৪৬।
[৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা খ: ১ পৃ: ৬৬-৬৭।

من كذب علي متعمدا ليضلّ به الناس فليتبوّأ مقعده من النار

অর্থাৎ যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য জাল হাদীস রচনা করে তারা যেন তাদের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়)। তখন তারা বলে যে যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য জাল হাদীস তৈরী করে তাদের জন্য এই শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমরাতো মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নয় বরং হিদায়াতের পথে আনার জন্য জাল হাদীস রচনা করছি।

কিংবা কেউ কেউ এরূপও বলেন যে, হাদীসে বলা হয়েছে من كذب عليّ অর্থাৎ যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা হাদীস তৈরী করবে, আর আমরাতো তার পক্ষে হাদীস তৈরী করছি।

আবার অনেকেই বলেন যে, من كذب عليّ এর অর্থ হল আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে, অর্থাৎ আমি যে নবী, তা না বলে আমাকে কবি, যাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়।[১] এহেন তাবীল ও ব্যাখ্যার কোনটিই মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উল্লেখ্য যে, উবাই ইবনে কা'ব এর সূত্রে প্রত্যেক সূরার ফযীলত সম্পর্কে যেসব 'মরফূ' হাদীস বর্ণিত আছে সেগুলো জাল হাদীস, অনুরূপভাবে ইবনে আব্বাস থেকে মাইসরা এবং নূহ ইবনে আবি মারয়ামের সূত্রে বর্ণিত সূরার ফযীলত সংক্রান্ত সকল হাদীস, এবং আবু উমামা বাহেলী থেকে সাল্লাম ইবনে সুলায়ম এর সূত্রে বর্ণিত সূরার ফযীলত সংক্রান্ত সকল হাদীস মওযূ'। তবে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআনের নিম্নোক্ত সূরাগুলোর ফযীলত সম্পর্কে সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত আছে। যথা -

১. ফাতিহা, ২. বাকারা, ৩. আল্-ইমরান, ৪. নিসা, ৫. মায়েদাহ, ৬. আন'আম, ৭. আ'রাফ, ৮. তাওবা ৯. কাহাফ, ১০. ইয়াসীন, ১১. দূখান, ১২. মূলক, ১৩. যূলযাল, ১৪, নসর ১৫, কাফেরুন ১৬. ইখলাস, ১৭. ফালাক, ১৮. নাস।

এছাড়া অন্য কোন সূরার ফযীলত সম্পর্কে কোন বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত নেই।[২]

হাদীস জালকারীদের অনুসৃত পন্থাসমূহ :

জাল হাদীস রচনাকারীরা বিভিন্ন পন্থায় জাল হাদীস তৈরী করে থাকে। যথা:

১. নিজে কোন বাক্য বানিয়ে তার সাথে সনদ সংযুক্ত করে সেটিকে হাদীসরূপে চালিয়ে দিত। অধিকাংশ জাল হাদীস এ প্রকারেরই।

---

[১] তাদরীব পৃ: ২৪৭।

[২] তাদরীব পৃ: ২৫১-২৫২।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা উকায়লী 'আয্-যূ'আফা' নামক গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল-মাসলুবের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেন -

لا بأس إذا كان الكلام حسن أن يضع له إسناد –

যদি কথাটি উত্তম হয় তাহলে তার জন্য একটি সনদ বানিয়ে সংযুক্ত করে দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। ইবনে হিব্বান আবু আব্দুল্লাহ ইয়াযীদ আল-মুকরীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক বিদ'আতী তাওবা করার পর বললেন- انظروا هذا الحديث عمن تأخدونه فانا اذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا -

হাদীসগুলো কার কাছ থেকে গ্রহণ করছ সে ব্যাপারে লক্ষ্য রেখো। কেননা পূর্বে আমরা যখন কোন বক্তব্যকে যুক্তিসঙ্গত মনে করতাম তখন তার জন্য একটি হাদীস বানিয়ে ফেলতাম।[১]

২. অনেক সময় কোন দার্শনিক, জ্ঞানীজন, বা আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তির কথাকে সনদ সংযুক্ত করে সেটিকে হাদীস বলে চালিয়ে দিত। যেমন নিম্নের হাদীসটি – المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء

পরিপাকতন্ত্র হল ব্যাধির উৎসস্থল আর সতর্কতা হলে সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। এটি মূলত রাসূল সা. এর বক্তব্য নয়। বরং এটি কোন চিকিৎসকের মন্তব্য। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি মূলত আরব্য চিকিৎসক হারেস ইবনে কালদার উক্তি।[২]

৩. অনেক সময় তারা কোন নীতি বাক্যের সাথে সনদযুক্ত করে তাকে হাদীস হিসাবে চালিয়ে দিত। ইমাম তিরমিযী আল-ইলালে উল্লেখ করেছেন যে, আবু মুকাতিল খুরাসানী আউন ইবনে শাদ্দাদের সূত্রে লোকমানের ওসিয়ত সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলে তার ভাতিজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আউন থেকে কিভাবে হাদীস বর্ণনা করছেন ? অথচ আপনিতো তাথেকে কোন কিছুই শ্রবণ করেননি। উত্তরে তিন বললেন, হে ভাতিজা! এটি খুবই উত্তম একটি কথা। তাই হাদীস হিসাবে সেটিকে চালিয়ে দেওয়াতে কোন দোষ নেই।

৪. কখনো সাহাবী বা তাবেয়ীনদের কথাকে সনদযুক্ত করে হাদীস বলে চালিয়ে দিত।[৩]

৫. কখনো কোন সহীহ হাদীসের সাথে নিজের মনগড়া কোন শব্দ বা বাক্য সংযোজন করে হাদীস জাল করত। যেমন মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল্

---

১ তাদরীব পৃ:.....।
২ তাদরীব পৃ: ২৪৯।
৩ কাওয়ায়েদুত তাহদীস জামাল উদ্দীন কাসেমীকৃত পৃ: ১৫১।

মাসলূর বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি - أنا خاتم النبيين، لا نبيّ بعدي الا أن يشاء الله

বস্তুত الا أن يشاء الله এই অংশটুকু হাদীসের অংশ নয়। মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ এটুকু হাদীসের সাথে সংযোজন করেছেন।[১]

৬. কখনো দুর্বল সনদকে ফেলে দিয়ে স্ববল সনদযুক্ত করে হাদীস জাল করত।[২]

মওযূ' হাদীসের বিভজান:

মওযূ' হাদীসকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. **ইচ্ছাকৃতভাবে রচনা করা জাল হাদীস :** অর্থাৎ বর্ণনাকারী স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে যা হাদীস নয় তাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিবেন। সাধারণত অধিকাংশ জাল হাদীসই এরূপ।

২. **অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন বক্তব্যকে হাদীস বলে বর্ণনা করা :** ভুল বুঝার কারণেই সাধারণত এমনটি হয়ে থাকে। যেমন ইবনে মাজাহ বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি -

روى ابن ماجة عن اسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً : من كثرت صلوته بالليل حسن وجهه بالنهار

হাকেম উল্লেখ করেছেন যে, বস্তুতঃ সাবেত যখন শরীকের দরবারে প্রবেশ করেছিল তখন তিনি ছাত্রদেরকে হাদীস লিখাচ্ছিলেন। তিনি -

حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صـــ

এইটুকু বলে থামলেন। যাতে ছাত্ররা লিখে নেয়; ইতিমধ্যেই সাবেতের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি সাবেতকে লক্ষ্য করে ঐ মন্তব্য করেছিলেন যে,

من كثرت صلوته بالليل حسن وجه بالنهار–

যেহেতু তিনি একজন মুত্তাকী আল্লাহওয়ালা লোক ছিলেন, তাই তার প্রশংসায় এ বাক্যটি বলেছিলেন। কিন্তু সাবেত মনে করেছেন যে, এটি পূর্বোক্ত সূত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি হাদীস। তাই তিনি ঐ সূত্রে এটিকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করতেন।[৩]

---

[১] তাদরীব পৃ: ....

[২] কাওয়ায়েদুত্ তাহদীস জামাল উদ্দীন কাসেমীকৃত পৃ: ১৫১।

[৩] তাদরীব পৃ: ২৫০।

জাল হাদীসের বিভিন্ন স্তর :

ইমাম যাহাবী জাল হাদীসকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা:

১ম স্তর : যেসব হাদীস মওযূ' হওয়র ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসের ঐকমত্য রয়েছে। কেননা এর রচয়িতারাই তা জাল বলে স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেছেন। কিংবা অন্য কোন পন্থায় প্রমাণিত হওয়ার কারণে মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত্যে উপণীত হয়েছেন।

২য় স্তর : যে হাদীস জাল হওয়ার ব্যপারে অধিকাংশ মুহাদ্দিস অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে কেউ কেউ সেগুলো সম্পর্কে এই মত পোষণ করেন যে, হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য না হলেও জাল নয়।

৩য় স্তর : যে হাদীস অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে যয়ীফ ও পরিত্যাজ্য। তবে কেউ কেউ সেগুলোকে মিথ্যা বা জাল বলে অভিহিত করেছেন।[১]

মওযূ' বা জাল হাদীসের হুকুম

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মওযূ' হাদীস হল যয়ীফ হাদীসের সর্বনিৎকৃষ্ট প্রকার। অনেকেই মওযূ হাদীসকে যয়ীফের অন্তর্ভূক্ত করতেও সম্মত হননি। বরং মওযূ' হাদীসকে তারা একটি পৃথক প্রকার হিসাবে গণ্য করেছেন। মওযূ হাদীস কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য নয়।

বস্তুতঃ এগুলো হাদীসই নয়। তথাপি মুহাদ্দিসগণ এগুলোকে হাদীস নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং মওযূ' হাদীসের গ্রন্থকে হাদীসগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করেছেন, কেননা জালকারীরা যেহেতু এগুলোকে হাদীস নামে অভিহিত করেছেন; হতে পারে এজন্য মুহাদ্দিসগণও তাদের অনুকরণে এগুলোকে হাদীস বলেছেন। কিংবা হাদীসের আভিধানিক অর্থের প্রেক্ষিতে এগুলোকে হাদীস বলেছেন। তবে যদি কোন হাদীস মওযূ হওয়া সাব্যস্ত হয় তাহলে তা সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য কোন ক্ষেত্রেই তা প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে না।

মওযূ' বা জাল হাদীস বর্ণনার হুকুম

মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, জ্ঞাতসারে কোন জাল হাদীস কোন অবস্থাতেই রিওয়ায়াত করা বৈধ নয়, হারাম। তবে লোকদেরকে অবহিত করার জন্য هذا حديث موضوع অর্থাৎ 'হাদীসটি জাল' একথা উল্লেখ পূর্বক রিওয়ায়াত করা যেতে পারে।[২]

---

[১] আল মুওকিযাহ ফি ইলমে মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ৩৬, জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত-এর সৌজন্যে।

[২] কাওয়ায়েদুত তাহদীস জামাল উদ্দীন কাসেমীকৃত পৃ: ১৫০ ও ফতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ: ৬১।

অবশ্য কতিপয় প্রজ্ঞাহীন সূফী ও যাহেদ এবং কারামিয়্যাদের একদল মনে করেন যে, তারগীব ও তারহীবের জন্য অর্থাৎ নেক কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করা এবং মন্দ কাজের ব্যপারে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করার জন্য জাল হাদীস রিওয়ায়াত করা বৈধ। তাদের এহেন ধারণার পিছনে কিছু যুক্তি থাকলেও (যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি) তা সুস্পষ্ট হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন,

من حدّث عنّي بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.

যদি কেউ আমার উদ্ধৃতিতে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করে, যা মিথ্যা বলে সে নিজে জানে তাহলে সে দুই মিথ্যাবাদীর একজন বলে গণ্য হবে।[১] মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের। অতএব যে কোন শুভ উদ্দেশ্য নিয়েও মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না । যেকোন উদ্দেশ্যই নবী সা. এর নামে মিথ্যারোপ করা গুনাহে কবীরা।

জাল হাদীস রচনাকারীদের হুকুম

নবী সা.-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করা যে হারাম ও গুনাহে কাবীরা তা বলতে গেলে সকল মুহাদ্দিসেরই অভিমত। তবে কেউ মিথ্যা হাদীস রচনা করলে তাকে কাফির বলা হবে কি না এ ব্যপারে মনীষীদের মতভিন্নতা রয়েছে।

জমহুরের অভিমত এই যে, কেউ মিথ্যা হাদীস রচনা করলে তাকে কাফির বলা যাবে না। তবে কেউ যদি এহেন কাজকে বৈধ ও হালাল মনে করে তাহলে তাকে কাফির কলে গণ্য করা হবে।[২]

অবশ্য আবু মুহাম্মদ আল্-জুওয়াইনী মনে করেন যে, যারা নবী সা.-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে তারা কাফির এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। তবে জমহুরের অভিমতটিই এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত।

সাধারণ কথা-বার্তায় কেউ মিথ্যা বলে থাকে একথা প্রমাণিত হলে তার রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে সে ব্যক্তি তাওবা করলে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হয়। আবার কেউ যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞাতসারে কোন জাল হাদীস বর্ণনা করে, আর পরে তা জানতে পেরে এহেন ভুলের জন্য তাওবা করে তাহলে তার তাওবাও গ্রহণযোগ্য হয় এবং তার বর্ণিত রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হয়।

---

[১] ফতহুল মুলহিম খ: ১ পৃ: ৬১।

[২] আল-ওয়াযউ ওয়াল ওয়ায্যাউন পৃ: ৩০।

কিন্তু যদি কেউ ইচ্ছা করে নবী কারীম সা.-এর নামে জাল হাদীস রচনা করে কিংবা বর্ণনা করে, তাহলে জমহুরের অভিমত অনুসারে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তার বর্ণিত কোন রিওয়ায়াতও গ্রহণ করা হবে না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আব্দুল্লাহ ইবনূল মুবারক, আল্লামা হুমায়দী, মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল্লাহ আস-সায়রাফী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন, আল্লামা সাম'আনী, খতীব আল-বাগদাদী প্রমূখ মনীষীও এরূপ মতামত পোষণ করেন।[১]

অবশ্য ইমাম নববী মনে করেন যে, কেউ নবী সা.-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনার পরও যদি খাঁটি দিলে তাওবা করে তাহলে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার বর্ণিত রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হবে। কেননা রিওয়ায়াত ও শাহাদাতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আর এব্যপারে সকল আলিমই একমত যে, কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করার পর তার শাহাদাত ও রিওয়ায়াত দুটোই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর অধিকাংশ সাহাবীইতো এমন ছিলেন।[২]

তবে আমাদের মতে জাল হাদীস রচনাকারীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ না করার ব্যপারে জমহুরের অভিমতই যথার্থ; কেননা এটা তার দুনিয়াবী শাস্তি। তবে তাওবার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার উপর ন্যাস্ত করাই শ্রেয়। কারণ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতেও পারেন।

জাল হাদীস চিনার উপায়

১. যদি জালকারী নিজেই স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন : যেমন মাইসারাহ ইবনে আব্দে রাব্বিহী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সূরার ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসগুলো তিনি নিজে বানিয়েছেন।[৩] অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী তারীখুল আওসাতে উল্লেখ করেছেন যে, আমর ইবনে সুবহ্ বলতেন যে, আমি নবী সা.-এর খুতবা সংক্রান্ত হাদীসটি নিজে বানিয়েছি।[৪]

অবশ্য অনেকেই এ প্রশ্ন উথাপন করেছেন যে, যে ব্যক্তি নবী সা.-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করতে পারে, সে যদি কোন হাদীস সম্পর্কে বলে যে, এটি আমি বানিয়েছি, তাহলে তার এই কথায় কতটা বিশ্বাস করা যায় ? কেননা তার একথাটিও মিথ্যা হতে পারে।

বস্তুতঃ তার এই স্বীকারোক্তি হাদীসটি বর্জন করার জন্য যথেষ্ট। তবে বাস্তবে হাদীসটি জাল নাও হতে পারে, কেননা তার বক্তব্যটি মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা

---

১ আল ওয়াযউ ফিল হাদীস ওমর ফালাতাকৃত পৃ: ৩২০-৩২১।

২ তাদরীব -পৃ: ....।

৩ যাহাবীকৃত মীযানুল এ'তেদাল খ: ৪ পৃ: ২৩।

৪ তাদরীব পৃ: ২৩৯।

যেহেতু রয়েছে। তবে হাদীস সহীহ, যয়ীফ বা মওযূ' হওয়ায় এই যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, তা বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে দেওয়া হয়। যদিও মিথ্যাবাদীও সত্য বলতে পারে। আর দূর্বল বর্ণনাকারীও নির্ভূল বর্ণনা উদ্ধৃত করতে পারে। তবে জালকারী যখন নিজেই স্বীকার করেন যে, এটি তিনি জাল করেছেন তখন বাহ্যিকভাবে তিনি সত্য কথাই বলছেন এই প্রত্যয় জন্মে।

২. স্বীকারোক্তির অর্থ বহন করে এমন কোন তথ্য যদি উদ্ঘাটিত হয় : যেমন কোন একজন বর্ণনাকারী তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সূত্রে এমন দুই জন রাবীর নাম উল্লেখ করলেন, যাদের একজন অন্যজন থেকে হাদীস আহরণ করেছেন বলে বাহ্যত বুঝা যায়: যেমন তিনি বললেন : حدثنا عبد الله عن عمرو অর্থাৎ আমাদেরকে আব্দুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর থেকে হাদীস আহরণ করেছেন। পরে তাকে জিজ্ঞাস করা হল যে, কোন আব্দুল্লাহ, তিনি কোন সালে জন্মগ্রহণ করে? তখন তিনি বললেন যে, ঐ আব্দুল্লাহ যিনি ১১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরে অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, আব্দুল্লাহ যে আমর থেকে হাদীস আহরণ করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন তিনি ১০৫ সালে মৃত্যু বরণ করেছেন। আর এই হাদীসটি উক্ত বর্ণনাকারী ছাড়া আর কারো কাছ থেকে বর্ণিত নেই। যদিও উক্ত বর্ণনাকারী হাদীসটি জাল করার কথা স্বীকার করছেন না, কিন্তু তার উস্তাদের জন্ম তারিখ সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি ও বাস্তব অবস্থা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে হাদীসটি জাল। কেননা তিনি আব্দুল্লার যে উস্তাদের কথা উল্লেখ করেছেন তার সাথে আব্দুল্লার দেখাই হয়নি। আর তাকে ছাড়া অন্য কারো সূত্রে তা বর্ণিত নেই। সুতরাং তিনি স্বীকার না করলেও উস্তাদের জন্ম তারিখ সম্পর্কে তার বক্তব্য ও অনুসাঙ্গিক অবস্থা বলছে যে, হাদীসটি জাল।

৩. কিংবা বর্ণনাকারীর মাঝে যদি এমন কোন ইশারা-ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকে যাদ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীসটি জাল : যেমন বর্ণনাকারী একজন রাফেযী। আর তিনি যে হাদীসটি বর্ণনা করছেন তাতে নবী পরিবারের ফযীলত সংক্রান্ত বাড়াবাড়ি মূলক বর্ণনা রয়েছে। কারণ রাফেযীরা নবী পরিবারের ফযীলত বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করে থাকে।

৪. কিংবা বর্ণিত হাদীসটিতেই এমন কোন ইশারা-ইঙ্গিত থাকতে পারে যাদ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীসটি জাল। যেমন :

ক. যদি হাদীসের শব্দ বিন্যাস কিংবা বাক্য গঠনে এমন কোন দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়- যা রাসূল সা. থেকে হতে পারে না। তাহলে এটিও হাদীস জাল হওয়ার প্রমাণ বহন করে ।

তবে ইবনে হজর মনে করেন যে, বস্তুতঃ শব্দ বিন্যাস ও বাক্য গঠনে দুর্বলতা যদি ভাবার্থের দুর্বলতাকে অপরিহার্য না করে, তাহলে তা সব সময় হাদীস জাল হওয়ার প্রমাণ বহন করেনা। কেননা হতে পারে বর্ণনাকারী হাদীসটির ভাব নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

তবে এক্ষেত্রে দুর্বলতার মূল ভিত্তি হল অর্থগত দুর্বলতা। যদি হাদীসে শব্দগত কোন দুর্বলতা নাও থাকে; কিন্তু যদি অর্থগত দিক থেকে এমন কোন দুর্বলতা পাওয়া যায় যা দ্বীনি মূল্যবোধকে বিপন্ন করে, তাহলে তা মওযূ' বা জাল হওয়ার প্রমাণ হবে। কেননা দ্বীনে এরূপ কোন দুর্বলতা থাকতে পারে না।[১]

খ. খতীব বাগদাদী আবু বকর ইবনুত তায়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হাদীস মওযূ' হওয়ার দলীল সমূহের মাঝে অন্যতম দলীল হল, তা এমন বিবেক বিরুদ্ধ হওয়া, যাকে কোনভাবেই বিবেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি এর সাথে আরো কিছু বিষয়কে সংশ্লিষ্ট করেছেন। যেমনঃ যদি মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সুস্থ্য অনুভতির পরিপন্থী হয়, যদি তা কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী হয়, কিংবা মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত দ্বারা যা প্রমাণিত তার পরিপন্থী হয় কিংবা সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মত ইজমার পরিপন্থী হয় তাহলে এগুলোও উক্ত হাদীসটি জাল হওয়ার প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে। তাই বলা হয়ে থাকে -

اذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع –

যখন দেখবে যে, কোন হাদীস বিবেকের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, কিংবা কুরআন সুন্নার সুস্পষ্ট বিধানের সাথে বৈপরিত্য পূর্ণ, কিংবা দ্বীনের স্বীকৃত নীতিমালার পরিপন্থী তখনই বুঝবে যে সেটা মওযূ' বা জাল।[২]

গ. যদি হাদীসটি এমন বিষয়ে হয় যা সর্বজন সংশ্লিষ্ট বা বহুজন সংশ্লিষ্ট; অথচ তা বর্ণনা করছেন একজন মাত্র ব্যক্তি, তাহলে এটিও হাদীস মওযূ' হওয়ার দলীল।

ঘ. সাধারণ কোন আমলের জন্য বিরাট সাওয়াবের প্রতিশ্রুতি, কিংবা ছোট কোন গোনাহের জন্য বিরাট শাস্তির উল্লেখ থাকলে এটিও হাদীসটি জাল হওয়ার প্রমাণ।

হাদীসে সন্নিহীত ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা হাদীসটি জাল হওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত রূহানি শক্তি ও আত্মশক্তির প্রয়োজন। মুহাদ্দিসগণকে আল্লাহ তা'আলা

---

[১] তাদরীব পৃ: ২৪০ এর ভাবাবলম্বনে।

[২] তাদরীব পৃ: ২৪০

হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্টতা ও হাদীসের খিদমাতে আত্মনিবেদিত থাকার কারণে এরূপ আত্মশক্তি দান করেন যে, তারা দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারেন যে, হাদীসটি জাল কি জাল নয়।

আল্লামা রবী' ইবনে খুছায়ম বলেন :

ان للحديث ضوءً كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره

দিবসের আলোকচ্ছটার ন্যায় হাদীসেরও এক ধরণের দ্যূতি থাকে যা দেখেই তুমি বুঝতে পারবে। আবার রাতের অন্ধকারের ন্যায় তাতে অন্ধকার থাকে যা দেখেই ওটা যে হাদীস নয়, তা তুমি বুঝতে পারবে।

আল্লামা ইবনূল জাওযী বলেছেন যে,

الحديث المنكر يقشعرّ له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب

মুনকার কোন হাদীস পাঠ করা মাত্রই সাধারণত ছাত্রের দেহের ত্বক কাটা দিয়ে উঠে। এবং তার অন্তর হাদীসটির প্রতি বিরূপভাবাপন্ন হয়ে যায়।

আল্লামা বুলকিনী বিষয়টির একটি বোধগম্য উপমা দিয়েছেন যে, এর উপমা হল এরূপ যে, যদি কোন লোক বহু বৎসর একজনের সেবা করে, তাহলে সে অবশ্যই জেনে যাবে যে, সে ব্যক্তি কি কি পসন্দ করে, আর কি কি পসন্দ করে না। পরে যদি কোন লোক তার সামনে বর্ণনা করে যে, উক্ত ব্যক্তি অমূক বস্তুটি পসন্দ করত না, অথচ খাদেম জানে যে তিনি ঐ বস্তুটি পসন্দ করতেন। তাহলে শুনা মাত্রই সে বুঝতে পারবে যে, ঐ লোক মিথ্যা বলছে।

অনুরূপ হাদীসের ইলমের সাথে দীর্ঘ সংস্রব ও ঘাটাঘাটির কারণে এ বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরাও শুনা মাত্রই বুঝতে পারেন যে, এটি রাসূল সা. এর হাদীস কি না ?

হাদীসটি জাল একথা বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণ যেসব শব্দ ব্যবহার করেন :

সাধারণত মুহাদ্দিসগণ 'হাদীসটি জাল' একথা বুঝানোর জন্য দুই ধরণের শব্দ ব্যবহার করেন। যথা:

১. **الصريح বা সুস্পষ্ট শব্দ।**

২. **الكناية বা ইঙ্গিত সূচক শব্দ।**

১. সুস্পষ্ট শব্দ বা الصريح বলতে এমন শব্দকে বুঝানো হয়ে থাকে যাদ্বারা হাদীসটি জাল, ভিত্তিহীন, মনগড়া ও বানানো- এই অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়। যেমন -

هذا حديث موضوع، هذا حديث لا اصل له، أو باطل لا اصل له، أو ليس له اصل، أو لم يوجد له اصل، لم اجد له اصلا، أو لم أقف له على اصل ولا يعرف له اصل، أو لم اعرف

له اصلا، أو لا اصل له بهذ اللفظ، وليس له اصل مرفوع، أو لا اصل له مرفوعاً، اوكذب لا اصل له.

কোন হাদীস সম্পর্কে যখন কোন হাফেজে হাদীস উপরোক্তরূপ মন্তব্য করেন, আর অন্য কোন ইমামে হাদীসের এ ব্যপারে যদি কোন ভিন্ন মত না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, হাদীসটি নিশ্চিতভাবেই জাল।[১]

২. কিনায়া বা ইঙ্গিতসূচক শব্দ বলতে এমন শব্দকে বুঝানো হয় যাদ্বারা হাদীসটি জাল এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন ধরণের শব্দ ব্যবহার করে এধরণের ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন। যেমন কখনো তারা বলেন -

لا يصحّ، لم يصحّ، لا يصحّ من وجه، لا يصحّ فيه شيئ، لا يصحّ حديثا، لا يصحّ مرفوعا، لا يصحّ رفعه،

কোন হাদীস সম্পর্কে উপরোক্ত ধরণের মন্তব্য যদি যয়ীফ বা জাল হাদীসের উপর রচিত গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় তাহলে তাদ্বারা হাদীসটির জাল বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি এধরণের মন্তব্য কোন আহকামের গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে যে হাদীসটি পারিভাষিক অর্থে সহীহ নয়।[২]

আবার কখনো বলেন -

لا يثبت، لا يثبت أصلا، لا يثبت فيه شئ، لم يثبت فيه شئ، ليس بثابت، غير ثابت، لا يثبت بهذا اللفظ –

আবার কখনো বলেন -

لاعرفه، لاعرفه مرفوعاً، لاعرفه بهذاللفظ، لايعرف، لايعرف بهذا اللفظ، ولايعرف له اسناد مرفوع، لم يعرف في كتب الحديث –

আবার কখনো বলেন - لم اجد، لم اجده هكذا ، لم اجده مرفوعاً، لم يوجد، لم اقف عليه

আবার কখনো বলেন - لا يعلم من اخرجه، ولا اعلم فيه شيأ، ولا اعلمه بهذا اللفظ

আবার কখনো বলেন - لم يرد فيه شيئ، ليس في شئ من المستندات

আবার কখনো বলেন - هذا حديث منكر، أو منكر جداً، أو منكر باطل، أو باطل منكر

---

[১] আল মসনূ' ফী মা'রিফাতি আহাদীসিল মওযূ' মুল্লা আলী কারীকৃত: পৃ: ২৫।

[২] আল মাসনূ' ফি মা'রিফাতিল আহাদীসিল মওযূ' মুল্লা আলী কারীকৃত পৃ: ৪০ এবং আল ওয়াযউ ওয়াল ওয়াযযাউন ড.

আবু বকরকৃত।

জাল হাদীসের উপর রচিত গ্রন্থবলী :

১. কিতাবুল মওযূ‘আত : ইবনুল জাওযীকৃত।

২. আল-লা‘আলিল মাসনূআহ্ ফিল আহাদীসিল মওযূ‘আহ- সুয়ূতীকৃত ইবনূল জাওযীর গ্রন্থের সংক্ষেপ।

৩. তানযীহুশ শরী‘আতিল মারফূআহ আনিল আহাদীসিশ শানিআতিল মারফূআহ ইবনুল আররাক আল-কিনানীকৃত।

৪. আল-আবাতিল -আল্লামা যূরকানীকৃত।

৫. আল-মাওযূ‘আতুল কুবরা : মুল্লা আলী কারীকৃত ।

৬. আল-মাসনু‘ ফী মা‘রিফাতিল হাদীসিল মাওযূ‘ মুল্লা আলী কারীকৃত।

৭. আল ওয়াযউ ওয়াল ওয়াযযাউন : ড. আবু বকরকৃত।

৮. আল ওয়াযউ ফিল হাদীস : উমর ফালাতাকৃত।

একাদশতম অধ্যায়
রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের মূলনীতি
(اصول الجرح والتعديل)

আভিধানিক অর্থ

جرح শব্দটি মূলত باب فتح এর ক্রিয়াধাতু। এর অর্থ হল কাউকে আহত করা, আক্রমণ করা, কারো সমালোচনা করা, কারো ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করা। যেমন বলা হয়ে থাকে جرح عليه فلان ফলানা তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছে। আর تعديل শব্দটি باب تفعيل এর ক্রিয়াধাতু। এর অর্থ হল সুশৃঙ্খল করা, কারো ব্যাপারে বিশ্বস্ত হওয়ার মতামত ব্যক্ত করা, কোন বিষয় যথার্থ হওয়ার সার্টিফাই করা। সুতরাং فن جرح وتعديل এর অর্থ হল এমন বিষয় যাতে রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়। সংক্ষেপে একে 'রাবীদের যাচাই-বাছাই' সংক্রান্ত বিষয়ও বলা যায়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

هو علم يبحثُ فيه عن أحوالِ الرُّواةِ من أمانتِهم وثقتِهم وعدالتِهم وضبطِهم أوعكس ذالك، من كذبٍ أو فسقٍ أو غفلةٍ أو نسيانٍ وغيرِ ذلك من العيوبِ القادحةِ في الصِّحَّة –

এটি এমন এক বিষয় যাতে রাবীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন তাদের আমানতদারী, নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও স্মৃতির প্রখরতা ইত্যাদি; কিংবা এর বিপরীত অবস্থা যেমন হাদীসে রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়া বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, অসতর্ক হওয়া ও ভুল-ভ্রান্তি বেশী হওয়া ইত্যাদি বিষয় যা হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে।

হাদীস সহীহ বা যয়ীফ হওয়ার ক্ষেত্রে রাবীদের নির্ভরযোগ্য হওয়া না হওয়ার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার বিষয়টি মূলত রাবীদের উপরই ভিত্তিশীল। একারণেই রাবীদের যাচাই-বাছাই ও তাদের সম্পর্কে মন্তব্যের বিষয়টি বলতে গেলে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই শুরু হয়। আমরা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করে এসেছি যে, সাহাবায়ে কিরামের মাঝে

ব্যক্তিচরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপারে যারা অধিক পারদর্শী ছিলেন তাদের মাঝে হযরত উমর রা. আলী রা. ইবনে আব্বাস রা., আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা., উবাদাহ ইবনুস সামেত রা., আনাস রা., আয়শা রা. এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাবেয়ীনদের মাঝে এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন শা'বী রহ., ইবনে সীরিন রহ. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহ., ইবনে জুবায়ের রহ., আ'মাশ রহ., শু'বা রহ. প্রমূখ। পরবর্তী কালে এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, ইবনুল মুবারক ও ইয়াহ্ইয়াহ ইবনে সাঈদ আল কাত্তান। তাদের পরবর্তী যুগে এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন আবু দাউদ তায়ালসী, আব্দুর রায্যাক প্রমুখ।

এর পরবর্তীকালে যারা এ বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেছেন তাদের মাঝে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আহমদ ইবনে হাম্বল, আলী ইবনুল মাদিনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের অনুসরণে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবু যুর'আহ, আবু হাতেম প্রমুখ মনীষী গ্রন্থাদি রচনা করেন। পরবর্তীকালে রাবীদের ব্যক্তিচরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। তবে এই বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সকলেই এক নীতি অনুসরণ করে চলেননি। কেউ এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের ছিলেন। যেমন- আবু হাতেম, নাসাঈ, ইবনে মাঈন, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, আবুল হাসান আল-কাত্তান, ইবনে হযম, ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল জাওযী, যুয্কানী প্রমুখ।

আবার অনেকেই এ বিষয়ে যথেষ্ট শিথিল ছিলেন। যেমন হাকেম আবু আব্দুল্লাহ, ইবনে হিব্বান, জালাল উদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখ।

আবার অনেকেই মন্তবের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ ছিলেন। যেমন আল্লামা যাহাবী, ইবনে হজর, হাফেয ইরাকী, হাফেয যাইলাঈ প্রমুখ।

একারণেই একই ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের মতামতে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেকেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও আক্রোশের বশবর্তী হয়েও মন্তব্য করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে আক্বীদা বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণেও কারো কারো মন্তব্য পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে।

রাবীদের দোষ-ত্রুটির আলোচনা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়

এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই হয় যে, ব্যক্তি বিশেষের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা গীবতের পর্যায়ে পড়ে- যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় রাবীদের ব্যক্তিচরিত্র নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার যে দ্বার উম্মুক্ত করা হয়েছে তা কি করে বৈধ হবে?

ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর মুকাদ্দামায় এ প্রশ্নের দীর্ঘ জবাব দিয়েছেন। তার বক্তব্যের সার সংক্ষেপ এই যে, "কতিপয় স্বঘোষিত মুহাদ্দিসকে যখন দেখলাম যে, তারা জেনে-শুনে মুনকার হাদীস জনগণের কাছে বর্ণনা করে এবং যাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করাকে আইম্মায়ে হাদীস যথা; মালেক ইবনে আনাস, শো'বা, সুফয়ান ইবনে উয়ায়না, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নিন্দনীয় বলে মনে করেন, তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করে। তখন আমার জন্য সহীহ ও যয়ীফের মাঝে পার্থক্য সূচিত করার এ দায়িত্ব পালন সহজসাধ্য মনে হল"।[১]

বস্তুতঃ রাসূল সা. এর হাদীসগুলো হল ইসলামী শরীয়তের অন্যতম প্রামাণিক ভিত্তি। এর মাধ্যমে হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ, করণীয়-বর্জনীয় ইত্যাদি বিষয় সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা উম্মতের দায়িত্ব। কেননা এগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপের জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। মহান আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে নহলে ইরশাদ করেছেন-

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ○ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

তোমাদের যবান থেকে যে মিথ্যা উদ্গত হয়, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপের জন্য সে ক্ষেত্রে এরূপ বলোনা যে, এটা হলাল ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে তারা সফলকাম হয় না। এ সুখ-ভোগতো সামান্যক্ষণের, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[২]

তাছাড়া রাসূল সা. নিজেই ইরশাদ করেছেন- من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار
যে ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।[৩]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন- من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو احد الكاذبين
যদি কেউ আমাথেকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করে যে, যাচাই-বাছাইয়ের পর দেখা গেল তা মিথ্যা, তাহলে সেও মিথ্যাবাদীদের একজন।[৪]

সুতরাং বর্ণিত হাদীসটি যে প্রকৃতই রাসূল সা. এর হাদীস তা যাচাই করার পরই তা বর্ণনা করতে হবে। একটি হাদীস প্রকৃত পক্ষে নির্ভুল হাদীস কিনা তা নির্ভর

---

[১] মুকাদ্দামায়ে মুসলিম।
[২] সূরা: ১৬ নাহাল: ১১৬-১১৭।
[৩] মুকাদ্দামায়ে মুসলিম।
[৪] মুকাদ্দামায়ে মুসলিম।

করে বর্ণনাসূত্রের রাবীদের বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ও তাদের স্মৃতির প্রখরতার উপর। সুতরাং বলা যায় যে, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য কি না তা নির্ভর করে সনদের রাবীদের উপর। অতএব হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে সনদই হল মূলভিত্তি। একারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলতেন- الاسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

সনদগুলো দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। কেননা সনদের সাথে উপস্থাপনের প্রশ্ন না হলে যার যা ইচ্ছা তাই বলত।[১]

যেহেতু হাদীসসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা উম্মতের দায়িত্ব; অতএব সনদের রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে কেবলমাত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্তদের থেকে হাদীস আহরণ করাও উম্মতের দায়িত্ব। ইবনে সীরিন তাই বলেছেন- إنّ هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم

এই ইলম অর্থাৎ ইলমে হাদীস হল দ্বীনের ভিত্তি, সুতরাং কার কাছ থেকে তা আহরণ করছ তা ভাল করে খতিয়ে দেখে নিও।[২]

তিনি আরো বলেন-

لم يكونوا يسئلون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.

পূর্ববর্তীরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন না। কিন্তু যখন ফিতনা শুরু হল, তখন আহরণকারী মুহাদ্দিসগণ বলতেন, সূত্রের ব্যক্তিবর্গের নাম-পরিচয় উল্লেখ করুন। যদি দেখা যেত; বর্ণনাকারীগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী, তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হত। আর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারীগণ বিদ'আতের অনুসারী, তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হত না।[৩]

সনদের রাবীদের বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা নিরূপণের জন্য তাদের এমন কোন ত্রুটি যদি থাকে যা তাদের বিশ্বস্ততাকে ক্ষুন্ন করে, তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তা না হলে বিষয়টি বোধগম্য হবে কি করে? দ্বীনের হিফাযতের প্রয়োজনেই এবং হাদীসসমূহ যথাযথ সংরক্ষণের তাকিদেই তাদের সমালোচনা অতীব প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা নাহলে হাদীসগুলো নির্ভুল

---

[১] মুকাদ্দামায়ে মুসলিম।

[২] মুকাদ্দামায়ে মুসলিম।

[৩] মুকাদ্দামায়ে মুসলিম।

ও বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। একারণেই তা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইমাম গাজালী এহ্ইয়ায়ে উলূমিদ দ্বীন গ্রন্থের 'আফাতুল লিসান' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন-

ان غيبة الرجل حيا وميتا تباح لغرض شرعيّ لا يمكن الوصول اليه الابها، هو ستة. والرابع منها تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم ... ومنه جرح الشهود عند القاضي وجرح رواة الحديث، هو جائز بالإجماع بل واجب للحاجة، ومنه ما اذا رأي متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف ان يتضرر المتفقه بذالك، فنصحته ببيان حاله جائز بشرط ان يقصد النصح، ولا يحمله علي ذالك الحسد والاحتقار-

কোন শরয়ী প্রয়োজনে জীবন্ত বা মৃত কোন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ হবে যদি তার গীবত না করে উদ্দেশ্য সফল না হয়। এ ধরণের কারণ মোট ছয়টি। এর মাঝে ৪র্থ কারণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মু'মিনদের কল্যাণ কামনা এবং তাদেরকে অনিষ্ট থেকে সতর্ক করার জন্য কারো গীবত করা বৈধ হবে। .. এর একটি দিক হল বিচারকের নিকট সাক্ষীর দোষ-ত্রুটি থাকলে তা উল্লেখ করা, কিংবা হাদীসের রাবীদের কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা উল্লেখ করা। এটা সর্বসম্মতভাবেই জায়েয বরং প্রয়োজনে এরূপ দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা ওয়াজিব ও একান্ত অপরিহার্য। এর একটি দিক এও যে, যদি কোন গবেষককে কোন বিদ'আতী কিংবা ফাসেকের কাছ থেকে হাদীস আহরণের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্থ দেখা যায়, আর সেই ব্যক্তি থেকে হাদীস আহরণ করে গবেষক ক্ষতিগ্রস্থ হবেন বলে মনে করা হয়; এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে যদি ঐ গবেষকের কল্যাণ কামনা করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই বৈধ হবে। তবে শর্ত এই যে, কল্যাণ কামনার মানসিকতা নিয়েই কাজটি করতে হবে, কারো প্রতি বিদ্বেষী হয়ে কিংবা কাউকে হেয় করার মানসে তা করা যাবেনা।[১]

বস্তুত কোন রাবীকে হেয় করার উদ্দেশ্য না হলে রাবীদের এধরণের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

হাসান ইবনে আলী আল-ইস্কাফী বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে গীবত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম; তিনি বললেন : إذا لم تُرد عيبَ الرجل যদি তুমি কারো দোষ বর্ণনার উদ্দেশ্যে কিছু না বল তাহলে তা গীবত হবে না। আমি বললাম লোকেরা যে বলে, অমুক অমুক থেকে হাদীস শ্রবণ করেনি, অমুক হাদীস

---

১ এহইয়াউ উলূমিদ দ্বীন খ: ৯, পৃ: ৬৫।

বর্ণনায় ভুল বেশী করে- এগুলো কোন পর্যায়ে পড়বে? তিনি বললেন : لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره এগুলো বর্ণনা না করলে তো কোনটা সহীহ কোনটা সহীহ নয় তা চেনাই যাবে না।[১]

ইমাম মুসলিম পূর্ববর্তী মনীষীদের হাদীসের রাবীদের ব্যাপারে সমালোচনা সম্বলিত প্রায় ৫১টি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করার পর উল্লেখ করেছেন -

انما الزموا انفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الاخبار، وافتوا بذالك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخظ، اذ الاخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ... كان آثمًا بفعله ذلك، غاشيًا لعوامّ المسلمين.

বস্তুত এই সব মনীষীগণ রাবীদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করার বিষয়টিকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাস করা হলে তারা তাদের মতামত নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন; কেননা এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ এসকল রিওয়ায়াত দ্বারা মূলত হালাল হারাম ও করণীয় বর্জনীয় বিষয় ব্যক্ত হয়ে থাকে কিংবা এ দ্বারা কোন কাজের উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে কিংবা কোন বিষয়ে সতর্ক করা হয়ে থাকে। সুতরাং যদি হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সত্যবাদী বিশ্বস্ত না হয়, আর জেনে শুনে এধরণের ব্যক্তি থেকে হাদীস আহরণ করা হয়, কিন্তু তার দোষ-ত্রুটিগুলো উল্লেখ না করা হয়, তাহলে সে ব্যক্তি এহেন কাজের কারণে গুনাহগার সাব্যস্ত হবে এবং সাধারণ মুসলমানদের সাথে প্রতারণাকারী বলে গণ্য হবে।[২]

একবার ইমাম আহমদ রহ. জনৈক যয়ীফ রাবীর সমালোচনা করলেন। তখন তাকে বলা হল يا شيخ لاتغتب العلماء হে শায়খ! আলেম উলামাদের গীবত করবেন না। উত্তরে ইমাম আহমদ বললেন : ويحك هذا نصيحة وليس هذا غيبة আরে আহমক, এটা গীবত নয় বরং এটা (উম্মতের জন্য) কল্যাণ কামনা।[৩]

একবার ইবনুল মুবারক জনৈক যয়ীফ রাবীর সমালোচনা করলেন। তখন তাকে বলা হল যে, আপনি গীবত করছেন ? উত্তরে তিনি বললেন -

---

১ টীকা আর-রাফউ ওয়াত্-তাকমীল পৃ: ৫৪।

২ মুকাদ্দামায়ে মুসলিম।

৩ তাবাকাতুল হানাবেলা খ: ১ পৃ: ২৪৮-২৪৯ আর-রফউ ওয়াত্-তাকমীলের ৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত টীকার সৌজন্যে।

أسكت، اذا لم نبيّن فمن أين يعرف الحقّ من الباطل؟

চুপ কর, আমরা যদি রাবীদের দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ না করি তাহলে হক বাতিলের মাঝে পার্থক্য কিভাবে করা হবে।[১]

ইমাম তিরমিযী তার কিতাবুল ইলালের শুরুর দিকে উল্লেখ করেছেন -

إنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك – عندنا – والله أعلم، النصيحة للمسلمين، ولا يظنّ بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس، والغيبة.

বস্তুতঃ মুহাদ্দেসীন রিজালে হাদীস তথা রাবীদের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন এবং তাদেরকে যয়ীফ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। আমাদের ধারণা মতে (আল্লাহই ভাল জানেন) মুসলমানদের কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যেই তাঁরা এহেন কাজে উদ্যোগী হয়েছেন। তাদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা করা যায় না যে, তারা কোন লোককে কটাক্ষ করা কিংবা কারো গীবত করার উদ্দেশ্যে এহেন কাজ করেছেন।[২]

অনুরূপভাবে রাবীদের দোষত্রুটির উপর গ্রন্থ রচনা করা- যাতে হাদীসের ছাত্ররা তাদ্বারা উপকৃত হতে পারে, তাও বৈধ হবে।[৩]

جرح و تعديل বা রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করার মূলনীতি

পূর্বের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দ্বীনের হিফাযত ও হাদীসগুলোর যথাযথ সংরক্ষণের প্রয়োজনে রাবীদের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করা বৈধ হলেও তা নি:শর্তভাবে নয়। বরং কতিপয় শর্তসাপেক্ষে রাবীদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা বৈধ হবে। বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। কেননা এখানে একদিকে যেমন ব্যক্তির হকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনি আল্লাহর হকের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

আর-রাফউ ওয়াত্-তাকমীলের টীকায় আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. আল্লামা কারাফী রচিত 'আল-ফুরুক' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক শর্ত রয়েছে। যথা-

احدها: ان تكون النية فيه خالصة لله تعالى في نصيحة المسلمين في ضبط شرائعهم وأمّا متى كان لأجل العداوة أو تفكه بالأعراض أو جريان مع الهوى فذالك حرام،

---

[১] তারতীবুল মাদারেক খ: ৩ পৃ: ৫১ আর-রফউ ওয়াত্-তাকমীলের ৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত টীকার সৌজন্যে।

[২] কিতাবুল ইলাল ইমাম তিরমিযীকৃত পৃ: .....

[৩] টীকা আর-রফউ ওয়াত্-তাকমীল পৃষ্ঠা ৫৫ দ্রষ্টব্য।

والثاني : الاقتصار على القوادح المخلّة بالرواية، فلا يقول هو إبن زنا، ولا أبوه لاعن امه، إلى غير ذالك من المؤلمات التي لا تعلق لها بالرواية.

১. এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়্যত পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে যে, কেবলমাত্র মুসলমানদের কল্যাণকামনা ও শরীয়তের হিফাযতের উদ্দেশ্যেই এটি করা হচ্ছে। কিন্তু যদি শক্রতাবশতঃ কিংবা কারো সম্মান লাঘবের উদ্দেশ্যে ঠাট্টাচ্ছলে কিংবা প্রবৃত্তির তাড়নায় এরূপ করা হয় তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম হবে।

২. রিওয়ায়াতের শুদ্ধাশুদ্ধির সাথে যেসব দোষ-ত্রুটির সম্পর্ক রয়েছে, কেবল সে ধরণের দোষ-ত্রুটির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। সুতরাং 'সে জারয সন্তান', 'তার পিতা তার মায়ের চরিত্রে দোষারোপ করে লি'আন করেছিল' ইত্যাদি ধরণের কোন দোষ যা পীড়াদায়ক কষ্টদায়ক তবে রিওয়ায়াতের শুদ্ধাশুদ্ধির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই ,সে ধরণের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করা যাবে না।[১]

৩. আল্লামা সাখাভী الاعلان التوبيخ لمن ذم أهل التوريخ এ উল্লেখ করেছেন যে, যদি অস্পষ্ট ইশারার মাধ্যমে কারো দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করার দ্বারা কিংবা সামান্য সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে বেশী বর্ণনা করা বৈধ হবে না। কেননা বিশেষ প্রয়োজনেই বিষয়টি বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং উদ্দেশ্য অর্জন পরিমাণের চেয়ে বাড়িয়ে বলা যাবে না। ইমাম মুযানী বলেন যে, একবার ইমাম শাফেয়ী রহ. আমাকে বলতে শুনলেন যে, فلان كذاب এ শুনে তিনি বললেন, হে ইব্রাহীম! তোমার শব্দকে সংযত কর এবং সুন্দর করে বল। কারো সম্পর্কে (كذاب) মিথ্যাবাদী বলো না, বরং বলো যে, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়।[২]

৪. আল্লামা সাখাভী ফতহুল মুগীসে উল্লেখ করেছেন,' لايجوز التجريح بشيئين اذا حصل بواحد যদি এক বিষয়ের সমালোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যায় তাহলে একাধিক বিষয়ের সমালোচনা বৈধ নয়।[৩]

যারা রাবীদের দোষ-ত্রুটি সনাক্ত করবেন তাদের জন্য শর্তসমূহ:

যিনি রাবীদের দোষ-ত্রুটি সনাক্ত করবেন তার জন্যও কিছু শর্ত-শারায়েত রয়েছে। যথা:

---

[১] আল-ফুরুক খ: ৪ পৃ: ২০৬, টীকা আর্-রফউ ওয়াত্-তাকমীল পৃ: ৫৫ এর সৌজন্যে।

[২] আল-ই'লান বিত্-তাওরিখ পৃ: ৬৮-৬৯, আর-রফউ ওয়াত্-তাকমীল পৃষ্ঠা: ৫৭ এর টীকার সৌজন্যে।

[৩] আর-রফউ ওয়াত্-তাকমীল পৃষ্ঠা: ৫৭।

১. আব্দুল হাই লাখনোভী রাহ. উল্লেখ করেছেন যে-

يشترط في الجارح والمعدل العلم، والتقوى، والورع، والصدق، والتجنب عن التعصب، ومعرفة اسباب الجرح والتزكية . ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح والتزكية.

যিনি রাবীদের ব্যাপারে জরাহ ও তা'দীল করবেন তাকে অবশ্যই ইলম, তাকওয়া ও পরহেযগারী ও সত্যবাদীতার গুণে অভিসিক্ত হতে হবে এবং গোড়ামীর অভিযোগ থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে, তদুপরি জরাহ ও তা'দীলের বিষয়ে প্রাজ্ঞ হতে হবে। যিনি এহেন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন না তার জরাহ তা'দীল গ্রহণযোগ্য হবে না।[১]

২. আল্লামা যাহাবী আল-মুওকেযাহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে-

والكلام في الرُّواة يحتاج إلى ورع تامّ وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله

রাবীদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে হলে পূর্ণপরহেযগারী থাকতে হবে, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও কোন বিশেষ মতাদর্শের প্রতি অধিক টানের অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকতে হবেঃ হাদীস সম্পর্কে, হাদীসের ইল্লত এবং রিজালে হাদীস সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি থাকতে হবে।[২]

৩. বাহরুল উলূম মাও. আব্দুল আলী ইবনে মুল্লা নিযামুদ্দীন লাখনোভী (মৃঃ ১২২৫হিঃ) মুসাল্লামুস সুবূত-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ فواتح الرحموت নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে-

ولابد لمزكي أن يكون عدلا عارفًا بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون منصفا ناصحا، لا ان يكون متعصبا ومعجبا بنفسه، فانه لا اعتدادَ بقول المتعصبِ كما قدح الدارقطني في الإمام الهمام أبي حنيفة رح بأنه ضعيف في الحديث-

যিনি রাবীদের জরাহ তা'দীল করবেন তাকে অবশ্যই বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। জরাহ ও তা'দীলের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে হবে, তাকে ন্যায়নিষ্ঠ, ইনসাফগার ও কল্যাণকামী হতে হবে। তাকে অবশ্যই গোড়ামীর অভিযোগ মুক্ত হতে হবে। এবং নিজের প্রতি অতিসুধারণা পোষণকারী না হতে হবে। কেননা গোড়ামীর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্যের কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। যেমন দারাকুতনী ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ন্যায়

---

১ আর-রফউ ওয়াত্-তাকমীল পৃষ্ঠাঃ ৫৭।

২ টীকা আর রফউ ওয়াত্-তাকমীল পৃঃ ৬৮ দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যয়ীফ ছিলেন।[১]

এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আব্দুল হাই লাখনোভী রহ. বলেন -

الحاصل انه إذا علم بقرائن المقالية أوالحالية أن الجارح طعن على أحد بسبب تعصب منه عليه لا يقبل منه ذلك الجرح، وإن علم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر، ارتفع الأمان عن جرحه وعدّ من أصحاب القرح .

যদি বাক্যের ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা কিংবা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বুঝা যায় যে, মন্তব্যকারী কোন গোড়ামীর কারণে কারো উপর মন্তব্য করেছেন, তাহলে তার এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কিংবা যদি জানা যায় যে, উক্ত মন্তব্যকারী আকাবিরদের কোন জামাতের ব্যাপারে গোড়ামীর মানসিকতা পোষণ করেন, তাহলে তার মন্তব্যের ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায় না বরং সে নিজেই সমালোচিত বলে গণ্য হয়। তাছাড়া কেউ যদি আকাবিরদেরকে গালি-গালাজ করে তাহলে তার কাছ থেকে হাদীসই গ্রহণ করা হয় না।[২]

ইবনুল মুবারক প্রকাশ্য জনসমাবেশে বলতেন-

دعوا حديث عمرو بن ثابت فانه كان يسبّ السلف.

আমর ইবনে সাবেতের কাছ থেকে হাদীস আহরণ করো না। কেননা সে সলফকে গালি দেয়।[৩]

উপরোক্ত বক্তব্যগুলোকে সমন্বিত করলে জরাহ্ তা'দীলের জন্য যেসব বিষয় অপরিহার্য বলে গণ্য হয় তা নিম্নরূপ :

১. যিনি রাবীদের দোষ-ক্রটি নিয়ে পর্যালোচনা ও মন্তব্য করবেন তাকে অবশ্যই প্রাজ্ঞ আলেম, বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।
২. তাকে অবশ্যই সত্যবাদী, মুত্তাকী ও পরহেযগার হতে হবে।
৩. জরাহ ও তা'দীলের ভিত্তিগুলো কি কি সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। ইলালে হাদীস ও রিজালে হাদীস সম্পর্কে পাণ্ডিত্য থাকতে হবে।
৪. প্রবৃত্তির অনুসারী এবং বিশেষ মতাদর্শের প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত না হতে হবে এবং গোড়ামীর অভিযোগমুক্ত হতে হবে।

---

[১] আর-রফউ ওয়াত্-তাকমীল পৃষ্ঠা: ৭০-৭১।
[২] আর-রফউ ওয়াত্-তাকমীল পৃষ্ঠা: ৭৮।
[৩] মুকাদ্দামায়ে মুসলিম।

৫. আল্লাহর সন্তুষ্টির মানসে ইখলাসের সঙ্গে শুধুমাত্র দ্বীনের সংরক্ষণের দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম উম্মার কল্যাণ কামনার চেতনায় একাজ করতে হবে।
৬. কারো প্রতি বিদ্বেষ বা আক্রোশ নিয়ে কিংবা কাউকে হেয় লাঞ্ছিত করার মানসিকতা নিয়ে কিংবা প্রবৃত্তির তাড়নায় কারো সমালোচনা করার মানসে একাজ করা যাবে না।
৭. রিওয়ায়াতের শুদ্ধাশুদ্ধির সম্পর্ক যেসব দোষ-ত্রুটির সাথে সংশ্লিষ্ট কেবল সেগুলোই উল্লেখ করা যাবে, অন্য দোষ-ত্রুটির অহেতুক উল্লেখ করা যাবে না।
৮. যতটুকু দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা দ্বারা প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়, তার চেয়ে অতিরিক্ত দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা অনুচিৎ।
৯. যতটুকু সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করলে প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক ব্যাখ্যা করে বলা নিস্প্রয়োজন।
১০. যদি একটি দোষ উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যায়, তাহলে একাধিক দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা অনুচিৎ।

রাবী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার মূলভিত্তি কি কি?

সকল আইম্মায়ে হাদীস ও ফিকাহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, একজন রাবী বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তার মাঝে মৌলিকভাবে দু'টি বিষয় বিদ্যমান থাকতে হবে। যথা: ১. العدالة (আদালত)। ২. الضبط (যবত)।

আদালত বলতে রাবীর মুসলমান হওয়া, বালেগ হওয়া, বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী হওয়া, পাপাচারমুক্ত হওয়া, উন্নত শিষ্টাচারের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত না হওয়ার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যবান হওয়াকে বুঝানো হয়ে থাকে।

আর যবত্ বলতে প্রখর স্মৃতিশক্তির মালিক হওয়া, হাদীস আহরণ ও ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ণ সচেতনতার অধিকারী হওয়া, নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যহীন রিওয়ায়াত বর্ণনা না করা, মারাত্মক স্মৃতিদৌর্বল্যের অধিকারী না হওয়া, অসচেতনতার কারণে ভুল বেশী করেন এমন না হওয়া, হাদীস আহরণ ও সংরক্ষণের প্রশ্নে গাফেল না হওয়া, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে ভুল করার অভিযোগে অভিযুক্ত না হওয়া ইত্যাদিকে বুঝানো হয়ে থাকে।

রাবী عادل বা বিশ্বস্ত তা কিভাবে বুঝা যাবে?

১. রাবীর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে মন্তব্য করার যোগ্যতা রাখেন এমন সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ কিংবা তাদের কোন একজনও যদি কোন রাবী সম্পর্কে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার সুস্পষ্ট মন্তব্য করেন।

২. কিংবা রাবী যদি এমন ব্যক্তি হন যার বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। যেমন: সুফয়ান সাওরী, সুফয়ান ইবনে ওয়ায়না, আওযায়ী, বুখারী, মুসলিম।

অবশ্য আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বলতে চেয়েছেন যে, যদি কোন রাবীর ব্যাপারে অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্য না পাওয়া যায়, তাহলেই উক্ত রাবী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে। তবে অন্যান্যরা তাঁর এমতের সাথে একমত হতে পারেন নি।

রাবীর যবৃত ও সংরক্ষণগুণে কোন ত্রুটি নেই তা কিভাবে প্রমাণিত হবে?

১. যদি রাবী ব্যাপক ভিত্তিতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ রিওয়ায়াত বর্ণনা না করেন, তাহলেই বুঝা যাবে যে তার সংরক্ষণগুণ যথাযথ বিদ্যমান আছে। অবশ্য দু-এক ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা দ্বারা তার এই বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হবে না।

২. রাবীদের ব্যাপারে মন্তব্য করার যোগ্যতা রাখেন এমন ব্যক্তিরা যদি কারো সংরক্ষণগুণের দুর্বলতার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

রাবীদের ব্যাপারে অস্পষ্ট মন্তব্য (جرح مبهم) গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

কেউ যদি রাবীদের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করে; কিন্তু তার কারণ ব্যাখ্যা না করেন, তাহলে তার এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে কি না তা একটি পর্যালোচনা সাপেক্ষ বিষয়। কেননা মন্তব্যকারী হয়ত তাকে গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করবেন কিংবা অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করবেন। উভয় ধরণের মন্তব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হুকুম রয়েছে। আর এক্ষেত্রে মোট পাঁচ ধরণের মতামত রয়েছে-

১. যদি গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেন, তাহলে বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে কারণ ব্যাখ্যা না করলেও তার মন্তব্য গৃহীত হবে। কেননা একজন ব্যক্তির গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি বহুবিদ কারণের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়ে থাকে। আর এর সবগুলো উল্লেখ করা বলতে গেলে অসম্ভব।

আর যদি অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেন, তাহলে তার কারণ অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে। অন্যথায় তার এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা যে কোন একটি কারণেই রাবী অগ্রহণযোগ্য হয়ে যেতে পারে। আর তা উল্লেখ করা অসম্ভব কোন বিষয় নয়। তাছাড়া মন্তব্যের ভিত্তি বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন বিষয় হতে

পারে। তাই যিনি মন্তব্য করলেন, তিনি যে ভিত্তিতে মন্তব্য করেছেন তা হয়ত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার প্রকৃত কারণ নাও হতে পারে। যেমন, শো'বাকে জিজ্ঞাসা করা হল, অমুকের হাদীস আপনি গ্রহণ করেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাকে বিরযাউন (برذون) জাতীয় ঘোড়ার (অর্থাৎ ঘোড়া ও গাধার মিলনের ফলে যে ঘোড়ার জন্ম হয়, তার) উপর সওয়ার হতে দেখেছি। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, এ জাতীয় ঘোড়ার উপর আরোহণ করা এমন কোন কারণ নয়; যার জন্য উক্ত ব্যক্তির হাদীস বর্জন করতে হবে।[১] তাই কারণ উল্লেখ করে দিলে অন্যদের জন্য বিষয়টি বিবেচনা করা সহজ হবে। একারণেই দেখা যায় যে, ইমাম বুখারী এমন ধরণের ব্যক্তিদের হাদীস গ্রহণ করেছেন, যাদের ব্যাপারে অন্যদের থেকে অগ্রহণযোগ্য হওয়ার মন্তব্য রয়েছে। যেমনঃ ইকরিমা, আমর ইবনে মারযূক। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিমও সুওয়ায়েদ ইবনে সাঈদসহ এমন বেশ কিছু ব্যক্তি থেকে হাদীস আহরণ করেছেন, যাদের ব্যাপারে অন্যদের থেকে অগ্রহণযোগ্য হওয়ার মন্তব্য রয়েছে। ইমাম আবু দাউদের ক্ষেত্রেও এরূপ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত অন্য মন্তব্যকারীদের কাছে এসব ব্যক্তিরা অগ্রহণযোগ্য হলেও বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদের নিকট তাঁরা গ্রহণযোগ্য ছিলেন। উপরোক্ত মতটিই এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত বলে মনে করা হয়। তবে এসম্পর্কে আরো মোট ৪টি মতামত পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে সেগুলো অতিসংক্ষেপে উল্লেখ করে দিলাম।

২. কেউ যদি কারো ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করেন, তাহলে তাকে অবশ্যই তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু যদি কারো ব্যাপারে অগ্রহণযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করা হয়, তাহলে তার কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

এমতের প্রবক্তাদের যুক্তি হল, কারো গুণ বর্ণনায় অতিরঞ্জন থাকে; কিন্তু কারো দোষ বর্ণনায় সাধারণতঃ তা থাকে না । এটি ইমামুল হারামাইন, ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী প্রমুখের অভিমত।[২]

৩. গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য উভয় ধরণের মন্তব্যের ক্ষেত্রেই কারণ অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে। এমতটির কথা খতীব বাগদাদী ও উসূলবিদগণ উদ্ধৃত করেছেন[৩]।

৪. যদি মন্তব্যকারী এ ব্যাপারে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি হন, তাহলে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য কোন ধরণের মন্তব্যের ক্ষেত্রেই কারণ ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য নয়।

---

[১] আর-রফউ ওয়াত-তাকমীল পৃষ্ঠা: ৮০।

[২] তাদরীব পৃষ্ঠা: ২০৩।

[৩] তাদরীব পৃষ্ঠা: ২০৩।

এটি কাজী আবু বকর বাকেল্লানী সহ অন্যান্যদের অভিমত । এমতটি খতীব বাগদাদী, ইমাম রাযী, ইমাম গাযালী গ্রহণ করেছেন। আবুল ফযল ইরাকী এটিকেই বিশুদ্ধ অভিমত বলে ব্যক্ত করেছেন।[১]

৫. যে বারী সম্পর্কে অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করেননি তার ব্যাপারে অস্পষ্ট সমালোচনা (الجرح المبهم) গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হওয়ার মন্তব্য রয়েছে তার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না। এটি মূলত ইবনে হজর আসকালানীর অভিমত।

তবে আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ আর-রফউ ওয়াত তাকমীলের টীকায় তার নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে-

وقد تبين لنا ان في المسئلة قولين راجحين، هما الأول و الرابع، و لكن الأول منه يلزم منه ان تكون فائدة كتب أئمة الجرح والتعديل، وفيهما الجرح المبهمة، التوقف في الراوي المجروح حتى تنـــزاح منه الريبة عنه، و هذا – كما ترى – تعطيل و إلغاء لتلك الكتب الهامة المعتبرة، التى الفها لائمة الثقات – فلا مناص من ترجيح القول الرابع، وقد قال الباقلاني أنه قول الجمهور، و هو الذي جرى عليه علماء الجرح و التعديل من المتأخرين ايضا .

এ থেকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ বিষয়ে দুটি মত অগ্রগণ্য; প্রথমটি ও চতুর্থটি। কিন্তু যদি প্রথম মতটি গ্রহণ করা হয় তাহলে আইম্মায়ে জরাহ ও তা'দীল কর্তৃক রচিত গ্রন্থসমূহ- যাতে অস্পষ্ট সমালোচনা ব্যাপক ভিত্তিতে রয়েছে- সেগুলোর দ্বারা কেবল আমাদের এতটুকু ফায়দা হবে যে, তারা যাদের ব্যাপারে অস্পষ্ট সমালোচনা করেছেন, সেই রাবীগণ গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য নয়, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি আমাদেরকে মুলতবী রাখতে হবে। যতক্ষণ না আমরা অন্যান্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে তার বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এইসব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি- যা নির্ভরযোগ্য ইমামগণ কর্তৃক রচিত- সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় ও ফলাফলশূন্য করে দেওয়া হচ্ছে।

এহেন প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে অবশ্যই চতুর্থ মতটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যে মতটিকে আল্লামা বাকেল্লানী জমহুরের অভিমত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া জরাহ তা'দীল বিষয়ে অভিজ্ঞ মুতাআখখেরীন উলামায়ে কিরামও সে মতটিকেই অনুসরণ করেছেন।[২]

---

[১] তাদরীব পৃষ্ঠা: ২০৩।

[২] টীকা আর-রফউ ওয়াত্-তাকমীল পৃষ্ঠা ১০৭।

ইমাম গাযালী[১], আল্লামা ইবনে কাসীর[২], আল্লামা ইবনূল আসীর,[৩] আল্লামা সুয়ূতী[৪]সহ অনেকেই এমতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লামা ইবনুল আসীর মন্তব্য করেছেন যে,

لا يجب ذكر سبب الجرح و التعديل جميعا، لانه إن لم يكن الجارح و المعدل بصيرا بهذا الأمر فلا يصلح للتزكية و الجرح، و إن كان بصيرا فأيُّ معنى للسؤال؟

'জরাহ ও তা'দীল কোন ক্ষেত্রেই কারণ ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য নয়' কেননা যিনি জরাহ তা'দীল সংক্রান্ত মন্তব্য করবেন তিনি যদি এবিষয়ে অভিজ্ঞ না হন, তাহলে তিনি একাজের যোগ্য বলেই বিবেচিত হবেন না। আর যদি তিনি অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাহলে তার মন্তব্যের পর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কোন অর্থই হয় না।[৫]

সুতরাং বলা যায় যে বিষয়টি মন্তব্যকারীর প্রেক্ষিতে বিচার্য। যদি তিনি অভিজ্ঞ না হন তাহলে তার অস্পষ্ট সমালোচনা (الجرح المبهم) গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি তিনি অভিজ্ঞ হন তাহলে তার অস্পষ্ট সমালোচনাও গ্রহণযোগ্য হবে।

জরাহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে বিশেষ সংখ্যার শর্ত আছে কি না?

পুরুষ-নারী, স্বাধীন-গোলাম নির্বিশেষে যোগ্যতা সাপেক্ষে সকলেই জরাহ ও তা'দীল করতে পারবেন। তবে কতজন ব্যক্তি জরাহ বা তা'দীল করলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে এ নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে।

আল্লামা ইরাকীসহ আলফিয়ার অনেক ব্যাখ্যাকার এক্ষেত্রে তিন ধরণের অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

১. সাক্ষী ও রাবী উভয় ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতার সত্যায়ন কম পক্ষে দু'জন ব্যক্তি থেকে পাওয়া যেতে হবে। মদীনার অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের এরূপ অভিমত ছিল বলে আল্লামা বাকেল্লানী উল্লেখ করেছেন।
২. সাক্ষী ও রাবী উভয়ের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতার সত্যায়ন একজন ব্যক্তি থেকে পাওয়া গেলেই যথেষ্ট হবে। কেননা নির্ভরযোগ্যতার সত্যায়ন অনেকটা খবরের মত। আর একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এটি কাজী আবু বকর বাকেল্লানীর নিকট গ্রহণযোগ্য মত।

---

[১] মুসতাসফা খ: ১ পৃষ্ঠা ১৬২-১৬৩ দ্রষ্টব্য।
[২] ইখতিসারু উলূমিল হাদীস পৃ: ১০৪ দ্রষ্টব্য।
[৩] মুকাদ্দামায়ে জামিউল উসূল খ: ১ পৃ: ১২৮ দ্রষ্টব্য।
[৪] আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের সয়ূতীকৃত পৃষ্ঠা: ৫৫৯ দ্রষ্টব্য।
[৫] টীকা আর-রফউ ওয়াত-তাকমীল পৃষ্ঠা: ১০৮।

৩. রাবীর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে একজনের সত্যায়নই যথেষ্ট হবে। তবে সাক্ষীর ক্ষেত্রে নয়। এটি ইমাম ফখরুদ্দীন ও সাইফুদ্দীন আমেদীর নিকট গ্রহণযোগ্য অভিমত। খতীব বাগদাদীর নিকটও এমতটিই গ্রহণযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেছেন :

انه يثبت في الرواية بواحد، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه و تعديله بخلا ف الشهادة

রাবীর নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি একজন ব্যক্তির মন্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হবে। কেননা কোন রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য একাধিক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত থাকার শর্ত লাগানো হয় না। অতএব রাবীর গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্যও একাধিক ব্যক্তির মন্তব্যের শর্ত লাগানো হবে না। তবে সাক্ষীর বিষয়টি এর চেয়ে ভিন্নতর।[১]

যদি কোন রাবীর ব্যাপারে বিপরীতমুখী মন্তব্য পাওয়া যায়?

যদি কোন রাবীর ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্যও পাওয়া যায়, আবার অগ্রহণযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্যও পাওয়া যায় অর্থাৎ কতিপয় তার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করেছেন, আর কতিপয় তার ব্যাপারে অনির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করেছেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে কি করা হবে এব্যাপারে তিনটি মতামত রয়েছে।[২]

---

[১] আর-রফউ ওয়াত্-তাকমীল পৃ: ১১১-১১২ এর তথ্য অবলম্বনে।

[২] জরাহ ও তা'দীল অর্থাৎ রাবী গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য এদু'টি মন্তব্যই যদি ত্রুটিমুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হয় কেবলমাত্র তখনই নিম্নোক্ত তিনটি পন্থার কোন একটিকে অনুসরণের প্রশ্ন আসবে। কিন্তু যদি দু'টি মন্তব্যের কোন একটি যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য না হয়; যেমন কেউ কারো প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ বশত; কিংবা গোড়ামীর বশবর্তী হয়ে সমালোচনা করে থাকেন, তাহলেতো তার এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্যই হবে না। তার বিপরীতে যিনি উক্ত রাবীর ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করেছেন তার মন্তব্য যদি যথার্থ এবং অতিরঞ্জন মুক্ত হয়, তাহলে এহেন অবস্থায় উক্ত রাবীর ব্যাপারে মতানৈক্যই প্রমাণিত হবে না। তাই সে ক্ষেত্রে যার মন্তব্য যথার্থ হবে তার মন্তব্যই গ্রহণীয় হয়ে যাবে। যেমন, ইবনে ইসহাকের ব্যাপারে ইমাম মালেক মন্তব্য করেছেন: انه دجال من الدجاجلة । আর শো'বা মন্তব্য করেছেন : انه امير المؤمنين في الحديث ! কিন্তু ইমাম মালিকের মন্তব্যের পিছনে ক্রোধ কাজ করেছে। কেননা ইবনে ইসহাক একবার মন্তব্য করেছিলেন : اعرضوا على علم مالك فانـــا بيطـــاره । এ মন্তব্যের কথা শুনেই ইমাম মালেক ইবনে ইসহাক সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। সুতরাং তার ব্যাপারে ইমাম মালিকের এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব ইবনে ইসহাকের ব্যাপরে শো'বা যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, সেটি যথার্থ সাব্যস্ত হবে। এবং ইবনে ইসহাক গ্রহণযোগ্য রাবী হওয়ার মতামতই প্রাধান্য পাবে।

এক্ষেত্রে জরহে মুবহাম ও মফাসসালের বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ অগ্রগণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে জরহে মুবহাম ও জরহে মুফাসসালের যথেষ্ট দখল রয়েছে। কেননা জরহে মুবহাম তো গ্রহণযোগ্যই হয় না। অথচ তা'দীলে মুবহাম গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়। তাই যদি কোন রাবীর ব্যাপারে

১. প্রথম মত :

অগ্রহণযোগ্য হওয়ার মন্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে; গ্রহণযোগ্য হওয়ার মন্তব্য কারীরা সংখ্যায় অনেক হলেও। এটি জমহুরের অভিমত বলে খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনুস সালাহ, ফখরুদ্দীন রাযী, আল্লামা আমেদীসহ বেশ কতিপয় উসূলবিদ উলামায়ে কিরাম এটিকে সঠিক মত বলে অভিহিত করেছেন। কারণ যিনি রাবী সম্পর্কে অগ্রহণযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করেছেন, তিনি মূলত কিছু বাড়তি তথ্য পরিবেশন করেছেন, যে সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মন্তব্যকারী অবহিত হতে পারেননি।

২. দ্বিতীয় মত :

যদি নির্ভরযোগ্য বলে সার্টিফাইকারীদের সংখ্যা বেশী হয় তাহলে তাদের মতামতই প্রাধান্য পাবে। কেননা নির্ভরযোগ্য বলে সার্টিফাইকারীরা সংখ্যায় বেশী হওয়ার কারণে তাদের মত শক্তিশালী হবে। আর অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্যকারীরা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে তাদের মন্তব্য দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হবে। খতীব বাগদাদী কিফায়ায় এমতটির কথা উল্লেখ করেছেন।

৩. তৃতীয় মত :

প্রাধান্য দেওয়ার কোন একটি কারণ দেখিয়ে কোন একটি মতকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা আল্লামা লাখনোভী 'আল-আজবিবাতুল ফাযেলা' কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে তার প্রতি আলোকপাত করছি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রাধান্য দেওয়ার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

ক. বিপরীতমুখী দুইজন মন্তব্যকারীর একজন যদি নির্ভরযোগ্যতার সার্টিফাইয়ের ক্ষেত্রে শিথিল মনোভাব পোষণকারী হয়ে থাকেন, আর অন্যজন যদি ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাবের অধিকারী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি ভারসাম্যপূর্ণ তাঁর মন্তব্য অগ্রগণ্য হবে। যেমন কোন রাবী সম্পর্কে যদি হাকেম নির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করেন, আর আল্লামা যাহাবী যদি তাকে যয়ীফ ও অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেন তাহলে যাহাবীর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, হাকেম এক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকেন। অনুরূপ ভাবে কোন রাবীর ব্যাপারে যদি ইবনে হিব্বান নির্ভরযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করেন, আর

জরাহ ও তা'দীল দু'টিই মুবহাম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তা'দীল অগ্রগণ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি জরাহ মুবহাম হয় তা'দীল মুফাসসাল হয় তাহলেও তা'দীল অগ্রগণ্য হবে।

তবে হ্যা যদি জরাহ মুফাসসাল হয় আর তা'দীল মুবহাম হয়, কিংবা জরাহ ও তা'দীল দু'টোই মুফাসসাল হয় তাহলে এই দুই ক্ষেত্রে জরাহ মুকাদ্দাম হবে। —আর-রফউ ওয়াত-তাকমীল পৃঃ ১২০

অন্যরা যদি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার মন্তব্য করেন, তাহলে অন্যদের মন্তব্য অগ্রগণ্য হবে, কেননা ইবনে হিব্বান এক্ষেত্রে শৈথিল্য করে থাকেন। এমনকি তিনি মজহুল রাবীদেরকেও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন।

খ. যদি বিপরীতমুখী দুইজন মন্তব্যকারীর মাঝে একজন কঠোর মনোভাবাপন্ন হয়, আর অন্যজন ভারসাম্যপূর্ণ হয়, তাহলে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তির মতামত অগ্রগণ্য হবে। যেমন ইবনুল জাওযী খুব কঠোর মনোভাবাপন্ন; কিন্তু হাফেয যাহাবী ও ইবনে হজর ভারসাম্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে যাহাবী ও ইবনে হজরের মন্তব্য ইবনুল জাওযীর মুকাবেলায় অগ্রগণ্য হবে।

হাফেয ইবনে হজর উল্লেখ করেছেন, জরাহ ও তা'দীলের ইমামগণ সময় কালের প্রেক্ষিতে চারস্তরে বিভক্ত। কোন স্তরে কারা কঠোর মনোভাবাপন্ন ও কারা ভারসাম্যপূর্ণ তা তিনি উল্লেখ করেছেন। যথা :

* **প্রথম স্তর :** শো'বা ও সুফয়ান সাওরীর স্তর। এদু'জনের মাঝে শো'বা কঠোর মনোভাবাপন্ন।

* **দ্বিতীয় স্তর :** ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান ও আব্দুর রহমান ইবনে মাহদীর স্তর। এদুজনের মাঝে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কঠোর মনোভাবাপন্ন।

* **তৃতীয় স্তর :** ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ও আলী ইবনুল মাদিনীর স্তর। এ দুজনের মাঝে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন কঠোর মনোভাবাপন্ন।

* **চতুর্থ স্তর :** ইবনু আবি হাতেম ও ইমাম বুখারীর স্তর। এ দুজনের মাঝে ইবনু আবি হাতেম কঠোর মনোভাবাপন্ন।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী রহ. উল্লেখ করেছেন, এর পরবর্তী যুগে আল্লামা ইবনুল জাওযী, আমর ইবনে বদর মুত্তসেলী, আল্লামা যুযকানী, হাফেয সাগানী, আবুল ফাতাহ আযদী এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া কঠোর মনোভাবাপন্ন ছিলেন। পক্ষান্তরে হাফেয ইবনে হজর, হাফেয যাহাবী, হাফেয ইরাকী, হাফেয যাইলায়ী প্রমুখ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণদের মন্তব্য অগ্রগণ্য হবে।

গ. উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণের বিচার-বিশ্লেষণ করে যাদের দলীল প্রমাণ বলিষ্ঠ মনে হবে তাদের মন্তব্য অগ্রগণ্য বলে গ্রহণ করা হবে। তবে এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সকলের জন্য সম্ভব নয়। বরং যারা ইলমে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসয় সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য রাখেন তাদের জন্যই এটি সম্ভব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যদি দুইজন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি থেকে কোন রাবীর ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য পাওয়া যায় তখন এই তৃতীয় পন্থাটিই অবলম্বন করতে

হবে। অর্থাৎ উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণের বিচার-বিশ্লেষণ করে যদি কোন একটি মতকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে তাই করা হবে। অন্যথায় যার কথায় অধিক আস্থা জন্মে তার মতকে প্রাধান্য দিতে হবে।[১]

কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কারো কাছ থেকে হাদীস আহরণ করলে তা ঐ ব্যক্তিকে বিশ্বস্ত বলে প্রতিপন্ন করবে কি না?

কোন নির্ভরযোগ্য রাবী যদি কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোন হাদীস আহরণ করে, তাহলে এ দ্বারা উক্ত ব্যক্তিটি নির্ভরযোগ্য এ কথা প্রমাণিত হবে কি না- এ ব্যাপারে দুই ধরণের অভিমত পাওয়া যায়। যথা:

১. এ দ্বারা উক্ত ব্যক্তিটি নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে না। এটিই বিশুদ্ধ মত এবং অধিকাংশের অভিমত।
২. কেউ কেউ মনে করেন, এদ্বারা উক্ত ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য-একথা প্রমাণিত হবে।

অনুরূপভাবে কোন নির্ভরযোগ্য আলেম যদি এমন কোন আমল করেন কিংবা যদি তিনি এমন কোন ফত্ওয়া দেন যা কোন রিওয়ায়াতের অনুকূল হয়, তাহলে এদ্বারা উক্ত হাদীসটি সহীহ তা প্রমাণিত হয় না। আবার কোন নির্ভরযোগ্য আলেম যদি কোন হাদীসের পরিপন্থী কোন আমল করেন কিংবা ফত্ওয়া দেন, তহালে এদ্বারা হাদীসটির সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা সৃষ্টি করে না।[২]

তবে কোন রাবী যদি নিজেই কোন রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন, অতঃপর তিনি নিজেই যদি উক্ত রিওয়ায়াতের সুস্পষ্ট পরিপন্থী কোন আমল করেন, তাহলে এদ্বারা উক্ত রিওয়ায়াতটি আমলযোগ্য নয় একথা সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি তার ঐ আমলটি উক্ত হাদীস বর্ণনার পূর্বের হয়, কিংবা আগের না পরের তা জানা না যায়, তাহলে এদ্বারা হাদীসটি আমলযোগ্য নয় একথা প্রমাণিত হবে না। অনুরূপভাবে যদি হাদীসটির একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে, আর বর্ণনাকারী তার কোন একটি অর্থের ভিত্তিতে আমল করে থাকেন, তাহলে অন্য অর্থের প্রেক্ষিতে হাদীসটির উপর আমল করতে কোন বাধা নেই।

তবে কোন সাহাবী যদি কোন হাদীসের অনুকূল আমল করেন তাহলে এ দ্বারা হাদীসটি সহীহ বলে প্রমাণিত হবে। আর কোন সাহাবী যদি তৎকর্তৃক বর্ণিত

---

[১] আল-আজবিবাতুল ফাযিলাহ্ পৃষ্ঠা: ১৬১-১৮০ থেকে সংক্ষেপায়িত, [illegible] তিরমিযী খ: ১ পৃ: ৮১ ৮২ এর সৌজন্যে।
[২] তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস পৃ: ১৪৬।

হাদীসের পরিপন্থী কোন আমল করেন; আর হাদীসটিতে যদি কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে তাহলে তাঁর এই আমল হাদীসটির সহীহ হওয়ার পথে অন্তরায় বলে গণ্য হবে। তবে যদি হাদীসটিতে কোন অস্পষ্টতা থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাঁর আমল উক্ত হাদীসটি সহীহ হওয়ার পথে অন্তরায় বলে গণ্য হবে না।

ইবনুল হুমাম উল্লেখ করেছেন যে,

اذا لم يعرف من الحال سوى أنه خالف مرويه، حكمنا بانه اطّلع على ناسخه في نفس الأمر ظاهراً

যদি রাবী তাঁর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করেছেন শুধুমাত্র এতটুকু জানা যায়, এছাড়া অন্য কোন কিছু জানা সম্ভব না হয়; তাহলে তখন আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, তিনি অবশ্যই এই হাদীসটি রহিত হওয়ার ব্যাপারে অবহিত হয়েছেন। (যে কারণে নিজের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করেছেন)।[১]

পাপাচার থেকে তাওবাকারীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত মতামত এই যে, পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবা করলে তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে। তবে হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে যিনি মিথ্যা বলেছেন বলে প্রমাণিত হবে, এমন ব্যক্তি তাওবা করলেও তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না।

যিনি হাদীস বর্ণনার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

এক্ষেত্রে তিন ধরণের মতামত পাওয়া যায়। যথা:

১. ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হে ও আবু হাতেম মনে করেন যে, যিনি হাদীস বর্ণনার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন তার রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হবে না।

২. আবু নু'আয়ম, ফযল ইবনে দুকায়নসহ কতিপয় আলেম মনে করেন এ ধরণের ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে।

৩. তবে আবু ইসহাক শিরাযী এ মর্মে ফতওয়া দিয়েছেন যে, হাদীস বর্ণনায় নিরত থাকার কারণে যদি কারো পরিবার-পরিজনের জন্য উপার্জন করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে।

---

[১] ফতুহল কাদীর খ: ৩ পৃ: ৭।

কোন রাবী হাদীস বর্ণনার পর তা ভুলে গেলে তাঁর হাদীস গ্রহণ করা হবে কি না?

কোন ব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনার পর যদি তিনি তা ভুলে যান এবং বিষয়টিকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন; যেমন বলেন যে, 'আমি এ হাদীস কখনই বর্ণনা করিনি' 'সে আমার উপর মিথ্যারোপ করছে' ইত্যাদি তাহলে তার হাদীস গ্রহণ করা হবে না।

তবে যদি তিনি দ্বিধা প্রকাশ করেন; যেমন তিনি বললেন যে, 'মনে পড়ে না' 'বুঝতে পারছিনা' ইত্যাদি তাহলে তার হাদীস গ্রহণ করা হবে।

তাছাড়া যার অবস্থা এমন যে, হাদীস বর্ণনার সময় কোন কথার তালকীন করা হলে অর্থাৎ কোন কথা তাকে বলে দিলে তিনি তাই বর্ণনা করতে শুরু করেন; একথাটি প্রকৃত পক্ষে তার বর্ণিত হাদীসের অংশ ছিল কিনা তা ভেবে দেখেন না, তার হাদীসও গ্রহণ করা হবে না। অনুরূপভাবে যিনি বারবার ভুল করেন তার হাদীসও গ্রহণ করা হবে না। তাছাড়া যিনি হাদীস আহরণ কিংবা অন্যের নিকট বর্ণনার সময় সতর্ক থাকেন না (যেমন ঘুমিয়ে যান) তার হাদীসও গ্রহণ করা হবে না।

নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতার স্তরসমূহ :

ক. নির্ভরযোগ্যতার স্তরসমূহ:

আল্লামা সাখাভী উল্লেখ করেছেন, রাবীদের নির্ভরযোগ্যতার মোট ৬টি স্তর রয়েছে। যথা:

১. **নির্ভরযোগ্যতার সর্বোচ্চ স্তর:** এ স্তরের রাবীদের বেলায় সাধারণত: মুহাদ্দিসগণ ইসমে তাফযীলের সীগাহ ব্যবহার করেন। যেমন:

هو أوثق الناس، أضبط الناس، وإليه المنتهى في التثبيت، ولا أعرف له نظيرًا في الدنيا،

২. **দ্বিতীয় স্তর :** এটি প্রথম স্তরের চেয়ে সামান্য নিম্ন পর্যায়ের। এ স্তরের রাবীদের জন্য মুহাদ্দিসগণ সাধারণতঃ فلان لا يسئل عنه বা এধরণের কোন শব্দ ব্যবহার করেন।

৩. **তৃতীয় স্তর :** এ স্তরে রাবীদের বেলায় সাধারণত নির্ভরযোগ্যতার অর্থবোধক শব্দগুলো একাধিক বার উল্লেখ করেন। যেমন- كان ثقة ثقة، أو كان ثبت ثبت

কিংবা অনেক সময় নির্ভরযোগ্যতার অর্থজ্ঞাপক একাধিক শব্দ উল্লেখ করেন। যেমন- هو ثقة مامون، ثبت حجة ، صاحب حديث عدل ضابط

৪. **চতুর্থ স্তর :** এ স্তরে রাবীদের বেলায় নির্ভরযোগ্যতার অর্থজ্ঞাপক শব্দ একবার করে উল্লেখ করেন। যেমন- هو ثقة، أو ثبت، أو كانه مصحف، او امام، او حافظ، أو حجة অবশ্য এর সঙ্গে রাবীকে আদালতের বৈশিষ্ট্যে অবশ্যই বৈশিষ্ট্যবান হতে হবে। কেননা শুধুমাত্র যবতের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলেই হাদীস প্রমাণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয় না।

৫. **পঞ্চম স্তর :** এ স্তরের রাবীদের বেলায় সাধারণতঃ নিম্নোক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন- ليس به بأس، لا بأس به، لابأس، صدوق، مأمون، خيار الخلق

৬. **ষষ্ঠ স্তর :** এটি সর্বনিম্ন স্তর। এ স্তরের জন্য যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো সাধারণতঃ সমালোচনার খুবই কাছাকাছি অর্থ বহন করে। এ স্ত রের জন্য সাধারণত নিম্নোক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন-

ليس ببعيد عن الصواب، أو يروى حديثه، أو يعتبر به أو شيخ وسط، أو روى الناس عنه، أو صـالح الحديث، أو يكتب حديثه، أو مقارب الحديث، أو صدوق انشاءالله، ارجو ان لا بأس به.

উপরোল্লিখিত ছয়টি স্তরের মাঝে প্রথম চার স্তরের রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ পেশ করা যাবে। বরং পঞ্চম স্তরের বর্ণনাকারীদের দ্বারাও প্রমাণ পেশ করা যাবে বলে অনেকেই মনে করেন। তবে ইবনুস সালাহ মনে করেন যে, শেষোক্ত দুই স্তরের রাবীদের হাদীস আহরণ করা গেলেও তাদ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না। তবে যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে তাহলে তা প্রমাণযোগ্য বলে গণ্য হবে।[১]

তবে ইমাম গাযালী রাবীদেরকে গ্রহণযোগ্য বলে সার্টিফাই করার অন্য একটি পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন। যথাঃ

১. হয়ত তাকে নির্ভরযোগ্য বলে সরাসরি মন্তব্য করা হবে।
২. তার বর্ণিত রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য কি না এব্যাপারে সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।
৩. তাঁর বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুসারে আমল করার মাধ্যমে।
৪. তাঁর রিওয়ায়াত আহরণ করার মাধ্যমে।[২]

খ. অনির্ভরযোগ্যতার স্তরসমূহ :

অনির্ভরযোগ্য রাবীদেরও মোট ৬টি স্তর রয়েছে। যথা :

১ম স্তর : রাবী মারাত্মক ধরণের অভিযুক্ত হলে এস্তরের বলে গণ্য করা হয়। এস্তরের রাবীদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন-

---

[১] যফরুল আমানী পৃঃ ৭৭-৭৯।

[২] আল-মুসতাসফা খঃ ১ পৃঃ ১৬৩।

اكذب الناس، واليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب، أو هو منبع الكذب، أو معدن الكذب، أو جبل الكذب أو جراب الكذب .

২য় স্তর : এস্তরের রাবীরা পূর্ববর্তী স্তরের চেয়ে সামান্য হালকা অভিযোগে অভিযুক্ত। এ স্তরের রাবীদের জন্য সাধারণত: নিমোক্ত শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়। যথা: هو دجال، أو كذاب، أو وضاع، يضع الحديث، أو يكذب في الحديث
ইমাম শাফেয়ী ليس بشيئ শব্দটিকেও এ স্তরের বলে গণ্য করেন।

৩য় স্তর : এস্তরের রাবীরা পূর্ববর্তী রাবীদের চেয়ে সামান্য হালকা অভিযোগে অভিযুক্ত। এস্তরের রাবীদের জন্য সাধারণত: নিমোক্ত শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়।

فلان يسرق الحديث، فلان متهم بالكذب، أو متهم بالوضع، أو فلان ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث، أو تركوه، أو لايعتبربه، أو لايعتبر بحديثه، أوغير ثقة، أو ليس بالثقة.

৪র্থ স্তর : এস্তরের রাবীগণ পূর্ববর্তী স্তরের চেয়ে সামান্য হালকা অভিযোগে অভিযুক্ত। এ স্তরের রাবীদের জন্য সাধারণত: নিম্নোক্ত শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়। যথা:

فلان رد حديثه، أو مردود الحديث، أو ضعيف جداً، أو واه بمرة، أو متروح الحديث، أو طرحوه، أو لا يكتب حديثه ، لا تحل الرواية عنه، ولا تحل كتابة حديثه، وليس بشيئ–

৫ম স্তর : এস্তরের রাবীগণ পূর্ববর্তী স্তরের চেয়ে সামান্য হালকা অভিযোগে অভিযুক্ত। এস্তরের জন্য সাধারণত: নিম্নোক্ত শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়। যথা:

فلان لا يحتج به، أو ضعفوه، أو مضطرب الحديث، أو له ما ينكر أو له مناكير، أو هومنكرالحديث أو هو ضعيف، أو له اوابد، ويأتي بالعجائب–

৬ষ্ট স্তর : সবচেয়ে হালকা অভিযোগে অভিযুক্ত রাবীদের স্তর। এ স্তরের জন্য সাধারণত: নিম্নোক্ত শব্দাবলী ব্যবহার করা হয় -

فيه مقال، أو ادنى مقال، أو ضعيف، أو ينكر مرة ويعرف اخرى، أو ليس بالقوي أو ليس بحجة، أو ليس بثقة، وفيه شئ، أو فيه ضعف، أو فيه لين أو لين الحديث، أو سيئ الحفظ، أو تكلموا فيه، أو سكتوا عنه، أو فيه نظر–

জরাহ্ ও তা'দীলের উপর রচিত গ্রন্থাবলী:

১. তারীখুল কাবীর; ইমাম বুখারীকৃত। এ গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য সবধরণের রাবীর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. আল-জরহু ওয়াত্-তা'দীল; ইবনু আবি হাতেমকত্। সবল দুর্বল সব ধরণের রাবীর কথাই এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।
৩. আস-সিকাত; ইবনে হিব্বানকৃত। এতে শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য রাবীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. আল-কামেল ফীয্-যু'আফা; ইবনে 'আদীকৃত। এতে শুধুমাত্র যয়ীফ রাবীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৫. আল-কামাল ফী আসমায়ির রিজাল; আব্দুল গণী মাকদেসীকৃত। সিহাহ সিত্তার সবল দুর্বল সব রাবীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
৬. মীযানুল-এ'তেদাল; আল্লামা যাহাবীকৃত। যয়ীফ ও মাতরুক রাবীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
৭. তাহযীবুত্-তাহযীব; ইবনে হজরকৃত।
৮. আল-কাশেফ; যাহাবীকৃত

পরিশিষ্ট -১

হাদীস থেকে বিধান আহরণের প্রক্রিয়া

বস্তুতঃ হাদীস থেকে বিধান আহরণ করা গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী মুজতাহিদের কাজ। যে কেউ ইচ্ছা করলেই এ কাজ করতে পারে না। শারইয়্যাহ সম্পর্কে যাদের অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে তাদের জন্য বিষয়টি সম্ভব হলেও নিম্নোক্ত বিধানাবলী অনুসরণ করে তা করতে হবে।

হাদীস থেকে যিনি বিধান আহরণ করবেন তাকে প্রথমেই জেনে নিতে হবে যে, কোন ধরণের হাদীস দ্বারা বিধান প্রবর্তন করা যায় আর কোন ধরণের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না, কোনগুলো প্রমাণ হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য আর কোনগুলো প্রমাণিক ভিত্তি হওয়ার যোগ্য নয়। এ বিষয়ের জ্ঞান উসূলে হাদীস অধ্যয়নের দ্বারা অর্জন করা যাবে। উসূলে হাদীস অধ্যয়নের দ্বারা জানা যায় যে, গ্রহণযোগ্য হাদীস মূলত তিন প্রকার। যথা: ১. মুতাওয়াতির ২. মশহুর ৩. খবরে ওয়াহেদ। আমরা আরও জেনেছি যে, মুতাওয়াতির সূত্রে যে হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌঁছবে, সে হাদীসটি যে নবী সা. এর বক্তব্য সে ব্যাপারে আমাদের علم يقيني قطعي অর্থাৎ সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত প্রত্যয় জন্মাবে। আমরা আরও জেনেছি যে, মশহুর পর্যায়ের খবর দ্বারাও হাদীসটি যে নবী সা. এর বক্তব্য এ ব্যাপারে علم يقيني قطعي এর কাছাকাছি প্রত্যয় জন্মে বলে হানাফী ইমামগণ অভিমত পোষণ করেন। তবে খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীস দ্বারা সে ব্যাপারে দ্বিধাহীন নিশ্চিত প্রত্যয় না জম্মালেও ظن غالب বা প্রবল ধারণা জম্মায় যে, সেটি রাসূল সা.-এর বক্তব্য। ফলে সেটি রাসূল সা.এর হাদীস হওয়ার বিষয়টি ظنيّ الثبوت-এর পর্যায়ে থেকে যায় যেকারণে এক ধরণের সংশয় তাতে বিধ্যমান থাকে। মুতাওয়াতিরের ন্যায় সন্দেহাতীত প্রত্যয় জন্মায় না। তবে বিধান প্রবর্তনের জন্য যে ধরণের প্রত্যয় প্রয়োজন তা তাদ্বারা অর্জিত হয়ে যায়।

আমরা আরও জেনেছি যে, রাসূল সা.-এর কথা, কাজ, অনুমোদন এ সবই হাদীসের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং হাদীস থেকে বিধান আহরণের ক্ষেত্রে বিধানের উৎস হবে তিনটি। যথা:

১. নবী সা. এর বক্তব্য (قول الرسول)

২. নবী সা. এর কাজ (فعل الرسول)

৩. নবী সা. এর অনুমোদন (تقرير الرسول)

বক্তব্য থেকে বিধান আহরণ

নবী সা. এর বক্তব্য থেকে বিধান আহরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে, যে বক্তব্য থেকে আমরা বিধান আহরণ করব, তা রাসূল সা.-এর বক্তব্য বা হাদীস হওয়ার বিষয়টি কোন পর্যায়ের? অর্থাৎ সেটি কি قطعي الثبوت না ظَنّي الثبوت। কেননা এর উপর বিধানটি কোন পর্যায়ের হবে; অর্থাৎ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতে মুআক্কাদাহ, সুন্নত, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরুহ, মাকরূহে তাহরিমী, হারাম ইত্যাদির মাঝে কোন স্তরের হবে তা সাব্যস্ত হওয়া নির্ভর করে।

অত:পর বিধান উদ্ভাবনকারীকে 'বক্তব্যটির ধরণ কি'? তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে যে সব বিষয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা করতে হবে তা নিম্নরূপ:

এক.

বিধান আহরণকারীকে প্রথমেই জেনে নিতে হবে, যে শব্দাবলী থেকে বিধান আহরণ করা হবে তা কি সুস্পষ্ট অর্থবোধক না অস্পষ্ট অর্থবোধক। সুস্পষ্ট অর্থবোধক হলে কোন পর্যায়ের সুস্পষ্ট; কিংবা অস্পষ্ট অর্থবোধক হলে কোন পর্যায়ের অস্পষ্ট তাও জেনে নিতে হবে। কেননা সুস্পষ্টতা ও অস্পষ্টতারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এবং এর উপর বিধানের স্তর নির্ধারণের বিষয়টি নির্ভর করে।

সুস্পষ্টতার মোট স্তর ৪টি। যথা:

১. الظاহر ২. النص ৩. المؤل/المفسر ৪. المحكم

এগুলোর সংজ্ঞা ও উদাহরণ টিকায় প্রদত্ত্ব হল।[১]

---

١ : (الف)– الظاهر : هو دلالة اللفظ على معناه الوضعى البين الواضح ، ولكن لم يسق الكلام لا جل هذا المعنى، بل بفهم بظاهر العبارة ،

مثاله : قوله تعالى ان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، سيق الآية لأجل ان يقسط فى التقسيم وان كانت احدى ازواجه من اليتامى وان يراعى العدل فيه ولكن يفهم بظاهر العبارة ، على اباحة التعدد الى الأربعة ،

(ب)– النص : هو دلالة اللفظ على ما سيق له ، اى هو المقصد الأولى من البيان

مثاله : قوله تعالى احل الله البيع وحرم الربوا – سيق لأجل بيان ان ما حصل بطريق البيع وما حصل بطريق الربوا بينهما فرق متبائن فالبيع حلال والربوا حرام –

(ج)– المفسر/ المؤل : هو دلالة اللفظ على ما سيق له وقد تبين معناه من دليل آخر

مثاله: قوله تعالى – واتوا الزكوة – فبين النبى صـــ فى الحديث نصابه ومقداره فهذا هو المفسر ، واما اذا كـــان اللفـــظ ذو احتمالين فعين نص آخر – احد الإحتمالين – وعين معناه ، فصار مؤولا كما فى لفظ القروء ، فى قوله تعـــالى – ويتربصـــن

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, الظاهر দ্বারা অর্থ সুস্পষ্ট হলেও অন্যকোন তাবিলী অর্থ হওয়ার সম্ভবনা থাকে, তার বিধানটি অন্য বিধানের দ্বারা সীমিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে, অনুরূপভাবে বিধানটি রহিত হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান থাকে। অতএব অর্থ সুস্পষ্ট হলেওে তা সংশয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়।

অনুরূপভাবে نص-এর ক্ষেত্রেও তাখসীস, তা'বীল ও নস্খ এর সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। অতএব এদ্বারাও অর্থটি পূর্ণ সংশয় মুক্ত হয় না।

তবে মুফাস্সার (المفسر) ও মুআওয়ালে (المؤوّل) তাখসীস ও তাবীলের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু সেটিও নসখ বা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা মুক্ত নয়।

তবে মুহকাম (محكم)-এর মাঝে এর কোনটিরই সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং ظاهر، نص، مفسر، محكم সবগুলোই সুস্পষ্ট অর্থ প্রদান করলেও এগুলোর মাঝে তারতম্য রয়েছে। অর্থাৎ সবচেয়ে সুস্পষ্ট অর্থ প্রদান করে محكم, তার চেয়ে একটু নিম্নমানের সুস্পষ্ট অর্থ প্রদান করে مفسر। তার চেয়ে একটু নিম্নমানের সুস্পষ্ট অর্থ প্রদান করে نص, তার চেয়ে একটু নিম্নমানের স্পষ্ট অর্থ প্রদান করে ظاهر। তবে তা অস্পষ্টতার পর্যায়ে পৌঁছে না।

আবার অস্পষ্ট অর্থ প্রদানেরও ৪টি পর্যায় রয়েছে। যথা -

১. الخفي ২. المشكل ৩. المجمل ৪ المتشابه

এগুলোর সংজ্ঞা ও উদাহরণ টিকায় প্রদত্ত্ব হল।[১]

بأنفسهن ثلاثة قروء – فى معناه احتمالان الحيض والطهور باعتبار اللغة – ويوئد ان معناه الحيض حديث رواه دارقطنى – انه صلى قال طلاق الأمة تطليقتان وعدها حيضتان–

(د)– المحكم : هو اللفظ الدال على ما سبق له وهو واضح الدلالة على معناه ولا يقبل التاويل ، ولا التخصيص

مثاله : الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة –

١ . (الف)- الخفى : (فمعناه على ما قاله فخر الإسلام البزدوى) هو ما اشتبه معناه وخفى مراده بعارض خارج الصيغة لا ينال الا بالطلب –

مثاله : قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ، وان كان معنى السارق ظاهراً ولكن اشتبه هل الطرار والنشالون والنباشون داخلون فى معناه ام لا ؟ لثبوت معنى السارق فيهم من جهة، وعدم ثبوته من جهة فزعم المالك رح والشافعى رح واحمد رح انهم داخلون فى معنى السارق وزعم ابو حنيفة رح انهم ليسوا بداخلين فيه –

(ب)- المشكل : هو الذى خفى معناه بسبب فى ذات اللفظ كاللفظ المشترك –

مثاله : لفظ 'العين' له عدة معان –

(ج)- المجمل : هو الذى ينطوى معناه عدة احوال واحكام قد جمعت فيه وقال فخر الإسلام رح ما إذدحمت فيه المعانى واشتبه المراد إشتباها لا يدرك بنفس العبارة –

এগুলোর সবগুলোর অর্থই অস্পষ্ট, তবে خفي -এর চেয়ে مشكل বেশী অস্পষ্ট; مشكل এর চেয়ে مجمل আরো বেশী অস্পষ্ট; مجمل এর চেয়ে متشابه আরো বেশী অস্পষ্ট।

অস্পষ্টতা ও সুস্পষ্টতার এই যে, স্তরভেদ তা একটি হাদীসকে পরস্পর বিরোধী আরেকটি হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। অন্যথায় স্পষ্টগুলো সুস্পষ্ট অর্থবোধক বলে গণ্য হবে। আর অস্পষ্টগুলো অস্পষ্ট অর্থবোধক বলেই গণ্য হবে।

দুই.

বিধান আহরণকারীকে আরো জানতে হবে যে, যে শব্দাবলী থেকে বিধান আহরণ করা হবে তার অর্থের পরিধি কতটুকু অর্থাৎ তা কি ব্যাপক অর্থবোধক না সীমিত ও নির্দিষ্ট অর্থবোধক? ব্যাপক অর্থবোধক হলে তা কি কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা শর্তের দ্বারা সীমিত না তা শর্তমুক্ত ব্যাপক অর্থের জন্যই প্রযোজ্য। এপ্রেক্ষিত্রে তা মোট ৪ প্রকার। যথা - ১. العام ২. الخاص ৩. المطلق ৪. المقيد

এগুলোর সংজ্ঞা ও উদাহরণ টিকায় প্রদত্ত্ব হল।[১]

এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে উদ্ভাবিত বিধানের পরিধিটি কি হবে অর্থাৎ বিধানটি কাদের উপর প্রযোজ্য হবে তা বুঝার জন্য।

مثاله : أقم الصلوة – لا نعلم صورة ادائها فبيّن النبى صـــ بعمله وبقوله صلوا كما رأيتمونى –

(د-) المتشابه : هو اللفظ الذى يخفى معناه بحيث لا سيل لأن تدركه عقول العلماء لعلم ما يفسره من الكتاب والسنة –

مثاله : فواتح السور ك الف ، لام ، ميم ، وغيره وكقوله تعالى – يد الله هى العلياء – لا يعلم معنى 'يد الله ﷺ وما قسم به سبحانه تعالى فى القرآن –

١. (الف)- العام : هو اللفظ الدال على استغراق كل ما يصلح له اللفظ من كثرة الأفراد من حيث الوضـــع ، كلفظ 'الرجل ﷺ 'الناس ﷺ 'الجن ﷺ 'الإنس ﷺ 'والأسم الموصول ﷺ و 'اسماء الشروط ﷺ وغيره –

(ب)- الخاص : هو اللفظ الذى وضع لمعنى واحد على سبيل الإنفراد سواء كان ذالك المعنى جنسا او نوعـــا او فرداً كحيوان و انسان و رجل و زيد

الملاحظة : يفهم من تعريف العام والخاص ان كون اللفظ عاماً او خاصاً هو امر اضافى اى يمكن ان يكون لفـــظ باعتبار عاما وباعتبار خاصاً –

(ج)- المطلق : هو اللفظ الدال على حقيقته الموضوعة من غير وصف او قيد يقيدها كلفظة 'رقبـــة ﷺ فى قولـــه تعالى – فك رقبة يدل على تحزير رقبة عبد بغير ملاحظة ان يكون مذكراً او مؤنثاً و مؤمنا او غير مؤمن –

(د)- المقيد: هو اللفظ الدال على حقيقة مؤضوعة مقيداً بقيد او وصف او شرط او علة كما فى قولـــه تعـــالى – فتحرير رقبة مؤمنة – قيد الرقبة بقيد الإيمان –

যে বাক্যে এই আম কিংবা খাস শব্দগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানে শব্দটি কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ প্রেক্ষিতে তা আবার ৪ প্রকার হতে পারে। যথা:

১. العامّ يراد به العامّ : শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক এবং ব্যাপক অর্থের জন্যই তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

২. الخاصّ يراد به الخاص : শব্দটি সীমিত বা নির্দিষ্ট অর্থবোধক, আর সীমিত বা নির্দিষ্ট অর্থের জন্যই তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ –

৩. العامّ يراد به الخاصّ : শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক কিন্তু সীমিত অর্থের জন্য তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন - خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
اموال শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কিন্তু সব মালে যাকাত আসে না। তাই এখানে নির্দিষ্ট মালের অর্থে তা প্রয়োগ হয়েছে।

৪. الخاص يراد به العام : শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থবোধক কিন্তু ব্যাপক অর্থে তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন - فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا
"اُفٍّ" শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থবোধক। কিন্তু সব ধরণের কষ্টের অর্থেই এক্ষেত্রে শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

তিন.

তাছাড়া বাক্যে শব্দটি কি তার প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ হয়েছে না রূপক অর্থে প্রয়োগ হয়েছে তাও আমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ প্রেক্ষিতে তা দুই প্রকার। যথা -

১. الحقيقة বা প্রকৃত অর্থ । ২. المجاز বা রূপক অর্থ।

চার.

আমাদেরকে আরো পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, আমরা যে বিধানটি আহরণ করতে চাচ্ছি; সে বিধানটি বর্ণনা করাই কি হাদীসটির উদ্দেশ্য? না আমরা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে এ বিধানটি অনুধাবন করেছি, না তার ইশারা ইঙ্গিত থেকে বিধানটি অনুধাবন করেছি ? না তার ভাবার্থ থেকে তা অনুধাবন করেছি? এ প্রেক্ষিতে তা চার প্রকার । যথা:

১. صراحة النص/عبارة النص/دلالة العبارة : বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা যা বুঝা যায় অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২. اشارة النص : হাদীসের বিবরণ থেকে যে বিষয়ের ইশারা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

৩. دلالة النص : হাদীসের অর্থ থেকে যে বিষয় বোধগম্য হয় বা অন্তর্নিহিত অর্থ।

৪. إقتضاء النص : হাদীসের ভাবার্থে যে বিষয়টি প্রচ্ছন্নভাবে নীহিত আছে।

এগুলোর সংজ্ঞা ও উদাহরণ টিকায় প্রদত্ত হল।[১]

আহরণ করা হবে তা হয়ত শরীয়তের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত নাও হতে পারে। তাছাড়া মফহুমে মুখালিফ থেকে বিধান আহরণ করলে কোন কোন ক্ষেত্রে মারাত্মক ধরণের ঝটিলতা দেখা দেয়। যেমন: এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ -

আসমান যমীনের সৃজন যে দিন হয়েছে সে দিনই মাসের সংখ্যা আল্লহর নিকট ছিল বার মাস; তার মাঝে চার মাস নিষিদ্ধ মাস। এটাই আল্লাহর সৃদৃঢ় বিধান। অতএব এই নিষিদ্ধ মাসে তোমরা পরস্পরের প্রতি জুলুম করো না।

---

١ (الف)– دلالة العبارة (ويقال له ايضاً صراحة النص او عبارة النص) : هى المعنى المفهوم من العبارة سواء كان ظاهرا او نصا او مفسرا او محكما ويمكن ان يقال بلفظ آخر 'كل ما يفهم من ذات اللفظ الذى وضع له، مهما يدل عليه، يعد من قبيل دلالة العبارة'

مثاله : إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم ناراً – عبارة النص منه أن اشنع الظلم أكل اموال اليتامى ويستفاد منه معنى آخر وهو انه جريمة توجب عقاباً دنيويا وأخروياً –

(ب)– إشارة النص : وهى ما يدل عليه اللفظ بغير عبارة ولكنه يجيئ نتيجة لهذه العبارة فهو ما يفهم من الكلام ولكن لا يستفاد من العبارة –

مثاله : فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة – فعبارة النص هنا ان لا يجوز لأحد ان يزوج اكثر من واحدة ان لم يتيقن ان يمكن له إقامة العدل بينهن، ويفهم بإشارته ان إقامة العدل بين الأزواج واجب دائماً سواء كانت واحدة او اكثر –

(ج)– دلالة النص : وهو المعنى الذى يفهم من مفهوم الموافق، بعض الفقهاء يسميها القياس الجلى كما اذا دلت عبارة النص على حكم يفهم من النص، وهذا الحكم ينطبق واقعة اخرى لتحقق موجب الحكم فيه –

مثاله : ولا تقل لهما أف و لا تنهرهما – اذا ثبت ان قوله 'اف لهما' حرام فالضرب والشتم يحرم بطريق الأولى–

(د)– إقتضاء النص : وهى دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم معنى النص الا بتقديره –

مثاله : فمن عفى له من أخيه شيئ فإتباع بالمعروف واداء اليه باحسان– يفهم من هذه الآية ان العفو يكون بعوض المال والا لا يستقيم معنى قوله 'واداء اليه باحسان'

এর মফহুমে মুখালিফ বা প্রতিফলিত অর্থ হল এই চার মাস ছাড়া অন্য মাসে পরস্পরে জুলুম করার বৈধতা রয়েছে। অথচ জুলুম তো সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

অনুরূপভাবে এক হাদীসে আছে– لايبولنّ أحدكم في الماء الدائم ولايغتسلنّ فيه من الجنابة এই হাদীসে স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এরূপ স্থির পানি যাতে পেশাব করা হয় তাদ্বারা নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর একটি প্রতিফলিত অর্থ হল অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্য না হলে এরূপ পানিতে গোসল করা বৈধ। কিন্তু বাস্তবে এরূপ পানি দ্বারা গোসল করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়।[১]

তবে অনেক হানাফী ফকীহ-এর অভিমত এই যে, তা সর্বোতভাবে বর্জনীয়ও নয় আবার ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রহণীয়ও নয়। অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে মফহুমে মুখালিফ থেকে বিধান আহরণ করা যাবে; সব ক্ষেত্রে নয়। তবে মফহুমে মুখালিখকে হুজ্জত মনে না করার বিষয়টি শুধুমাত্র নুসূসে শারইয়্যার সাথেই সংশ্লিষ্ট; অন্য ক্ষেত্রে নয়। আল্লামা ইবনে হুমাম আত-তাহরীরে উল্লেখ করেছেন যে- الحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فقط– -

হানাফীগণ যে মফহুমে মুখালিফকে হুজ্জত মনে করেন না, তা কেবল শারে'-এর বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[২]

শামসুল আইম্মা কারদারী উল্লেখ করেছেন যে-

ان التخصيص الشئ بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه في خطابات الشارع، واما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فيدلّ–

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোন বক্তব্যে কোন বিধানকে বিশেষ কোন শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করে উল্লেখ করা হলে যেখানে সেই শর্তটি নেই সেখানে বিধানটি কার্যকর হবে না- এরূপ বুঝা যায় না। অর্থাৎ মফহুমে মুখালিফ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণীয় একথা বুঝা যায় না। কিন্তু অন্যান্যদের বক্তব্যে, মানুষের সাধারণ প্রচলনে, লেন-দেনের ভাষায় এবং যুক্তিবোধ্য বিষয়াসয়ের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।[৩]

শারে'-এর বক্তব্যে হানাফীগণ মফহুমে মুখালিফকে বিধানের উৎস হিসেবে গণ্য না করলেও সংযোজিত শর্তসমূহের কোনই গুরত্ব নেই তাও কিন্তু তারা বলে না।

আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, মফহুমে মুখালিফকে বিধানের

---

[১] উসূলুল ফিক্হ আবু যাহরাকৃত পৃ: ১৪৮-১৮৯।
[২] মা'আরিফুস-সুনান-খ:১, পৃ: ৫৬।
[৩] রদ্দুল-মুহতার খ: ১, পৃ: ১১৪-১১৫।

তত্ত্ব (الحكمة) তাৎপর্য (النكتة) এবং অতিরিক্ত ফায়দাহ্ (فوائد) রূপে গণ্য করতে হবে। কেননা বিষয়টি উচ্চাঙ্গের বক্তব্যের স্বাভাবিক দাবি। অন্যথায় বক্তব্যে যে শর্ত-শারায়েত সংযুক্ত করা হয় তার কোন গুরত্বই থাকবে না। বরং সেটি অর্থহীন বলে গণ্য হবে। আর নুসূসে শারইয়্যায় এধরণের অর্থহীন কোন শর্ত জুড়ে দেওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।[১]

বস্তুতঃ উপরোক্ত বিষয়গুলো উসূলে ফিকাহ অধ্যয়নের দ্বারা জানা যাবে। এগুলো জানতে হবে এজন্য যে, যে হাদীস দ্বারা আমরা বিধানটি প্রবর্তন করব, সেই হাদীসটি দ্বারা এই বিধানটি কতটা নিশ্চিতভাবে বোধগম্য হল- অর্থাৎ সেটি কি قطعي الدلالة না ظنّيّ الدلالة তা বুঝার জন্য। কেননা এর উপরও বিধানটি কোন পর্যায়ের হবে (ফরজ ওয়াজিব সুন্নত..) তা সাব্যস্ত হওয়া নির্ভর করে।

পাঁচ.

এরপর আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যে, যে শব্দ দ্বারা বিধানটি বর্ণনা করা হয়েছে তার গুরুত্ব কোন পর্যায়ের। অর্থাৎ তাকি আদেশ নিষেধের পর্যায়ের, না বিবরণ মূলক। যদি বিবরণ মূলক হয় তাহলে তাদ্বারা কি বিষয়টি অপরিহার্যরূপে করণীয় বা বর্জনীয় হওয়ার ভাব ব্যাক্ত হয়েছে, না করা বা বর্জন করার ক্ষেত্রে স্বীধনতা আছে- এরূপ ভাব ব্যাক্ত হয়েছে ?

সাধারণত أمر বা নির্দেশ সূচক ক্রিয়া দ্বারা কোন বিষয় অপরির্হাভাবে করণীয় একথাই বুঝানো হয়। যেমন: أقم الصّلوة অর্থাৎ নামায কায়েম কর। যদি এর ব্যতিক্রম কোন অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে- এরূপ কোন ইশারা ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকে, তাহলে তখন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন: فاذا حللتم فاصطادوا যখন তোমরা ইহ্রামের অবস্থা থেকে হালাল হয়ে যাও, তখন শিকার কর। এখানে اصطادوا বা শিকার কর নির্দেশসূচক ক্রিয়া হলেও ইহ্রাম ভঙ্গ করার পর শিকার করা অপরিহার্য- এরূপ উদ্দেশ্য নয়। বরং ইহরামের অবস্থায় শিকার করা যে নিষেধ ছিল তা ইহরাম ভাঙ্গার পর আর বহাল নেই, কেউ ইচ্ছা করলে এখন শিকার করতে পারে অর্থাৎ 'শিকার করা' তার জন্য বৈধ একথা বুঝানোই উদ্দেশ্য।

অনূরূপভাবে فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا 'তাদের সঙ্গে মুকাতাবাহ্[২] চুক্তিতে আবদ্ধ হও' যদি তাতে তাদের কল্যাণ হবে বলে মনে কর। এখানে فَكَاتِبُوهُمْ

---

১ মা'আরিফুস্-সুনান-খ:১, পৃ: ৫৫-৫৬।

২ মুকাতাবাহ্- গোলামের সাথে মালিকের এমর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, যদি তুমি নিজে উপার্জন করে এত দিনের মাঝে এত টাকা পরিশোধ করতে পার তাহলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে। এরূপ চুক্তিকে মুকাতাবাহ্ চুক্তি বলা হয়।

'মুকাতাহ্র চুক্তিতে আবদ্ধ হও' এটি নির্দেশসূচক ক্রিয়া হলেও এর দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য এরূপ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হওয়া উত্তম। যা আয়াতের শেষাংশ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا 'যদি তাতে তাদের কল্যাণ হবে বলে মনে কর' এই বাক্য দ্বারা বোধগম্য হয়।

আর نهي বা নিষেধ সূচক ক্রিয়া দ্বারা সাধারণত: কোন বিষয় অপরিহার্যভাবে বর্জনীয় এ অর্থই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন: ولا تقربو الزنا 'যিনার নিকটস্থ হয়ো না'। তবে যদি ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা অন্যকোন অর্থ হওয়ার কথা বুঝা যায়, তখন সেক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থটি গ্রহণ করা হয়। যেমন : ولاتسبّوا الديك فانه يوقظكم للصلوة ' মোরগকে গালি দিয়োনা'। কেননা সে তোমাদেরকে নামাযের জন্য জাগায়। এর অর্থ হল গালি দেওয়া ঠিক নয় (মাকরূহ)।

আবার جمله خبرية দ্বারা সাধারণত: কোন বিষয়ের বিবরণ পেশ করাই উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু বিবরণের মাঝ দিয়েও আবার কাজটি অপরিহার্যভাবে করণীয় বা বর্জনীয় তা বোঝানো যায়। যেমন: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 'তোমাদের জন্য রোযাকে অবধারিত করা হয়েছে'। এর দ্বারা রোযা অপরিহার্যভাবে পালনীয় একথা বুঝানো হয়েছে। هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الخ এর অর্থ হল- যদি তোমরা মুত্তাকি হতে চাও তাহলে উল্লেখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন কর। أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا এর অর্থ হল- কোন প্রাণীকে বধ করো না। বস্তুতঃ সাধারণ বিবরণ দ্বারা কোন কাজ করা কিংবা বর্জন করা অপরিহার্য কি না, তা পারিপার্শিক বর্ণনা থেকে অনুধাবন করা যায়। সুতরাং কোন্ কাজ করার জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে কিংবা কোন্ কাজ বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে, যে বাক্য দ্বারা এই অপরিহার্যতাকে বুঝানো হবে তা মোট চার প্রকার -

১. الأمر বা নির্দেশসূচক ক্রিয়া।

২. خبر بمعنى الأمر সাধারণ বিবরণ যা নির্দেশের অর্থ বহন করে।

৩. نهي নিষেধসূচক ক্রিয়া।

৪. خبر بمعنى النهي সাধারণ বিবরণ যা নিষেধের অর্থ বহন করে।

অপরিহার্যভাবে করণীয় ও বর্জনীয় হওয়ারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন, বিষয়টি সম্পর্কে আদেশ করা হয়েছে বা নিষেধ করা হয়েছে, আবার অমান্য করার জন্য শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা তিরস্কার করা হয়েছে। কিংবা তিরস্কার বা শাস্তি কোনটির কথাই উল্লেখ করা হয়নি।

আবার নবী সা. হয়ত সে কাজ সব সময় করেছেন, কখনো বর্জন করেননি। কিংবা সবসময় করলেও মাঝে মধ্যে বর্জন করেছেন। কিংবা নবী সা. করলেও সব সময় করেননি। কেউ বর্জন করলে তিনি কটাক্ষ বা সমালোচনাও করেননি। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখেই একটি বিধানের পর্যায় নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবনে নুজায়ম উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন ও হাদীসের দলীল সমূহ স্ত র ভেদে চার প্রকার। যথা:

১. قطعي الثبوت و قطعي الدلالة অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং অর্থও সুস্পষ্ট।

২. ظنّي الثبوت و قطعي الدلالة প্রামাণ্যতা সংশয়যুক্ত কিন্তু অর্থ সুস্পষ্ট ।

৩. قطعي الثبوت و ظنّي الدلالة অকাট্যভাবে প্রমাণিত কিন্তু অর্থ সংশয়যুক্ত।

৪. ظنّي الثبوت وظنّي الدلالة প্রামাণ্যতাও সংশয়যুক্ত এবং অর্থও সংশয়যুক্ত।

১. قطعي الثبوت و قطعي الدلالة : যদি দলীলটি قطعي الثبوت বা সংশয়মুক্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার অর্থও قطعي الدلالة অর্থাৎ দ্বার্থতামুক্ত সুস্পষ্ট হয়, (অর্থাৎ হাদীসটি যে সূত্রে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তাতে যদি কোনরূপ সংশয় সন্দেহ বিদ্যমান না থাকে, আর যে অর্থের প্রেক্ষিতে বিধানটি আহরণ করা হচ্ছে তাতে যদি কোনরূপ দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা, কিংবা দ্বিধা-সংশয় বিদ্যমান না থাকে,) আর সেই বক্তব্যটি যদি (ايجابي) বা ইতিবাচক হয় অর্থাৎ যদি তা করণীয় হওয়া সংক্রান্ত বক্তব্য হয়, তাহলে তা দ্বারা উদ্ভাবিত বিধানটি ফরয বলে গণ্য হবে। আর যদি সেই বক্তব্যটি (سلبي) বা নেতিবাচক হয় অর্থাৎ বর্জনীয় হওয়া সংক্রান্ত বক্তব্য হয়, তাহলে তাদ্বারা যে বিধান উদ্ভাবিত হবে তা হারাম বলে গণ্য হবে। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, যদি বিষয়টি করার জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়ে থাকে; তা أمر বা নির্দেশসূচক ক্রিয়ার মাধ্যমেই নির্দেশ প্রদান করা হয়ে থাকুক বা خبر بمعنى أمر দ্বারাই নির্দেশ দেওয়া হোক, তাহলে তাদ্বারা উদ্ভাবিত বিধানটি ফরয বলে গণ্য হবে।

আর যদি শরীয়ত তা বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে থাকে; তা نهي বা নিষেধ সূচক ক্রিয়ার মাধ্যমেই নিষেধ করা হোক কিংবা خبر بمعنى النهي বা নিষেধের অর্থ জ্ঞাপক সাধারণ বিবরণের মাধ্যমেই নিষেধ করা হয়ে থাকুক, তাদ্বারা উদ্ভাবিত বিধানটি হারাম (حرام) বলে গণ্য হবে। যেমন কুরআনের আয়াত সমূহ এবং মুতাওয়াতির ও মশহুর হাদীসসমূহ (হানাফীগণের অভিমত অনুসারে) শংসয়হীন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এধরণের মুতাওয়াতির কোন হাদীসের অর্থও যদি দ্বার্থহীন সংশয়মুক্ত ও সুস্পষ্ট হয়, তাহলে এদ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধানটি ইতিবাচক

বা (ايجابي) হলে ফরক হবে, আর নেতিবাচক বা (سلبي) হলে হারাম হবে।

২. ظنيّ الثبوت وقطعي الدلالة : যদি দলীলটির প্রামাণ্যতা সংশয়মুক্ত না হয় কিন্তু তার বক্তব্য দ্বিধামুক্ত দ্বার্থহীন হয় (অর্থাৎ দলীলটি যে সূত্রে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তা যদি সম্পূর্ণরূপে সংশয় কাটিয়ে উঠতে না পারে; যেমন খবরে ওয়াহিদ মুতাওয়াতিরের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত নয়; এমতাবস্থায় যে অর্থের প্রেক্ষিতে বিধানটি আহরিত হচ্ছে সেই অর্থের ক্ষেত্রে যদি কোনরূপ দ্বিধা সংশয় না থাকে) তাহলে তাদ্বারা যে বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে তা امر বা নির্দেশসূচক ক্রিয়া দ্বারা ব্যাক্ত হোক কিংবা خبر بمعنى أمر দ্বারাই ব্যাক্ত হোক; তাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধানটি ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। আর নেতিবাচক ক্ষেত্রে বিধানটি نهي বা خبر بمعنى النهي এর যেকোন শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত করা হোক, তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধানটি মাকরূহে তাহরিমী বলে গণ্য হবে।

৩. قطعي الثبوت وظنيّ الدلالة : যদি দলীলটি قطعي الثبوت বা সংশয়মুক্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তার অর্থ যদি দ্বিধামুক্ত দ্বার্থহীনভাবে সুস্পষ্ট না হয়; যেমন কোন একটি হাদীস মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। কিন্তু তার অর্থ যদি দ্বার্থহীন না হয় অর্থাৎ যে অর্থটি গ্রহণ করা হয়েছে সুনিশ্চিতভাবে সেটিই হাদীসটির অর্থ তা যদি সাব্যস্ত না হয়, তাহলে তাদ্বারা যে বিধান উদ্ভাবিত হবে তা امر বা নির্দেশ সূচক ক্রিয়া দ্বারা ব্যাক্ত হোক বা خبر بمعنى امر অর্থাৎ নিষেধের অর্থ জ্ঞাপনকারী সাধারণ বিবরণ দ্বারাই ব্যাক্ত করা হোক, তা ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। আর নেতিবাচক ক্ষেত্রে বিধানটি نهي বা নিষেধসূচক ক্রিয়া কিংবা خبر بمعنى النهي বা নিষেধের অর্থ জ্ঞাপনকারী কোন সাধারণ বিবরণ দ্বারাই ব্যাক্ত হোক, তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধানটি মাকরূহে তাহরিমী বলে গণ্য হবে।

৪. ظنيّ الثبوت وظنيّ الدلالة : অর্থাৎ দলীলটি যদি সংশয়মুক্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত না হয় এবং তার অর্থও যদি দ্বার্থহীন শংসয়মুক্ত ও সুস্পষ্ট না হয়; যেমন কোন একটি হাদীস যদি খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের হয়, আর তার অর্থ যদি সংশয়মুক্ত দ্বার্থহীন সুস্পষ্ট না হয়, তাহলে তাদ্বারা যে বিধান উদ্ভাবিত হবে তা (ايجابي বা ইতিবাচক হলে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে। আর নেতিবাচক হলে তা মাকরুহ বলে গণ্য হবে।[১]

---

[১] শামী খণ্ড: ১ পৃ: ২০৭। (গ্রন্থকারের ব্যখ্যাসহ)

এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ফরয ও ওয়াজিবের যে বিভাজন তা কেবল হানাফী ইমামগণের নিকট। অন্যরা এই বিভাজন করেন না তারা অপরিহার্যরূপে করণীয় সব বিষয়কে একই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত মনে করেন। তাই তারা ফরয্ ও ওয়াজিব দুটো শব্দকেই সমঅর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। অর্থাৎ দুটো শব্দ দ্বারাই তারা অপরিহার্যরূপে করণীয় এই অর্থ গ্রহণ করে থাকেন।

আল্লামা ইউসুফ বিননূরী রহ. মা'আরেফুস সুনানে উল্লেখ করেছেন যে, শারে' (شارع) বা বিধান দাতা তথা আল্লাহ ও রাসুল যখন কোন বিধান امر বা নির্দেশসূচক ক্রিয়া দ্বারা ব্যাক্ত করেন, তখন তা দ্বারা সাধারণত অপরিহায়ভাবে করণীয়- এ অর্থটিই বুঝানো হয়ে থাকে। (অনুরূপভাবে যখন نهي বা নিষেধাজ্ঞাসূচক ক্রিয়া দ্বারা কোন বিধান ব্যাক্ত করা হয়, তখন তাদ্বারা সাধারণত: অপরিহার্যভাবে তা বর্জনীয়- এ অর্থই বোঝানো হয়ে থাকে। তবে যদি কোন ইশারা ইঙ্গিত বা অন্যান্য লক্ষণাদী দ্বারা কিংবা অন্য কোন বিবরণ দ্বারা বিষয়টি অপরিহার্যভাবে করণীয় বা বর্জনীয় না হওয়ার অর্থ বোধগম্য হয়, তখন তা ভিন্ন অর্থে প্রযোগ হয়েছে বলে ধরা হবে। তবে কোন অর্থে তা প্রয়োগ হয়েছে তাও লক্ষণাদী ও ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা মুজ্‌তাহিদ নির্ধারণ করবেন।

আদেশ (امر) বা নিষেধ (نهي) সূচক ক্রিয়া দ্বারা অপরিহার্য্যভাবে করণীয় বা অপরিহার্যভাবে বর্জনীয় এ অর্থ গ্রহণ করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন -

১. বিধানটি অমান্য করলে যদি তার জন্য (وعيد) বা শাস্তির কথা বিধানের সাথে বর্ণিত থাকে।

২. বিধানটি অমান্য করলে তার জন্য ভর্ৎসনা বা نكير করা হয়েছে বলে যদি উল্লেখ পাওয়া যায়।[১]

৩. নবী সা. এ ব্যপারে مواظبة করতেন অর্থাৎ সবসময় করতেন, কখনই বর্জন করতেন না বলে যদি প্রমাণিত হয়।[২]

সারকথা এই যে-

---

[১] نكير তিরস্কার পাওয়া গেলে তার দ্বারা বিষয়টি ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। এটি আল্লামা ইবনে হুমাম এবং আল্লামা ইবনে নুযাইম উভয়েরই অভিমত।

[২] ইব্‌নে হুমাম মনে করেন, নবী সব সময় করতেন কখনোই বর্জন করতেন না এ কথা প্রমাণিত হলে তার দ্বারাও বিষয়টি অপরিহার্যভাবে করণীয় (واجب) বলে সাব্যস্ত হবে। অবশ্য ইবনে নুযাইম মনে করেন যে, নবী সা. সব সময় করতেন এর দ্বারা বিষয়টি সুন্নত বলে সাব্যস্ত হবে। -মা'আরিফুস্ সুনান খণ্ড: ১ পৃ: ৭১-৭২।

১. যদি নির্দেশসূচক ক্রিয়া الامر বা خبر بمعنى امر নির্দেশসূচক ক্রিয়ার অর্থজ্ঞাপনকারী কোন বর্ণনা দ্বারা যদি কোন বিষয় অপরিহার্যভাবে করণীয় হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়, আর যে দলীলের দ্বারা বিষয়টি উদ্ভাবন করা হচ্ছে তা যদি قطعي الثبوت وقطعي الدلالة পর্যায়ের হয় এবং তা অমান্য করার কারণে যদি وعيد বা শাস্তির কথা উল্লেখ থাকে তাহলে তা দ্বারা যে বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে তা (فرض) ফরয্ বলে গণ্য হবে।

২. আর امر বা خبر بمعنى امر দ্বারা ব্যাক্ত কোন বিষয় যদি অপরিহার্যভাবে করণীয় হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়, কিন্তু দলীলটি যদি قطعي الدلالة ظنّي الثبوت কিংবা ظنّي الدلالة قطعي الثبوت পর্যায়ের হয়, আর যদি তা অমান্যকারীর জন্য শাস্তির কথা উল্লেখ থাকে কিংবা যদি نكير বা তিরস্কার করা হয়ে থাকে, কিংবা (আল্লামা ইবনে হুমামের মতে) যদি নবী কারীম সা. তার উপর مواظبة করতেন অর্থাৎ সবসময় করতেন কখনো বর্জন করতেন না বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধানটি ওয়াজিব (واجب) বলে গণ্য হবে।

৩. আর امر কিংবা خبر بمعنى امر দ্বারা ব্যাক্ত কোন বিষয় যদি অপরিহার্যভাবে করণীয় না হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়, আর যে দলীলের মাধ্যমে বিষয়টি উদ্ভাবন করা হচ্ছে তা যদি ظنّي الثبوت قطعي الدلالة পর্যায়ের হয়, আর (ইবনে নুজায়মের মতে) যদি তার উপর নবী সা.-এর مواظبة পাওয়া যায় অর্থাৎ তিনি সব সময় করতেন কখনো বর্জন করতেন না, কিংবা (আনওয়ার শাহ কাশমিরীর মতে) সব সময় করলেও মাঝে মধ্যে বর্জন করতেন বলে যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধানটি সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বলে গণ্য হবে।

৪. আর امر বা خبر بمعنى امر দ্বারা বর্ণিত কোন বিষয় যদি অপরিহার্য পর্যায়ের করণীয় না হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয় আর যে দলীলের মাধ্যমে বিধানটি উদ্ভাবিত হচ্ছে তা যদি ظنّي الثبوت وظنّي الدلالة পর্যায়ের হয়। আর নবী সা. তা করলেও অব্যাহতভাবে করেননি, কিংবা করার জন্য অন্যদেরকে উৎসাহিত করেছেন, কিন্তু না করলে তার জন্য তিরস্কার ও ভৎসনা করেননি -এরূপ প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধানটি সুন্নতে যায়েদাহ বা মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে।

আর نهي এর ক্ষেত্রেও ফরজের বিপরীতে হারাম, ওয়াজিবের বিরীতে মাকরূহে তাহরিমী, সুন্নত মুস্তাহাবের বিপরীতে মাকরূহ বলে গণ্য হবে।

৫. আর যদি امر বা خبر দ্বারা বিবৃত কোন বক্তব্য থেকে কোন কাজ করা না করা উভয় বিষয়ের স্বাধীনতার অর্থ বোধগম্য হয় তাহলে বিষয়টি মুবাহ (مباح) বলে গণ্য হবে।

কর্মের আলোকে নিসৃত বিধান

আর রাসুল সা.-এর فعل বা কর্ম দ্বারা যে বিধান উদ্ভাবন করা হবে, তার ব্যপারে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। কেঁউ কেউ বলেছেন যে, কর্মের আলোকে উদ্ভাবিত বিধানসমূহ ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন মনদূব (مندوب) বা মুস্তাহাব (مستحب) বলে গণ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অভিমত এই যে, যদি উক্ত কর্মের ব্যপারে অন্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায়, যাদ্বারা বিষয়টি অপরিহার্য হওয়ার কথা বুঝা যায়, তাহলে তার আলোকে উদ্ভাবিত বিধানটি ওয়াজিব (واجب) বলে গণ্য হবে। আর যদি সেই বিবরণ থেকে কাজটি উত্তম ও প্রশংসনীয় হওয়ার অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু অপরিহার্য হওয়ার অর্থ বোধগম্য হয় না, ‘তাহলে তার আলোকে নিসৃত বিধানটি মুস্তাহাব (مستحب) বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি কর্মের ব্যপারে অন্যকোন বিবরণ না পাওয়া যায়, তাহলে দেখতে হবে কাজটি কোন ধরণের। যদি কাজটি উত্তম ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন জাতীয় হয়, তাহলে তা মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে। আর যদি তা বৈধ জাতীয় কাজ হয় তাহলে তা মুবাহ (مباح) বলে গণ্য হবে।[১]

তাকরীর (التقرير) বা অনুমোদনের দ্বারা উদ্ভাবিত বিধান :

বস্তুতঃ তাকরীর বা অনুমোদন দ্বারা যেসব বিধান উদ্ভাবিত হবে সেগুলোও مباح বা বৈধ বলে গণ্য হবে।[২]

একটি জ্ঞাতব্য বিষয়

ফরয ও ওয়াজিব বর্জন করলে তার জন্য ব্যক্তি গুনাহগার হবে এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। যদিও হানাফীগণ ছাড়া অন্যান্যরা ফরয ও ওয়াজিবের মাঝে কোন পার্থক্য করেন না।

তবে সুন্নত বর্জন করার কারণে ব্যক্তি গুনাহগার হবে কি না এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লামা ইবনে হুমাম মনে করেন যে, সুন্নত বর্জনকারী গুনাহগার সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু কেউ যদি সুন্নত বর্জনে অভ্যস্ত হয়ে

---

[১] বিদায়াতুল মুয়্তাহিদ পৃঃ ১-৩ দ্রষ্টব্য।

[২] বিদায়াতুল মুয়্তাহিদ পৃঃ ১-৩ -এর ভাব অবলম্বনে।

পড়ে, তাহলে সুন্নতের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শনের অপরাধে সে গুনাহগার হবে। ইবনে আমিরিল হজ্জও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন- যে সুন্নত বর্জণকারী গুনাহগার হবে না। কিন্তু যদি কেউ সুন্নত বর্জনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে কিংবা সুন্নতকে অস্বীকার করে, তাহলে সে অবশ্যই গুনাগার হবে। পক্ষান্তরে বাহ্‌রুর রায়েকের গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে নুজায়ম মনে করেন যে, সুন্নত বর্জনকারী অবশ্যই গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। তবে তিনি এও বলেছেন যে, সুন্নত বর্জনের গুনাহ অবশ্যই ওয়াজিব বর্জনের গুনাহ থেকে হালকা হবে।[১]

---

[১] মা'আরেফুস সুনান খণ্ড : ১ পৃ: ৭২।

পরিশিষ্ট -২

(حجيّة الحديث) হাদীস শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি

কুরআনের ন্যায় হাদীসও ইসলামী শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি -এটি উম্মাহর সর্বজন স্বীকৃত একটি বিশ্বাস। আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও ফুকাহায়ে উম্মতের কারো এতে কোনরূপ দ্বিমত নেই। কিন্তু পাশ্চাত্যের ইসলামবিদ্বেষী মহল এবং তাদের পদলেহী কতিপয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবি ইসলাম সম্পর্কে তাদের স্বকল্পিত ধ্যান-ধারণার পথে হাদীসের সুরক্ষিত বিশাল ভাণ্ডারকে অন্তরায় মনে করে, হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা তথা সেগুলোর হুজ্জত বা প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার উপর সন্দেহের ধুম্রজাল ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং হাদীস প্রামাণিক ভিত্তি তথা হুজ্জত হওয়ার বিষয়ে উম্মতকে দ্বিধাগ্রস্থ করে তোলার জন্য বলতে গেলে অহেতুক চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কিত করেছেন।

পাশ্চাত্যের অন্যতম চিন্তাবিদ হাঙ্গেরীর অধিবাসী গোল্ড যিহার ও তার ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত মিশরের অধ্যাপক ত্বহা হোসাইন, অধ্যাপক-ইসমাঈল আদহাম, ড. আলী হাসান আব্দুল কাদের, তুরস্কের যিয়া গোক আলাপ্লো, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব স্যার সৈয়দ আহমদ খান, আসলাম জয়রাজপুরী, গোলাম পারভেজ, এনায়েত উল্লাহ মাশরেকী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে হাদীস অস্বীকারের এই ফিতনা নতুন কিছু নয়। বরং এটা অতি প্রাচীন এক ফিতনা যা রং পাল্টিয়ে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলা হয় যে, মুলহিদ, যিন্‌দীক, রাফেযী ও এক শ্রেণীর মু'তাযিলাদের থেকে এই ফিতনার প্রথম সূচনা হয়। বস্তুতঃ এরা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে অস্বীকার করে। যেমন হাশর-নশর, আল্লাহর দীদার, জান্নাত জাহান্নাম ইত্যাদি- যার সুস্পষ্ট বর্ণনা হাদীসে রয়েছে। অতএব এগুলোকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে হাদীসকে অস্বীকার করারই নামান্তর। আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহ. مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة নামক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে-

إن زنديقا رافضيًا كان يقول : إن السنة النبوية والأحاديث الشريفة ليست بحجة، إنما الأصل هو القرآن، فألفت هذه الرسالة .

জনৈক রাফেযী যিনদীক বলত যে, হাদীস হুজ্জত নয়; মূল বিষয় হল কুরআন- তার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই আমি এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছি। তিনি আরো বলেন যে, এটি ঐ রাফেযীর নিজের উদ্ভাবিত কোন বক্তব্য নয়। বরং এটি

অনেক পূর্ব থেকে চলে আসা একটি ফিতনা। মূলত যিনদীকরা হলো গোড়াপন্থী রাফেযীদের একটি দল। তারা হাদীসের প্রামাণিক ভিত্তি বা হুজ্জত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে থাকে। ঐ রাফেযী মূলত তাদের থেকেই এ দৃষ্টিভঙ্গি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে।

এথেকে বুঝা যায়, হাদীসকে প্রামাণিক ভিত্তি হিসাবে অস্বীকার করার এই ফিতনা অতিপ্রাচীন এক ফিতনা। বস্তুতঃ এরা বিভিন্নভাবে হাদীস ও হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমালোচনা করেছে এবং হাদীসগুলো হুজ্জত বা প্রামাণিক ভিত্তি নয়, এ কথা প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছে। এদের প্রত্যেকের ধ্যান-ধারণা ও বক্তব্য এক ছিল না। তবে সবাই কোন না কোনভাবে হাদীসের প্রামাণ্যতাকে অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্যগুলোকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত ৪টি মৌলিক ধারায় তা ব্যক্ত করা যায়। যথা:

১. তাদের কতিপয় মনে করতেন যে, নবীর দায়িত্ব শুধুমাত্র একজন সংবাদ বাহকের ন্যায়। আল্লাহর কালামকে মানুষ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেওয়া, এতটুকুই তার যিম্মাদারী। সুতরাং তার নিজের উক্তি ও বক্তব্য, তার পক্ষ থেকে বর্ণিত বিধি-বিধান উম্মতের জন্য দ্বীন হিসাবে অনুসরণীয় নয়। তবে হ্যাঁ এক্ষেত্রে তার ভূমিকা একজন সম্রাটের ন্যায়। প্রজারা যেমন সম্রাটের আদেশ নিষেধ মানার জন্য আইনগতভাবে বাধ্য; কিন্তু এর সাথে তাদের দ্বীন ও ঈমানের কোন সম্পর্ক থাকে না, নবীর সুন্নতের পর্যায়ও ঠিক তদ্রুপ। এর সাথে মানুষের দ্বীন ও ঈমানের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ এগুলো প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পর্যায়ে পড়ে যা প্রজাদের জন্য পালনীয়।

২. তাদের কতিপয়ের ধারণা ছিল যে, নবীর অনুসরণ তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত অপরিহার্য ছিল। আর এই অপরিহার্যতা তাঁর জীবনকালের সাথে সীমিত ছিল। পরবর্তী কালের লোকদের জন্য তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য পর্যায়ের নয়। অর্থাৎ পরবর্তী কালের লোকদের জন্য তা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অনুসরণীয় বলে গণ্য হবে না।

৩. তাদের আর কতিপয়ের ধারণা এরূপ ছিল যে, যেহেতু নবীকে কুরআন উম্মতের নিকট পৌছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, অতএব কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তাঁর মতামত উম্মতের জন্য অবশ্য অনুসরণীয় বটে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ও মতামত উম্মতের জন্য আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয় নয়।

৪. তাদের আর কতিপয়ের মতামত এরূপ ছিল যে, যদিও নবীর কথা, কাজ ও মৌন অনুমোদন এক কথায় নবীর সুন্নত উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয় বিষয় ছিল, কিন্তু তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকেনি। কেননা নবীর

জীবদ্দশায় সেগুলো সংকলিত হয়নি, হয়েছে অনেক পরে, হিজরী তৃতীয় শতকের এদিকে। আর এই দীর্ঘ সময় তা অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের স্মৃতিপটে থেকেছে এবং তাদের পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে। কে জানে ঐ অশিক্ষিত লোকেরা সেগুলো কতটা অনুধাবন করতে পেরেছে, কতটা যথার্থভাবে ধারণ করেছে? সুতরাং সেগুলোকে সন্দেহাতীতভাবে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা যায় না। যেহেতু তা সন্দেহাতীতভাবে সংরক্ষিত থাকেনি, তাই সেগুলো অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অনুসরণীয় হওয়ার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। অতএব সেগুলোকে নির্বিচারে প্রমাণযোগ্য বলে মনে করা যায় না। সুতরাং যা আমাদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে, সেগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি। তবে যেগুলো আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে না, সেগুলো অবশ্যই বর্জনীয় হবে। আর এই গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার মানদণ্ড হবে আমাদের নিজেদের বিবেক।

উপরোক্ত চার ধরণের বক্তব্যকে সমন্বিত করলে আমাদের সামনে চারটি মৌলিক প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। যথা :

ক. নবীর দায়িত্বের পরিধি কতটুকু ছিল?

খ. কুরআনের ব্যাখ্যা ছাড়া নবীর অন্যান্য বক্তব্য, দৈনন্দিন জীবনের কাজ কর্ম ও মৌন অনুমোদন আমাদের জন্য অনুসরণীয় কি না?

গ. নবীর অনুসরণের প্রশ্নটি কোন কালের সাথে সীমিত কি না?

ঘ. নবীর সুন্নত তথা হাদীস হিসাবে যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে, নির্ভুল ও অবিকৃত অবস্থায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে কি না?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা কুরআনে কারীম থেকে খুঁজতে চেষ্টা করব। অতপর আমরা নবীর অনুসরণের পক্ষে কয়েকটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করব।

নবীর দায়িত্বের পরিধি কুরআনে কারীমের আলোকে

মুহাম্মদ সা. মূলত ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী ও রাসূল। রাসূল হিসাবে তাঁর উপর যে সকল দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অর্পিত হয়েছিল সেগুলোর সফল ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই ছিল তাঁর জীবনের মূল মিশন। মানুষের মাঝে মানবতাবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে ইনসানিয়্যাতকে পূর্ণাঙ্গতার চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর মূল দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য যা যা করণীয় ছিল, তার সবই নববী যিম্মাদারীর পরিধিভুক্ত বলে গণ্য ছিল। তবে এই সামগ্রিক দায়িত্বের মাঝেও বেশ কিছু বিষয়

এমন রয়েছে যেগুলো অধিক গুরুত্ব বহন করে বিধায় মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বিশেষভাবে সেগুলোর উল্লেখ করেছেন। আমাদের ধারণামতে, নবীপ্রেরণের উদ্দেশ্যাবলী, নবীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সুসম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে আল-কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো নববী দায়িত্বের মৌলিক শিরোনামের মর্যাদা রাখে।

আমরা নিম্নে এধরণের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করছি, যাতে নবীর দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(١) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ –

তিনিই উম্মীদের মাঝে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করেন এবং তাদের আত্মশুদ্ধি করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।[১]

(٢) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ○

মহান আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যেহেতু তিনি তাদেরই মাঝ থেকে তাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের সামনে তিলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পরিশোধিত করেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।[২]

(٣) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا○

হে নবী ! আমিতো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে। আর আল্লাহর অনুমোদন ক্রমে তাঁরই প্রতি আহ্বানকারী হিসাবে এবং আলো বিকিরণকারী প্রদীপরূপে।[৩]

(٤) إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ –

আমি সত্যসহ তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি সেই কিতাব অনুসারে আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞার আলোকে মানুষের মাঝে বিচার মিমাংসা কর।[৪]

---

১ সূরা- ৬২: জুম'আহ : ২।

২ সূরা: ৩ আলে ইমরান : ১৬৪।

৩ সূরা : ৩৩ আহ্যাব : ৪৫-৪৬।

৪ সূরা: ৪ নিসা: ১০৫।

(৫) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ —

আর আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি; যাতে মানুষের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তুমি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও।[১]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ নিয়ে গবেষণা করলে নববী দায়িত্বের মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নোক্ত শিরোনামে প্রকাশ করা যায় :

* বান্দা ও আল্লাহর মাঝে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করা। رَسُولاً مِّنْهُمْ শব্দে যার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।[২]
* মানুষকে আল্লাহর কালামের পঠন ও পাঠনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি শিক্ষাদান। يَتْلُو عَلَيْهِمْ বাক্যে যার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।[৩]
* আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত উপদেশ ও হিদায়াত, আদেশ-নিষেধ, আইন-কানুন, বিধি-বিধান এবং এর তত্ত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে সমাজকে বুঝানো এবং সেগুলো তাদেরকে শিক্ষা দান। وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ এর মাঝে যার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।[৪]
* আল্লাহর নির্দেশিত পথ ও পন্থার প্রতি সমাজকে দাওয়াত দেওয়া ও আহ্বান জানানো। داعيا إلى الله باذنه এর মাঝে যার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।[৫]
* সমাজের মানুষের নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলীকে সুসংহত ও উন্নত করার মাধ্যমে তাদেরকে আখলাক ও ইনসানিয়্যাতের চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছে দেওয়া। وَيُزَكِّيهِمْ এর মাঝে যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।[৬]
*পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়নে রেখে সময়ানুপাতে কর্মপন্থা নির্ধারণের কর্মকৌশল শিক্ষা দান। والحكمة শব্দের ভাবার্থ থেকে যা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।[৭]
* আল্লাহর বিধানানুসারে ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক বিচারব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ এর মাঝে যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।[৮]

---

[১] সূরা: ১৬- নহল : ৪৪।
[২] সূরা : জুমআহ আয়াত-২ দ্রষ্টব্য।
[৩] সূরা : জুমআহ আয়াত-২ দ্রষ্টব্য।
[৪] সূরা : জুমআহ আয়াত-২ দ্রষ্টব্য।
[৫] সূরা: আহযাব আয়াত ৪৬ দ্রষ্টব্য।
[৬] সূরা: বাকারা আয়াত ১২৯ দ্রষ্টব্য।
[৭] সূরা : জুম'আহ আয়াত ২ দ্রষ্টব্য।
[৮] সূরা: নিসা আয়াত ১০৫ দ্রষ্টব্য।

* মানুষের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা তথা জীবন বিধানকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া, কর্মময় জীবনে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়ে তার সম্ভাব্যতা, কার্যকারিতা ও সুফলকে সুস্পষ্ট করে দেওয়া। لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ-এর মাঝে যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।[১]
* অনুগতদের জন্য ইহলৌকিক জীবনের সফলতার ও পারলৌকিক জীবনে অফুরন্ত নিয়ামত তথা জান্নাতের অনাবিল সুখের সুসংবাদ দান করা। بشيراً শব্দে যার ইঙ্গিত রয়েছে।[২]
* গাফেল ও নাফরমানদের জন্য দুনিয়ার জীবনে সংকটাচ্ছন্নতা ও পরকালে কঠিন শাস্তি তথা জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করা। نذيراً শব্দে যার ইঙ্গিত রয়েছে।[৩]
* পরজগতের বিষয়াসয়ের ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর দায়িত্ব পালন করা। شاهدا শব্দে যার ইঙ্গিত রয়েছে।[৪]
* ইহধাম ত্যাগ করার পরেও যাতে তার হিদায়াত ও কর্মপন্থা দ্বারা সমাজের মানুষ উপকৃত হতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাওয়া। سراجا منيراً বাক্যে[৫] যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। -সূরা : আহযাব আয়াত ৪৬ দ্রষ্টব্য।

যেহেতু নবী এইসব কর্ম সম্পাদনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, অতএব এসকল ক্ষেত্রেই তাঁর বক্তব্য ও নির্দেশিত পন্থা চুড়ান্ত হবে নি:সন্দেহে। আর এসকল ক্ষেত্রের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তিনি যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, যা তিনি করে দেখিয়েছেন, যা তিনি করার জন্য অনুমোদন করেছেন তাঁর উম্মত ও অনুসারীদের জন্য তা অনুসরণ করে চলা একান্ত অপরিহার্য ও অবশ্য পালনীয় হবে নি:সন্দেহে। পরবর্তীতে যারাই তাঁকে অনুসরণ করবে এবং তাঁর শিক্ষা ও তরবিয়্যতের অধীন হবে তাদেরকেও

---

[১] সূরা : নাহল আয়াত ৪৪ দ্রষ্টব্য।

[২] সূরা ঃ আহযাব আয়াত ৪৫ দ্রষ্টব্য।

[৩] সূরা ঃ আহযাব আয়াত ৪৫ দ্রষ্টব্য।

[৪] সূরা ঃ আহযাব আয়াত ৪৫ দ্রষ্টব্য।

[৫] কেননা سراجا منيراً অর্থাৎ আলোকিত সূর্য। সূর্য যেমন আকাশে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সরাসরি আলো বিকিরণ করে পৃথিবীকে আলোকিত করে; তেমনি অস্তমিত হলেও অর্থাৎ রাতের বেলায় চাঁদের উপর আলো বিকিরণ করে চাঁদের আলো দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলে। নবীকে আলোকিত সূর্য বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জীবদ্দশায় সরাসরি মানুষের কল্যাণ কামনায় নিরত থাকা, আর মৃত্যুর পর অন্যকোন সত্তার উপর এই কল্যাণ কামনার দায়িত্ব অর্পণ করে যাওয়া। উলামায়ে উম্মত হল সেই সত্তা যার উপর নববী প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তারা বিশ্ব মানুষের কল্যাণে কাজ করে যায়।

এসকল ক্ষেত্রে নববী নির্দেশনাকে মেনে চলতে হবে এবং তা কর্মে পরিণত করা ও বাস্তবায়ন করার জন্য একান্ত ভাবে বাধ্য থাকতে হবে। পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লিখিত কিতাব ও হিকমাতের তালীমের বাধ্যবাধকতার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর কথা মেনে চলতে হবে। আর আমলী তরবিয়্যতের বিধান থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর কর্মেরও অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং নবীর দায়িত্ব কেবল কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল- এধারণা যথার্থ নয়। বরং তার দায়িত্ব ছিল সর্বব্যাপী, তাই তাঁকে অনুসরণের পরিধিও হবে সর্বব্যাপী।

কুরআনের বহু আয়াতে নবীকে মেনে চলার এবং তাকে অনুসরণ করার সরাসরি নির্দেশ দিয়ে মুসলমানদের জন্য তা অবশ্য পালনীয় করে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআন মৌলিকভাবে দু'টি পরিভাষা ব্যবহার করেছে। যথা:

১. اطاعت বা আনুগত্য করা।

২. اتباع বা অনুসরণ করা।

উম্মতকে নবীর اطاعت বা আনুগত্য করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার اتباع বা অনুসরণ করে চলতেও বলা হয়েছে। বস্তুতঃ ইতা'আত বা আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে তাঁর বক্তব্য, ইরশাদ ও হিদায়াতের আলোকে নিঃসৃত ও উদ্ভাবিত আহকামাতের আনুগত্যকে অবশ্য পালনীয় করে দেওয়া হয়েছে। আবার ইত্তিবা' বা অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে তার কর্মময় জীবনের আমল-আখলাক ও যাবতীয় আচার-আচরণের অনুসরণকে অবশ্য পালনীয় করে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নবীর ইতা'আত ও ইত্তিবার ব্যাপারে যে নির্দেশ আল-কুরআনে প্রদান করা হয়েছে, তাকে কোনরূপ শর্ত-সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। নির্দেশের এই ব্যাপকতা দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল ক্ষেত্রেই তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। অনুরূপভাবে আনুগত্য ও অনুসরণের এই নির্দেশ কোন কালের সাথে সংশ্লিষ্ট করেও উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং নবীর নবুয়্যতের পরিব্যাপ্তি যতকাল ব্যাপীয়া হবে, তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণও ততকাল যাবৎ করে যেতে হবে। তাই নবীর আনুগত্য তার জীবনকাল পর্যন্ত সীমিত ছিল এরূপ ধারণাও যথার্থ নয়।

নবীর ইতা'আত বা আনুগত্য সম্পর্কে আল-কুরআনের ভাষ্য

আল-কুরআনের বহু আয়াতে উম্মতকে নবীর ইতা'আত বা আনুগত্য করার সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবীর ইতা'আতের বিষয়টিকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, যেখানেই আল্লাহর ইতা'আতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানেই নবীর ইতা'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আল্লাহ ও রাসূল এই দুই সত্ত্বার ইতা'আতের অন্যথাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে -

(١) قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ –

বল ! আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।[১]

(٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ –

হে মু'মিনগণ। তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মাঝে যারা কর্মবিধায়ক তাদের আনুগত্য কর।[২]

(٣) فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ –

আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ককে পরিশোধন কর। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মু'মিন হও।[৩]

(٤) وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ —

আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার।[৪]

(٥) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ –

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আর আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যচারিতার ব্যাপারে সতর্ক থাকে বস্তুত তারাই সফলকাম।[৫]

(٦) وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا –

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারাতো মহা সাফল্য অর্জন করে।[৬]

(٧) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ —

আমি যেকোন রাসূলকে এ জন্যই প্রেরণ করেছি যেন আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হয়।[৭]

(٨) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا –

---

[১] সূরা: ৩ : আলে-ইমরান ৩২।

[২] সুরা: ৪ নিসা : ৫৯।

[৩] সূরা: ৮ আনফাল-১।

[৪] সূরা : ৩ আল-ইমরান: ১৩২

[৫] সূরা: ২৪-নূর:৫২।

[৬] সূরা: ৩৩ আহযাব: ৭১

[৭] সূরা: ৪ নিসা: ৬৪।

আর যে রাসূলের আনুগত্য করবে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যারা রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, আমিতো তাদের তত্ত্বাবধায়করূপে তোমাকে প্রেরণ করিনি।[১]

এসকল আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, যেভাবে আল্লাহর ইতা'আত ও আনুগত্য করতে হবে; তদ্রুপ তাঁর রাসূলেরও আনুগত্য ও ইতা'আত করতে হবে। শেষোক্ত আয়াতে পরিষ্কারভাবে বিবৃত হয়েছে যে, যদি কেউ রাসূলের ইতা'আত করে তাহলে যেন সে আল্লাহরই ইতা'আত ও আনুগত্য করল। বলতে গেলে এ'দুই আনুগত্যের মাঝে তেমন একটা পার্থক্য নেই, একথাই যেন বলা হল।

বস্তুতঃ আল্লাহ সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথোপকথন করেন না, রাসূল পাঠিয়ে তাঁকে সব জানিয়ে দেন এবং তাঁরই মাধ্যমে বান্দাদের প্রতি তাঁর হিদায়াত, আদেশ-নিষেধ জারী করেন। একারণেই রাসূলের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য বলা হয়েছে।

অপর পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যচারিতার পরিণাম যে একই অর্থাৎ দুটোরই পরিণাম যে জাহান্নাম, বহু আয়াতে তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

(১) وَمَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا –

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; যেখানে সে অনন্তকাল থাকবে।[২]

(২) وَمَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا –

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে সেতো সুস্পষ্টই পথভ্রষ্ট।[৩]

(৩) وَمَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا –

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।[৪]

---

[১] সূরা: ৪ নিসা: ৮০

[২] সূরা: ৪ নিসা: ১৪।

[৩] সূরা: ৩৩ - আহযাব : ৩৬।

[৪] সূরা: ৭২ জ্বিন: ২৩।

(٤) وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ –

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে (তার জেনে রাখা উচিৎ যে) আল্লাহ শাস্তি দানে বড়ই কঠোর।[১]

(٥) أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا –

তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি যেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।[২]

উপরন্তু বেশ কিছু আয়াতে শুধুমাত্র রাসূলের আনুগত্যের কথা বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে -

(١) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ –

সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।[৩]

(٢) وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ

আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তাহলে সৎপথ প্রাপ্ত হবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।[৪]

(٣) وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا –

কারো নিকট হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর যদি সে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তাহলে সে যে দিকে ফিরতে চায় আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দিব। আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব। সেটা আবাস হিসাবে বড়ই জঘণ্য।[৫]

নবীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য খোদ আল্লাহই কুরআনে উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

রাসূল তোমাদের সামনে যা কিছু পেশ করেন তা তোমরা উত্তমরূপে ধারণ কর। আর যা কিছু থেকে তিনি তোমাদেরকে বারণ করেন তাথেকে তোমরা বিরত থাক।[৬]

---

[১] সূরা: ৮ আনফাল: ১৩

[২] সূরা : ৯ তাওবা: ৬৩।

[৩] সূরা: ২৪ নূর : ৫৬।

[৪] সূরা: ২৪ নূর: ৫৪।

[৫] সূরা: 8 নিসা : ১১৫।

[৬] সূরা: ৫৯ হাশর: ৭।

কোন মু'মিনের জন্য আল্লাহর নির্দেশ, ফরমান ও ফয়সালার অন্যথা করার যেমন কোন অবকাশ নেই তেমনি রাসূলের ফরমান, ফয়সালা ও নির্দেশের অন্যথা করারও কোন অবকাশ নেই। ইরশাদ হয়েছে -

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ –

কোন বিষয়ে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোন মু'মিন নর কিংবা নারীর জন্য সে বিষয়ে আর কোন স্বাধীনতা থাকে না।[১]

বরং কেউ যদি রাসূলের সিদ্ধান্তকে দ্বিধাহীনভাবে মেনে না নেয়, তাহলে সে ব্যক্তি মু'মিন বলেই গণ্য হয় না। ইরশাদ হয়েছে -

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا –

অবশ্যই না। তোমার প্রতিপালকের শপথ; তারা ততক্ষণ মু'মিন বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ করবে। আর সে ব্যাপারে তুমি যা ফয়সালা দিবে তাতে কোনরূপ অসন্তোষ বোধ করবে না এবং তোমার ফয়সালাকে সর্বান্তিকরণে মেনে নেবে।[২]

রাসূলের ইত্তিবা বা অনুসরণ সম্পর্কে আল-কুরআনের ভাষ্য

রাসূলের আনুগত্যের সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্রিয়া-কর্মে তাঁকে অনুসরণ করেও চলতে হবে। ইত্তিবা (اتباع) শব্দটির মূল অর্থ হল কারো পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা; যা মূলত কর্মের অনুসরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল-কুরআনে নবীর ইত্তিবা বা তাঁকে অনুসরণ করে চলার নির্দেশ সম্বলিত বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে -

(١) فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং তার বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি; যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান রাখেন। আর তোমরা তাঁকে অনুসরণ করে চল, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পার।[৩]

---

১ সূরা: ৩৩ আয়াত: ৩৬।

২ সূরা: ৪ নিসা: ৬৫

৩ সূরা: ৭ আ'রাফ : ১৫৮।

(٢) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ –

বলুন (হে নবী)! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।[১]

(٣) وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

আমিতো সেই কিবলাকে- যার উপর আপনি বিদ্যমান ছিলেন কেবল এ জন্যই নির্ধারণ করেছিলাম যাতে আমি জানতে পারি যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়।[২]

(٤) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ –

হে নবী! তোমার জন্য এবং যারা তোমাকে অনুসরণ করে চলে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৩]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, যারা নবীর আনুগত্য করবে তাদেরকে নবীর অনুসরণও করতে হবে একান্ত অপরিহার্যভাবে। বস্তুতঃ নবীর কর্মময় জীবন ছিল আল্লাহর আনুগত্যের সর্বোন্নত মডেল বা নমূনা। নবী মূলত আল্লাহর ইতা'আতের মডেল হিসাবেই দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন। সে কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্যের উত্তম নমূনা নবীর কর্মময় জীবনে খোঁজার জন্য বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ

তোমাদের মাঝে যারা আল্লাহকে পেতে চায় এবং আখেরাতে সফলতার প্রত্যাশা করে তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (কর্মময় জীবনের) মাঝে উত্তম নমূনা রয়েছে।[৪]

বস্তুতঃ প্রত্যেক শিক্ষার জন্যই একটি প্রেক্টিক্যালের ব্যবস্থা থাকে। আল্লাহর দ্বীনের প্রশিক্ষণের জন্য নবী ছিলেন প্রেক্টিক্যালের নমূনা। আর একারণেই কুরআন তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের কথা এত জোর দিয়ে বলেছে।

তাছাড়া নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ একারণেও করতে হবে যে, নবীর কথা, কাজ ও তাঁর অনুমোদন সব কিছুই ওয়াহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। নবী যা বলতেন, করতেন বা যা কিছু অনুমোদন করতেন সবই ছিল পরোক্ষ ওয়াহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। ইরশাদ হয়েছে- وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ۝ তিনি নিজের প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে কিছুই বলেন না। যা বলেন তার সবই ওয়াহী-

---

[১] সূরা: ৩ আয়াত: ৩১।

[২] সূরা ২ বাকারা: ১৪৩।

[৩] সূরা: ৮ আনফাল: ৬৪।

[৪] সূরা: ৩৩ আহযাব : ২১।

যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।[১]

বস্তুতঃ ওযাহী দুই প্রকার। যথা:

১. وحي متلو বা স্বশব্দে অবতীর্ণ ওয়াহী।

২. وحي غير متلو বা যার শব্দ নয় বরং শুধু ভাব অবতীর্ণ।

বস্তুত ওয়াহীয়ে গায়র মাতলূও আল্লাহরই নির্দেশ। আল্লাহ সেগুলোকে তাঁর ভাষ্য বলে কুরআনে কারীমে স্বীকৃতি দিয়েছেন বহুস্থানে।

ওয়াহীয়ে গায়র মাত্‌লূ যে নবীর কাছে প্রক্ষেপিত হত এবং সেগুলো যে আল্লাহর নির্দেশেরই মর্যাদা রাখে কুরআনে কারীম থেকে তার প্রমাণ :

ওয়াহীয়ে গায়র মাতলূ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত না হলেও এগুলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রক্ষেপিত নির্দেশ তা কেবল কুরআনে কারীমে উল্লেখই করা হয়নি; বরং এগুলোকে আল্লাহ তাঁর নিজের হুকুম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে

(১) وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

আমি সেই কিবলাকে -যার উপর আপনি বিদ্যমান ছিলেন, কেবল এজন্যই নির্ধারণ করে ছিলাম যাতে আমি জানতে পারি যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়।[২]

মদীনায় হিজরতের পর বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানিয়ে নবী সা. ও সাহাবায়ে কিরাম নামায আদায় করতেন। দীর্ঘ ১৬ মাস মতান্তরে ১৭ মাস পর فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আপনি আপনার মুখমণ্ডলকে মসজিদে হারামের অভিমুখী করুন।[৩] -এই আয়াতের মাধ্যমে কিবলার পরিবর্তন করা হয়েছে। ঠিক তখনই পূর্বোল্লিখিত আয়াতটি-

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا অর্থাৎ আপনি যে কিবলার উপর বিদ্যমান ছিলেন সেটিকে আমি কেবল এজন্যই কিবলা হিসাবে নির্ধারণ করেছিলাম যে, ... এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু নবী ও সাহাবীগণ যে কিবলার উপর বিদ্যমান ছিলেন (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস) সেটাকে কিবলা হিসাবে গ্রহণ করার কোন নির্দেশ কুরআনের ভাষায় (পূর্বে) অবতীর্ণ হয়নি। বরং এ নির্দেশ ছিল নবী সা. এর নিজের পক্ষ থেকে। অথচ সেটাকেই আল্লাহ এভাবে ব্যক্ত

---

[১] সূরা: ৫৩-নাজম -৩-৪।

[২] সূরা: ২ বাকারা: ১৪৩।

[৩] সূরা: ২ বাকারা: ১৪৪

করলেন যে, আমি সেই কিবলাকে এজন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম যে, ...। অর্থাৎ আল্লাহ সেই নির্দেশের নিসবত নিজের দিকে করলেন -যা মূলত ছিল নবীর নির্দেশ। এথেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নবী সে বিষয়ে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওয়াহীর মাধ্যমেই দিয়েছিলেন, যে নির্দেশের কোন উল্লেখ কুরআনের ভাষ্যে নেই। বস্তুতঃ সে নির্দেশ ছিল ওয়াহীয়ে গায়র মাতলূর মাধ্যমে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বেরিয়ে আসে -

ক. নবীর উপর এমন ওয়াহীও অবতীর্ণ হত যা কুরআন নয়।

খ. মূলত সেটিও আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হত, যে কারণে সে সব ওয়াহীর আলোকে নবী কর্তৃক প্রবর্তিত বিধানকে আল্লাহ নিজের বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।

গ. ওয়াহীর এই প্রকারও অর্থাৎ ওয়াহীয়ে গায়র মাতলূও (غير متلو) ওয়াহীয়ে মাতলূর ন্যায় মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয়।

ঘ. এ ধরণের ওয়াহীর একটা উদ্দেশ্য এও হত যে, মুসলমানরা নবীর প্রবর্তিত বিধানকে অনুসরণ করে কি না তা পরীক্ষা করা।

(২) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ -

রমযানের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের সৌন্দর্যের উপকরণ, আর তোমরাও তাদের সৌন্দর্যের উপকরণ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি খিয়ানত করছিলে; ফলে তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন। অতএব এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হতে পার।[১]

এই আয়াতের ভাবার্থ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বোধগম্য হয়।

ক. এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রমযান মাসে সন্ধার পর কেউ ঘুমিয়ে পড়লে তার জন্য সেই রাতে স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করা বা সংগত হওয়া হারাম ছিল।

খ. যারা এই বিধান লঙ্ঘন করে রাতের বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তারা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে ধিকৃত হয়েছে। সেটা ছিল পাপ ও সীমালঙ্ঘন; যে কারণে তাদেরকে ক্ষমা করার ও মাফ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেননা অপরাধ ও গুনাহ না হলে ক্ষমা করার প্রশ্ন আসে না।

---

[১] সূরাঃ ২ বাকারা : ১৮৭।

গ. 'এখন থেকে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পার' -একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, রমযানের রাতে স্ত্রীদের সঙ্গে মেলামেশার বৈধতা এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে কার্যকর হয়েছে।

কিন্তু কুরআনের কোন আয়াতে রমযানের রাত্রে স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হওয়া হারাম, এ মর্মে কোন বিধান বর্ণিত নেই। নবী সা. নিজেই এহেন বিধান বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পূর্বোক্তি আয়াতে বিষয়টিকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যারা এহেন কাজ করেছে তারা যেন আল্লাহর বিধানকেই লঙ্ঘন করেছে এবং খিয়ানতে লিপ্ত হয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

(৩) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ ○-

আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা পর্যুদস্ত ছিলে, তখন আল্লাহ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে হয়তো তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবে। যখন তুমি মু'মিনদেরকে বলছিলে যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ করে তোমাদেরকে সাহায্য করলে সেটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ হবে না ?[১]

ওহুদের যুদ্ধের মূহুর্তে বদরের যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি মু'মিনদেরকে বলছিলে, যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ করে সাহায্য করেন তাহলে কি তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে না ? এরপর পাঁচ হাজারের কথা উল্লেখ করার পর ইরশাদ হয়েছে -- وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ

এটা আল্লাহ করেছেন কেবল তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং তোমাদের অন্তরকে পরিতৃপ্ত করা উদ্দেশ্যে।[২] আয়াতের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, বদরের যুদ্ধের সময়কার তিন বা পাঁচ হাজার ফিরিশতা পাঠিয়ে সাহায্য করার যে ঘোষণা, সেটা যেন আল্লাহই দিয়েছিলেন। অথচ বদরের যুদ্ধের সময় এরূপ অঙ্গিকার সম্বলিত কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। বরং সেটা ছিল নবী সা.-এর পক্ষ থেকে দেওয়া একটি বক্তব্য, যাকে আল্লাহ নিজের ঘোষণা বলে উল্লেখ করলেন।

---

১ সূরা: ৩ আল ইমরান: ১২৩-১২৪।

২ সরা: ৩ আল ইমরান: ১২৬ সূরা: ২৫ আল ফুকান: ১

এধরণের আরো অনেক বিবরণ কুরআনে কারীমে রয়েছে, যেখানে নবীর কোন নির্দেশ বা কাজকে মহান আল্লাহ তা'আলা নিজের নির্দেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এই সব বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় যে, নবী সা. কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য, নির্দেশ এবং তৎকর্তৃক জারীকরা বিধি-বিধান পরিণামে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানেরই মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং উম্মতকে কুরআনের বিধি-বিধান যেভাবে মেনে চলতে হবে, নবী কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানও তেমনিভাবে মেনে চলতে হবে।

আর নবী কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধান যে সর্বকালের মানুষকেই মেনে চলতে হবে তা বলাই বাহুল্য। কেননা নবী সর্বকালের মানুষের জন্যই নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। অতএব তার আনুগত্য ও অনুসরণ সর্বকালের মানুষকেই করতে হবে। তিনি যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল জ্বীন ও ইনসানের নবী তা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিবৃত হয়েছে। সম্ভবত যারা হাদীসের প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন তারাও বিষয়টি স্বীকার করেন। ইরশাদ হয়েছে

(١) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ـــ

আমি আপনাকে সমস্ত জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।[১]

(٢) لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ـــ

যাতে তিনি সমস্ত জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।[২]

(٣) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ـــ

আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।[৩]

(٤) وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ -

বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।[৪]

যেহেতু তিনি সমস্ত সৃষ্টির তরে রহমতরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, যেহেতু তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে আগমন করেছেন, যেহেতু তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনিই সর্বশেষ নবী; অতএব অঞ্চল, দেশ, রাষ্ট্র ও মহাদেশের গন্ডি পেরিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর তরে, সমগ্র জগত ও মহাজগতের তরে তিনি রাসূল হিসাবে আগমন করেছেন। তার

---

[১] সূরা: ২১ আম্বিয়া: ১০৭।

[২] সূরা: ২৫ আল ফুরকান : ১।

[৩] সূরা: ৩৪ সাবা: ২৮।

[৪] সূরা: ৩৩ আহযাব: ৪০।

নবুয়্যতের এই কালব্যাপীয়া পরিব্যাপ্তিই সমগ্রকালের মানুষের জন্য তাঁর ইত্তিবা ও ইতা'আতকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। অতএব তার কথা একালে অনুসরণীয় হবে, সেকালে হবে না, এক্ষেত্রে অনুসরণীয় হবে, সেক্ষেত্রে অনুসরণীয় হবে না, এরূপ মতামতের কোন সারবত্তা নেই। তাছাড়া তিনি এসেছেনই নবীরূপে, তাই তার কথাকে শাসকের কথার মত মনে করা এও এক অহেতুক বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

* এখন শুধু থেকে যায় যে, তাঁর যে হাদীসগুলো আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা যথাযথভাবে, অবিকৃত অবস্থায়, বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না?

যদি প্রমাণ করা যায় যে, তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের যে বিবরণ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সূত্রে, অবিকৃত অবস্থায়, হুবহু আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে; তাহলে তাঁর কথা, কাজ, অনুমোদন তথা হাদীসসমূহ যে আমাদের জন্য হুজ্জত বা প্রামাণিক ভিত্তি হবে এব্যাপারে আর কোন সন্দেহই থাকবে না। অবশ্য এ বিষয়টি দীর্ঘ বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা সাপেক্ষ একটি বিষয়। তবে নিম্নোক্ত কয়টি বিষয়ের অবগতি এ বিষয়ের সন্দেহ নিরসন করতে সহায়ক হবে।

যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলা এদ্বীনের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন, তাই তিনি সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী কালে এক বিশাল বাহিনীকে এ কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তাদের তৎপরতার ইতিহাস থেকে এ ব্যাপারে সম্যক অবগতি লাভ করা সম্ভব হবে। সে জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের অবগতি অর্জন করতে হবে।

১. হাদীস আহরণ ও সংরক্ষণে সাহাবায়ে কিরাম থেকে নিয়ে পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসগণ যে কষ্ট ও শ্রম ব্যায় করেছেন, যে ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছেন, যে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তার ইতিহাস অধ্যয়ন।

২. আরবদের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা ও হাদীস আহরণে সাহাবীগণের সতর্কতার ইতিহাস অধ্যয়ন।

৩. নবীর প্রতি তাদের ভালবাসা ও ভক্তির নিদর্শন সংক্রান্ত ইতিহাস, নবীর হাদীস শুনার জন্য তাদের আগ্রহ উদ্দীপনা ও অধ্যবসায়ের ইতিহাস অধ্যয়ন।

৪. নবীর বক্তব্যের গভীরতা ও আলোকময়তা তাদের অন্ধকার জীবনে যে আলোর দিশা দিয়েছিল, সে প্রেক্ষিতে তাঁর কথাগুলো হুবহু স্মৃতিতে ধারণ করে রাখার জন্য তাদের অনুরাগের মাত্রা সম্বলিত ইতিহাস অধ্যয়ন। (অত্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করে এসেছি)।

৫. ভুল যাতে না হয় সেজন্য তাদের অনুসৃত কর্ম-কৌশলসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগতি অর্জন।

ভুল যাতে না হয় এবং ভুলে যাতে না যায় সে জন্য তারা নিম্নোক্ত সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যথা :

ক. তারা নবীর কথা গভীর মনোযোগের সাথে ঐশী হিদায়াত মনে করে অন্তর দিয়ে শ্রবণ করতেন।

খ. শ্রবণের পর পারস্পরিক আলোচনা ও তাকরারের মাধ্যমে যা শ্রবণ করেছেন তা হুবহু ধারণ করেছেন কি না তা যাচাই করে নিতেন, কোথাও ভুল হলে তা অন্যের কাছ থেকে শুনে শুধরিয়ে নিতেন।

গ. অনেকেই অতিপ্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় বিষয়গুলো লিখে রাখতেন।

ঘ. রাত জেগে জেগে সেগুলো মুখস্ত করতেন।

ঙ. অন্যকে দাওয়াত দিতে গিয়ে সেগুলোর পূনরাবৃত্তি করতেন।

এভাবেই প্রথম স্তরের ব্যক্তিরা নবীর হাদীসগুলোকে হুবহু ধারণ করে রেখেছেন।

পরবর্তী কালে যারা হাদীস সংগ্রহ করেছেন তারা উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলো অবলম্বন করা ছাড়াও নিম্নোক্ত সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যথা:

ক. বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা যাচাই করে তবেই হাদীস আহরণ করতেন।

খ. একই হাদীস একাধিক সূত্রে সংগ্রহ করতেন এবং কোন গড়মিল আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতেন। গড়মিল থাকলে কেন হয়েছে, কার দ্বারা হয়েছে তাও উদ্ঘাটন করতেন।

গ. বর্ণনাকারী কোনরূপ স্মৃতিদৌর্বল্যের শিকার কি না তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

ঘ. বর্ণনাকারী মুত্তাকী, পরহেযগার, খোদাভীরু ও শিষ্টাচারের অধিকারী কি না তার প্রতি লক্ষ রেখে হাদীস সংগ্রহ করতেন।

ঙ. আহরণ ও সংগ্রহের পর যাথেকে আহরণ করতেন তাকে পূনরায় শুনিয়ে তাথেকে বিশুদ্ধতার অনুমোদন গ্রহণ করতেন। পাণ্ডুলিপিতে সেগুলো লিপিবদ্ধ করার পর উস্তাদের পাণ্ডুলিপি সাথে মিলিয়ে নির্ভুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন।

চ. হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে কঠোর নীতিমালা অনুসরণ করে চলাকে তাঁরা নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন।

ছ. বর্ণনাকারীদের পর্যায়ভেদের নিরিখে হাদীস সমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন এবং সেগুলোর মান নির্ণয় করে দিয়েছেন।

জ. বর্ণনাকারী স্মৃতিদৌর্বল্য কিংবা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে হাদীসের শব্দে কোন রদবদল করেছে কি না সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।

ঝ. কেউ কোন হাদীস নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বর্ণনা করছে কি না সে ব্যাপারে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।

ঞ. সনদ বিচ্ছিন্ন কি অবিচ্ছিন্ন তা বিভিন্নভাবে যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রহণ করতেন।

ট. বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে কোন শব্দ বা বাক্য ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় পরিবর্ধিত হয়েছে কি না তাও যাচাই করতেন।

ঠ. সনদের রাবীদের ক্ষেত্রে কোন রদবদল করা হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতেন। এ ধরণের বহুমুখী পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একটি হাদীসকে সহীহ হাদীস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এভাবে হাদীস যাচাই-বাছাই ও তার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের বিষয়টি এমন এক বৈজ্ঞানিকরূপ লাভ করেছে যে, এ সম্পর্কে জ্ঞাত কোন ব্যক্তিই হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। অবশ্য যারা হাদীস নিরীক্ষা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞানের অধ্যায়ে প্রবেশ করেননি, তারা নিজের অনুমান প্রসূত চিন্তা ভাবনার আলোকে এব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। কেননা অন্ধের কাছে গোটা আলোকিত দিবসই রজনীর ন্যায় মনে হয়। হাদীস নিরীক্ষা-বিজ্ঞানের অধ্যায়ে অবগাহন করার পরও যদি কেউ দ্বিধা-সন্দেহ প্রকাশ করে তাহলে হয়তো সে পাগল, না হয় জ্ঞানপাপী, অথবা ইসলাম বিদ্বেষী মহলের চর।

হাদীস প্রামাণিক ভিত্তি ও অনুসরণীয় হওয়ার পক্ষে কতিপয় যৌক্তিক বিশ্লেষণ

যেহেতু ইসলামের মূল কালিমা لا اله الا الله محمد رسول الله এর মাঝে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমানের অংশ হিসাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সুতরাং তাঁর হাদীস কেন প্রামাণিক ভিত্তি হবে না ? তার বিশ্বস্ততাকে কেনই বা মেনে নেওয়া হবে না? যেসব আল্লাহ ওয়ালা, বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী ব্যক্তিদের মাধ্যমে হাদীসগুলো আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যাচাই-বাছাইয়ের কঠোর নিয়মনীতির যে অধ্যায় অতিক্রম করে হাদীসগুলো আমাদের কাছে পৌঁছেছে তাতে সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকার কথা নয়। এব্যাপারে সন্দেহ করাও উচিত নয়। কেননা পৃথিবীর জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এক বা দুজনের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে অনেক কিছুই বিশ্বাস করি ।

সেই বর্ণনাকারী লোকটি বিশ্বস্ত ও মুত্তাকী কি না, সে মিথ্যা বলে কি না এসবের কিছুই যাচাই-বাছাই করতে যাই না। আর যদি সে লোকটি বিজ্ঞানী উপাধিধারী কোন ব্যক্তি হয়, তাহলে তো তার অনুমানকেই আমরা ওয়াহীর মত গুরুত্ব দিতে শুরু কির। অনেক ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য ওয়াহীর বর্ণনার পরিপন্থী হলে আমরা ওয়াহীলব্ধ বিষয়ের প্রতিও সন্ধিহান হয়ে পড়ি। অথচ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীন, ফুকাহা, মুহাদ্দেসীন ও মুজতাহেদীন (যাদের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে) তাদের সততা, বিশস্ততা, আমানতদারী ও ন্যায়পরায়ণতা সমকালীন পৃথিবীর মানুষের কাছে যেমন স্বীকৃত ছিল, পরবর্তী পরীক্ষ-নিরীক্ষায় এবং বিচার বিশ্লেষণেও তাদের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততায় সামান্যতম খুঁত বের হয়ে আসেনি। অথচ এহেন ব্যক্তিদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে হাদীসের প্রামাণ্যতাকে অস্বীকার করছেন এমন ব্যক্তিরা; যাদের বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, সততা, আমানতদারী ও খোদাভীরুতার কোনই প্রামাণিক ভিত্তি নেই।

সুতরাং স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, এরা মূলত বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে; নয় বরং নিজস্ব কোন স্বার্থের পথে অন্ত রায় মনে করেই হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার জিগির তুলে সেগুলোর প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করতে চায়। হাদীসের শুদ্ধা-শুদ্ধি নির্ণয়ের জন্য মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত পন্থা এমন এক নিরীক্ষা বিজ্ঞান যা প্রয়োগের পর শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়ের বিষয়টি ২+২=৪ এর মতই চিরন্তন ধারায় প্রমাণিত বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়। একটি কথার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাইয়ের সম্ভাব্য যত পন্থা হতে পারে মুহাদ্দিসগণ হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তার সবগুলোই সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন। অতপর যেগুলোকে তারা গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন সেগুলোকেই হাদীস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এরপরও যদি হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা এবং সেগুলোর প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা প্রকাশ করা হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্ন হয় যে, ঘটে যাওয়া ঘটনার যে বিচার আদালতে করা হয়, তার ভিত্তি কি হবে ? একজন অন্যজনকে হত্যা করেছে, তা যদি বিচারক দেখে না থাকেন (সাধারণত বিচারক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হন না) তাহলে তিনি কি করে একজনকে ফাঁসীর হুকুম দিবেন ? যে সাক্ষীর কথায় তিনি বিশ্বাস করে ফয়সালা করবেন, তার বিশ্বস্ততা কিভাবে প্রমাণ হবে ? যদি সাক্ষীর বিশ্বস্ততা নির্ণয়ের কোন প্রক্রিয়া থাকে, আর তার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে একজনকে ফাঁসীতে ঝুলানো সম্ভব হয়, তাহলে আমরা বলব যে, সাক্ষীর বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত-শারায়েত আরোপ করা হয় তার চেয়েও কঠিন ও কঠোর শর্ত আরোপ করে হাদীসের রাবী ও বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা যাচাই করে তবেই হাদীস গুলোকে গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব এগুলোর বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীতভাবেই

প্রমাণিত। এহনে কঠিন ও কঠোর শর্তারোপের ফলে এমনটি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রকৃত পক্ষে যা হাদীস ছিল এবং যথার্থই নবী কারীম সা. এর উক্তি ছিল, তা হাদীসের তালিকা থেকে হয়ত বাদ পড়ে গেছে কিংবা দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু যা বিশুদ্ধসূত্রে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তা সন্দেহাতীতভাবে নবী সা.-এর বক্তব্যই পৌঁছেছে। সুতরাং সেগুলোর প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার বিষয়টিও সন্দেহাতীত ও প্রশ্নাতীতভাবেই স্বীকৃত হয়ে গেছে। শুধু কি তাই? কোন বর্ণনা নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী সূত্রে পাওয়া গেলেও যদি তা শরীয়তের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে তাহলে মুহাদ্দিসগণ সেগুলোকেও বর্জন করেছেন।

তদুপরি তারা এক্ষেত্রে কেবল বাহ্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যন্তই ক্ষান্ত থাকেন নি। বরং এসকল হাদীসের শুদ্ধা-শুদ্ধি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তারা আত্মশক্তিকেও প্রয়োগ করেছেন। আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করেও তারা হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ইস্তিখারার মাধ্যমেও তাঁরা হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের কোশেশ করেছেন। বলা যায় যে, হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্জনের চিন্তাই অগ্রাধিকার পেয়েছে, অর্থাৎ হাদীস শুনামাত্রই গ্রহণ নয় বরং সার্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সঠিক বলে প্রমাণিত হলেই গ্রহণের প্রশ্ন আসত। একজনের সংগৃহীত হাদীসের উপর পরবর্তী গবেষকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থেকেছে। এভাবে অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার ধাপ অতিক্রম করেই হাদীসগুলো আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। কোন হাদীসে সামান্য খুঁত পেলেই মুহাদ্দিসগণ সেটিকে সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন এবং সেগুলোকে ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এভাবে দুর্বল হাদীস ও জাল হাদীসগুলো পৃথক পৃথক গ্রন্থে সংকলন করে সেগুলোকে আলাদা করে ফেলেছেন। এর ফলে সহীহ হাদীসগুলো দুর্বল ও জাল হাদীসের মিশ্রণ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এসব যাচাই-বাছাইয়ে কাজ করতে গিয়ে তারা যে শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন এবং যে ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছেন তার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

তারপরও যারা হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তারাতো কুরআনের বিশস্ততার উপরও প্রশ্ন উঠাতে পারেন যে, এটাই যে সেই কুরআন যা রাসূল সা. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তারই বা প্রমাণ কি ? সুতরাং যদি তারা কুরআনে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যে মন্ত্রবলে তারা কুরআনের বিশুদ্ধতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন সেই মন্ত্রবলেই তাদেরকে হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। আর যদি কুরআনের বিশুদ্ধতার উপরই কারো সন্দেহ থাকে তাহলে তার সাথে আমাদের তর্কের ধরণ হবে ভিন্ন। মূলত হিদায়াত আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান সঠিক পথের সন্ধান দেন।

পরিশিষ্ট -৩

রাবীদের স্তরবিন্যাস طبقات الرواة

রিজালের কিতাবসমূহে কোন রাবীর জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ করার পর বলা হয় -

وهو من الطبقة الثانية، أو هو من الطبقة الثالثة، أو من الطبقة الرابعة، أو من الطبقة الخامسة

এই তবকাহ বা স্তর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা তা অনুধাবন করতে পারে না। ফলে তারা রাবীর পর্যায় নির্ণয় করতে জটিলতায় নিপতিত হয়।

বস্তুতঃ হাফেয ইবনে হজর রহ. তাকরীবুত তাহযীবে সময়কালের বিচারে রাবীদেরকে মোট ১২টি স্তরে বিভক্ত করে উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তীরা এই স্তরবিন্যাসকে অনুসরণ করে চলেছেন। কেননা ইতিপূর্বে রাবী কোন যুগের ব্যক্তি, তা নির্ধারণ করার জন্য রাবীর উস্তাদ ও শাগরিদদের দীর্ঘ তালিকা পেশ করা হত। যেমন উস্তাদদের তালিকা পেশ করতে গিয়ে বলা হত روى عن فلان و عن فلان আবার শাগরিদদের তালিকা পেশ করতে গিয়ে বলা হত روى عنه فلان وفلان। উস্তাদ শাগরিদদের তালিকা দেখে অনুমান করা হত যে, তিনি কোন কালের লোক। কিন্তু সময়কালের প্রেক্ষিতে করা ইবনে হজর রহ.-এর এই বিভাজনের দ্বারা এই দীর্ঘ তালিকা পেশ করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। বরং বর্ণনাকারী কোন তবকার রাবী, তা উল্লেখ করে দিলেই তিনি কোন কালের লোক তা বুঝা সহজ হয়ে যায়।

বস্তুতঃ ইবনে হজর তিনশত হিজরী পর্যন্ত রাবীদেরকে মোট ১২টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তবে তিনি শতাব্দীর ভিত্তিতে বিভাজন করেননি। বরং তিনি বিভাজন করেছেন সাহাবী, তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবয়ে তাবেয়ীন এই ক্রমানুসারে। আবার প্রত্যেকটি স্তরকে তিনি কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। তবে এই বিভাজনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করেননি। ফলে এতে কিছু জটিলতা থেকেই গেছে।

এজন্য আমরা তাঁর বিভাজনকে শতাব্দীভিত্তিক বিন্যস্ত করে পেশ করছি।

প্রথম শতাব্দী

১. **প্রথম স্তর:** সকল সাহাবী এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

২. **দ্বিতীয় স্তর:** বর্ষীয়ান তাবেয়ীনদের স্তর। যেমন- আলকামাহ -মৃ: ৮৬ হি:, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব -মৃ: ৯৪ হি:, অরওয়া -মৃ: ৯৪ হি:, সালেম -মৃ: ১০৬ হি:, ইকরিমা -মৃ: ১০৮ হি: প্রমুখ এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় শতাব্দী

৩. **তৃতীয় স্তরঃ** তাবেয়ীনদের মধ্যম স্তর- যারা সাহাবীদের থেকে প্রচুর রিওয়ায়াত আহরণ করেছেন। যেমন- শা'বী -মৃঃ ১০৪/১১০ হিঃ, হাসান বসরী -মৃঃ ১১০ হিঃ, মুহাম্মদ ইবনে সীরিন -মৃঃ ১১০ হিঃ, মকহুল -মৃঃ ১১২-১১৩ হিঃ প্রমুখ।

৪. **চতুর্থ স্তরঃ** স্বল্পবয়সী তাবেয়ীন, যারা বর্ষীয়ান তাবেয়ীনদের থেকে অধিকাংশ রিওয়ায়াত আহরণ করেছেন। তবে সাহাবীদের থেকেও কিছু কিছু রিওয়ায়াত আহরণ করেছেন। যেমন- কাতাদাহ -মৃঃ ১১৭/১১৮ হিঃ, যুহরী -মৃঃ ১২৪ হিঃ।

৫. **পঞ্চম স্তরঃ** স্বল্পবয়সী তাবেয়ীন- যারা এক/দুই জন সাহাবীর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তবে তাদের থেকে কোন হাদীস আহরণ করতে পারেননি। যেমন সুলায়মান আল্-আ'মাশ -মৃঃ ১৪৮ হিঃ, ইমাম আবু হানীফা -মৃতঃ ১৫০ হিঃ প্রমুখ।

৬. **ষষ্ঠ স্তরঃ** এমন ব্যক্তিবর্গ যারা স্বল্পবয়সী তাবেয়ীনদের সমবয়সী হলেও কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। যেমন- ইবনে জুরায়জ -মৃঃ ১৫০ হিঃ, ইমাম আওযায়ী -মৃঃ১৫৭ হিঃ, রবী ইবনুস সাবী ১৬০হিঃ প্রমুখ।

৭. **সপ্তম স্তরঃ** বর্ষীয়ান তাবয়ে তাবেয়ীনদের স্তর। যেমন- সুফয়ান সাওরী -মৃঃ ১৬১ হিঃ, ইমাম মালেক -মৃঃ ১৭৯ হিঃ প্রমুখ।

৮. **অষ্টম স্তরঃ** মধ্যবয়সী তাবয়ে তাবেয়ীনদের স্তর। যেমন- ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা -মৃঃ ১৯৩ হিঃ, সুফয়ান ইবনে উয়ায়না -মৃঃ ১৯৮ হিঃ, ইয়াহ্ইয়াহ ইবনে সাঈদ -মৃঃ ১৯৮ হিঃ প্রমুখ।

তৃতীয় শতাব্দী

৯. **নবম স্তরঃ** স্বল্পবয়সী তাবয়ে তাবেয়ীনদের স্তর। যেমন- ইমাম শাফেয়ী -মৃঃ ২০৪ হিঃ, আব্দুর রায্যাক -মৃঃ ২১১ হিঃ প্রমুখ।

১০. **দশম স্তরঃ** তাবয়ে তাবেয়ীনদের থেকে যারা হাদীস আহরণ করেছেন তাদের মাঝে বর্ষীয়ান ব্যক্তিবর্গ। যেমন- উসমান ইবনে আবি শায়বা মৃঃ ২৩৯ হিঃ, আহমদ ইবনে হাম্বল -মৃঃ ২৪১ হিঃ প্রমুখ।

১১. **একাদশ স্তরঃ** তাবয়ে তাবেয়ীনদের থেকে যারা হাদীস আহরণ করেছেন তাদের মাঝে যারা মধ্যবয়সী ছিলেন। যেমন- ইমাম যুহলী -মৃঃ ২৫৩ হিঃ, ইমাম বুখারী -মৃঃ ২৫৬ হিঃ প্রমুখ।

১২. **দ্বাদশতম স্তরঃ** তাবয়ে তাবেয়ীন থেকে যারা হাদীস আহরণ করেছেন তাদের মাঝে যারা স্বল্পবয়সী ছিলেন। যেমন- ইমাম তিরমিযী -মৃঃ ২৭৯ হিঃ, আবু যুর'আহ দিমাশকী -মৃঃ ২৮১ হিঃ, আবু বকর মারওয়াযী মৃত ২৯২ হিঃ ও তার সমকালীন ব্যক্তিবর্গ।[১]

---

[১] দরসে তিরমিযী খঃ১, পৃঃ ৭৭-৭৮ এর তথ্যাবলম্বনে আংশিক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত।

পরিশিষ্ট -৪

উল্লেখযোগ্য উসূলবিদ ও মুহাদ্দিসগণের শতাব্দীভিত্তিক তালিকা (মৃত্যু তারিখের ক্রমানুসারে)

(বস্তুত রাসূল সা.-এর পর থেকে ৫০ হিজরী পর্যন্ত হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্টদের অধিকাংশই ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম; যাদের বিবরণ গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।)

৫০ - ১০০ হিজরী

নাম		মৃত্যুসন
হযরত আলকামা ইবনে কায়েস	রহ.	৬১/৬২/৬৫/৭২ হি:
" আবু মুসলিম খাওলানী	"	৬২ হি:
" মাসরুক ইবনুল আজদা'	"	৬৩ হি:
" আবীদাহ ইবনুল আমর সালমানী	"	৭২/৭৩ হি:
" আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ	"	৭৪/৭৫ হি:
" 'আমর ইবনে মায়মূন আওদী	"	৭৪/৭৫/৭৬ হি:
" আব্দুর রহমান ইবনে গন্ম	"	৭৮ হি:
" আবু ইদরীস খাওলানী	"	৮০ হি:
" সুআয়দ ইবনে গাফালাহ	"	৮১/৮২ হি:
" যির ইবনে হুবায়শ	"	৮১/৮২ হি:
" রিবয়ী ইবনুল হিরাশ	"	৮১/৮২/১০০ হি:
" শাকীক ইবনে সালামাহ	"	৮২ হি:
" আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ	"	৮২ হি:
" আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা	"	৮২/৮৩
" যায়েদ ইবনে ওয়াহাব	"	৮৩ হি:
" আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নাওফাল	"	৮৩/৮৪ হি:
" আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস	"	৮৬ হি:
" মুতাররিফ ইবনে 'আব্দিল্লাহ	"	৮৬ হি:
" মারসাদ ইবনে আব্দিল্লাহ	"	৯০ হি:
" আলী ইবনুল হুসাইন	"	৯২/৯৪/৯৫ হি:
" আবু বকর ইবনে আব্দির রহমান	"	৯৪ হি:

" সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব	"	৯৪ হিঃ
" অরওয়া ইবনুয যুবায়ের	"	৯৪ হিঃ
" আবু সালামাহ ইবনে আব্দির রহমান	"	৯৪ হিঃ
" সাঈদ ইবনে জুবায়ের	"	৯৫ হিঃ
" আবু উসমান নাহদী	"	৯৫/১০০ হিঃ
" মাহমূদ ইবনুর রবী'	"	৯৬/৯৯ হিঃ

১০১ - ২০০ হিজরী

নাম		মৃত্যুসন
হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয	(রহ.)	১০১হিঃ
" মুজাহিদ ইবনে জাব্‌র	"	১০১/১০২/১০৩/১০৪ হিঃ
" ইমাম শা'বী (আমের ইবনে শারাহীল)	"	১০৪/১১০ হিঃ
" আবু কালাবাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ	"	১০৪ হিঃ
" আবু বুরদাহ ইবনে আবি মূসা আশ'আরী	"	১০৪ হিঃ
" সালেম ইবনে আব্দিল্লাহ	"	১০৬ হিঃ
" তাউস ইবনে কায়সান	"	১০৬ হিঃ
" কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর	"	১০৭ হিঃ
" মুহাম্মদ ইবনে সীরীন	"	১১০ হিঃ
" হাসান বসরী	"	১১০ হিঃ
" মাকহুল শামী	"	১১২/১১৩ হিঃ
" 'আতা ইবনে আবি রাবাহ	"	১১৪/১১৫ হিঃ
" নাফে' মাওলা ইবনে উমর	"	১১৭ হিঃ
" কাতাদাহ ইবনে দি'আমাহ	"	১১৭/১১৮ হিঃ
" ইবনে আবী মুলাইকা	"	১১৭ হিঃ
" ইবনে হযম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আমর	"	১২০ হিঃ
" ইমাম যুহরী	"	১২৪ হিঃ
" আমর ইবনে দ্বীনার	"	১২৬ হিঃ
" আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার মাদানী	"	১২৭ হিঃ
" আবু ইসহাক কূফী	"	১২৭ হিঃ
" আবু ইসহাক আছ্-ছাবিঈ	"	১২৯হিঃ
" আবুয্ যিনাদ (আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান)	"	১৩০/১৩১হিঃ
" মানসুর ইবনুল মু'তামির	"	১৩২ হিঃ
" ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবি কাসীর	"	১৩২ হিঃ
" আ'মাশ (সুলায়মান ইবনে মিহরান)	"	১৪৮ হিঃ

" মুহাম্মদ ইবনে 'আজলান " ১৪৮ হিঃ
" ইমাম আবু হানীফা " ১৫০ হিঃ
" আব্দুল মালিক ইবনে জুরায়য " ১৫০ হিঃ
" মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক " ১৫১হিঃ
" মা'মার ইবনে রাশেদ " ১৫৩/১৫৪হিঃ
" মিস'আর ইবনে মিকদাম " ১৫৫হিঃ
" ইমাম আওযায়ী (আব্দুর রহমান ইবনে আমর) " ১৫৭ হিঃ
" শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ " ১৬০ হিঃ
" রবী ইবনুস সাবী " ১৬০ হিঃ
" সুফয়ান সাওরী " ১৬১ হিঃ
" হাম্মাদ ইবনে সালামা বসরী " ১৬৭ হিঃ
" ইমাম মালিক " ১৭৯ হিঃ
" আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক " ১৮১ হিঃ
" ইমাম আবু ইউসুফ " ১৮২ হিঃ
" মু'তামির ইবনে সুলায়মান বসরী " ১৮৭ হিঃ
" ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানী " ১৮৯ হিঃ
" ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যাহ " ১৯৩ হিঃ
" ওয়াকী ইবনুল জাররাহ কূফী " ১৯৭ হিঃ
" সুফয়ান ইবনে উয়ায়না " ১৯৮ হিঃ
" আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী " ১৯৮ হিঃ
" ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান " ১৯৮ হিঃ

২০১ - ৩০০ হিজরী

নাম	মৃত্যুসন
হযরত আবু দাউদ তায়ালেসী	রহ. ২০৩/২০৪ হিঃ
" ইমাম শাফেয়ী (মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস)	" ২০৪ হিঃ
" আব্দুর রায্যাক ইবনে হাম্মাম	" ২১১ হিঃ
" মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফিরয়াবী	" ২১২ হিঃ
" আসাদ ইবনুল ফুরাত মালেকী	" ২১৩ হিঃ
" উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা আল্ আবাসী	" ২১৩ হিঃ
" আল্লামা হুমায়দী (আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের)	" ২১৯ হিঃ
" আবু উবায়েদ (কাসেম ইবনে সাল্লাম)	" ২২২/২২৩/২২৪ হিঃ
" সুলায়মান ইবনে হারব বসরী	" ২২৪ হিঃ
" ইয়াহইয়া হাম্মানী	" ২২৮ হিঃ

" মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ " ২২৮ হিঃ
" নূআয়ম ইবনে হাম্মাদ " ২২৮ হিঃ
" আবু জা'ফর মুসনাদী " ২২৯ হিঃ
" ইবনে সা'দ (মুহাম্মদ ইবনে সা'দ) " ২৩০ হিঃ
" আলী ইবনুল জা'দ " ২৩০ হিঃ
" ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন " ২৩৩ হিঃ
" আলী ইবনুল মাদিনী " ২৩৪ হিঃ
" আব্দুল্লাহ ইবনে নু'আয়ম কূফী " ২৩৪ হিঃ
" যুহায়ের ইবনে হারব " ২৩৪ হিঃ
" আবু বকর ইবনে আবি শায়বা " ২৩৫ হিঃ
" ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হে " ২৩৮ হিঃ
" উসমান ইবনে আবি শায়বা " ২৩৯ হিঃ
" ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল " ২৪১ হিঃ
" আবুল হাসান তুছী " ২৪২ হিঃ
" আবু জা'ফর মুখাররামী " ২৪২ হিঃ
" দারাওয়ারদী (মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া) " ২৪৩ হিঃ
" আবদ ইবনে হুমায়দ " ২৪৯ হিঃ
" ইব্রাহীম দাওরাকী " ২৫২ হিঃ
" আবুল হোসাইন যুহলী " ২৫৩ হিঃ
" আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দারেমী " ২৫৫ হিঃ
" ইমাম বুখারী (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল) " ২৫৬ হিঃ
" ইবনে সানজার (মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ) " ২৫৮ হিঃ
" ইমাম যুহ্লী (মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া) " ২৫৮ হিঃ
" ইমাম মুসলিম (মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ) " ২৬১ হিঃ
" আবুল হাসান ঈজলী " ২৬১ হিঃ
" ইয়াকুব ইবনে শায়বা " ২৬২ হিঃ
" আবু যুর'আহ রাযী " ২৬৪ হিঃ
" ইমাম মুযানী (ইয়াহইয়া ইবনে ইসমাঈল) " ২৬৪ হিঃ
" ইমাম ইবনে মাজাহ (মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ) " ২৭৩/২৭৫ হিঃ
" আবু বকর আল-আস্রাম " ২৭৩ হিঃ
" আবু হাতেম রাযী " ২৭৫/২৭৭ হিঃ
" ইমাম আবু দাউদ (সুলায়মান ইবনুল আশ্আস্) " ২৭৫ হিঃ
" বাকী ইবনে মাখলাদ " ২৭৬ হিঃ

" ইবনে কুতায়বা (আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম)	"	২৭৬ হিঃ
" ইয়াকূব ইবনে সূফয়ান	"	২৭৭ হিঃ
" ইমাম তিরমিযী	"	২৭৯ হিঃ
" আবু সাঈদ দারেমী	"	২৮০ হিঃ
" আবু যুরাআহ দিমাশকী	"	২৮১ হিঃ
" আবু বকর ইবনে আবিদ্দুনিয়া	"	২৮১ হিঃ
" বায্যার (আবু বকর আহমদ ইবনে আমর)	"	২৯০/২৯২ হিঃ
" আবু বকর মারওয়াযী	"	২৯২ হিঃ
" মুহাম্মদ ইবনে নসর মারওয়াযী	"	২৯৪ হিঃ
" ওয়াকেদী (মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে ওয়াকেদ)		২৯৬/২৯৭/২৯৯ হিঃ
" আবুল আব্বাস তুছী	"	২৯৮/২৯৯ হিঃ

৩০১ - ৪০০ হিজরী

নাম		মৃত্যুসন
হযরত ইমাম নাসাঈ (আবু আব্দুর রহমান)	(রহ.)	৩০৩ হিঃ
" হাসান ইবনে সুফয়ান	"	৩০৩ হিঃ
" ইবনুল জারুদ	"	৩০৬/৩০৭ হিঃ
" আবু ইয়া'লা মুওসেলী	"	৩০৭ হিঃ
" ইবনে জারীর তাবারী	"	৩১০ হিঃ
" আবু বিশ্‌র দলাবী	"	৩১০ হিঃ
" ইবনে খুযায়মা (মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা)		৩১১ হিঃ
" আবু বকর আল্-খাল্লাল	"	৩১১ হিঃ
" আবু আওয়ানা ইসফারায়েনী	"	৩১৬ হিঃ
" ইবনুল মুনযির (মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম ইবনুল মুনযির)		৩১৯ হিঃ
" আবু জা'ফর তহাবী	"	৩২১ হিঃ
" আবু জা'ফর উকায়লী	"	৩২৩ হিঃ
" ইবনে আবি হাতেম (আব্দুর রহমান)	"	৩২৭ হিঃ
" কাসেম ইবনে আসবাগ	"	৩৪০ হিঃ
" ইবনুল আকরাম (আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব)		৩৪৪ হিঃ
" আবুল ওয়ালীদ কাযবিনী	"	৩৪৪ হিঃ
" ইবনুস সাকান (সাঈদ ইবনে উসমান)	"	৩৫৩ হিঃ
" ইবনে হিব্বান (আবু হাতেব মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান)		৩৫৪ হিঃ
" ইবনে 'আল্লান আল হাররানী	"	৩৫৫ হিঃ
" তাবরানী (সোলায়মান ইবনে আহমদ)	"	৩৬০ হিঃ

" আবু বকর আল-আজুররী "	৩৬০ হি:
" আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আব্দুর রহমান রামাহুরমুযী	৩৬০ হি:
" ইবনুস সিন্নী "	৩৬৩ হি:
" ইবনে 'আদী (আবু আহমদ আব্দুল্লাহ ইবনে 'আদী)	৩৬৫ হি:
" আবুশ্ শায়খ ইবনে হাইয়্যান "	৩৬৯ হি:
" আবু বকর ইসমাঈলী "	৩৭১ হি:
" ইবনুল জারুদ "	৩৭৬ হি:
" ইবনে শাহীন (আবু হাফস উমর ইবনে আহমদ)	৩৮৫ হি:
" আবুল হাসান দারাকুতনী "	৩৮৫ হি:
" আবু সুলায়মান খাত্তাবী "	৩৮৮ হি:
" ইবনে মান্দাহ (আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক)	৩৯৫ হি:

৪০১- ৫০০ হিজরী

নাম	মৃত্যুসন
হযরত ইবনুল ফারাজী (আবু ওয়ালীদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ) (রহ.)	৪০৩ হি:
" হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী "	৪০৫ হি:
" ইবনে মারদুবিয়্যাহ কাবীর "	৪১৬ হি:
" আবুল কাশেম হিবাতুল্লাহ লালকায়ী "	৪১৮ হি:
" আবু নু'আয়েম ইস্পাহানী "	৪৩০ হি:
" ইবনে গায্লান (আবু তালিব মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ)	৪৪০ হি:
" হাফেয আবু ইয়া'লা খলিলী "	৪৪৬ হি:
" শিহাবুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ আল্-কুজাঈ "	৪৫৮ হি:
" ইমাম বায়হাকী (আবু বকর আহমদ ইবনে আলী)	৪৬৩ হি:
" হাফেয ইবনে আব্দুল বার "	৪৬৩ হি:
" খতীবে বাগদাদী (আবু বকর আহমদ ইবনে আলী)	৪৬৩ হি:
" আবুল হাসান আল্-ওয়াহেদী "	৪৬৮ হি:
" আবুল ওয়ালিদ আল্-রাজী "	৪৭৪ হি:
" ইবনে মাকুলা (আবু নসর আলী ইবনুল উজীর) "	৪৭৫ হি:
" আবুল মুজাফ্ফার সাম্আনী "	৪৮৯ হি:
" ইবনে মারদুবিয়্যাহ সগীর "	৪৯৮ হি:

৫০১ - ৬০০ হিজরী

নাম		মৃত্যুসন
হযরত আবু হামেদ গাজালী	(রহ.)	৫০৫ হি:
" হাফেয মুহাম্মদ ইবনে তাহের মাকদেসী	"	৫০৭ হি:
" হাফেয দায়লামী (শিরওয়াই ইবনে শাহারদার)	"	৫০৯ হি:
" মুহিউস সুন্নাহ আল বগভী	"	৫১৬ হি:
" হিবাতুল্লাহ ইবনুল আক্‌ফানী	"	৫২৪ হি:
" ইবনুল খাত্তাব আর্‌-রাজী	"	৫২৫ হি:
" রযীন ইবনে মু'আবিয়াহ	"	৫৩৫ হি:
" আল্লামা যমখশারী	"	৫৩৮ হি:
" আবু বকর ইবনুল আরাবী	"	৫৪৩/৫৪৬ হি:
" কাজী ইয়ায্‌ ইবনে মূসা	"	৫৪৪ হি:
" আবু মানসুর দায়লামী	"	৫৫৮ হি:
" আবু সা'দ সাম্‌আনী	"	৫৬২ হি:
" হাফেয ইবনুল আসাকির	"	৫৭১ হি:
" আবু তাহের সিলাফী	"	৫৭৬ হি:
" ইবনে বাশকাওয়াল (খরফ ইবনে আব্দুল মালিক)	"	৫৭৮ হি:
" আবুল কাসেম সুহাইলী	"	৫৮১ হি:
" আব্দুল মজিদ মাইয়্যানিশী	"	৫৮১ হি:
" আব্দুল হক ইশবিলী	"	৫৮১/৫৮২ হি:
" হাফেয আবু বকর হাযেমী	"	৫৮৪ হি:
" ইবনুল জাওযী	"	৫৯৭ হি:
" হাফেয আব্দুল গণী মাকদেসী		৬০০ হি:

৬০১- ৭০০ হিজরী

নাম		মৃত্যুসন
হযরত মাজদুদ্দীন ইবনুল আসীর	(রহ.)	৬০৬ হি:
" ইয়াকুত আল্‌-হামাভী	"	৬২৬ হি:
" আবুল হাসান ইবনুল কাত্তার আল্‌-ফাছী	"	৬২৮ হি:
" ইবনে মুকাত বাগদাদী	"	৬২৯ হি:
" ইয্‌যুদ্দীন ইবনুল আসীর	"	৬৩০ হি:
" শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ারদী	"	৬৩২ হি:

" ইবনে দিহ্ইয়া কাল্বী	"	৬৩৩ হি:
" মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী	"	৬৩৮ হি:
" আবুল কাসেম ইবনে তায়লাসান	"	৬৪২ হি:
" ইবনুন নাজ্জার বাগদাদী	"	৬৪৩ হি:
" ইবনুস-সালাহ শহ্রাযূরী	"	৬৪৩ হি:
" জিয়াউদ্দীন আল্-মাকদেসী	"	৬৪৩ হি:
" ইউসুফ ইবনে খলীল দিমাশ্কী	"	৬৪৮ হি:
" আল্লামা রযিউদ্দীন সাগানী	"	৬৫০ হি:
" মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়াহ	"	৬৫২ হি:
" আবুল মুয়াঈদ খাত্তয়ারেযমী	"	৬৫৫ হি:
" আল্লামা কুরতুবী	"	৬৫৬ হি:
" হাফেয যকী উদ্দীন মুনযিরী	"	৬৫৬ হি:
" আবু শা'মা (আব্দুর রহমান দিমাশকী)	"	৬৬৫ হি:
" মুহিউদ্দীন নববী	"	৬৭৬ হি:
" ইবনুস্ সাবুনী (জামাল উদ্দীন আবু হামেদ)	"	৬৮০ হি:
" আবুল ফজল মুওসেলী	"	৬৮৩ হি:
" মুহিবুদ্দীন আবুল আব্বাস তাবায়ী	"	৬৯৪ হি:
" শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবনে খলীল	"	৬৯৯ হি:

৭০১ - ৮০০ হিজরী

নাম		মৃত্যুসন
হযরত তাকী উদ্দীন ইবনে দাকিকুল ঈদ	(রহ.)	৭০২ হি:
" শরফুদ্দীন দিম্য়াতী	"	৭০৫ হি:
" ইবনে রুশাইদ	"	৭২১/৭২২ হি:
" ইবরাহীম মক্কী	"	৭২২ হি:
" তাকি উদ্দীন ইবনে তাইমিয়া	"	৭২৮ হি:
" ইবনে নুকতা (মুঈনুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল গনী হাম্বলী)		৭২৯ হি:
" বদরুদ্দীন ইবনে জামা'আহ্	"	৭৩৩ হি:
" আলাউদ্দীন ইবনে বালবান	"	৭৩৯ হি:
" ওয়ালী উদ্দীন খতীব তাবরেযী	"	৭৪০ হি:
" আবুল হুজ্জাত ইউসুফ আল্-মিয্যী	"	৭৪২ হি:
" শরফুদ্দীন তীবী	"	৭৪৩ হি:
" আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী	"	৭৪৫ হি:
" আল্লামা যাহাবী	"	৭৪৮ হি:

" আলাউদ্দীন মারদেনী (ইবনুত তুরুকমানী)	"	৭৫০ হিঃ
" ইবনুল কাইয়্যিম	"	৭৫১ হিঃ
" তাকিউদ্দীন সুবকী	"	৭৫৬ হিঃ
" জামালুদ্দীন যায়লায়ী	"	৭৬২ হিঃ
" আলাউদ্দীন মুগলতাঈ	"	৭৬২ হিঃ
" আবুল মাহাসীন আল্-হুসাইনী	"	৭৬৫ হিঃ
" ইযযুদ্দীন ইবনে জামা'আহ (হবন)	(রহ.)	৭৬৭ হিঃ
" তাজুদ্দীন সুবকী	"	৭৭১ হিঃ
" ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর	"	৭৭৪ হিঃ
" আব্দুল কাদের কুরাশী	"	৭৭৫ হিঃ
" আল্লামা কিরমানী	"	৭৭৫ হিঃ
" বদরুদ্দীন যারকাশী	"	৭৯৪ হিঃ
" ইবনে রজব হাম্বলী	"	৭৯৫ হিঃ

৮০১ - ৯০০ হিজরী

নাম		মৃত্যুসন
হযরত বুরহান উদ্দীন ইবনে মূসা আল্-আরনাসী	(রহ.)	৮০২ হিঃ
" সদরুদ্দীন আল-মুনাবী	"	৮০৩ হিঃ
" ইবনুল মুলাক্কিন (সিরাজুদ্দীন আবু হাফস উমর ইবনে আলী)		৮০৪ হিঃ
" ইবনে রাসলান (সিরাজুদ্দীন বুল্কীনী)	"	৮০৫ হিঃ
" যয়নুদ্দীন আল-ইরাকী	"	৮০৬ হিঃ
" নূরুদ্দীন হায়ছামী	"	৮০৭ হিঃ
" ইবনে হাবীব হালাবী (আবুল ঈয্ তাহের ইবনুল হাসান)		৮০৮ হিঃ
" বদরুদ্দীন ইবনে জামা'আহ	"	৮১৯ হিঃ
" কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তামিমী	"	৮২১ হিঃ
" জামালুদ্দীন আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ইবনে মূসা	"	৮২৩ হিঃ
" আবু যুর'আহ ইরাকী	"	৮২৬ হিঃ
" শিহাবুদ্দীন আল্-বুসীরী	"	৮৪০ হিঃ
" মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম (ইবনুল ওয়াযীর)	"	৮৪০ হিঃ
" হাফেয ইবনে হজার আসকালানী	"	৮৫২ হিঃ
" বদরুদ্দীন আইনী	"	৮৫৫ হিঃ
" কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম	"	৮৬১ হিঃ
" কাসেম ইবনে কুত্লুবুগা	"	৮৭৯ হিঃ
" ইবনে আমীরিল হাজ্জ	"	৮৭৯ হিঃ

" বুরহান উদ্দীন আল্-বেকায়ী	"	৮৮৫ হিঃ
" তাকিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ফাহাদ মক্কী	"	৮৮৫ হিঃ
" শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস যাবিদী	"	৮৯৩ হিঃ
" বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ নাজী	"	৯০০ হিঃ

৯০১ - ১০০০ হিজরী

নাম		মৃত্যুসন
হযরত শামসুদ্দীন সাখাভী	(রহ.)	৯০২ হিঃ
" ইবনুস্-সায়রাফী (আবুল ফজল আহমদ ইবনে সদকা)	"	৯০৫ হিঃ
" জালালুদ্দীন সুয়ূতী	"	৯১১ হিঃ
" শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল্-কাছতাল্লানী	"	৯২৩ হিঃ
" সফিউদ্দীন খাজরাজী	"	৯২৩ হিঃ এর পরে
" কাজী যাকারিয়্যাহ	"	৯২৬ হিঃ
" কাজী রযী উদ্দিন দামেশকী	"	৯৩৫ হিঃ
" মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ছালেহী	"	৯৪২ হিঃ
" বুরহান্ উদ্দীন হালাবী	"	৯৫৬ হিঃ
" ইবনে আররাক (আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ)	"	৯৬৩ হিঃ
" ইবনুল হাম্বলী	"	৯৭১ হিঃ
" আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী	"	৯৭৩ হিঃ
" ইবনে হাজার হাইতামী আল্-মক্কী	"	৯৭৩ হিঃ
" আলী আল্-মুত্তাকী আল্ হিন্দী	"	৯৭৫ হিঃ
" তাহের পাটনী	"	৯৮৬ হিঃ
" সায়্যিদ শরীফ মুহাঃ আমীন	"	৯৮৭ হিঃ
" কুতুব উদ্দীন আল-মক্কী	"	৯৮৮ হিঃ

১০০১ - ১১০০ হিজরী

নাম		মৃত্যুসন
হযরত মোল্লা আলী কারী	(রহ.)	১০১৪ হিঃ
" মানসূর আত্-তাবলাবী	"	১০১৪ হিঃ
" আব্দুর রঊফ আল মুনাবী	"	১০৩১ হিঃ
" আবুল ইমদাদ বুরহানুদ্দীন মালেকী	"	১০৪১ হিঃ
" আব্দুল হক দেহলভী	"	১০৫২ হিঃ
" ইয্যুদ্দীন খলীলী	"	১০৫৭ হিঃ
" ফকীহ্ যয়নুল আবেদীন	"	১০৬৬ হিঃ
" কাজী মুহাম্মদ আকরাম সিন্ধি	"	শতকের শুরুভাগে জন্ম

১১০১ - ১২০০ হিজরী

নাম	মৃত্যুসন
হযরত শায়খ আব্দুল্লাহ্ ইয়ামানী	(রহ.) ১১০৫ হি:
" যুরকানী (মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বাকী)	" ১১২২ হি:
" আবুল হাসান সিন্ধি	(রহ.) ১১৩৮ হি:
" আব্দুল গনী নাবলূসী	" ১১৪৩ হি:
" নূরদ্দীন হালাবী	" ১১৪৪ হি:
" আল্লামা আজলুনী	" ১১৬২ হি:
" মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস্ সালাম আল্-বান্নানী	" ১১৬৩ হি:
" শামসুদ্দীন ইবনে হিম্মত্যাদাহ	" ১১৭৫ হি:
" শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী	" ১১৭৬ হি:
" মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমীর সানআনী	" ১১৮২ হি:
" আবুল আ'লা আল্-ইরাকী	" ১১৮৩ হি:

১২০১ - ১৩০০ হিজরী

নাম	মৃত্যুসন
হযরত মুরতাযা হাসান যুবায়দী	(রহ.) ১২০৫ হি:
" শাহ আব্দুল আযীয	" ১২৩৯ হি:
" আল্লামা শাওকানী	" ১২৫৫ হি:
" আবু আব্দুল্লাহ সিন্ধি	" ১২৫৭ হি:
" আহমদ আলী সাহারানপুরী	" ১২৯৭ হি:
" মুহাম্মদ কাসেম নানূতুভী	" ১২৯৭ হি:

১৩০১ - ১৪০০ হিজরী

নাম	মৃত্যুসন
হযরত আব্দুল হাই লাখনভী	(রহ.) ১৩০৪ হি:
" ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী	" ১৩১৫ হি:
" জহির আহসান নিমাভী	" ১৩২২ হি:
" রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী	" ১৩২৩ হি:
" আল্লামা তাহের জাযায়েরী	" ১৩৩৮ হি:
" শাইখুল হিন্দ (মাহমূদ হাসান দেওবন্দী)	" ১৩৩৯ হি:
" মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর কাত্তানী	" ১৩৪৫ হি:
" খলীল আহমদ সাহারানপুরী	" ১৩৪৬ হি:
" আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী	" ১৩৫২ হি:

" আব্দুর রহমান মুবারকপুরী	"	১৩৫৩ হিঃ
" আশরাফ আলী থানভী	"	১৩৬২ হিঃ
" শাব্বির আহমদ উসমানী	"	১৩৬৯ হিঃ
" যাহেদ কাওছারী	(রহ.)	১৩৭১ হিঃ
" হুসাইন আহমদ মাদানী	"	১৩৭৭ হিঃ
" আহমদ ইবনুস সিদ্দীক আলগুমারী	"	১৩৮০ হিঃ
" বদরে আলম মিরাঠী	"	১৩৮৫ হিঃ
" সাইয়্যিদ ফখরুদ্দীন আহমদ মুরাদাবাদী	"	১৩৯২ হিঃ
" ইউসুফ বিন্নূরী	"	১৩৯৩ হিঃ
" আমীমূল ইহসান মুজাদ্দেদী	"	১৩৯৪ হিঃ
" যফর আহমদ উসমানী	"	১৩৯৪ হিঃ
" মুফতী মাহমূদ	"	১৩৯৬ হিঃ

১৪০০ হিজরী

হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়াহ কান্দলভী	(রহ.)	১৪০২ হিঃ
" হাবীবুর রহমান 'আজমী	"	১৪১২ হিঃ
" আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ	"	১৪১৭ হিঃ
" আব্দুর রশীদ নোমানী	"	১৪২০ হিঃ
" মাহমূদ আত্-তাহহান	মুদ্দাঃ	
" শায়খ মুহাঃ আওয়ামা	মুদ্দাঃ	
" আল্লামা ত্বকী উসমানী	মুদ্দাঃ	

পরিশিষ্ট -৫

ভারতবর্ষে ইলমে হাদীস

ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের চর্চা ঠিক কখন থেকে শুরু হয়েছিল, দিনক্ষণ ঠিক করে তা বলা খুবই মুশকিল। তবে ইসলাম ও মুসলমানরা যখন থেকে এদেশে আগমণ করে তখন থেকেই হাদীসের চর্চাও এদেশে শুরু হয়েছে- একথা অনায়াসেই বলা যায়।

বস্তুত হযরত ওমর রা.-এর যুগ থেকে হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর যুগ পর্যন্ত বেশ কিছু সাহাবী ভারতবর্ষে আগমন করে ছিলেন। যথা :

১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে ওতবান রা.
২. " আসেম বিন আমর আত্-তামিমী রা.
৩. " সুহায়ব বিন আদী রা.
৪. " সুহার বিন আল-আবাদী রা.
৫. " হাকাম বিন আবিল'আস আস-সাকাফী রা.
৬. " উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার তামিমী রা.
৭. " আব্দুর রহমান বিন সামুরা রা.
৮. " হাকাম ইবনে আমর আত্-তাগলিবী রা.
৯. " সিনান ইবনে সালমা হুযালী রহ. মৃঃ ৫৩ হিঃ
১০. " মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা রহ. মৃঃ ৮৩ হিঃ
১১. " মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. মৃঃ ১৬০ হিজরী।

তিনি ভারতের পথে যুদ্ধাভিযানকালে সাগরে ইন্তিকাল করেন। তাকে সিন্ধুতে মতান্তরে জাযিরাতুল আরবে দাফন করা হয়।[১]

৯৩ হিজরী মুতাবিক ৭১১/১২ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে বহু সংখ্যক মুসলমান এদেশে আগমন করে এবং তারা মুলতান, মনসূরা, আলোর, কুসদার, দেবল এবং সিন্দানসহ বিভিন্ন স্থানে বিশেষত; নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করে স্থায়ীভাবে এদেশে বসবাস শুরু করে। তাদের মাধ্যমে এদেশের মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। ইসলাম প্রচার ও কুরআন-হাদীসের চর্চা বলতে গেলে এসকল নবাগত মুসলমানদের মাধ্যমেই শুরু হয়। আগতদের মাঝে যারা হাদীসের শিক্ষাদান-কার্যের সাথে বিশেষভাবে

---

[১] তাহযীবুত তাহযীব- ইবনে হজর কৃত -খ: ৩ পৃ : ৩৪৮।

জড়িত ছিলেন, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হলেন :

১. হযরত মূসা বিন ইয়াকূব আস-সাকাফী আল-বসরী রহ. মৃত :......হিঃ
২. " ইয়াযীদ বিন আবি কাবশাহ দিমাশকী রহ. মৃতঃ ৯৭ হিঃ
৩. " আবু মূসা ইসরাঈল বিন মূসা আল-বসরী রহ.[১] মৃতঃ ১৫৫ হিঃ
৪. " আমর বিন মুসলিম আল বাহেলী রহ. মৃত : ১২৩ হিঃ
৫. " ফযল বিন মুহাল্লাব ইবনে আবী সুফরা রহ. মৃত : ......হিঃ
৬. " রবী ইবনূস-সবীহ আল-বসরী রহ.[২] মৃত : ১৭০ বা ১৬১ হিঃ

এ সকল মনীষীগণের শিক্ষার বদৌলতে ভারত উপ-মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক মুহাদ্দিস তৈরী হয়ে ছিলেন। নিম্নে অঞ্চল ভিত্তিক তাদের উল্লেখযোগ্যদের তালিকা প্রদত্ত্ব হলো।

সিন্ধু ও দেবল অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণ

১. হযরত আহমদ ইবনে মুহাম্মদ হারুন দেবলী রহ. মৃত : ২৭৫ হিঃ
২. " খলফ ইবনে মুহাম্মদ দেবলী রহ. মৃত : ৩০৭ হিঃ
৩. " আবু জা'ফর দেবলী রহ. মৃত : ৩২২ হিঃ
৪. " আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ দেবলী রহ. মৃত : ৩৪৩ হিঃ
৫. " ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ দেবলী রহ. মৃত : ৩৪৫ হিঃ
৬. " মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দেবলী রহ. মৃত : ৩৪৬ হিঃ
৭. " হাসান ইবনে মুহাম্মদ আসাদ রহ. মৃত : ৩৫০ হিঃ
৮. " আবু আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর রহ. মৃত : ৩৯০ হিঃ
৯. " আবুল কাসেম শু'আয়ব ইবনে মুহাম্মদ রহ. মৃত : ৪০০ হিঃ
১০. " হাসান ইবনে হামেদ দেবলী রহ. মৃত : ৪০৭ হিঃ
১১. " আহমদ আবুল আব্বাস মনসূরী[৩] রহ. মৃত :.........হিঃ
১২. " জা'ফর বিন খাত্তাব কুসদারী রহ. মৃত : ৪৫০ হি :
১৩. " ফাত্‌হ ইবনে আব্দুল্লাহ সিন্ধী রহ.[৪] মৃত : ...... হি :

---

১ বুখারী শরীফে তাঁর সূত্রে ইমাম বুখারী অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। সুফয়ান সাওরী ও সুফয়ান ইবনে ওয়ায়না তার ছাত্র ছিলেন।

২ ইনি সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজার রাবীদের একজন, ইমাম বুখারীও তার কাছ থেকে তা'লীকান হাদীস নকল করেছেন। -তাকরীবুত তাহযীব খ:১, পৃঃ ২৪৫।

৩ ইনি মনসূরার কাজী ছিলেন। তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে।

৪ আস সাকাফাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল হিন্দ পৃষ্ঠা ঃ ১৩৫-এর তথ্য অবলম্বনে।

লাহোর

৩১৫ হিজরীতে বুখারা থেকে শায়খ মুহা. ইসমাঈল নামে জনৈক মুহাদ্দিস লাহোরে আগমন করেন। তার প্রভাব ও সান্নিধ্যে লাহোরে অনেক মুহাদ্দিস তৈরী হয়েছিলেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হলেন :

১. হযরত আবুল হাসান আলী ইবনে উমর লাহোরী রহ. মৃঃ ৫২৯ হিঃ
২. " আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে খলফ লাহোরী রহ. মৃঃ ৫৪০ হিঃ
৩. " আবুল ফতূহ আব্দুস সামাদ লাহোরী রহ. মৃঃ ৫৫০ হিঃ
৪. " সাইয়্যিদ মুরতাযা আল-কূফী রহ. মৃঃ ৫৮৯ হিঃ

মানসূরা (হায়দরাবাদ)

১. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালেহ মনসূরী রহ. মৃঃ........হিঃ
২. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ মনসূরী রহ. মৃ : ৩৮০হিঃ
৩. আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর ইবনে মুররাহ- মানসূরী রহ. মৃ : ৩৯০ হিঃ

কুসদার (বেলুচিস্থান)

১. সিনান ইবনে সালামাহ আল-হুযালী রহ. মৃঃ.........হিঃ
২. জা'ফর ইবনে খাত্তাব কুসদারী রহ. মৃঃ ৪৫০ হিঃ
৩. সীবওয়ায়হ ইবনে ইসমাঈল রহ. মৃঃ ৪৬৩ হিঃ

মুলতান

১. শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়্যাহ মুলতানী রহ. মৃঃ ৬৬৬ হিঃ

এছাড়াও সপ্তম হিজরীতে যারা হাদীসের খিদমাতে নিয়োজিত ছিলেন, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হলেন-

১. কাজী মিনহাজুস সিরাজ জোযজানী রহ. মৃঃ ৬৬৮ হিঃ
২. কামাল উদ্দীন আয্-যাহেদ রহ. মৃঃ ৬৮৪ হিঃ
৩. বুরহান উদ্দীন মাহমুদ ইবনে আবুল খায়ের বলখী রহ. মৃঃ ৬৮৭ হিঃ
৪. রযী উদ্দীন বাদায়ূনী রহ. মৃঃ ৭০০ হিঃ
৫. আবু তাওয়ামাহ আল-বুখারী (হাম্বলী) রহ. মৃঃ ৭০০ হিঃ

তৎকালের কতিপয় উল্লেখযোগ্য হাদীস চর্চাকেন্দ্র :

* এসময় ভারত উপমহাদেশে বেশ কিছু হাদীসচর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠে। যথা:

১. দিল্লীতে নিযামুদ্দীন আওলিয়া (মৃঃ ৭২৫ হিঃ)-এর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্র গড়ে উঠে। এ কেন্দ্র থেকে যেসব মুহাদ্দিস তৈরি হয়েছেন তাদের মাঝে নিম্নোক্তরা উল্লেখযোগ্য :

* শায়খ ফখরুদ্দীন যাররাদ দেহলভী রহ. মৃঃ ৭৪৮ হিঃ
* শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া উরনী রহ. মৃঃ ৭৪৯ হিঃ
* শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী রহ. মৃঃ ৭৫৭ হিঃ
* শায়খ শামসুদ্দীন খাজেগী কুরাবী রহ. মৃঃ ৮৭৮ হিঃ

২. বিহারে শরফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া আল মুনিরী (মৃঃ ৭৮৬ হিঃ)-এর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্র গড়ে উঠে। এ কেন্দ্র থেকে যে সব মুহাদ্দিস তৈরি হয়েছিলেন তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হলেন :

* শায়খ মুযাফ্ফর বলখী রহ. মৃঃ ৭৮৬ হিঃ
* শায়খ হুসাইন বিন মুঈয বিহারী রহ. মৃঃ ৮৪৫ হিঃ

৩. কাশ্মীরে আলী হামদানীর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এখান থেকেও অনেক মুহাদ্দিস তৈরী হয়েছিলেন।

৪. মুলতানে শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়্যাহর নেতৃত্ব একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এখান থেকেও বহু ব্যক্তিত্ব তৈরী হয়েছিল।

৫. লাক্ষৌ ফিরিঙ্গিমহলে মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহলাভীর নেতৃত্বে দারুল উলূম নিযামিয়্যাহ নামে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী প্রায় ৩০০ বৎসর গোটা ভারতের মাদরাসাগুলো এ মাদরাসার সিলেবাস অনুসারে পরিচালিত হয়।

৬. বাংলাদেশে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০ হিঃ)-এর নেতৃত্বে ঢাকার সোনারগাঁয়ে একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বহু জ্ঞান-পিপাসু এখান থেকে তাদের ইলমের পিপাসা নিবারণ করেন।

এই শতাব্দীর আরো যারা উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন তারা হলেন -

১. শায়খ মুহীউদ্দীন আল-কাশানী রহ. মৃঃ ৭১৯ হিঃ
২. শায়খ নিযামুদ্দীন যফরাবাদী রহ. মৃঃ ৭৫৫ হিঃ
৩. শায়খ যিয়াউদ্দীন আল-বারানী রহ. মৃঃ ৭৫৮ হিঃ
৪. শায়খ মুযাফফর বলখী রহ. মৃঃ ৭৮৬ হিঃ
৫. শায়খ জামালুদ্দীন ইবনে বাহাউদ্দীন রহ. মৃঃ....... হিঃ
৬. শায়খ জালালুদ্দীন বুখারী রহ. মৃঃ ৭৮৮ হিঃ
৭. শায়খ আবুল ফাতাহ সদরুদ্দীন হুসাইনী রহ. মৃঃ ৮২৫ হিঃ
৮. শায়খ হুসাইন ইবনে মুঈয বিহারী রহ. মৃঃ ৮৪৪ হিঃ
৯. শায়খ কাজী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী রহ. মৃঃ ৮৪৫ হিঃ
১০. শায়খ আহমদ লঙ্গর দরিয়া রহ. মৃঃ ৮৮১ হিঃ
১১. শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন রহ. মৃঃ ৯১৯ হিঃ

অন্যান্য দেশ থেকে আগত কতিপয় মুহাদ্দেসীন

এ সময়ে এসে ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয় এবং খোরাসানীদের কর্তৃক ভারতের ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়ার ফলে ইলমে হাদীসের চর্চায় খানিকটা ভাটা পড়ে। তখন ইউনানী দর্শন, রিয়াজী, কবিতার চর্চা, নাহু-সরফ, ফিকাহ ও উসূলে ফিকাহ ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যসূচীতে প্রাধান্য পায়। হাদীসের ক্ষেত্রে আল্লামা সানআনীর 'মাশারেকুল আনওয়ার' এবং বেশী থেকে বেশী খতীব তাবরেযীর 'মিশকাতুল মাসাবীহ'-এর পাঠদান করা হত। সৌভাগ্যক্রমে এসময় বেশ কিছু বহিরাগত মুহাদ্দিস এদেশে তশরীফ আনেন। বস্তুত গুজরাটের অধিপতি আহমদ শাহ কর্তৃক ভারত ও আরবের মাঝে সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ অবমুক্ত করে দেওয়ার কারণে আরবীয় মুহাদ্দিসগণের ভারতে আসার পথ সুগম হয়। তাছাড়া ইরানে শিয়া মতাবলম্বীরা সে দেশের ক্ষমতায় চেপে বসার কারণে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেম উলামাদের উপর ব্যাপক নির্যাতন শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে বহু ইরানী আলেম হিজরত করে ভারতে চলে আসেন। ফলে আরব ও ইরানের অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস তখন ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন।

তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হলেন-

১. বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর দামামিনী (মৃঃ ৮২৭ হিঃ)। তিনি ইয়ামানের 'জামে' আল-জাবেদ'-এর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। যথা :

    ক. তা'লীকুল ফারায়েয ।

    খ. তুহফাতুল গরীব (মুগনীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ)।

    গ. আইনুল হায়াত (হায়াতুল হাইওয়ানের ব্যাখ্যাগ্রন্থ)।

২. ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দির রহমান হাশেমী রহ. (মৃঃ ৮৪৩ হিঃ) ইনি মিশরের ইবনে হজর আসকালানীর শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আগত।

৩. আবুল ফতুহ নূরুদ্দীন আহমদ বিন আব্দুল্লাহ শিরাযী রহ. (মৃঃ ৮৬০ হিঃ) তিনি শিরায নগর থেকে আগত প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন।

৪. খাজা ইমাদুদ্দীন মাহমূদ ইবনে মোহাম্মদ আল-জিলানী রহ. (মৃঃ ৮৮৬ হিঃ) ইবনে হজরের শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আগত ।

৫. আবুল ফাতাহ ইবনুর রযী খালেকী রহ. (মৃঃ ৮৮৬ হিঃ) সাখাভীর শিষ্য।

৬. আহমদ ইবনে সালেহ রহ. (মৃঃ----- হিঃ) সাখাভীর শিষ্য।

৭. আব্দুল আযীয ইবনে মাহমূদ তোসী রহ. (মৃঃ ৮৯৯ হিঃ) সাখাভীর ছাত্র।

৮. ওমর ইবনে মুহাম্মদ আদ-দিমাশকী রহ.(মৃঃ ৯০০ হিঃ) সাখাভীর শিষ্য।

৯. ওয়াজীহুদ্দীন মুহাম্মদ মালেকী রহ.(মৃঃ ৯১৯ হিঃ)।

১০. মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আব্দুর রহমান মিশরী রহ.(মৃঃ ৯১৯ হিঃ)।

১১. জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আমর আল-হাযরামী রহ. (মৃঃ ৯২০ হিঃ) সাখাভীর ছাত্র।

১২. হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কিরমানী রহ.(মৃঃ ৯৩০হিঃ) সাখাভীর ছাত্র।

১৩. শিহাবুদ্দীন আব্বাসী রহ. (মৃঃ ৯৩২ হিঃ)

১৪. রফী উদ্দীন সফভী রহ. (মৃঃ ৯৫৪ হিঃ) সাখাভীর ছাত্র।

১৫. মীর মুরতাযা শরীফ শিরাযী রহ. (মৃঃ ৯৭৪ হিঃ)

১৬. মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে খাজা আকবরাবাদী রহ. (মৃঃ ৯৮৩হিঃ) ইনি ইবনে হজর হাইতামীর ছাত্র; মীর কাঁলা নামে খ্যাত। মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মেরকাতের রচয়িতা মুল্লা আলী কারী তাঁর ছাত্র ছিলেন।

১৭. শায়খ আব্দুন নবী গংগুহী রহ. (মৃঃ ৯৯০ হিঃ) শায়খ যাকারিয়্যাহ আল-আনসারীর ছাত্র।

১৮. শিহাবুদ্দীন আল-আব্বাসী রহ.(মৃঃ ৯৯২ হিঃ) শায়েখ যাকারিয়্যাহ-এর ছাত্র।

১৯. আব্দুল মু'তী ইবনে হুসাইন আল-মক্কী রহ. (মৃঃ ৯৯২ হিঃ)।

২০. শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে বদরুদ্দীন মিশরী রহ.(মৃঃ ৯৯২ হিঃ)।

২১. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-ফাখী রহ. (মৃঃ ৯৯২হিঃ) ইবনে হজর হাইতামীর ছাত্র)

২২. শায়খ ইব্রাহীম ইবনে আহমদ বাগদাদী রহ. (মৃঃ........হিঃ)।

২৩. যিয়াউদ্দীন আল-মাদানী রহ. (মৃঃ........হিঃ)।

২৪. শায়খ আব্দুল্লাহ রহ. (মৃঃ ৯৯০ হিঃ) ইবনে হজর হাইতামীর ছাত্র।

২৫. আবুল মুতী' হাযরামী রহ. (মৃঃ ৯৮৯ হিঃ)।

ইলমে হাদীস আহরণের জন্য যারা বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন :

এ পর্যায়ে এসে ভারতীয় ছাত্রদের ইলমে হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞান-পিপাসা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় এবং তারা মক্কা-মদীনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে হাদীসের ইলম আহরণে প্রবৃত্ত হন। হাদীসের ইলম আহরণের উদ্দেশ্যে যারা বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন তাদের মাঝে প্রখ্যাতরা হলেন-

১. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দুল্লাহ সিন্ধী রহ.

২. শায়খ রহমত উল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ সিন্ধি রহ.

৩. শায়খ জামালুল্লাহ গুলবুরগাভী রহ.

৪. শায়খ আব্দুল আওয়াল হুসাইনী রহ.(মৃঃ ৯০৭হিঃ)

৫. শায়খ আহমদ ইবনে ইব্রাহীম আওদী আল-হানাফী রহ.

৬. শায়খ আহমদ ইবনে আলী আল-হিন্দী রহ.

৭. শায়খ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-হিন্দী রহ.

৮. শায়খ হাফেয ইবনে মুহায্যাব জৈনপুরী রহ.

৯. শায়খ হাফেয ইবনে ইলয়াস আল-হিন্দী রহ.

১০. শায়খ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ.

১১. শায়খ ওমর ইবনে বাহাউদ্দীন রহ.

১২ . শায়খ যাহেদ ইবনে আরেফ লাখনোভী রহ.

১৩. শায়খ কাসেম ইবনে দাউদ আহমদাবাদী রহ.

১৪. শায়খ মাসউদ ইবনে আহমদ রহ.

১৫. শায়খ আবু বকর ইবনে আলী দেহলভী রহ.

১৬. শায়খ রেজা ইবনে দাউদ আহমদাবাদী রহ.

এসময়ের উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন মুহাদ্দেসীন

এছাড়াও বেশ কিছু মুহাদ্দিস এমন ছিলেন যারা হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন এবং হাদীস শাস্ত্রে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থাদিও রচনা করেছেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হলেন -

১. জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে তাহের আল-পাটনী (মৃঃ ৯১৪হিঃ) তিনি 'মালিকুল মুহাদ্দেসীন' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী :

ক. মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার

খ. তাযকেরাতুল মওযু'আত

গ. আসমাউর রিজাল

ঘ. কানূনুল্ মওযূ'আত ওয়ায যয়ীফ

ঙ. আল-মুগনী ফি যবতির রিজাল।

২. আবু বকর বিন মুহাম্মদ আল-রাহরুযী (মৃঃ ৯১৫ হিঃ)। তিনি ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। আল-জাজায়েরী রচিত 'হিসনে হাসীন' এবং কাজী ইয়ায রচিত 'আইনুল ওয়াফা ফী তরজমাতিশ শিফা' এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

৩. মীর সাইয়্যিদ আব্দুল আওয়াল আল-হুসাইনী (মৃঃ ৯৬৮ হিঃ)। তিনি মক্কা ও মদীনায় সফর করে ইলমে হাদীসে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তার অত্যন্ত মূল্যবান দুটি গ্রন্থ রয়েছে। যথা :

ক. ফয়যুল বারী ফী শরহে সহীহিল বুখারী ।

খ. মুনতাখাবু সিফরিস সা'আদাত।

৪. শায়েখ আলী ইবনে হুসামুদ্দীন আল-মুত্তাকী বুরহানপুরী রহ. (মৃঃ ৯৭৫ হিঃ। তিনি ইলমে হাদীসের একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানযুল উম্মাল' তারই অমর রচনা।

৫. শায়খ আব্দুল্লাহ আনসারী সুলতানপুরী রহ. (মৃ : ৯৯০ হিঃ)। তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। যথা :

ক. শরহু শামায়িলিন নবী

খ. ইসমতুল আম্বিয়া ।

৬. শায়েখ তায়্যিব সিন্ধী রহ. (মৃঃ ৯৯৯ হিঃ)। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'তা'লিকাতু মিশকাতিল মাসাবীহ'।

৭. শায়খ ইয়াকুব ইবনে হাসান সায়ফী কাশ্মীরী রহ. (মৃঃ ১০০৩হিঃ) ইনি মুজাদ্দিদে আলফে সানীর উস্তাদ ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী হল :

ক. শরহু সহীহিল বুখারী ।

খ. মাগাযীউন নবুয়্যাহ ।

গ. রিসালায়ে আবদার।

ঘ. তাফসীরুল কুরআন।

৮. শায়খ আলহাজ্ব মুহাঃ কামাল কাশ্মীরী রহ. (মৃঃ ১০০৬হিঃ)। মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর কাছ থেকে হাদীসের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী:

ক. শরহু শামায়িলিন নবী।

খ. শরহু মাশারেকিল আনওয়ার।

গ. খুলাসাতুল জামে' ফী জামেয়িল আহাদীস।

৯. শায়খ জাওহার কাশ্মীরী রহ. (মৃঃ ১০২৬ হিঃ)

১০. মুহীউদ্দীন আব্দুল কাদের (ইবনে শায়খ) রহ.(মৃঃ ১০৩৭ হিঃ)। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী:

ক. আল মিনহাজুল বারী ফী খতমি সহীহিল বুখারী ।

খ. আর-রিসালাহ ফী মানাকিবিল বুখারী।

১১. খাজা মুবারক ইবনে মাখদুম রহ.- মাদারিজুল আখবারের প্রণেতা।

১২. শায়খ শামসুদ্দীন আব্দুল্লাহ সুলতানপুরী রহ.। তাঁর রচিত শামায়েলের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছিল।

১৩. শায়খ আহমদ ইবনে ইসমাঈল রহ.

১৪. শায়খ রাজেহ ইবনে দাউদ গুজরাটি রহ.

১৫. আলীমুদ্দীন সাত্তারী রহ.

১৬. উসমান ইবনে ঈসা সিন্ধী রহ. (মৃঃ১০০৮ হিঃ)।

পরবর্তী যুগের তিনজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস:

এর পরবর্তী যুগে তিনজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন। বলতে গেলে এই তিন জনের অপরিসীম শ্রম ও অবদানের ফলে ভারতবর্ষে ইলমে হাদীস প্রাতিষ্ঠানিক গতি লাভ করে। এই তিনজন হলেন :

১. শায়খ আহমদ ইবনে আব্দুল আহাদ সারহিন্দী রহ. (মুজাদ্দিদে আলফে সানী) মৃঃ ১০৩৪ হি
২. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. (মৃঃ ১০৫৩ হিঃ)
৩. শায়খ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ. (মৃঃ ১১৭৬ হিঃ)

১. শায়খ আহমদ সারহিন্দী রহ. ও ইলমে হাদীসে তাঁর খিদমাত

শায়খ আহমদ সারহিন্দী রহ. (মৃঃ ১০৩৪ হিঃ) একজন প্রতিভাধর আধ্যাত্মিক সাধক ব্যক্তি ছিলেন। কুরআন সুন্নার আলোকে সমাজ সংস্কারের এক বিরাট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার উপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূচনা হয়। তিনি নিজে 'হাদীসে আরবাঈন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে ছিলেন। তাঁর এই সংস্কার কার্যক্রমের ধারায় অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস তৈরি হয়। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হলেন :

১. শায়খ সাঈদ ইবনে শায়খ আহমদ সারহিন্দী রহ.(মৃঃ ১০৭০ হিঃ) তিনি মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার ছিলেন।
২. শায়খ মা'সুম ইবনে শায়খ আহমদ সারহিন্দী রহ. (মৃঃ ১০৮০ হিঃ)
৩. খাজা সাইফুদ্দীন সারহিন্দী রহ.(মৃঃ ১০৯৮ হিঃ)
৪. শায়খ ফররুখ শাহ ইবনে শায়খ সাঈদ সারহিন্দী রহ. (মৃঃ ১১১২ হিঃ)। কথিত আছে যে তিনি সত্তুর হাজার হাদীস মুখস্ত জানতেন।
৫. শায়খ মুহাঃ আ'যম ইবনে সাইফুদ্দীন মা'সুমী রহ. (মৃঃ১১১৪ হিঃ) তিনিও বুখারী শরীফের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ তৈরি করে ছিলেন।
৬. শাহ আবু সাঈদ ইবনে সফীউল কদর মুজাদ্দেদী রহ. (মৃঃ ১২০৫ হিঃ) তিনি খাজা সাইফুদ্দীনের পৌত্র ছিলেন এবং শাহ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদীর পিতা ছিলেন।
৭. শায়খ সিরাজ আহমদ ----- ইবনে ফররুখ শাহ রহ.(মৃঃ ১২৩০ হিঃ) তিনি বুখারী শরীফের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।
৮. শাহ- আব্দুল গণী ইবনে আবু সাঈদ মুজাদ্দেদী রহ. (মৃঃ ১২৯৬হিঃ)
৯. শায়খ মুহাঃ আফজাল শিয়ালকোটী রহ. (মৃঃ...... হিঃ) তিনি হিজাযে সফর করে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ বসরী আল-মক্কী থেকে হাদীস আহরণ করেন

এবং দেশে ফিরে এসে দিল্লীতে হাদীসের শিক্ষাদান কার্যে আজীবন নিরত থাকেন।

১০. শায়খ সফীউল্লাহ খায়রাবাদী রহ. (মৃঃ-১১৫৭ হিঃ) তিনি হিজাযে গমন করে শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম কুরদী আল-মাদানী থেকে হাদীস আহরণ করেন। হিজায থেকে ফিরে এসে খায়রাবাদে হাদীস শিক্ষাদানের কাজে আজীবন নিরত থাকেন।

১১. শায়খ ফাখের ইবনে ইয়াহইয়া এলাহাবাদী রহ. (মৃ :-----হিঃ)। তিনি শায়খ মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধী থেকে হাদীস আহরণ করেন এবং ইলমে হাদীসের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন

১২. শায়খ খায়রুদ্দীন শুরাটি রহ. (মৃঃ ----হিঃ)। তিনি শায়খ মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধী থেকে হাদীস আহরণ করেন এবং শুরাটে দীর্ঘ ৫০ বৎসর যাবৎ ইলমে হাদীসের খিদমতে নিরত থাকেন। বহু ছাত্র তাঁর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করে।

২. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী রহ. ও ইলমে হাদীসে তাঁর খিদমাত

বস্তুত আব্দুল হক দেহলভী রহ. (মৃঃ ১০৫২ হিঃ) ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যার মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের নবজাগরণের সূচনা হয়। স্বদেশে শিক্ষা অর্জনের পর তিনি হিজায গমণ করেন। তথায় তিনি শায়খ আলী তকী এবং তাঁর খলীফা আব্দুল ওয়াহাব মুত্তাকীর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন এবং সিহাহ সিত্তার ইজাযত প্রাপ্ত হন। স্বদেশে ফিরে এসে দীর্ঘ ৫০ বৎসর যাবৎ স্বীয় বাসভবনে ইলমে হাদীস শিক্ষাদানের কাজে নিরত থাকেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী :

ক. আশিয়াতুল লুম্'আত - মেশকাত শরীফের ফার্সী শরাহ।

খ. আত্-তরীকুল কাভীম ফী শরহি সিরাতিল মুস্তাকীম।
(সিফরুস সাআদাতের ফার্সী শরাহ)

গ. আল-ইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল

ঘ. মা-সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ ফী আইয়্যামিস সানাহ

ঙ. হাদায়েকুল হানাফিয়্যাহ ।

তাঁর ভক্তবৃন্দ ও বংশধারায় অনেক প্রখ্যাত আলেম-উলামা ও মুহাদ্দিস তৈরী হয়। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হলেন -

১. শায়খ নূরুল হক ইবনে আব্দুল হক দেহলভী (মৃঃ ১০৭৩ হিঃ) তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকেই ইলমে হাদীস অর্জন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী :

ক. তাইসীরুল কারী ফী শরহে সহীহিল বুখারী ।

খ. শরহু শামায়িলিন নবী ।

২. খাজা হায়দার পটলু রহ. মৃঃ ১০৫৭ হিঃ
৩. খাজা মুঈনুদ্দীন রহ. মৃঃ ১০৮৫ হিঃ
৪. বাবা দাউদ মেশকাতী কাশ্মীরী রহ. মৃঃ ১০৯৮ হিঃ
৫. মীর সাইয়্যিদ মুবারক বেলগ্রামী রহ. মৃঃ ১১১৫ হিঃ
৬. মীর আব্দুল জলীল বেলগ্রামী রহ. মৃঃ ১১৩৮ হিঃ
৭. হাফিজ আব্দুস সামাদ ফখরুদ্দীন ইবনে মুহিবুল্লাহ রহ. (মৃঃ ১১৫০ হিঃ)
তিনি শায়খ নূরুল হক রহ.-এর পৌত্র ছিলেন।
৮. শায়খুল ইসলাম ইবনে হাফিজ ফখরুদ্দীন রহ. মৃঃ ১১৮০ হিঃ
৯. শায়খ এনায়েতুল্লাহ মশাল কাশ্মীরী রহ. মৃঃ ১১৮৫ হিঃ
১০. মীর গোলাম আলী আযাদ বেলগ্রামী রহ. মৃঃ১২০০ হিঃ
১১. সালামুল্লাহ সিরাজ আহমদ সারহিন্দী রহ. মৃঃ ১২২৯ হিঃ

এ সময়ের খ্যাতিমান আরো কতিপয় মুহাদ্দিস

১. শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক ইবনে শরীফ রহ. মৃঃ ১০৪০ হিঃ
২. শায়খ হুসাইন আল হুসাইনী রহ. মৃঃ ১০৪৪ হিঃ
৩. শায়খ আমীন উদ্দীন ইবনে মাহমূদ জৈনপুরী মৃঃ ১০৭২ হিঃ
৪. সাইয়্যিদ জা'ফর বদরে আলম রহ. মৃঃ ১০৮৫ হিঃ
৫. শায়খ ইয়াকুব বান্নানী লাহোরী রহ. মৃঃ ১০৯৮ হিঃ
৬. আবুল মাজদ মাহবুব আলম ইবনে বদরে আলম রহ. মৃঃ ১১১১ হিঃ
৭. শায়খ নাঈম ইবনে মুহাম্মদ জৈনপুরী রহ. মৃঃ ১১২০ হিঃ
৮. শায়খ মুহাঃ আকরাম ইবনে আব্দুর রহমান সিন্ধী রহ. মৃঃ ১১৩০ হিঃ
৯. শায়খ নূরুদ্দীন ইবনে সালেহ আহমদাবাদী রহ. মৃঃ ১১৫৫ হিঃ
১০. ইয়াহইয়া ইবনে আমীন আব্বাসী এলাহাবাদী মৃঃ ১১৮০ হিঃ
১২. মিরজা জান-জলন্দরী রহ. মৃঃ ১১৮০ হিঃ
১১. মিরজা মুহাম্মদ ইবনে রুস্তম বদখশী রহ. মৃঃ ১১৯৫ হিঃ

৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী ও ইলমে হাদীসে তাঁর খিদমাত

শাহ আহমদ ইবনে আব্দুর রহীম, যিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহ (মৃঃ ১১৭৬ হিঃ) নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের ব্যাপক খিদমাত আঞ্জাম পায়। তিনি প্রথমে স্বীয় পিতার নিকট ইলমে হাদীস অধ্যয়ন করেন। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার কাজ আঞ্জাম দেওয়ার পর প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে হিজাযের উদ্দেশ্যে সফর করেন। তথায় দুই বৎসর অবস্থান করেন। মক্কায় তিনি ওয়াফদুল্লাহ আল-মালেকী ও শায়খ তাজুদ্দীন কালাঈ মালেকী রহ. এর নিকট থেকে হাদীসের ইলম অর্জন করেন এবং মদীনায় শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ

ইবনে ইব্রাহীম কুরদী রহ. এর কাছ থেকে হাদীসের ইলম ও ইজাযত লাভ করেন। স্বদেশে ফিরে এসে তিনি দিল্লীতে হাদীসের খিদমতে নিরত হন। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলী-

ক. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ।
খ. তারাজিমুল বুখারী ।
গ. শরহু তারাজিমে আবওয়াবিল বুখারী ।
ঘ. আল-মুসাওয়া শরহে মুয়াত্তা।
ঙ. আল-মুসাফ্ফা শরহে মুআত্তা (ফার্সী ভাষায় রচিত)
চ. আসারুল মুহাদ্দেসীন
ছ. ওয়াসীকাতুল আখইয়ার।

বস্তুত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের নবযুগের সূচনা হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে এমন কোন মুহাদ্দিস পাওয়া যাবে না, যার সনদ কোন না কোন ভাবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেনি। এই ধারার মাধ্যমে ইলমে হাদীস সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু খ্যাতিমান মুহাদ্দিস জন্ম গ্রহণ করে। শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তা ধারার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে ইসলামী কৃষ্টি-কালচার, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা গড়ে উঠে। এ কাফেলার সূর্য-সন্তানেরাই ইলমে হাদীসের ঝাণ্ডা ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে উড্ডিন করে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর উল্লেখযোগ্য শাগরেদগণ হলেন :

১. সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. (মৃঃ ১২২৫হিঃ)। হাদীসে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে শাহ আব্দুল আযীয তাকে 'যুগের বায়হাকী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল-লুবাব নামে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে।
২. শাহ আব্দুল আযীয ইবনে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. মৃঃ ১২৩৯ হিঃ
৩. মাওঃ আশেক ফুলতী রহ. মৃঃ.........হিঃ
৪. ফকীহ নূর মুহাম্মদ বুরহানভী রহ. মৃঃ.........হিঃ
৫. মাওঃ রফীউদ্দীন মুরাদাবাদী রহ. মৃঃ ১২১৮ হিঃ
৬. মাওঃ খায়রুদ্দীন সুয়ূতী রহ. মৃঃ ১২০৬ হিঃ
৭. মাওঃ সৈয়দ মুর্তাজা বেলগ্রামী রহ. মৃঃ ১২০৫ হিঃ
৮. মাওঃ মাখদূম শাহ -লাখনোভী রহ. মৃঃ ....হিঃ

শাহ আব্দুল আযীয রহ. মৃঃ ১২৩৯ হিঃ

তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী :

ক. উজালাতুন নাফে'আহ - (উসূলে হাদীস সংক্রান্ত)
খ. বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন

গ. তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ
ঘ. আল-মওযূ'আত
ঙ. মুসাওয়ার তা'লীক

তার বহু শিষ্য ছিল যারা ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে হাদীসের দরস দানের কাজে নিরত ছিলেন। তাদের মাঝে খ্যাতিমানরা হলেন :

১. মাও. শাহ রফিউদ্দীন রহ. (মৃঃ ১২৪৯হিঃ) শাহওয়ালী উল্লাহর দ্বিতীয় পুত্র।
২. মাও. শাহ আব্দুল কাদের রহ. (মৃঃ --হিঃ) শাহওয়ালী উল্লাহর তৃতীয় পুত্র।
৩. মাও. শাহ আব্দুল গণী দেহলভী রহ. (মৃঃ১২৯৬) শাহওয়ালী উল্লাহর কনিষ্ঠ পুত্র।
৪. মাও. শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. (মৃঃ ১২৪৬ হিঃ)
৫. মাও. আব্দুল হাই দেহলভী রহ. (মৃঃ ১২৪৬হিঃ)
তিনি আঃ আযীযের রহ.-এর জামাতা ছিলেন।
৬. মাও. সৈয়দ আওলাদ কানৌজী রহ. মৃঃ ১২৫৭ হিঃ
৭. মাও. সদরুদ্দীন কাশ্মীরী (মুফতী) রহ. মৃঃ ১২৫৮ হিঃ
৮. মাও. ফয়যুল্লাহ দেহলভী রহ. মৃঃ ১২৫৮ হিঃ
৯. মাও. খোররাম আলী বালহুরী রহ. মৃঃ ১২৭১ হিঃ
১০. মাও. হুসাইন আহমদ মালিহাবাদী রহ. মৃঃ ১২৭৫ হিঃ
১১. মাও. হাসান আলী লাখনোভী রহ. মৃঃ ...... হিঃ
১২. মাও. আব্দুল হালীম লাখনোভী রহ. মৃঃ .... হিঃ
১৩. মাও. আফযাল ফারুকী রহ. (শাহ আঃ আযীযের জামাতা) মৃঃ ....হিঃ

এসময় শাহ আব্দুল আযীযের অন্যতম শিষ্য মাওঃ বেলায়াত আলী পাটনায় একটি হাদীসচর্চা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। পাটনার একেন্দ্রটি এক সময় যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করে। সৈয়দ নযীর হুসাইন ও নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সে কেন্দ্রের অন্যতম কৃতি সন্তান। তাঁদের মাধ্যমে এ ধারাটির ব্যাপক প্রসার ও বিস্তৃতি ঘটে।

শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী রহ. (মৃঃ ১২৬২ হিঃ)

শাহ মুহাঃ ইসহাক দেহলভী ছিলেন আফযাল ফারুকীর ছেলে এবং শাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর দৌহিত্র। তিনি শাহ আব্দুল আযীয, শাহ আব্দুল কাদের ও শাহ রফীউদ্দীন থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করেন। শাহ আব্দুল আযীযের ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন। অসংখ্য ছাত্র তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করে। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হলেন-

১. নওয়াব কুতুবউদ্দীন খাঁ দেহলভী রহ. (মৃঃ ১২৭৯ হিঃ)। মেশকাত শরীফের ব্যাখা গ্রন্থ " মাযাহেরে হক " তারই অমর কীর্তি।

২. মুফতী এনায়েত আহমদ রহ. মৃঃ ১২৭৯ হিঃ
৩. মাওঃ আহমদ আলী সাহারানপুরী রহ. মৃঃ১২৯৭ হিঃ
৪. মাওঃ আলম আলী নগীনবী রহ. মৃঃ ১২৯৫ হিঃ
৫. মাওঃ শায়খ মুহাম্মদ থানভী রহ. মৃঃ১২৯৬ হিঃ
৬. মাওঃ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী রহ. মৃঃ ১২৯৬হিঃ
৭. মাওঃ সৈয়দ নযীর হুসাইন (মিয়া সাহেব) মৃঃ ১২৯৬ হিঃ
৮. মাওঃ আব্দুর রহমান পানিপথী (ক্বারী) রহ. মৃঃ ১৩১৪ হিঃ

আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রহ. (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ)

তিনি আপন পিতা খাজা আবু সাঈদ মুজাদ্দেদী ও শাহ ইসহাক থেকে ইলম অর্জন করেন। পরে হজ্জ উপলক্ষে হিজায সফর কালে শায়খ আবেদ সিন্ধী মাদানী থেকে হাদীসের ইজাযত লাভ করেন। তাঁর ছাত্রদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হলেন :

১. মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. মৃঃ১২৯৭ হিঃ
২. মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. মৃঃ ১৩২৩ হিঃ
৩. মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী রহ. মৃঃ ১৩০২ হিঃ
৪. মাওলানা মঞ্জুর আহমদ সিন্ধী রহ. মৃঃ ....হিঃ
৫. মাওলানা আব্দুল হক এলাহাবাদী রহ. মৃঃ ....হিঃ
৬. মাওলানা আলীমুদ্দীন বলখী রহ. মৃঃ..........হিঃ
৭. মাওলানা মুহাম্মদ জা'ফরী রহ. মৃঃ..........হিঃ
৮.মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন এলাহাবাদী রহ. মৃঃ..........হিঃ
৯. মাওলানা মাযহার মুজাদ্দেদী রহ. মৃঃ ....হিঃ

আহমদ আলী সাহারনপুরী রহ. মৃঃ ১২৯৭ হিঃ

তিনি মক্কায় অবস্থানকালে শাহ ইসহাক রহ. থেকে হাদীসের ইলম অর্জন করেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর ১৮৬৬ ইংরেজীতে সাহারনপুর মাজাহিরুল উলূম মদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তথায় হাদীসের দরসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা-

ক. হাশিয়ায়ে বুখারী ।
খ. হাশিয়ায়ে তিরমিযী ।
গ. দলীলুল কারী।

তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যগণ হলেন -

১. মওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. মৃঃ ১২৯৭ হিঃ
২. মাওলানা এনায়েত এলাহী সাহারনপুরী রহ. মৃঃ ১৩০৪ হিঃ
৩ মাওলানা মাযহার নানুতুবী রহ. মৃঃ ১৩০২ হিঃ

মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. মৃঃ ১২৯৭ হিঃ

তিনি মাওলানা মামলুক আলীর ছাত্র ছিলেন। মাওলানা আব্দুল হালীম লাখনোভী, মাওলানা আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী ও আহমদ আলী সাহারনপুরীর কাছ থেকে হাদীসের দীক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী থেকে সুলূকের দীক্ষা গ্রহণ করেন। বুখারী শরীফের টিকাসহ অনেক মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্ররা হলেন :

১. মাওলানা ইয়াকূব নানুতুবী রহ. মৃঃ ১৩০২ হিঃ
২. মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী রহ. মৃঃ ১৩১৫ হিঃ
৩. মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী রহ. মৃঃ ১৩৩০হিঃ
৪. মাওলানা মনসূর আলী রহ. মৃঃ ১৩৩৭হিঃ
৫. মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ. মৃঃ ১৩৩৯ হিঃ

মাওলানা ইয়াকূব নানুতুবী রহ. মৃঃ ১৩০২ হি :

তিনি ছিলেন মাওলানা মমলুক আলীর পুত্র। পিতা মামলুক আলী ও কাসেম নানুতুবীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন এবং আব্দুল গণী মুজাদ্দেদীর কাছ থেকে হাদীসের দীক্ষা লাভ করেন। ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী থেকে খিলাফত লাভ করেন। তিনিই দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম মুহ্তামিম নিযুক্ত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্ররা হলেন-

৩. মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী রহ. মৃঃ ১৩৩০ হিঃ
৮. মাওলানা হাকীম মর্নসুর আলী খাঁন -মুরাদাবাদী রহ. মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ
৭. মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (শায়খুল হিন্দ) রহ. মৃঃ ১৩৩৯ হিঃ
১. মাওলানা আব্দুল হক পুরকাজরী রহ. মৃঃ ১৩৪২ হিঃ
২. মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ থানভী রহ. মৃঃ ...... হিঃ
৪. মাওলানা হাফেজ আহমদ নানুতুবী রহ. মৃঃ ১৩৪৭ হিঃ
(দারুল উলূমের ৫ম মুহতামিম)
৯. মুফতী আযীযুর রহমান মৃঃ ১৩৪৭ হিঃ
৫. মাওলানা হাবীবুর রহমান ওসমানী রহ. মৃঃ ১৩৪৮ হিঃ
(দারুল উলূমের ৬ষ্ঠ মুহতামিম)
৬. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. মৃঃ ১৩৬২ হিঃ

মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী রহ. (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ)

তিনি তাঁর পিতা আব্দুল হালীম লাখনোভীর নিকট থেকেই শিক্ষা সমাপন করেন। তাঁর শতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

ক. যফরুল আমানী-(উসূলে হাদীস সংক্রান্ত)

খ. রিসালাহ ফী আহাদিসিল মওযূ'আহ
গ. আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল ।
ঘ. তা'লীকুল মুমাজ্জাদ শারহে মুয়াত্তা মুহাম্মদ
ঙ. আল-আজবিবাতুল ফাযিলাহ

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রগণ হলেন-

১. মাওলানা জহীর আহমদ নিমুভী রহ. মৃঃ ১৩২২ হিঃ
২. মাওলানা আব্দুল হাদী আযীমাবাদী রহ. মৃঃ .... হিঃ
৩. মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন এলাহাবাদী রহ. মৃঃ .... হিঃ
৪. মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান লাখনোভী রহ. মৃঃ .... হিঃ
৪. মাওলানা আব্দুল গফুর রমাযানপুরী রহ. মৃঃ .... হিঃ
৫. মাওলানা আব্দুল আযীয ফিরিঙ্গীমহল্লী রহ. মৃঃ .... হিঃ

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. (মৃঃ ১৩২৩ হিঃ)

তিনি মাওলানা মামলুক আলী, শাহ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী ও শাহ আহমদ সাঈদ থেকে দীক্ষা লাভ করেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী থেকে খিলাফত লাভ করে নিজ বাড়ী গঙ্গুহতেই হাদীস ও তাসাউফের দরস দানের কাজে নিরত থাকেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

ক. লামেউদ দারারী ।
খ. কাওকাবুদ দুররী।

তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যরা হলেন -

১। মাওলানা ইয়াহইয়া কান্দলভী রহ.
২। মাওলানা মাজেদ আলী জৈনপুরী রহ.
৩। মাওলানা কাদের আলী রহ.
৪। মাওলানা সা'দুল্লাহ রহ.
৫। মাওলানা হাবীবুর রহমান দেওবন্দী রহ. মৃঃ ১৩৪৮ হিঃ প্রমুখ ।

এসময়ের কতিপয় উল্লেখযোগ্য হাদীসচর্চা কেন্দ্র

১. মাদ্রাসায়ে ফতেহপুর : হিজরী একাদশ শতকে সম্রাট শাহজাহানের পৃষ্ঠ পোষকতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. মাদ্রাসায়ে আকবরাবাদী : হিজরী একাদশ শতকে সম্রাট শাহজাহানের পৃষ্ঠ পোষকতায় এটি প্রতিষ্ঠিত এবং মাওলানা আব্দুল কাদের দেহলভীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ইসমাঈল শহীদ ও ফজলে হক খায়রাবাদী এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কৃতীসন্তান।

৩. মাদ্রাসায়ে দারুল বাকা : ১০৬০ হিজরী সালে সম্রাট শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকাতায় দিল্লী জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্শে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. মাদ্রাসায়ে নিযামিয়্যাহ : ১১০৫ সালে বাদশাহ আলমগীর রহ. এর বদান্যতায় মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহলাভী কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মোল্লা হাসান, বাহরুল উলূম মাওলানা আব্দুল 'আলী, মাওলানা আব্দুল হাই, মাওলানা আব্দুল হালীম প্রমুখ এ প্রতিষ্ঠানের কৃতীসন্তান।

৫. দিল্লী কলেজ : একাদশ শতকের শেষভাগে গাজীউদ্দীন খানের প্রচেষ্টায় আজমীর শরীফের সন্নিকটে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা রশিদুদ্দীন খান ও মাওলানা মমলুক আলী নানুতুবী যথাক্রমে এ প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ছিলেন। মাওলানা কাসেম নানুতুবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, ইয়াকুব নানুতুবী, আহসান নানুতুবী, জুলফিকার আলী দেওবন্দী, ফজলুল রহমান দেওবন্দী প্রমুখ এ প্রতিষ্ঠানের কৃতীসন্তান ছিলেন।

৬. রামপুর আলীয়া মাদ্রাসা : রামপুরের গভর্নর নওয়াব ফয়জুল্লাহ খান বাহরুল উলূম মাওলানা আব্দুল 'আলীর মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

৭. মাদ্রাসায়ে রহিমিয়্যাহ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর পিতা মাওলানা আব্দুর রহীম কর্তৃক একাদশ শতকের শুরুভাগে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ, শাহ আব্দুল আযীয, শাহ রফীউদ্দীন, শাহ ইসহাক, সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ, ইসমাঈল শহীদ প্রমূখ এ প্রতিষ্ঠানের কৃতীসন্তান ছিলেন।

৮. কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা : ১৭৮১ খ্রষ্টাব্দে মাওঃ মাজদুদ্দীন কর্তৃক কলকাতায় বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংয়ের বাংলো বাড়ীতে এটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯. মাদ্রাসায়ে আওরঙ্গবাদ : হিজরী দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মিয়া সাহেব সাইয়্যিদ নজীর হুসাইন কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। যেখানে ইলমে হাদীসের চর্চা হত।

দারুল উলূম দেওবন্দ ও কতিপয় প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস :

বস্তুতঃ হযরত কাসেম নানুতুবী রহ.-এর মাধ্যমে ১২৮৩ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছু দিনের মাঝেই তা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ হাদীসচর্চার কেন্দ্র হিসাবে সর্বমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এর অল্প কালের মাঝেই প্রতিষ্ঠিত হয় মাজাহিরুল উলূম সাহারণপুর এবং অল্প দিনে সেটিও হাদীসের উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্র রূপে সুখ্যাতি অর্জন করে।

এদুটি প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য-অগণিত ছাত্র ইলমে হাদীস অর্জন করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে; যেখান থেকে ইলমে হাদীসের তা'লীম অবিরত ধারায় চলতে থাকে। এমনকি বহিঃরাষ্ট্র থেকেও বহু ছাত্র অত্র প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে ইলমে হাদীস আহরণের জন্য ছুটে আসে। যেমন : ইরাক, আফগানিস্তান, বুখারা, সমরকন্দ, তুর্কীস্থান, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, ভূটান, কাশ্মীর, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ইউরোপের বহু ছাত্রও অত্র প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে আগমন করে। ইলমে হাদীস অর্জন করে তারা স্বদেশে ফিরে গিয়ে দ্বীনের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানদ্বয় থেকে যত মুহাদ্দিস তৈরি হয়েছে, তাদের পরিসংখ্যান পেশ করা অসম্ভব। তবে ইলমে হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে যাদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি রয়েছে এমন কতিপয়ের নাম আমরা নিম্নে উল্লেখ করলাম ।

১. শায়খুল হিন্দ মাওঃ মাহমুদুল হাসান রহ. মৃঃ ১৩৩৯ হিঃ

তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য রচনাঃ

ক. আল-আবওয়াব ওয়াত তারাজিম।

খ. তাকরীরে তিরমিযী।

গ. আল-আরফুশ শাযী আলা জামে' তিরমিযী ।

২. খলীল আহমদ সাহারনপুরী রহ. মৃঃ ১৩৪৬ হিঃ

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

ক. বযলুল মজহুদ - শরহে আবু দাউদ (পাঁচ খণ্ড)।

খ. তানশীতুল আযান।

৩. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. মৃঃ ১৩৬৯ হিঃ।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

ক. ফাতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম।

খ. ফযলুল বারী ফী শরহে সহীহিল বুখারী।

গ. বুখারী শরীফের উর্দু তরজমা ।

৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. মৃঃ ১৩৫২ হিঃ

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

ক. ফয়যূল বারী 'আলা সহীহিল বুখারী।

খ. আরফুশ শাযী 'আলা জামেয়িত তিরমিযী ।

গ. আনওয়ারুল মাহমুদ (আবু দাউদ শরীফের টিকা)

ঘ. আসারুস সুনান এর টীকা।

ঙ. ইবনে মাজাহ শরীফের টীকা।

চ. মাআরিফে মাদানিয়্যাহ

ছ. তাকরীরে তিরমিযী।

৫. মাওঃ জা'ফর আহমদ উসমানী রহ. মৃঃ১৩৯৪ হিঃ

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

ক. এ'লাউস সুনান (হযরত থানভী রহঃ এর তত্ত্বাবধানে)

খ. ফাতেহুল কালাম।

গ. আল-কওলুল মাতীন।

৬. মাওঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. মৃঃ ১৩২৩ হিঃ

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

ক. কাউকাবুদ দুররী।

খ. আন-নাফহুশ শাযী শরহে তিরমিযী ।

৭. মাওঃ আহমদ রেজা বিজনৌরী রহ. মৃঃ.......হিঃ

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা- আনওয়ারুল বারী শরহে সহীহিল বুখারী ।

৮. মাওঃ মনযুর নূমানী রহ. মৃঃ ....হিঃ

রচনাঃ ক. আলফিয়াতুল হাদীস।

খ. মা'আরিফুল হাদীস।

৯. মাওঃ কাজী যয়নুল আবেদীন সাজ্জাদ মিরাঠী রহ. মৃঃ.......হিঃ

রচনা : ইনতিখাবুস সিহাহ আস-সিত্তাহ

১০. মাওঃ ফখরুদ্দীন আহমদ মুরাদাবাদী রহ. মৃঃ ১৩৯২ হিঃ

রচনা : ক. ইযাহুল বুখারী

খ. আল-কওলুল ফসীহ

১১. মাওঃ মানাযির আহসান গীলানী রহ. মৃঃ ১৩৭৫ হিঃ

রচনা : ক. তাদবীনে হাদীস ।

১২. মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী (রহঃ) মৃঃ ১৩৮৫ হিঃ

রচনা : ক. তরজমানুস সুন্নাহ

১৩. মাওলানা ইদ্রিস কান্দলভী রহ. মৃঃ ১৩৯৪ হিঃ

রচনা : ক. তা'লীকুস সবীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ ।

খ. হুজ্জিয়াতুল হাদীস

গ. তুহফাতুল বারী।

১৪. মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী (রহঃ) মৃঃ ১৩১৫ হিঃ

রচনা : তা'লীকুল মাহমূদ হাশিয়ায়ে আবু দাউদ ।

১৫. মাওঃ আব্দুস সামী দেওবন্দী রহ. মৃঃ-১৩৬৬ হিঃ

রচনা : রওযুর রায়াহীন (বস্তানুল মুহাদ্দেসীনের উর্দূ অনুবাদ)।

১৬. কারী মুহাম্মদ তায়্যিব রহ. মৃঃ ১৯৮৩ ইং
রচনা : হাদীসে রাসূল কা কুরআনী মি'য়ার ।
ইলমে হাদীসের উপর তাঁর প্রায় ত্রিশটি রচনা রয়েছে।

১৭. মাওঃ হাবীবুর রহমান আ'জমী রহ. মৃঃ হিঃ ১৪১২ হিঃ
রচনা : ক. সুনানে সাঈদ ইবনে মনসূর (ত. ক ও তা'লীক)
খ. কিতাবুয যুহদ ওয়ার রিকাক- (তাহকীক ও তা'লীক)
গ. মুসনাদে হুমায়দী (তাহকীক ও তা'লীক)
ঘ. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক (তাহকীক ও তা'লীক)
ঙ. আল-মাতালিবুল আলীয়া (তাহকীক ও তা'লীক)
চ. তারগীব ওয়াত তারহীব ইবনে হজর কৃত (তা'লীক)

১৮. মাওলানা ইবরাহীম বলইয়াভী রহ. মৃঃ ১৩৮৭ হিঃ
রচনা : শরহে তিরমিযী নামে একটি গ্রন্থ।

১৯. মাওলানা : সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দী মৃঃ ১৩৯৫ হিঃ
রচনা : মিশকাতুল আসার ।

২০. হাকীমুল উম্মাহ হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. মৃঃ ১৩৬২ হিঃ তাঁর রচনাবলী রয়েছে শতাধিক। তবে ইলমে হাদীসে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা:
ক. জামেউল আসার
খ. তায়েবুল আসার
গ. হিফজে আরবাঈন

২১. মাও : হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ
রচনা : ক. তাকরীরে বুখারী
খ. তাকরীরে তিরমিযী।

২২. মাওঃ ইউসূফ বিননূরী রহ. মৃঃ ১৩৯৭ হিঃ
রচনা : মা'আরেফুস সুনান (তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

২৩. আবুল হাসান চাটগামী রহ. মৃঃ ১৪০৭ হিঃ
রচনা : তানযীমুল আশতাত শরহে মিশকাত।

২৪. শায়খুল হাদীস যাকারিয়্যাহ কান্দলভী রহ. মৃঃ ১৪০২হিঃ
রচনা : ক. কাওকাবুদ দূররী
খ. লামেউদ দারারী।

২৫. আল্লামা হিফজুর রহমান সিউহারবী রহ. মৃঃ ১৩৮২ হিঃ

২৬. মাওলানা মুশাহেদ আলী সিলেটী রহ. মৃঃ ১৩৯০ হিঃ

২৭. মাওলানা মুফতী শফী রহ. মৃঃ ১৩৯৩ হিঃ

২৮. মুফতী কেফায়েত উল্লাহ মৃঃ ১৩৭২ হিঃ

২৯. মাওলানা তাজুল ইসলাম রহ. ব্রাহ্মনবাড়িয়া মৃঃ ১৯৬৭ ইং

৩০. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী রহ. মৃঃ..........হিঃ

৩১. মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী রহ. মৃঃ..........হিঃ

৩২. মাওলানা সাঈদ স্বন্দিপী রহ. মৃঃ১৩৭৫হিঃ

এছাড়াও মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী, আহমদ হাসান আমরুহী, সানাউল্লাহ আমৃতশ্বরী, রাসূল হাসান খাঁন হাযারভী, মাওলানা আবুল হাসান নদভী, সুলায়মান নদভী, মাওলানা ফযলে রাবী পেশাওয়ারী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ চাটগামী, মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চাটগামী, মাওলানা ওয়াজীহুল্লাহ স্বন্ধিপী, মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব পীরজী, মাওলানা মিয়া হোসাইন মোমেনশাহী, মাওঃ আতহার আলী, মাওঃ মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী, মাওলানা আবুল হাসান যশোরী, মাওলানা সিদ্দিক আহমদ খতীবে আজম,মাওঃ নূরউদ্দীন মোমেনশাহী, মাওঃ মঞ্জুরুল হক নেত্রকোনা, মাওলানা আশরাফ আলী মোমেনশাহী মাওঃ ফয়জুর রহমান মোমেনশাহী প্রমূখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এসময় ভারতবর্ষে বহু হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠে। ভারত, পাকিস্তান, বার্মা ও বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ এমন কোন নগর নেই, যেখানে একটি হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেনি। বরং এসব দেশের গ্রাম-গঞ্জেও বহু বড় বড় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাদীস চর্চাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এ সকল দেশের ইউনিভার্সিটি গুলোর দ্বীনিয়াত ফ্যাকালিটিতেও হাদীসের শিক্ষাদান করা হয়। তাছাড়া ভারত ও বাংলাদেশে সরকারী আলীয়া মাদ্রাসাগুলোতেও হাদীসের জ্ঞান বিতরণ করা হয়ে থাকে। এধরণের সরকারী মাদ্‌রাসার সংখ্যাও অনেক।

ভারতবর্ষের একালের কতিপয় উল্লেখযোগ্য হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্র

১. মাযাহিরুল উলূম, সাহারানপুর, প্রতিষ্ঠা সন : ১৮৮৩ ইং
   প্রতিষ্ঠাতা- আহমদ আলী সাহারনপুরী।
২. নদওয়াতুল উলামা লাক্ষ্ণৌ
৩. মুরাদাবাদ মাদ্রাসা
৪. ফয়যে আম মাদ্রাসা দিল্লী
৫. ডাবেল মাদ্রাসা, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।
৬. দারুল উলূম কলকাতা
৭. মাদ্রাসায়ে ফিরিঙ্গী মহল্লা লাক্ষ্ণৌ

৮. জামিয়া আরাবিয়া ভূপাল।

৯. দারুল হাদীস রহমানিয়া, শায়খ আব্দুর রহমান কর্তৃক-১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত।

১০. দারুল উলূম মিরাঠ

এছাড়াও গুজরাট, হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চলে বহু হাদীস চর্চাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ হাদীস চর্চাকেন্দ্রসমূহ

১. দারুল উলূম করাচী- মুফতী শফী (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

২. জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ নিউটাউন, আল্লামা ইউসূফ বিন্নুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৩. জামেয়া ফারুকিয়া করাচী, মাওঃ সলীমুল্লাহ খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৪. খায়রুল মাদারিস মুলতান, মাওলানা খায়রুদ্দীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৫. জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর-মুফতী মুহাম্মদ হাসান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৬. জামেয়া টেন্ডুলকার-মাওঃ শাব্বীর আহমদ উসমানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৭. রাওয়ালপিণ্ডী মাদ্রাসা, মাওলানা গোলাম উল্লাহ খান কর্তৃক ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত।

এছাড়াও ইসলামাবাদ, পেশাওয়ার, মুলতান, বেলুচিস্থান ও ভাওয়ালপুর, কোয়েটাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে অনেক মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে।

বার্মায় উল্লেখযোগ্য হাদীস চর্চাকেন্দ্র

১. দারুল উলূম আহমদিয়া, বালী বাজার।

২. আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা, মুন্ডু প্রদেশ।

৩. দারুল উলূম মাদ্রাসা, আরাকান ।

৪. জামিয়া ইসলামিয়া, মুন্ডু প্রদেশ।

৫. দারুল উলূম ইসলামিয়া ......

৬. দারুল উলূম টাইসং, চঙ্গ বুহিদ্রাস।

দারুল উলূমের অনুকরণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে হাদীস চর্চাকেন্দ্র

বর্তমানে দারুল উলূম দেওবন্দের অনুকরণে পৃথিবীর অনেক দেশে হাদীস চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভূটানসহ মধ্য এশিয়ার বহু দেশে হাদিস চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু মাত্র ইন্দোনিশিয়া ও মালয়েশিয়াতেই হাদীসের দরসগাহ রয়েছে প্রায় ২৫টি।

মধ্য প্রাচ্যের ওমান, কাতার, দুবাই, ইয়ামানসহ সৌদি আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধারার বহু মাদ্রাসা গড়ে উঠছে। দক্ষিণ আফ্রিকায়ও এধারার বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। জোহান্সবার্গে দুটি বড় বড় হাদীসের দরসগাহ রয়েছে। যেখানে অফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্ররা লেখা-পড়া করতে আসে। বর্তমানে ইউরোপ-আমরিকাতেও এধারার বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেখানেও বহু ছাত্র হাদীসের জ্ঞান আহরণে নিরত রয়েছে।

বাংলাদেশে ইলমে হাদীস

বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন

রাসূল সা.-এর জীবদ্দশায় আরবদেশসমূহে ইসলামের চিরন্তন বাণী ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবয়ে তাবেঈণগণের সক্রিয় প্রচেষ্টা এবং অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার ফলে প্রথম যুগেই ইসলাম পশ্চিমে মরক্কো, স্পেন, পূর্তগাল, পূর্বে সুদূর চীন, পূর্ব-দক্ষিণে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও তথা সমগ্র মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এসময় আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ইসলামের অমিয়বাণী প্রবেশ করে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। সম্ভবত এ সময়ই বাংলাদেশে হাদীসের আলো পৌঁছেছিল।

ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হযরত ওমর রা.-এর শাসনামলে কয়েকজন ধর্মপ্রচারক হযরত মামুন ও হযরত মুহাইমিনের নেতৃত্বে এদেশে আগমন করে ছিলেন। দ্বিতীয় বার হযরত হামেদুদ্দীন, মুর্তাজা, আব্দুল্লাহ ও আবু তালেব রহ. ইসলামের প্রচার অভিযানে এদেশে আগমন করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতব্দীর খলীফার নামাঙ্কিত মোহর পাওয়া যাওয়ায় গবেষকগণ মনে করেন যে, সে সময় হয়ত এদেশে মুসলিম বণিকদের সমাগম হয়েছিল। ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হযরত বাইজিদ বোস্তামী চট্টগ্রামে, ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মাহীসাওয়ার বগুরার মহাস্থানগড়ে, ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা এলাকায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনের শাসনামলে বাবা আদম শহীদ রহ. এদেশে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। এ শতাব্দীতে ফরীদ উদ্দিন গাঞ্জে-শকর (১১৭৭-১২৬৯ইং) চট্টগ্রামে, হযরত শাহমখদুম রূপোস (১১৮৪ ইং) রাজশাহীতে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন।

ত্রয়োশত শতাব্দী

এসময় হযরত মাখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী তাঁর ১৭ জন সহচরসহ পশ্চিমবাঙ্গের মোঙ্গলকোটে, শাহ তুরকান শহীদ বগুড়ায়, শাহ তাকীউদ্দীন

আরাবী রাজশাহী জেলার মহীসন্তষ এলাকায় সর্বপ্রথম মাদ্রাসা স্থাপন করে ছিলেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়। আর সে সময় যেহেতু কোন বিশেষ ধরণের শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল না, বরং ধর্মভিত্তিক শিক্ষাই প্রচলিত ছিল, সুতরাং একথা বলা অসঙ্গত নয় যে, সে সব মাদ্রাসা সমূহে কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক শিক্ষাই চালু ছিল। অতঃপর ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর এদেশে বহু মসজিদ-মদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং কুরআন ও হদীসের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়।

১২৭০ খৃষ্টাব্দে তুঘলকীয় শাসনামলে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা তৎকালীন বাংলায় রাজধানী সোনারগায়ে আগমন করেন এবং উচ্চমানের একটি মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

চতুর্দশ শতাব্দী

১৩০৩ খৃষ্টাব্দের এদিকে হযরত শাহজালাল তাঁর ৩৬০ জন সহচরসহ পূর্ববঙ্গে ইসলাম ও ইলমে দ্বীনের প্রচারে আগমন করেন। এ শতাব্দীর অন্যান্য ধর্মপ্রচারকগণ হলেন, সাইয়্যিদ আহমদ কল্লাহ শহীদ কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে, প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আতা দিনাজপুরে, শেখ আখি সিরাজুদ্দীন তৎকালীন বাংলার কেন্দ্রস্থল গৌড় ও পান্ডুয়ায়, শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা চট্টগ্রামে, সাঈদ রিজা য়ামানী উত্তরবঙ্গে, হযরত রাসতি শাহ কুমিল্লায়; এছাড়াও আরো বহু উলামায়ে কেরাম এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের কাজ করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দী

এ শতাব্দীতে খানজাহান আলী ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যগণ যশোর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন। এতদ্ব্যতীত শেখ জনুরুদ্দীন বাগদাদী, চিচিল শাহ গাজী, শেখ হুসামুদ্দীন মানিকপুরী ও বদরে আলম শাহিদী এ শতাব্দীর খ্যতিমান ধর্ম-প্রচারক।

ষষ্ঠদশ-উনবিংশ শতাব্দী

এ সময় শাহ মোয়াজ্জম দানেশমান্দ রাজশাহী এলাকায়, শাহ জামালুদ্দীন জামালপুরে, খাজা শরফুদ্দীন ওরফে খাজা চিশতী বেহেশতী ঢাকায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এসময় সম্রাট শেরশাহ এদেশে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করেন। পরবর্তীতে হাজী মুহসিন উদ্দীন, সাইয়্যিদ নিসার আলী তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, পীর দুদু মিয়া, কেরামত আলী জৌনপুরী প্রমুখ উলামায়ে কেরাম বিদআত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে এদেশে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে বিপুল অবদান রাখেন।

যুগে যুগে উলামায়ে কেরামের অব্যাহত প্রচেষ্টায় ইসলামের শাশ্বতবাণী এদেশে প্রবেশ করে ও তৎসঙ্গে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার প্রসার হয়। ফলে বর্তমানে প্রায় সহস্রাধিক মাদ্রাসায় হাদীসের চর্চা ও গবেষণার কাজ চলছে।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইলমে হাদীসের চর্চা

প্রাচীনকালের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শিক্ষাবিদরা যেখানে আগমন করতেন সেখানেই গড়ে উঠত সুবিশাল শিক্ষাগার। তাই হযরত ওমর রা. এর যুগ থেকে শুরু করে যে সকল মহামনীষীগণ এদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করেন, তারা এদেশে হাদীসের চর্চা করেনি একথা বলা তাদের প্রতি অবিচারেরই নামান্তর। কেননা তারা ছিলেন তৎকালীন হাদীসচর্চার প্রাণকেন্দ্র আরব, ইরাক, ইরান ও খোরাসান থেকে আগত পীর-আওলিয়া। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারই ছিল তাদের মূল মিশন।

বর্তমানে রংপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় হিজরী তৃতীয় শতকের শেষের দিকে নির্মিত একটি বিরাট মসজিদ ও তৎসংলগ্ন ইমারাতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। গবেষকগণ অনুমান করেছন যে, সম্ভবত এখানে বিরাট আকারের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল, যাতে বহু ছাত্র লেখাপড়া করত। তাছাড়া উপকূলীয় অঞ্চল সমূহে আরব বণিকগণ নিজেদের বসতি গড়ে তুলে ছিলেন; সে বসতিসমূহে তারা নিজেদের প্রয়োজনে মসজিদ গড়ে তুলে ছিলেন। সে সব মসজিদগুলোতে ব্যাপক হারে ধর্মীয় শিক্ষার চর্চা হত। চারশত হিজরীর এদিকে আগত পর্যটক ইবনে হাওকাল মসজিদ ভিত্তিক এই শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপকতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন-'যে কোন মসজিদে গেলেই ছাত্রদের শোরগোল শোনা যেত এবং দলে দলে ছাত্রদের আনাগোনা পরিলক্ষিত হত'। বলা যায় যে, তখন থেকেই স্বল্প পরিসরে হলেও এদেশে হাদীস চর্চা শুরু হয়। তবে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তুঘলকীয় শাসনামলে বিশিষ্ট হাদীসবেত্তা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা দিল্লী থেকে ঢাকার সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। তাকে কেন্দ্র করেই সেখানে জ্ঞান-পিপাসু বহু শিক্ষার্থীর সমাগম শুরু হয়। ফলে সোনারগাঁও ইসলামী শিক্ষা ও হাদীসচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা জীবনের শেষাবধি সেখানে হাদীস, তাফসীর ইত্যাকার ইলম ও মা'রিফাতের আলো বিতরণে নিরত ছিলেন।

সোনারগাঁয়ের এই হাদীস চার্চা কেন্দ্র বহু কৃতীমান বিদগ্ধ হাদীস বিশারদের জন্ম দিয়েছে। তন্মধ্যে শায়খ ইয়াহইয়া মুনায়রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি এখানে বসে বুখারী, মুসলিম, জামেউস্-সগীর, মুসনাদে আবু ইয়ালা, মাশারিকুল আনওয়ার সহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ছিলেন।

দেওবন্দের অনুকরণে বাংলাদেশে প্রথম হাদীস চর্চাকেন্দ্র

দারুল উলূমে দেওবন্দের অনুকরণে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সিলেটের ঝিংগাবাড়ীতে হাদীসচর্চার একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তবে পরবর্তীতে হাদীসচর্চার এ কেন্দ্রটি টিকে থাকেনি বলে সেটি ততটা প্রসিদ্ধ লাভ করতে পারেনি। তবে অদ্যাবধি উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সুরমা নদীর পারে স্বীয় অস্তিত্বের স্বাক্ষর হয়ে টিকে আছে। পরবর্তীতে ১৯০১ ইং দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাত হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সেখানে ব্যাপকভাবে হাদীসচর্চা শুরু হয়। ফলে তা বাংলাদেশে দেওবন্দের অনুকরণে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হাদীস চর্চাগার কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আজও সেখানে হাদীসের খিদমত অব্যাহতভাবে চলছে।

বাংলাদেশের কতিপয় হাদীসচর্চা কেন্দ্র :

ইংরেজ শাসনামল থেকেই এদেশের ধর্মীয় শিক্ষা দুটি ধারায় চলে আসছে। এক. আলিয়া অর্থাৎ সরকারী মাদ্রাসার মাধ্যমে। দুই. কওমী মাদ্রাসার মাধ্যমে। আর এ উভয় ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে হাদীসের চর্চা হয়ে থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইলমে হাদীসের খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে তার সংখ্যা সহস্রাধিক। সে সকল প্রতিষ্ঠানের মাঝে উল্লেখযোগ্যগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো

<u>ঢাকা জেলা</u>

১. জামিয়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম কওমী মাদরাসা; বড় কাটারা। প্রতিষ্ঠা লাভ ও হাদীসের দরস শুরু ১৯৩৬ ইং ।

২. জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া-লালবাগ-১৯৫০ ইংতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এবৎসরই হাদীসের দরস চালু হয়।

৩. ঢাকা-আলিয়া মাদরাসা-বকশী বাজার।

৪. জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া তাতীবাজার ।

৫. জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম-ফরিদাবাদ।

৬. জামিয়া মাদানিয়া আরাবিয়া-যাত্রাবাড়ী।

৭. জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া, কামরাঙ্গীর চর।

৮. জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ-১৯৭৭ ইং সালে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং ১৯৮২ সালে হাদীসের দরস চালু হয়।

৯. শেখ জনুরুদ্দীন রহঃ দারুল কুরআন - চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা।

১০. জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা।

১১. জামিয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ-মিরপুর।

১২. জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া. সাত মসজিদ রোড।
১৩. জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া
১৪. জামিয়া ইসলামিয়া, তেজগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশান ।
১৫. জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, তেজগাঁও।
১৬. জামিয়া (রাহমানিয়া) আলী নূর এন্ড রিয়েল ষ্টেট, মুহাম্মদপুর।
১৭. ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা।
১৮. মাখযানুল উলূম মাদরাসা, খিলগাওঁ।
১৯. জামিউল উলূম মাদরাসা, মিরপুর।
২০. জামিয়া কারিমিয়া আরাবিয়া, রামপুরা।
২১. মাদরাসা বাইতুল উলূম, ঢালকানগর ।
২২. জামিয়া ইসলামিয়া মিফতাহুল উলূম, মধ্যবাড্ডা।
২৩. জামিয়া দ্বীনিয়া শামসুল উলূম-পীরজঙ্গী, মতিঝিল।
২৪. আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম, মাদানী নগর ।
২৫. মাদরাসা জামালুল কুরআন-সুত্রাপুর ।
২৬. আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আল-আহলিয়া দারুল উলূম-বনশ্রী।
২৭. মাদরাসা বাবুস সালাম ।
২৮. মাদরাসা বাইতুস সালাম ।
২৯. জামিয়া আশরাফিয়া মাদরাসা, শ্যামপুর।
৩০. মাদরাসা দারুর রাশাদ-মিরপুর।
৩১. মাদরাসা দারুল উলূম -মিরপুর।
৩২. দারুল উলূম ওয়াপদা, মতিঝিল।
৩৩. মাদরাসা ইমদাদিয়া দারুল উলূম-মুসলিম বাজার
৩৩. জামিয়া সুবহানিয়া মাহমুদ নগর (তুরাগ)
৩৪. জামিয়া আরাবিয়া খাদেমুল ইসলাম মাদরাসা-মিরপুর ।
৩৫. ইদারাতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া-রূপালী হাউজিং মিরপুর।
৩৬. জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম (আকবর কমপ্লেক্স) মিরপুর।
৩৭. আল-জামিআতুল ইসলামিয়া , গাওয়াইর, দক্ষিণ খান।
৩৮. জামিয়াতু ইব্রারীম (আঃ) মাহমুদ নগর, ডেমরা।
৩৯. জামিয়া মাদানিয়া রাজফুল বাড়িয়া-সাভার
৪০. জামিয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম, সাভার
৪১. জামিয়াতুস সাহাবা-উত্তরা-সেক্টর-৯।
৪২. জামিয়া ইসলামিয়া-ইসলামবাগ-পোস্তা
৪৩. মহাখালী টি এন্ড টি কলোনী মাদরাসা

৪৪. ফয়জুল উলূম মাদরাসা- আজিমপুর।
৪৫. জামিয়া রশিদিয়া এনায়েতুল উলূম, দক্ষিণ খান।
৪৬. জামিয়া রহমানিয়া- মাদারটেক, নন্দীপাড়া।

গাজীপুর

১. জামিয়া আনওয়ারিয়া-বরমী
২. জামিয়া ইসলামিয়া নূরিয়া-টংগী
৩. দারুল উলূম মাদরাসা -টংগী
৪. জামিয়া রশিদিয়া আশরাফিয়া মাদরাসা-কাপাসিয়া
৫. জামিয়া উলূমে শারইয়্যাহ-শ্রীপুর।

নরসিংদী

১. আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া-শিবপুর
২. দারুল উলূম মাদরাসা-দত্তপাড়া।
৩. মেরাজুল উলূম মাদরাসা-সদর ।

নারায়নগঞ্জ

১. জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম- দেওভোগ।
২. জামিয়া হোসাইনিয়া আরাবিয়া-ফতুল্লা।
৩. জামিয়া আরাবিয়া মারকাযুল উলূম - কাঁচপুর ।
৪. মারকাযুল উলূম আল-ইসলামিয়া ।

মুন্সিগঞ্জ

১. সৈয়দপুর জামিয়া ইমদাদিয়া-সিরাজদিখান।
২. জামিয়া ইসলামিয়া হালিমিয়া-মধুপুর।
৩. দারুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসা-রিকাবী বাজার
৪. উত্তর কোলাপাড়া আশরাফুল মাদারিস- শ্রীনগর।

ফরিদপুর জেলা

১. জামিয়া আরাবিয়া শামসুল উলূম, খাবাসপুর, সদর ।
২. শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসা।

মাদারীপুর

১. জামিয়াতুস সুন্নাহ-শিবচর ।
২. আল-জামিয়া ইসলামিয়া কওমী মাদরাসা-রাজার চর।
৩. মোহাম্মদীয়া শামসুল উলূম কওমী মাদরাসা-গুয়াতলা।

গোপালগঞ্জ

১. জামিয়া মুহাম্মদিয়া, কোর্ট মসজিদ।
২. গওহর ডাঙ্গা মাদ্রাসা।

মোমেনশাহী জেলা

১. জামিয়া ইসলামিয়া -সেহড়া
২. জামিয়া আশরাফিয়া-খাকডহর ।
৩. মাখযানূল উলূম মাদ্রাসা তালতলা।
৪. জামিয়া আরাবিয়া আহাদিয়া -বারুইগ্রাম ।
৫. জামিয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলূম-বালিয়া
৬. কাতলাসেন আলিয়া মাদরাসা।
৭. জামিয়া আরাবিয়া মাখযানুল উলূম, তালতলা
৮. জামিয়া গাফুরিয়া দারুস সুন্নাহ, ঈশ্বরগঞ্জ।
৯. জামিয়া হুসাইনিয়া দারুল উলূম-মাঝিয়াইল- হালুয়াঘাট।
১০. জামিয়া ফয়জুর রহমান (রহঃ) বড় মসজিদ, সদর।
১১. জামিয়া আরাবিয়া মিফতাহুল উলূম-মাসকান্দা ।
১২. জামিয়াতুল সুন্নাহ মুযাহিরুল উলূম, দিঘার কান্দা ।
১৩. মাদরাসা সাওতুল হেরা, মাইজবাড়ী ।
১৪. দারুস সালাম সোহাগী মাদরাসা ।

নেত্রকোণা

১. জামিয়া মিফতাহুল উলূম, বারহাট্টা রোড।
২. জামিয়া শাহীদিয়া ইমদাদিয়া- ঝাঞ্চাইল
৩. জামিয়া ইসলামিয়া জারিয়া-পূর্বধলা।
৪. জামিয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া-মালনি সদর।

কিশোরগঞ্জ

১. জামিয়া ইমদাদিয়া-সদর ।
২. জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম-ভৈরব।
৩. আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া নুরুল উলূম কুলিয়ার চর।
৪. জামিয়া ইসলামিয়া মাযাহিরুল উলূম-বাজিতপুর।
৫. জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম - কুলিয়ার চর।

শেরপুর

১. জামিয়া সিদ্দিকিয়া-তেরা বাজার
২. ঝিনাইগতি মদীনাতুল উলুম কওমী মাদরাসা

জামালপুর

১. জামিয়া হোসাইনিয়া আরাবিয়া মেলান্দহ
২. জামিউল উলূম হক্কানিয়া মাদরাসা-গোড়ারকান্দা
৩. আল-জামিয়াতুল হাবিবিয়া কওমী মাদরাসা ।

টাঙ্গাইল

১. ধুলেরচর মাদ্রাসা।
২. জামিয়া নেজামিয়া ইসলামাবাদ-বানুরগাছী।
৩. জামিয়া নেজামিয়া সিদ্দিকীয়া বরুরিয়া
৪. জামিয়া ইসলামিয়া দারুস সুন্নাহ-গোরস্থান ।

সিলেট জেলা

১. দরগাহ মাদরাসা, সিলেট সদর।
২. দারুল উলূম কানাইঘাট মাদ্রাসা।
৩. জামিয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া গওহরপুর ।
৪. আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর মাদ্রাসা।
৫. মাদরাসা মাদীনাতুল উলূম দারুস সালাম খাসদবীর ।
৬. জামিয়া ইসলামিয়া রাজাগঞ্জ।
৭. জামিয়া ইসলামিয়া মাদানীয়া- কাজির বাজার ।
৮. জামিয়া ইসলামিয়া নূরিয়া- ভার্থখোলা
৯. জামিয়া মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া বিশ্বনাথ।
১০. জামিয়া ইসলামিয়া দারুস সুন্নাহ-জকিগঞ্জ ।
১১. জামিয়া ইসলামিয়া ফয়জে আম-মুন্সিবাজার ।
১২. জামিয়া আরাবিয়া হোসাইনিয়া মাদরাসা-রানাপিং।
১৩. জামিয়া হোসাইনিয়া আরাবিয়া হাফিযিয়া মাদরাসা- সদর।
১৪. দারুল উলূম হোসাইনিয়া ঢাকা দক্ষিণ।
১৫. হযরত শাহ সুলতান (রহঃ) মাদরাসা। -বালাগঞ্জ।
১৬. জামিয়া আহলিয়া সুরাইঘাট।
১৭. মাদরাসা-ই আলিয়া -সিলেট।

সুনামগঞ্জ

১. কতিয়া মাদ্রাসা, সৈয়দপুর মাদ্রাসা।
২. জামিয়া ইসলামিয়া দারুল হাদীস, হাসনাবাদ।
৩. দরগাহপুর মাদ্রাসা।
৪. জামিয়া মাদানিয়া।

মৌলভী বাজার

১. দারুল উলূম টাইটেল মাদরাসা-শাহ মোস্তফা রোড।
২. জামিয়া লুৎফিয়া আনোয়ারুল উলূম - শ্রীমঙ্গল ।
৩. মাদরাসা হেমায়েতুল ইসলাম -রাজ নগর ।
৪. জামিয়া দ্বীনিয়া ইসলামবাগ-সদর।

৫. জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম বড় লেখা
৬. জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা কুলাউড়া।
৭. জামিয়া ইসলামিয়া রায়পুর।

হবিগঞ্জ

১. শামসুল উলূম কওমিয়া আলিয়া মাদরাসা চুনারুঘাট
২. জামিয়া ইসলামিয়া দারুল কুরআন বানিয়া চং
৩. হাশিমিয়া ইবতিদাইয়্যাহ মাদরাসা - চাঁন্দপুর।
৪. জামিয়া ইসলামিয়া উম্মেদ নগর ।

কুমিল্লা জেলা

১. জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলূম-লাকসাম রোড।
২. জামিয়া ইসলামিয়া মুজাফফারুল উলূম মুরাদনগর।
৩. আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম-বরুড়া।
৪. জামিয়া ইসলামিয়া দারুল - উলূম দাউদ-কান্দি।
৫. রামপুর ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম মাদরাসা-দেবিদ্বার।

বি-বাড়ীয়া

১. জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া-কান্দিপাড়া।
২. জামিয়া ছানিয়া ইউনুসিয়া-কসবা
৩. জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলুম-ভাদুঘর।
৪. জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম -সরাইল।
৫. জামিয়া দারুল আরকাম আল-ইসলামিয়া-পশ্চিম মেড্ডা ।

চাঁদপুর

১. কাসেমুল উলুম মাদরাসা - জাফরাবাদ।
২. জামিয়া ইসলামিয়া ইবরাহিমিয়া- উজানী ।
৩. জামিয়া আহমদিয়া মাদরাসা-কচুয়া ।
৪. জামিয়া আরাবিয়া শামসুল উলূম-মহামায়া।

নোয়াখালী জেলা

১. আল-আমীন মাদ্রাসা।
২. সোনাপুর ইসলামিয়া আলীয়া।
৩. আল্-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আমানতপুর।
৪. আল্-জামিয়াতুল আরাবিয়্যাহ আনওয়ারুল উলূম।

লক্ষীপুর

১. মাদরাসা ইশায়াতুল উলূম-রায়পুর ।
২. মাদরাসায়ে আশরাফুল মাদারেস সদর

ফেনী

১. উলামা বাজার মাদ্রাসা।
২. জামিয়া ইসলামিয়া ফেনী সদর ।
৩. শর্সাদি মাদ্রাসা।
৪. ফেনী আলীয়া মাদ্রাসা।

চট্টগ্রাম জেলা

১. আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম-হাটহাজারী ।
২. কাসেমুল উলূম পটিয়া মাদরাসা।
৩. জিরী মাদ্রাসা।
৪. নানুপুর মাদ্রাসা ।
৫. জামিয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া, চাঁদগাঁও।
৬. জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া, লালখান বাজার মাদ্রাসা ।
৮. মোজাহেরুল উলূম মাদ্রাসা নাজিরহাট।
৯. চারিয়া কাসেমুল উলূম মাদ্রাসা।

বরিশাল জেলা

১. জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া সদর ।
২. জামিয়া আরাবিয়া মুঈনুদ্দীন-বাজার রোড।

পাবনা জেলা

১. জামিয়া আশরাফিয়া -সদর ।
২. জামিয়াতু কুরআনিল কারীম- পাকশী।

সিরাজগঞ্জ

১. আহমদজান জামিয়া আশরাফুল মাদারেস-মাসুমপুর ।
২. বেতুয়া মাদরাসা ।
৩. খুকনী মাদ্রাসা।

রাজশাহী জেলা

১. জামিয়া ইসলামিয়া শাহ মাখদুম-দরগাপাড়া- বোয়ালিয়া
২. জামিয়া রহমানিয়া মাদরাসা ।

নওগাঁ

১. জামিয়া মাহমুদিয়া রওজাতুস সুন্নাহ-শান্তাহার ।

বগুড়া জেলা

১. জামিল মাদ্রাসা ।
২. মুফতী ইব্রাহীম সাহেবের মাদ্রাসা।

খুলনা জেলা

১. জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম- সদর ।
২. জাকারিয়া দারুল উলূম মাদরাসা- সেনহাটি।
৩. আল-জামিয়াতুল আরাবিয়াহ শামসুল উলূম, সাজিয়ারা।
৪. জামিয়া রশিদিয়া ।
৫. জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া মদীনাতুল রায়ের মহল।
৬. জামিয়া আরাবিয়া শামসুল উলূম দারুল মুকাররম - খালিশপুর।

বাগের হাট

১. সিদ্দিকিয়া জামিয়া আরাবিয়া-সরুই

সাতক্ষীরা

১. বংশীপুর শাহী মসজিদ আশরাফিয়া মাদরাসা-শ্যামনগর ।

যশোর জেলা

১. জামিয়া ই'যাযিয়া দারুল উলূম রেলষ্টেশন
২. জামিয়া আরাবিয়া মুহিউল ইসলাম, নওয়াপাড়া
৩. জামিয়া ইসলামিয়া দড়াটানা।
৪. জামিয়া ইমদাদিয়া মাদানী নগর-মনিরামপুর ।
৫. জামিয়া ইসলামিয়া মাদীনাতুল উলূম-মাছনা ।

নড়াইল

১. আন-নুর কমপ্লেক্স-মাদ্রাসা ও এতিমাখানা - লক্ষিপাশা

রংপুর জেলা

১. জুম্মাপাড়া মাদ্রাসা-সদর।
২. ধনতলা মাদ্রাসা।

সৈয়দপুর

১. জামিয়া আরাবিয়্যাহ সৈয়দপুর ।

কুষ্টিয়া জেলা

১. ইদ্রিস আলী বিশ্বাস ইসলামিয়া মাদ্রাসা- আল্লাহর দরগা ।

এছাড়াও বাংলাদেশে সরকারী, বেসরকারী কওমী মাদ্রাসা অনেক রয়েছে। যেখানে হাদীসের দরস দান করা হয়।

বাংলাদেশের মুহাদ্দেসীন বা হাদীস বিশারদগণ

প্রথম যুগ

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ভারত বিজয় থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

১. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজদান বখশ রহ. মৃঃ......... হিঃ
তিনি ঢাকা জেলার ঘোড়াশালে ইলমে হাদীসের খেদমত করেন।
২. শায়খ কালীম রহ.,সিলেট মৃঃ......... হিঃ
৩. শায়খ মাওঃ ইদ্রিস রহ. সিলেট মৃঃ......... হিঃ
৪. মাওঃ হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরিদপুরী রহ. মৃঃ ১৮৪০ ইং
৫. মাওঃ আবুল হাসান রহ. মৃঃ ১৮৬৫ ইং
৬. মাওঃ হাবীবুল্লাহ রহ. সিলেট মৃঃ ১২৭৯ হিঃ
৭. মাওঃ আব্দুল ওয়াহেদ রহ. চাটগামী মৃঃ ১৩২৮ হিঃ

দ্বিতীয় যুগ

১৯০৮ ইং সালে হাট হাজারী মাদরাসায় হাদীসের দরস আরম্ভ হওয়ার পর। এ যুগের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণ হলেন :

১. হযরত মাওঃ আব্দুল্লাহ রায়পুরী রহ. মৃঃ ১৯১৩ ইং
২. হযরত মাওঃ ওয়াজীহুল্লাহ স্বন্দীপী রহ. মৃঃ ১৯২০ ইং
৩. হযরত মাওঃ আব্দুল হামীদ রহ. মৃঃ ১৯২০ ইং
৪. হযরত মাওঃ আব্দুর রহমান রহ. মৃঃ ১৯৩০ ইং
৫. হযরত মাওঃ আহমদ আলী দূর্গাপুরী রহ. মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ
৬. হযরত মাওঃ জমীরুদ্দীন রহ. মৃঃ ১৩৫৯ হিঃ
৭. হযরত মাওঃ মুহাম্মদ তাহের রহ. সিলেট মৃঃ ১৩৫৯ হিঃ
৮. হযরত মাওঃ হাবীবুল্লাহ রহ. মৃঃ ১৩৬১ হিঃ
৯. হযরত মাওঃ সাঈদ আহমদ স্বন্দীপী রহ. মৃঃ ১৩৭৫ হিঃ
শায়খুল হাদীস-হাটহাজারী মাদ্রাসা ।
১০. হযরত মাওঃ মুফতী আযীযুল হক রহ.. মৃঃ ১৩৮০ হিঃ
তিনি পটিয়া ও বগুড়া জামিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।
১১. হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান রহ. মৃঃ ১৯৬৪ ইং
১২. ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম রহ. মৃঃ ১৩৮৭ হিঃ
তিনি ৪২ বৎসর কাল বি.বাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়ার শায়খুল হাদীস ও অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৩. হযরত মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. মৃঃ ১৩৮৮ হিঃ
তিনি লালবাগ, ফরিদাবাদ, গওহর ডাঙ্গা প্রভৃতি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও শায়খুল হাদীস ছিলেন।

১৪. মুফতী আযম হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ রহঃ। মৃঃ১৩৯৬ হিঃ।
তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৫. আল্লামা হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ.। মৃঃ ১৩৯৬ হিঃ
তিনি জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ও মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৬. হযরত মাওলানা দীন মুহাম্মদ রহ. মৃঃ ১৯৮৮ ইং
তিনি লালবাগের শায়খুল হাদীস ছিলেন।

১৭. হযরত মাওলানা ইয়াকুব রহ. মৃঃ.........হিঃ
তিনি লালবাগ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

১৮. মুফতী মাওলানা সৈয়দ আমীমূল ইহসান মুজাদ্দিদী রহ. মৃঃ ১৩৯৪হিঃ
তিনি ঢাকা-আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৯. খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ রহ. মৃঃ ১৪০৭ হিঃ
তিনি যমিরিয়া কাসিমুল উলূম পটিয়ার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

২০. শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়াত হুসাইন রহ. মৃঃ ১৯২১ ইং
তিনি কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস পরে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের হাদীসের প্রফেসার ছিলেন।

২১. মাওলানা আহমদ হুসাইন চৌধুরী রহ. মৃঃ.........হিঃ
তিনি সিলেটের আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস ছিলেন।

২২. মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল্লাহ রহ. মৃঃ ১৯৫১ ইং
তিনি ইসলামিয়া মাদ্রাসা নোয়াখালীর মুহাদ্দিস ছিলেন।

২৩. মুফতী মাওলানা নূরুল হক রহ.। মৃঃ ১৯৮৭ ইং
তিনি জিরী মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন।

২৪. মাওলানা মুশাহিদ আলী রহ. মৃঃ ১৩৯০হিঃ
তিনি সিলেট কানাইঘাট মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন।

২৫. হযরত মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী রহ. মৃঃ ১৪০৭ হিঃ
তিনি লালবাগ ও বড় কাটারার মুহাদ্দিস ও নুরিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

২৬. হযরত মাওলানা আবুল হাসান রহ. মৃঃ ১৪১২ হিঃ
তানজীমুল আশতাতের লেখক।

২৭. হযরত মাওলানা আবুল হাসান যশোরী রহ. মৃঃ ১৯৯৩ ইং

২৮. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন সিলেটি রহ. মৃঃ........হিঃ

২৯. হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী রহ. মৃঃ........হিঃ

৩০. হযরত মাওলানা নুরুদ্দীন রহ. মোমেনশাহী মৃঃ ১৯৬৮ ইং
তিনি জামিয়া ইসলামিয়া সেহাড়ার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৩১. হযরত মাওলানা মিয়া হুসাইন মোমেনশাহী মৃঃ ১৯৮৮ ইং
জামিয়া ইসলামিয়া সেহাড়া ও যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার মুহাদ্দিস।

৩২. হযরত মাওলানা আঃ ওয়াদুদ স্বন্দীপী মৃঃ.........হিঃ
তিনি জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়্যার শায়খুল হাদীস।

৩৩. হযরত মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম রহ. মৃঃ ১৪০১ হিঃ
তিনি হাটহাজারীর শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৩৪. হযরত মাওলানা নিয়াজ মাখদূম খাত্তানী রহ. মৃঃ ১৯৮৬ ইং
তিনি শর্ষিনা আলীয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৩৫. হযরত মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন রহ. মৃঃ ১৯৭৭ ইং
তিনি ফেনী আলীয়ার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৩৬.হযরত মাওলানা আঃ ওয়াহিদ রহ. মৃঃ.........হিঃ
তিনি ফেনী আলীয়ার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৩৭. হযরত মাওলানা আমীর হোসেন রহ. মৃঃ.........হিঃ
তিনি পটিয়ার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৩৮. হযরত মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ কাসেমী রহ. মৃঃ.........হিঃ
তিনি ঢাকা আলীয়ার মুহাদ্দিস ছিলেন।

৩৯. হযরত মাওলানা আঃ রহীম রহ. মৃঃ.........হিঃ

৪০. হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান রহ. মৃঃ ১৯৬৪ ইং
তিনি চট্টগ্রাম আলীয়ার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৪১. হযরত মাওলানা কুরবান আলী সাহেব রহ. মৃঃ ১৩৭৪ বাং
বরুরা মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৪২. হযরত মাওলানা আঃ খালেক রহ. মৃঃ.........হিঃ
তিনি বড় কাটারার মুহাদ্দিস ছিলেন।

৪৩. হযরত মাওলানা মুফতী ইউসূফ রহ. মৃঃ ১৪১৮ হিঃ
তিনি বৈয়াগ্রাম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৪৪. হযরত মাওলানা হেফাজউদ্দীন রহ. মৃঃ ১৯৮৭ ইং
উজানী মাদ্রাসা ও বরুড়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস।

৪৫. হযরত মাওলানা আব্দুল হাফীয রহ. মৃঃ ২০০০ ইং
তিনি ফরিদাবাদ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৪৬. হযরত মাওলানা আমীনূল হক রাহ. মৃঃ ১৯৮৭ ইং
তিনি বারুইগ্রাম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৪৭. হযরত মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ মৃঃ ১৯৯৬ ইং
লালবাগ মাদ্‌রাসা মুহাদ্দিস

বিগত একযুগ যাবত যারা এদেশে হাদীস শিক্ষাদানে নিরত ছিলেন

১. আল্লামা সিরাজুল ইসলাম রহ. মৃঃ.........হিঃ
তিনি জামিয়া ইউনুসিয়া বি.বাড়ীয়া শায়খুল হাদীস ছিলেন।

২. আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. মৃঃ.........হিঃ
তিনি পটিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৩. আল্লামা আতাউর রহমান খান রহ. মৃঃ ২০০৮ইং
তিনি জামিয়া এমদাদিয়ার মুহাদ্দিস ছিলেন।

৪. মাওলানা আমীরুদ্দীন রহ. মৃঃ.........হিঃ
শায়খুল হাদীস কুমিল্লা কাসিমুল উলূম।

৫. আল্লামা ইসহাক ফরীদী রহ. মৃঃ ২০০৫ ইং
তিনি চৌধুরী পাড়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৬. হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব রহ. মৃঃ ২০০৭ ইং
তিনি ঢাকা আলীয়ার হেড মুহাদ্দিস ছিলেন।

৭. হযরত মাওলানা ইসহাক গাজী রহ. মৃঃ.........হিঃ
তিনি পটিয়ার শায়খুর্ল হাদীস ছিলেন।

৮. হযরত মাওলানা নুরুদ্দীঁন গওহারপুরী রহ. মৃঃ ২০০৫ ইং
তিনি গওহারপুর মাদ্রসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

৯. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী বিশ্বনাথী রহ. মৃঃ ২০০৫ ইং
তিনি বিশ্বনাথ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম ছিলেন।

১০. হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. মৃঃ ২০০৮ ইং
বরুড়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

১১. হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল ওযাহেদ রাহ. মৃঃ ১৯৯৪ ইং
তিনি বালিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন।

১২. হযরত মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ রহ. মৃঃ ১৯৯৬ ইং
তিনি লালবাগ মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৩. হযরত মাওলানা আঃ মজীদ ঢাকুবী রহ. মৃঃ ১৯৯৭ ইং
তিনি লালবাগ মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৪. হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান রহ. মৃঃ ১৯৯১ ইং
শায়খুল হাদীস জামিয়া ইসলামিয়া, ময়মনসিংহ।

১৫. হযরত মাওলানা ফয়জুদ্দীন রহ. মৃঃ ২০০১ ইং
তিনি মালিবাগ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম ছিলেন।

১৬. হযরত মাওলানা আব্দুল লতীফ রহ. মৃঃ ২০০৮ ইং
শায়খুল হাদীস, জাফরাবাদ মাদ্রাসা।

১৭. হযরত মাওলানা মুজিবুর রহমান রহ. মৃঃ ২০০৯ইং
তিনি মিরপুর দারুল উলূম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।
১৮. হযরত মাওলানা আহমাদুল হক রহ. মৃঃ ২০০৯ ইং
তিনি হাটাজারী মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন।
১৯. হযরত মাওলানা শেখ আহমদ রহ. মৃঃ.........হিঃ
তিনি পটিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।
২০. হযরত মাওলানা শফীকুল হক আকুনী রহ. মৃঃ ২০০৪ইং
তিনি আকুনী মাজাহিরুল উলূম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন
২১. হযরত মাওলানা ইউসুফ নেযামী রহ. মৃঃ ২০০৯ ইং
জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া।
২২. হযরত মাওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী রহ. মৃঃ ২০০৭ ইং
তিনি মালিবাগ মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।
২৩. হযরত মাওলানা তাজাম্মুল আলী রহ. মৃঃ ২০০৬ ইং
তিনি লাউড়ী মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

বর্তমানে হাদীসের খিদমতে নিরতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন :

১. হযরত মাওলানা আযীযুল হক (দামাত বারাকাতুহুম)
শায়খুল হাদীস রহমানিয়া মাদ্রাসা, মুহাম্মপুর।
২. হযরত মাওলানা আহমাদ শফী (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, হাট হাজারী মাদ্রাস।
৩. হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, মালিবাগ মাদ্রাসা।
৪. হযরত মাওলানা মুফতী নুরুল্লাহ (দাঃ বাঃ)
জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসা।
৫. হযরত মাওলানা কুতুবুদ্দীন (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, ঢালকা নগর মাদ্রাসা
৬. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, কাসেমুল উলূম কুমিল্লা।
৭. হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান (দাঃ বাঃ)
ইসলামি রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা।
৮. হযরত মাওলানা সুলতান যওক (দাঃ বাঃ)
দারুল মাআরিফ চট্টগ্রাম।
৯. হযরত মাওলানা তাফাজ্জুল হক (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, হবিগঞ্জ।

১০. হযরত মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, লালবাগ মাদ্রাসা।
১১.হযরত মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, বারিধারা ও চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা।
১২. হযরত মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা।
১৩. হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা।
১৪. হযরত মাওলানা গিয়াসুদ্দীন (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, বালিয়া মাদ্রাসা।
১৫. হযরত মাওলানা আনোয়াহ শাহ (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, জামিয়া এমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ।
১৬. হযরত মাওলানা আঃ হাই পাহাড়পুরী (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, লাল মাটিয়া মাদ্রাসা।
১৭. মুফতী ওয়াক্কাস (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, লাউড়ী মাদ্রাসা, যশোর।
১৮. হযরত মাওলানা এহসানুল হক সন্দ্বিপী
১৯. হযরত মাওলানা আব্দুল হক (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, জামিয়া ফয়জুর রহমান, ময়মনসিংহ।
২০. হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান (দাঃ বাঃ)
শায়খুল হাদীস, মাখযানুল উলূম, ময়মনসিংহ।

বর্তমানে সারাদেশে কয়েক হাজার মুহাদ্দিস রয়েছেন। যারা হাদীসের শিক্ষাদান কার্যে নিরত আছে। অধুনা কিছু কিছু মহিলাও হাদীসের অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

❖ আল-কুরআনুল কারীম – ই.ফা.বা. প্রকাশিত

❖ আহাদীস

১. বুখারী শরীফ — আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রাহ.

২. মুসলিম শরীফ — আবুল হাসান মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশায়রী রাহ.

৩. তিরমিযী শরীফ — আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী রাহ.

৪. আবু দাউদ শরীফ — সুলায়মান ইবনে আশআস আস-সিজিস্তানী রাহ.

৫. ইবনে মাজাহ শরীফ — আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ

৬. মুসনাদে আহমাদ — ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ.

৭. মুসনাদে দারেমী — আব্দুর রহমান আদ-দারেমী রাহ.

৮. সুনানে দারেমী — আব্দুর রহমান আদ-দারেমী রাহ.

৯. মাজমাউয যাওয়ায়েদ — নূরুদ্দীন আল হাইসামী রাহ.

১০. আল লু'লু' ওয়াল মারজান ফী মা ইত্তাফাকা আলাইহিশ শায়খান — ফুয়াদ আব্দুল বাকী

১১. নাসবুর রায়াহ আলা তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া — আল্লামা যায়লায়ী রাহ.

❖ শরহে আহাদীস

১. উমদাতুল কারী — আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ.

২. ফাতহুল বারী — আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী রাহ.

৩. ফায়যুল বারী — আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহ.

৪. ফায়যুল জারী লি হল্লি সহীহিল বুখারী

৫. ফাতহুল মুলহিম — আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রাহ.

৬. শরহু মুসলিম — ইমাম নববী রাহ.

৭. মাআরিফুস সুনান — আল্লামা ইউসুফ বিন নূরী রাহ.

৮. মুশকিলুল আসার — আল্লামা আবু জাফর ত্বহাভী রাহ.

৯. তাকরীবুল মাদারেক আল মুয়াত্তা মালেক

১০. মা তামুসসু ইলাইহিল হাযাহ — মাও. আব্দুর রশীদ নু'মানী রাহ.

১১. মেরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ — মোল্লা আলী ক্বারী রাহ.

❖ উসূলে হাদীস :

১. মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সলাহ আবূ আমর উসমান ইবনে আবদুর রহমান ইবনুস সলাহ
২. মাহাসিনুল ইসতিলাহ আলা হামিশে মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সলাহ সিরাজুদ্দীন ইবনে রাসলান
৩. তাওযীহুন নযর শরহু নুখবাতিল ফিকার
৪. নুযহাতুন নযর শরহু নুখবাতিল ফিকার
৫. শরহে নুখবার টিকা আল্লামা আব্দুল্লাহ টুঙ্কী রাহ.
৬. তানকীহুল ফিকরি ওয়ান নযর শরহু নুখবাতিল ফিকার মাওলানা আব্দুল মালেক
৭. তাদরীবুর রাবী আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ.
৮. আলফিয়াতুল ইরাকী আল্লামা যায়নুদ্দীন আল ইরাকী রাহ.
৯. শরহুল ইরাকী আলা মুকাদ্দামাতি ইবনিস সলাহ আল্লামা য়ায়নুদ্দীন আল ইরাকী রাহ.
১০. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস ড. মাহমূদ আত তাহহান
১১. ফাতহুল মুগীস আল্লামা সাখাভী রাহ.
১২. মুকাদ্দামায়ে মিশকাত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ.
১৩. আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীইল ইসলামী ড. মুসতাফা আস-সিবায়ী
১৪. দিরাসাত ফী হাদীসিন নববী ওয়া তারিখি তাদবীনিহী ড. মুসতাফা আল আযাম রাহ.
১৫. হুজজিয়্যাতুল হাদীস আল্লামা তকী উসমানী মুদ্দা.
১৬. আস–সুন্নাতুন নববিয়্যাহ আল্লামা আব্বাস মুতাওয়াল্লী
১৭. ইরশাদুল ফুহুল আল্লামা শাওকানী রাহ.
১৮. কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস –মুকাদ্দামায়ে এ'লাউস সুনান
আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী রাহ.
১৯. আদ-দুরারুস সামীনাহ মাওলানা আব্দুল মতীন
২০. আন নাহজুল হাদীস ড. আলী মুহাম্মাদ আন নাসার
২১. উলূমুল হাদীস ড. সুবহী আস-সালেহ
২২. যাফরুল আমানী আল্লামা আব্দুল হাই লাখনাভী রাহ.
২৩. আল ইতকান ফী উলূমিল হাদীস
২৪. আল ইতিবার আল্লামা হাযেমী রাহ.
২৫. কাফউল আসার ফি সাফয়ী উলূমিল আসার আল্লামা রাজীউদ্দীন ইবনুল হাম্বালী রাহ.
২৬. লামহাত ফী উলূমিল হাদীস
২৭. আত তাক্বরীব আলাত তাদরীব আল্লামা শাওক্বানী রাহ.
২৮. আর রিসালাহ ইলা আহলি মাক্কাহ
২৯. আহকামুল মারাসিল আল্লামা আল্লায়ী
৩০. ইখতিসারু উলূমিল হাদীস ইবনে কাসীর রাহ

৩১. আল বায়েসুল হাসীস আলা শরহে ইখতিসারি উলূমিল হাদীস
৩২. কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস — ইবনে রজব হাম্বলী রাহ.
৩৩. মা'রেফাতু উলূমিল হাদীস — হাকেম আবূ আব্দিল্লাহ নিশাপূরী রাহ.
৩৪. আর রফউ ওয়াত তাকমীল — আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী রাহ.
৩৫. তা'লীক আলার রাফয়ি ওয়াত তাকমীল
৩৬. ইরশাদু তুল্লাবিল হাকায়েক — আল্লামা শাওকানী/মুহিউদ্দীন আন নাবাবী রাহ.
৩৭. লামহাত মিন তারীখিস সুন্নাহ — শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রাহ.
৩৮. বুহূস ফী তারীখিস সুন্নাহ — ড. আকরাম যিয়া আল উমারী
৩৯. আল-মাওযূ'আত — আল্লামা ইবনুল যাওযীয়া রাহ.
৪০. আল-কিফায়াহ — খতীব বাগদাদী রাহ.
৪১. আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ'আহ — আল্লামা শাওক্বানী রাহ.
৪২. আস-সুন্নাতু কবলাত তাদবীন — ড. আজায আল খতীব রাহ.
৪৩. আল-মাসনূউ ফী মা'রিফাতি আহাদীসিল মাওযূ — মোল্লা আলী কারী রাহ.
৪৪. আল-লা'আলিল মাসনূআহ ফী আহাদীসিল মাওযূআহ — আল্লামা সুয়ূতী রাহ.
৪৫. আল-মূকিযাহ ফী ইলমি মুসতালাহিল হাদীস
৪৬. কিতাবুল ইলাল — ইমাম তিরমিযী রাহ.
৪৭. আল-ওয়াযউ ওয়াল ওয়াযিউন — ড. আবূ বকর রাহ.
৪৮. তুহফাতুল আশরাফ — আবুল হাজ্জায মিযযী রাহ.
৪৯. শুরূতুল আইম্মাতিল খামসা — আল্লামা হাযেমী রাহ.
৫০. তা'লীক আলা শুরূতিল আইম্মাতিল খামসা
৫১. কাওয়ায়েদুল হাদীস — জামাল উদ্দীন কাসেমী রাহ.
৫২. কাওয়ায়েদুত তাহদীস — আল্লামা আবুল কাসেম আফগানী রাহ.
৫৩. আল-ওয়াযউ ফিল হাদীস — ড. উমর ইবনে হাসান ফালতা
৫৪. তাদবীনে হাদীস — মানাযির আহসান গিলানী রাহ.
৫৫. তারীখে ইলমে হাদীস — মুফতী আমীমুল ইহসান রাহ.
৫৬. হাদীস সংকলনের ইতিহাস — মাওলানা আব্দুর রহীম রাহ.
৫৭. তারীখে তাদবীনে হাদীস — মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আযমী রাহ.
৫৮. জাল হাদীসের উতিবৃত্ত — ড. জামালুদ্দীন
৫৯. তাওযীহুন নযর ইলা উসূলিল আসার আল্লামা তাহের জাযায়েরী রাহ.

ফিকাহ-ফাতাওয়া

১. ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া রাহ.
২. আদ-দুররুল মুখতার — আলাউদ্দীন হাসকারী রাহ.

৩. ফাতহুল কাদীর — আল্লামা ইবনে হুমাম রাহ.
৪. রদ্দুল মুহতার — আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রাহ.

❖ উসূলে ফিকাহ

১. আত–তাহরীর — আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ.
২. আত–তামহীদ — আবূ শুকুর সালেমী রাহ.
৩. আল–ফাসাল ফিল উসূল — আল্লামা তাহের জাযায়েরী রাহ.
৪. আল–কিফায়াহ — খতীব বাগদাদী রাহ.
৫. বিদায়াতুল মুজতাহিদ — ইবনে রাশেদ মালেকী রাহ.
৬. আল–আশবাহ ওয়ান নাযায়ের — আল্লামা সুয়ূতী রাহ.
৭. আল–আজউবাতিল ফাসিলা — আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী রাহ.
৮. আল–মুসতাসফা — ইমাম গাযালী রাহ.
৯. মুকাদ্দামায়ে জামিউল উসূল — ইবনুল আসীর রাহ.
১০. আল–ফুরুক — আল্লামা কারাফী রাহ.
১১. তাবাকাতুল হানাবেলা — কাযী মুহাম্মাদ ইবনে আবী ইয়ালা রাহ.
১২. আল-মুনতাকা — আল্লামা যাহাভী রাহ.
১৩. নূরুল আনওয়ার (টিকা)
১৪. নিহায়াতুস সুল শরহু মিনহাজিল উসূল — জামাল আল আসনাভী রাহ.
১৫. উসূলুল ফিকাহ — আবূ যাহরা রাহ.
১৬. আল-মুওয়াফাকাত — আল্লামা শাতেবী মালেকী রাহ.
১৭. আর–রিসালাহ — ইমাম শাফেয়ী রাহ.
১৮. আত–তাসীস — আবূ যায়েদ আদ–দাবূসী রাহ.

❖ রিযাল

১. আসমাউস সাহাবা ওয়ার রুয়াত — ইবনে হাযাম যাহেরী রাহ.
২. মীযানুল এতেদাল — আল্লামা যাহাভী রাহ.
৩. তাহযীবুত তাহযীব — আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.
৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা — আল্লামা যাহাভী রাহ.

❖ বিবিধ

১. আহকামুল কুরআন — আবূ বকর আল জাসসাস রাহ.
২. আত–তারীখুস সাগীর — ইমাম বুখারী রাহ.

৩. আস-সাফাকাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল হিন্দ
৪. হিলয়াতুল আউলিয়া — ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ রাহ.
৫. আল-বা'সুল ইসলামী — ইসলামী পত্রিকা
৬. আল-ফাউযুল কাবীর — শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ.
৭. আল-মু'জামুল ওয়াসীত — অভিধান
৮. কিতাবুর রূহ — আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহ.
৯. জামউল বয়ান — ইবনে আব্দিল বার রাহ.

সমাপ্ত